হাদীস শরীফ

বিশুদ্ধ হাদীসের সংকলন, মহানবী সা-এর জীবনী, বংশ তালিকা, জীবন ও বাণী-বৈশিষ্ট্য, সংক্ষিপ্ত জীবন-পঞ্জী, পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি, মুহাদ্দেস ও হাদীসের ইতিহাস এবং গ্রন্থপঞ্জী

সংকলন ও সম্পাদনা :
রফিক উল্লাহ্ এম. এ.

হরফ প্রকাশনী ।। এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ।। কলকাতা-৭০০০০৭

প্রথম প্রকাশ :
হযরত মুহাম্মাদ সা-এর পবিত্র জন্মদিন
১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮
২৭ মাঘ ১৩৬৫

প্রকাশনা :
হরফ প্রকাশনী
এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা ৭০০০০৭

গ্রন্থনা :
বাঁধাই
২ সি, কালিসোম স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
আমিনূর রহমান

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড : ইহলৌকিক

দ্বিতীয় খণ্ড : পারলৌকিক

তৃতীয় খণ্ড : ইতিহাসমূলক

ভূমিকা

হাদীস কি ? : 'হাদীস' এই আরবী শব্দের সাধারণ অর্থ বাণী বা উপদেশ—শাস্ত্রীয় অর্থ নবী (সঃ)-এর বাণী, তাঁর কাজ এবং অন্যের কাজের প্রতি তাঁর সমর্থন। আল্লাহ্‌তা'লার কাছ থেকে প্রত্যাদেশ পেয়ে মহানবী মুহম্মদ (সঃ) অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়েছেন, সত্যের আলো জেলে তাদের সরল পথে চলার জন্যে কত উপদেশ দিয়েছেন, কিভাবে সরল পথে চলতে হয় নিজে যথাযথভাবে চলে সে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আবার কখনো বা সৎকর্মশীল মানুষের ন্যায়সঙ্গত পথচলাকে সমর্থন করে তাঁর আদর্শ ও উদাহরণকে পরিস্ফুটতর করেছেন। উপদেশ ও আদর্শ উদাহরণের মাধ্যমে দীন ইসলাম দিনে দিনে দৃপ্ত গতিতে অগ্রসর হয়েছে। নবী-(সঃ)-এর এই উপদেশবাণী, আদর্শ কার্যধারা এবং অন্যের কাজের প্রতি সমর্থনের ঐতিহাসিক বর্ণনার নামই 'হাদীস শরীফ'।

হাদীসের শ্রেণীবিভাগ : 'হাদীস' শব্দের এই অর্থ ও তাৎপর্যের কথা বিবেচনা করে হাদীসকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—১) হাদীসে কওলী (বা ক্বওলী), ২) হাদীসে ফেয়ে'লী, এবং ৩) হাদীসে তকরীরী (বা তক্‌রীরী)। ১) হাদীসে কওলীর বাংলা অর্থ বাণী বা আদেশমূলক হাদীস। সাহাবী-(সহচর)-দের প্রশ্নের উত্তরে অথবা তাঁদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নবী (সঃ) যে সব বাণী বা উপদেশ দান করেছেন সেগুলোই হাদীসে কওলী। ২) হাদীসে ফেয়ে'লীর অর্থ কার্যমূলক হাদীস। সহচরেরা নবী (সঃ)-কে যে সব কাজ করতে দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন সেগুলোই হাদীসে ফেয়ে'লী। আর ৩) হাদীসে তকরীরীর অর্থ সমর্থন বা গ্রহণমূলক হাদীস। সহচরেরা যখন বর্ণনা করেছেন যে অমুক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর সামনে অমুক কাজ করেছেন, কিন্তু নবী (সঃ) সে সম্পর্কে ভালোমন্দ কোন মন্তব্য করেন নি কিংবা কোন প্রতিবাদও করেননি তখন নবী (সঃ)-এর সেই নীরবতাজাত সমর্থনই হাদীসে তকরীরী।

বিশুদ্ধতার তারতম্য অনুসারে হাদীসকে আরো কয়েকটা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন, ১) সহীহ্ বা বিশুদ্ধ হাদীস, ২) হাসান বা উত্তম হাদীস এবং ৩) জয়ীফ বা দুর্বল হাদীস। যে সব হাদীসের মধ্যে কোন দোষত্রুটি নেই এবং যে সব হাদীসের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাসী (ঈমানদার) মানুষদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই, সেগুলোই সহীহ্ বা বিশুদ্ধ হাদীস। ধর্মভীরু সাধু ব্যক্তিগণ এবং পুণ্যশীল হাফেজ বা শ্রুতিধরগণ এসব হাদীস যুগে যুগে একই ভাবে বর্ণনা করেছেন। বিশেষভাবে বুখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীসগুলো এই পর্যায়ভুক্ত। আর সহীহ্ হাদীসের মত উচ্চ শ্রেণীর চরিত্র ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন হাফেজ এবং মুহাদ্দেসগণ¹-কর্তৃক বর্ণিত না হলেও যে সব হাদীস অবশ্যই বিশ্বাস এবং প্রতিপালনযোগ্য—সেগুলোই হাসান বা উত্তম হাদীস। অপরপক্ষে যে সব হাদীসের বর্ণনাকারীগণ অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর এবং যাঁরা ত্রুটি বা সংস্কারমুক্ত নন

---

¹ মুহাদ্দেস—হাদীস শাস্ত্রবিদ্।

[illegible]—কোরআন বা হাদীস কণ্ঠস্থকারী।

সেই সব হাদীসই জয়ীফ বা দুর্বল হাদীস। দুর্বল বলেই অনেকে এই হাদীসগুলোকে গরীব হাদীস নামেও আখ্যাত করে থাকেন।

হাদীসমাত্রেরই দুটি অংশ—বাইরে তার বর্ণনাকারীদের শৃংখল বা 'সনদ', ভেতরে আছে তার আসল বিষয়। এই আসল বিষয়টুকুই ঐ হাদীসের উপদেশ বা বাস্তব ঘটনা। একে 'মতন' বা পাঠ বলা হয়। দেহ ত্রুটিপূর্ণ হলে যেমন প্রাণ রুগ্ণ ও বিপর্যস্ত হয়, তেমনি হাদীসের বহিরঙ্গের বর্ণনাকারীরা দুর্বল চরিত্রসম্পন্ন হলে হাদীসের 'মতন' বা মূল বিষয়টাও বর্জনযোগ্য হয়। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের ওপরেই হাদীসের সহীহ্, হাসান প্রভৃতি উল্লিখিত শ্রেণীবিন্যাস নির্ভরশীল।

হাদীসের সঙ্গে কোরআনের সম্পর্ক কি ? : হাদীস এবং কোরআন দুইই পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে অন্বিত। কোরআন শরীফ ইসলাম ধর্মের মূল সংবিধান, হাদীস তার ব্যাখ্যা। মুসলমানদের ইহকাল ও পরকালের সুষ্ঠু জীবন-পরিচালনার উদ্দেশ্যে সকল বাদশাহের বাদশাহ্ আল্লাহ্‌তা'লা যে সংবিধান বা শাহী ফরমান প্রেরণ করেছেন তারই নাম কোরআন শরীফ। কোরআন শরীফের প্রথম অবতীর্ণ বাণী 'একরা'—যার অর্থ 'পাঠকর'। ঐ একরা থেকেই 'কোরআন' অর্থাৎ 'পঠনীয় গ্রন্থ'। 'কোরআন শরীফ' অর্থ মহাপাঠ্যগ্রন্থ। 'কোরআন' নামটি স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত। কোরআন শরীফ সমস্যাসংকুল মানব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অবশ্য-পঠনীয় সুমহান সংবিধানগ্রন্থ। সংবিধান বা শাহী ফরমান সূত্রাকার ও সংক্ষিপ্তই হয়। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চলার পথে উপযুক্ত রাজপ্রতিনিধি তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। আমাদের প্রিয় নবী এবং মহান পথপ্রদর্শক হজরত মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌তা'লার সেই সূত্রাকার সংবিধান-বাণী কোরআন শরীফকে আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে' বুঝিয়েছেন। এই ব্যাখ্যারই নাম হাদীস। আল্লাহ্‌র প্রেরিত পয়গম্বরের ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলে আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ ও সংবিধানকে উপযুক্তভাবে মর্যাদা দান করা বা তা যথাযথ ভাবে কার্যে পরিণত করা আমাদেরপক্ষে সম্ভব হত না।

শুধু তাই নয়, পয়গম্বরের ব্যাখ্যা ব্যতীত আমরা আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসরণ করতে গিয়ে হয়তো অনেক সময় আল্লাহ্‌র আদেশ-বিরুদ্ধ কাজই করে বসতে পারতাম। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা আদেশ করেছেন, 'যারাই স্বর্ণরৌপ্য জমিয়ে রাখবে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে না, তাদের ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে।' এ আদেশের সাধারণ অর্থ, স্বর্ণরৌপ্যমাত্রই আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে হবে—সঞ্চয় করে রাখলে মহা পাপ হবে। অর্থাৎ সঞ্চয় নিষিদ্ধ। কিন্তু ইসলাম ধর্ম তো সঞ্চয়কে নিষিদ্ধ (বা হারাম) ঘোষণা করেনি। সঞ্চয় না করলে মানুষ দান করবে কি করে—ফেৎরা দেবে কি করে, জাকাত দেবে কি করে? জাকাত তো নামাজ রোজার মতই ফরজ—ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ্ ও জাকাতের অন্যতম স্তম্ভ। সঞ্চয় না করলে এ ফরজ তো তরক হয়ে যায়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বোঝা যেতে পারে—আল্লাহ্‌তা'লার উক্ত আদেশের অর্থ সঞ্চয় করতে নিষেধ করা নয়। কোরআন শরীফের উক্ত আয়তের (বাক্যের) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ্ (সঃ) তাই বলেন, 'যে সব ধনসম্পদের জাকাত (৪০ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা ২½ ভাগ) দান করা হয় তা উক্ত আয়তের উদ্দেশ্যের আওতাভুক্ত নয়' অর্থাৎ পাপযুক্ত নয়।

(সঃ) ব্যাখ্যা করে বললেন যে উপযুক্ত জাকাত (Poor-Tax) দান করা হলে সোনারূপা তথা সর্বপ্রকার ধনসম্পদ সঞ্চয় করা ইসলামী বিধান মতে সিদ্ধ (বা হালাল)। আর এই জন্যেই হাদীস শরীফকে কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা বলা হয়। কোরআন শরীফে যে কথাটা সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে ফুটি-ফুটি করছে, হাদীস শরীফ তার পাপড়িগুলোকে একটা একটা করে ফুটিয়ে শতদলের মত বিকশিত করেছে।

হাদীস যে আল্লাহ্‌র বাণী কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা—সে প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লাও পবিত্র কোরআন শরীফে বলেছেন, 'আল্লাহ্‌তা'লা আরববাসীদের মধ্য থেকে এমন একজন রসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদের আল্লাহ্‌র বাণী সমূহ পাঠ করে' শোনাবেন, তাদের পবিত্র করবেন, তাদের আল্লাহ্‌র গ্রন্থ কোরআন এবং হেকমত তথা শরিয়ত শিক্ষাদান করবেন।' অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কোরআন শিক্ষাদান করার সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের হেকমত বা গভীর তত্ত্ব এবং শরিয়ত বা বিধিবিধান মানব সাধারণকে ব্যাখ্যা করে' বুঝিয়ে দেবেন। আর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মনগড়া কথা না বলে এই ভাবে কেবল আল্লাহ্‌র বাণী বা কোরআনেরই ব্যাখ্যা করবেন বলেই এবং নিজের জীবনে সেই কোরআনের আদর্শকেই রূপায়িত করবেন বলেই, পবিত্র কোরআন শরীফে স্বয়ং আল্লাহতা'লা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—'নবী নিজের মন থেকে বানিয়ে কিছু বলেন না, তিনি যাকিছু বলেন সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে অহীপ্রাপ্ত হয়ে সেই অহীর (অর্থাৎ প্রত্যাদেশের) বিকাশ সাধন করেন মাত্র।'। আর এই ভাবে অহীর বিকাশ বা ব্যাখ্যা না করে 'যদি তিনি কোন একটা কথাও নিজে নিজে বানিয়ে বলতেন, তাহলে' আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, 'আমি আমার সর্ববিনাশী হস্তদ্বারা তাঁর হৃদ্‌পিণ্ডকে ছিন্নভিন্ন করে দিতাম।' (কোরআন শরীফ)

তাই হাদীস ও কোরআনের মধ্যে কোথাও কোন যথার্থ বিরোধ নেই। যদি কখনো কোন বিষয় সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে বুঝতে হবে ব্যাখ্যায় কোথাও আমাদের ভুল হচ্ছে অথবা কোরআন-বিরুদ্ধ ঐ হাদীস মিথ্যা, অতএব পরিত্যাজ্য। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাই বলেন, 'আমার বাক্য আল্লাহ্‌র বাক্যকে বাতিল করতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ্‌র বাক্য আমার বাক্যকে বাতিল করতে পারে।' (মিশকাত)।

কোরআন ও হাদীসের পার্থক্য : কোরআন আল্লাহ্‌তা'লার বাণী, হাদীস আল্লাহ্‌র রসূলের বাণী। কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে অহী মারফৎ, হাদীস শরীফেরও মূলে অহী। কিন্তু পার্থক্য এই যে, কোরআনের ভাব (অর্থাৎ অর্থ) ও ভাষা (Text) দুইই অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহ্‌তা'লার কাছ থেকে অহী মারফৎ প্রাপ্ত, জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক নবী (সঃ)-এর সম্মুখে পঠিত এবং প্রত্যেক নামাজের মধ্যে মুসলমানগণ কর্তৃক তা পাঠ বা তেলাওয়াত করার হয়। তাই কোরআন শরীফকে 'অহীয়ে মত্‌লু' বা 'পঠিত প্রত্যাদেশ' (Inspired Revelation) বলা হয়। কিন্তু হাদীসের বিষয়বস্তু (ভাব, অর্থ) আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে অহীমারফৎ প্রাপ্ত হলেও জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে তা পঠিত হয়নি এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-ও সেই পাঠ অবিকল সেই শব্দ ও বাক্য-বিন্যাস সমেত প্রচার করেন নি। তাই হাদীস শরীফকে 'অহীয়ে গায়ের মতলু' বা অপঠিত প্রত্যাদেশ (Uninspired

Revelation) বলা হয়। 'অহীয়ে গায়ের মতলু'র ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ প্রথমে নবী (সঃ)-এর অন্তরে আসে—পরে নবী (সঃ)-এর মুখ দিয়ে তা নবীর নিজের ভাষায় প্রকাশিত হয়, আল্লাহ্‌ তা'লার ভাষায় নয়।

নবী (সঃ)-এর কালে হাদীস কি লেখা হত ?ঃ 'অহীয়ে মতলু' মারফৎ প্রাপ্ত কোরআন শরীফ জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) প্রমুখ সুনির্দিষ্ট অহী লেখকদের সাহায্যে লিখিত করে রাখার ব্যবস্থা করা হলেও রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর জীবৎ-কালে 'অহীয়ে গায়ের মতলু' দ্বারা প্রকাশিত হাদীস শরীফ লিখিত আকারে সংরক্ষিত করার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাও কোরআন শরীফ লিখিত হত বিচ্ছিন্ন-ভাবে—খেজুরের পাতা, চামড়া, হাড় ও কাঠ প্রভৃতি জিনিসপত্রের ওপরে। স্বভাবতঃ কোরআনের ঐ সব বিচ্ছিন্ন লিখিত অংশগুলো একালের বাঁধানো বইপত্রের মত সুদৃঢ়ভাবে গুছিয়ে বাঁধাই করে রাখা সম্ভব হত না। ফলে ঐ একই সময়ে একই পদ্ধতিতে হাদীস লেখার কাজ শুরু করা হলে কোরআন ও হাদীসের লিখিত অংশগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারত বা মিশ্রিত হতে পারত—এই আশঙ্কায় নবী (সঃ) তাঁর জীবদ্দশায় হাদীস লিখে রাখার কাজকে সাধারণভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং হজরত ওমর (রাঃ)-ও হাদীস লিখে রাখার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কোন কোন বিশেষ সাবধানী সাহাবীর ক্ষেত্রে যে নবী (সঃ) তাঁর নিষেধকে কিছু পরিমাণ শিথিল করে দিয়েছিলেন এমন প্রমাণ দুর্লভ নয়। যেমন, আবুহোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, 'এই সব হাদীস আমি রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর মুখে শুনেছিলাম ও লিখে রেখেছিলাম—এবং তাঁকে শুনিয়েছিলাম।' আবু হোরায়রা (রাঃ) ছাড়াও অন্য কোন কোন নবীসহচর (সাহাবী) যেমন আব্দুল্লাহ্‌-ইবনে-আমর (রাঃ)ও হাদীস লিখে রাখতেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, 'আব্দুল্লাহ্‌-ইবনে-আমর (রাঃ)র কাছে বেশী হাদীস থাকতে পারে, কারণ তিনি হাদীস লিখে রাখতেন, আমি হাদীস লেখায় বিশেষ তৎপর ছিলাম না।' আমর (রাঃ) এক হাজার হাদীসের একখানা সহিফা নবী (সঃ)-এর আদেশে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এক দুর্বল স্মৃতিসম্পন্ন আনসারীকে রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) হাদীস লিখে রাখার সম্মতি দিয়েছিলেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, 'একদিন এক আনসারী রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে অনুযোগ করল যে সে হজরতের কাছে যা শুনছে তা স্মরণ রাখতে পারছে না। হজরত (সঃ) তাকে তার ডান হাতের সাহায্য নিতে বললেন (অর্থাৎ লিখে রাখতে বললেন)।' (তিরমিজী)। হজরত আবুবকর (রাঃ) এবং হজরত আলী (রাঃ)-ও কিছু কিছু হাদীস সংকলন করেছিলেন। তবে সাধারণভাবে এবং ব্যাপকভাবে হাদীস লিখে রাখার কোন ব্যবস্থা তখন প্রচলিত ছিল না। এ প্রসঙ্গে সহীহ্‌ বুখারীর বিখ্যাত টীকাকার আলকাস্তালানী বলেন, 'সাধারণতঃ সাহাবী বা তাবেয়ী কেউ হাদীস লিখে রাখতেন না। তাঁরা পরস্পরকে মৌখিক-ভাবে হাদীস শিক্ষা দিতেন এবং অক্ষরে অক্ষরে তা কণ্ঠস্থ করে রাখতেন।'[২] একদিকে সেকালের আরবদের স্মরণশক্তি যেমন প্রখরতর ছিল, অন্যদিকে তাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানের অভাব তেমনি ভয়াবহভাবে ব্যাপকতর ছিল। এই সব নিরক্ষর সাধারণ মানুষদের মধ্যে লেখার পরিবর্তে মৌখিক আকারেই হাদীসের প্রচার ও প্রসার

আলকাস্তালানী—শরেহ্‌ বুখারী ৩য় পৃ.

সহজসাধ্য হবে ভেবে নবী (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের কালে হাদীস লিখে রাখার কাজকে বিলম্বিত ও নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল।

হাদীস লিখিত হ'বার ইতিহাস : কিন্তু চলমান কাল একদিন হাদীস লিখে রাখার পথের সবচেয়ে বড় বাধাটা দূর করে দিল। খলীফা আবুবকর (রাঃ)র নির্দেশে সাহাবী জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) কোরআন শরীফের যে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি সংকলিত ও লিপিবন্ধ করেছিলেন, তৃতীয় খলীফা হজরত ওসমান (রাঃ) তার অসংখ্য কপি প্রস্তুত করিয়ে সারা সাম্রাজ্যের দিকে দিকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করলেন। ফলে কোরআন শরীফের ব্যাপক প্রচার সাধিত হল। কোরআনের নির্ভুল পাঠ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অন্তরে অন্তরে নূরের আখরে মুদ্রিত হয়ে গেল। এখন আর কোরআনের মধ্যে হাদীসের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা রইল না। অন্যদিকে ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসার এবং অন্যান্য কারণজনিত ক্রমবর্ধমান জীবন-সমস্যার অস্বাভাবিক জটিলতার সমাধান পাওয়ার জন্য সমগ্র মুসলিম জগৎ পবিত্র হাদীস শরীফকে সংকলিত আকারে পেতে একান্তভাবে উৎসুক হয়ে উঠল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মুয়র বলেন, 'একশ বছরের মধ্যেই মুসলমানেরা (এশিয়ার) অক্সাস নদীর তীরভূমি থেকে উত্তর আফ্রিকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত জনপদ জয় করলেন এবং কোরআনের পতাকাতলে সেখানকার জনমণ্ডলীকে সমবেত করলেন। এই বিশাল সাম্রাজ্য হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সমসাময়িক আরবরাজ্য থেকে বহুলাংশে পৃথক ছিল।···কুফা, কায়রো, দামেস্ক প্রভৃতি লোকাকীর্ণ নগর গুলোর বিচার-কার্য পরিচালনার জন্য আইনের বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হল।' কিন্তু 'প্রত্যাদেশের (অর্থাৎ কোরআনের) অপরিসর' আয়তনের মধ্যে সেই ব্যাখ্যা সহজলভ্য হল না। তাই 'সমস্যাসমাধানের জন্য হাদীসের আশ্রয় গ্রহণের' কামনা বিশ্বমুসলিমের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবলতর হয়ে উঠল।[৩]

অন্যদিকে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য নানা কারণে উদ্ভূত অজস্র জাল বা 'মওজু' হাদীসের ছড়াছড়ি অবিলম্বে হাদীস শরীফকে লিখিত গ্রন্থের আকারে সংকলন ও সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা ও দাবীকে দিকে দিকে সোচ্চার করে তুলল। জাল হাদীসের জঞ্জালের তলায় আসল হাদীস প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যেতে বসল। গোঁড়া সুন্নী, শিয়া, খারেজী, মুতাজেলা, জিন্দিক ও সুফী সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তখন স্বকল্পিত হাদীস প্রচার করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। শিয়ারা হজরত আলীর বংশধরকেই খেলাফতের একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে তাঁদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করাব জন্যে নিতান্ত উদ্দেশ্যমূলক ভাবে হাদীস উদ্ধৃত করতে শুরু করেছেন। সুন্নী ও খারেজীরা ঠিক এর বিপরীত দাবীটাই বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত করে প্রচার করতে শুরু করেছেন। উদ্ধৃতিতে যেখানে আঁটছে না অত্যুৎসাহী অন্ধ সমর্থকেরা সেখানে মনের মত হাদীস বানিয়ে নিয়ে নিজ নিজ বক্তব্যকে জোরদার করছেন। ওদিকে জিন্দিকরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে দ্বিত্ববাদী ও স্বাধীনচেতা হয়ে উঠেছে। তারা আল্লাহর রসুলের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে। তখন ইমাম শাফেয়ী (রঃ) [খৃী. ৭৬৭-৮২০] ঘোষণা করলেন যে রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে অতিরঞ্জন করাও অবৈধ নয়। ফলে অতিভক্তির প্রাবল্যে অজস্র অতিরঞ্জিত জাল হাদীসের আবির্ভাব ঘটল। অন্য দিকে গ্রীক বিজ্ঞান-দর্শনের ভাবধারায়

[৩] Muir—Life of Mohammad—Introduction. Vol. I

ন্যাত মুতাজেলা সম্প্রদায় ঈমানের মূল শর্ত অস্বীকার করে ধর্ম-বিশ্বাসকে প্রমাণ ও বিচার সাপেক্ষ করে' তুলল। তারা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মত স্থূল দেহ-বিশিষ্ট রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে আকাশ ভেদ করে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাকে অসম্ভব বলে মনে করল এবং সেই যুক্তিতে 'মে'রাজ' বা 'নভোভ্রমণ'কে অস্বীকার করল। তারা অল্লাহ্‌র সর্বময় একত্বের দোহাই দিয়ে রসূল (সঃ)-এর সুন্নত পালন করাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করল। তখন ইমাম হাম্বলের (খৃঃ ৭৮০-৮৫৫) নেতৃত্বে গোঁড়ারা বিচার-বিরোধী হয়ে উঠলেন। সূফী সাধকরা 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি' প্রচার করতে লাগলেন আর বিষয়ীরা 'ইসলামে কোন বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসধর্ম নেই'—এই কথাটার ওপর অস্বাভাবিক জোর দিতে লাগলেন। ওয়াকিদির (Wakidi) মত কোন কোন ঐতিহাসিক এই ঘোলাপানিতে মৎস্য-শিকারের উদ্দেশ্যে তাঁদের পোষকতাকারী খলীফাদের দরবারের জাঁকজমক ও বাহ্যাড়ম্বরকে সমর্থন করতে গিয়ে নবী (সঃ) ও তাঁর অনুচরদের অনাড়ম্বর জীবনের পুণ্যস্মৃতি মুছে দিতে লাগলেন। উদ্দেশ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁরা নানান মিথ্যা ও কল্পিত কাহিনী প্রচার করতে লাগলেন।[৪] এসব তথ্যের প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা নানান কল্পিত হাদীস তুলে ধরতে লাগলেন। ফলে সংখ্যাতীত 'মওজু' বা জাল হাদীসের[৫] আবির্ভাবে মুসলিমজগতের ভাগ্যাকাশ দুর্যোগের কালোমেঘে ঘনঘোর হয়ে উঠল। পুণ্যশীল মানুষেরাও অস্বাভাবিক ভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিতে লাগলেন। ইমাম মুসলিম (রঃ)-র ভাষায়, 'হাদীসের বিষয় ছাড়া আর কোন বিষয়েই আমরা পুণ্যশীলদের এত বেশী মিথ্যা কথা বলতে দেখিনি।'[৬]

কিন্তু মেঘের আঁধারের পেছনেই সূর্যের আলোক প্রতীক্ষা করে। তাই এবার হাদীসের সংকটের ঘন অন্ধকার ভেদ করে' নতুন দিনের নতুন সূর্যালোক দিগন্ত রঞ্জিত করে উদয় হল। রসূল (সঃ)-এর কথা হিসেবে চালিয়ে দেওয়া এই সব মিথ্যা কথা বা জাল হাদীসের জঞ্জাল থেকে হাদীস-শাস্ত্রকে নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক

---

৪ 'The conflict spread even into history where to justify the luxury of the court, a school of historians of whom Wakidi is the chief, anxious to obliterate the memory of Muhammad's simple life, succeeded in fogging the later writers by picturing him and his companions as enjoying to the full all the pleasures which were at their command'. —Arabic Literature by H. A. R. Gibb.

কুফার কুখ্যাত জাল হাদীস রচনাকারী ইবনে আলী আউফাকে কুফার গভর্নর মুহম্মদ বিন সুলায়মান মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলে অনুতপ্ত ইবনে আলী বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমি ৪০০০ জাল হাদীস রচনা করেছি। ওর দ্বারা আমি হারামকে (নিষিদ্ধকে) হালাল (সিদ্ধ) এবং হালালকে হারাম করেছি। রোজার দিনে রোজা রাখা নিষেধ করেছি এবং অ-রোজার দিনে রোজা রাখার আদেশ দিয়েছি।' এরকম আরো অনেক দুর্জন ব্যক্তি বহু জাল বা মিথ্যা হাদীস রচনা করেছিলেন। সাহাব বিন সুরী বলেন, 'এদের রচিত হাদীসের সংখ্যা কমপক্ষে দশ হাজার হবে।' F. Karim —Al-Hadis: P.18.

৬ সহীহ্ মুসলিম এবং Nicholson's Literary History of Arabs.

করার উদ্দেশ্যে এবং সমসাময়িক সুবিশাল মুসলিম-বিশ্বের বিচিত্র সমস্যার সমাধানকে হাদীসের মাধ্যমে সর্বত্র সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ্ (সঃ)এর মৃত্যুর ৮৯ বছর পরে হিজরী ৯৯ সনে উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বা দ্বিতীয় ওমর হাদীস-সংকলনের কাজে উদ্যোগী হলেন। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ দ্বিতীয় খলীফা হজরত ওমর (রাঃ)-র দৌহিত্রীর পুত্র। আচারে ও আচরণে তিনি ধর্মপ্রাণ খলীফা ওমর (রাঃ)-কেই অক্ষরে অক্ষরে অনুকরণ করতেন। তাঁরই মত একনিষ্টভাবে তিনি নামাজ-রোজা করতেন, শততালি যুক্ত জামা পরতেন, সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন, এবং নিজের সর্বস্ব রাষ্ট্রের ধনাগারে জমা দিয়ে রাষ্ট্রের কাছ থেকে দৈনিক মাত্র দুই দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ভাতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। তাই ইসলামের ইতিহাসে তিনি 'দ্বিতীয় ওমর' নামে বিখ্যাত। তিনি তাঁর-নিযুক্ত মদীনার গভর্নর আবুবকর ইবনে হযমকে হাদীস সংকলনের কাজে অগ্রসর হবার জন্য আদেশ দিলেন। লিখলেন, 'আমার আদেশ—আপনি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এক-একটা হাদীস তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করুন এবং লিখে রাখুন। আমার ভয় হচ্ছে, এরকম না করলে একদিন এ জ্ঞানভাণ্ডার বিলুপ্ত হয়ে যাবে—এই জ্ঞানভাণ্ডারের রক্ষক সাহাবী ও তাবেয়ীগণ[৭] দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করছেন।' (বুখারী শরীফ)।

ফলে এই হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই হাদীস সমূহ গ্রন্থাকারে সংকলন করার ব্যাপক প্রয়াসের একটা বান ডেকে গেল। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুয়র বলেন, 'হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রায় একশ বছর পরে খলীফা দ্বিতীয় ওমর প্রচলিত হাদীসগুলোকে সংগ্রহ ও সংকলিত করার জন্য একটা বৃত্তাকার আদেশ দিলেন। এইভাবে যে কাজের সূত্রপাত হল, প্রবল বেগে তা অগ্রসর হতে লাগল।' রাবী অর্থাৎ বর্ণনাকারী নামে একশ্রেণীর হাদীস-বর্ণনাকারীর আবির্ভাব ঘটল। তাঁরা এই হাদীস সংগ্রহ করার জন্যে তাঁদের 'জীবন যৌবন ধনমান' সব কিছু উৎসর্গ করে দিলেন। প্রথমযুগের এই সব রাবীদের মধ্যে রাবী-বিন-সাবিহ এবং সাঈদ-বিন-আবি-আরুয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা এঁদের সংকলিত হাদীসের প্রত্যেক অধ্যায়কে পৃথক গ্রন্থাকারে এবং ধর্মীয় বিধান সমূহকে একত্রিত আকারে সজ্জিত করেছিলেন। এরপর হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে ইমাম মালেক বিন আনাস (রঃ) প্রচলিত হাদীস থেকে চয়ন করে 'মুয়াত্তা' অর্থাৎ 'সমতল পথ' নামক একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর হাদীসগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলন। দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে আব্দুল্লাহ্ বিন মুসা, মুসাদ্দাদ-বিন-মনির-বসরী, নঈম-বিন-হাম্মাদ-খাজায়ী মিসরী প্রমুখ একদল তরুণ মুহাদ্দেস হাদীস-সংকলনের কাজে অগ্রসর হলেন এবং প্রত্যেকেই এক একটা মসনদ রচনা করলেন। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আওযায়ী, ইমাম যোহ্‌রী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজী, ইমাম আবু দাউদ,

---

৭ যিনি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)কে দেখেছেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন তাঁকে সাহাবী বা সহচর বলে। সাহাবীর বহুবচন অসহাব। যিনি সাহাবীকে দেখেছেন তাঁকে তাবেয়ী বলে। তাবেয়ীর বহুবচন তাবেয়ীন। যিনি তাবেয়ীকে দেখেছেন তাঁকে তাবেয়ে-তাবেয়ীন বলে। হাদীস-সংকলক ও হাদীস-বিশেজ্ঞদের মুহাদ্দেস বলে। এঁদের মাধ্যমেই রসুলুল্লাহ্ (সঃ)এর বাণী বা হাদীস সংগৃহীত হয়েছে। ইমাম বুখারী (রঃ) একজন মুহাদ্দেস।

ইমাম নাসায়ী প্রমুখ শত শত হাদীস শাস্ত্রজ্ঞ মুহাদ্দেস রসূলুল্লাহ্ (সঃ)এর হাদীস সমূহকে গ্রন্থাকারে সংকলিত করে প্রকাশ করতে লাগলেন। এই ভাবে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে হাদীস সঙ্কলনের সংখ্যা ১৪৬৫ তে গিয়ে দাঁড়াল।[৮]

এই বিপুল সংখ্যক হাদীস-গ্রন্থের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায় মাত্র ৪ খানা এবং সুন্নী সম্প্রদায় মাত্র ৬ খানা হাদীসকেই সহীহ্ বা বিশুদ্ধ বলে স্বীকার করেন। সুন্নী সম্প্রদায়ের এই ৬ খানা হাদীসই মুসলিম-জগতে 'সিহাহ্ সেত্তা' বা 'বিশুদ্ধ ছয় হাদীস' নামে সুপরিচিত। এই 'বিশুদ্ধ ছয় হাদীসের' প্রথম হাদীসের নাম সহীহ্ বুখারী, দ্বিতীয় সহীহ্ মুসলিম, তৃতীয় সুনানে আবু দাউদ, চতুর্থ জামেয়ে তিরমিজী, পঞ্চম জামেয়ে নাসায়ী এবং ষষ্ঠ সুনানে ইবনে মাজা। অনেকে সুনানে ইবনে মাজার পরিবর্তে ইমাম মালেকের মুয়াত্তা বা মসনদ পাককে বিশুদ্ধ ছয় হাদীসের অন্তর্ভূক্ত করেন। এদের মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফকে আবার 'সহীহায়েন' বা 'দুই বিশুদ্ধ হাদীস' নামে অভিহিত করা হয়।

এই সব সঙ্কলনের ক্ষেত্রে হাদীস-বিশেষজ্ঞরা যে নিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধের পরিচয় দিলেন বিশ্বের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। এই নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের অকৃত্রিমতার জন্যেই রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বহুকাল পরে সঙ্কলিত হলেও হাদীস-গুলো সম্পূর্ণ অবিকৃত এবং বিশ্বাসযোগ্য। কারণ সঙ্কলকদের সামনে ছিল আল্লাহ্‌র ভয় আর আল্লাহ্‌র রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী—'আমার ভবিষ্যৎ-অনুবর্তীদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকবে যারা তোমাদের কাছে এমন সব হাদীস বর্ণনা করবে যা তোমরা কখনো শোননি কি তোমাদের পূর্বপুরুষেরাও কখনো শোনেনি, অতএব তোমরা তাদের কাছ থেকে সাবধান থাকবে।' ঐ সব জাল হাদীস বর্ণনাকারীদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। ওদের জন্য নির্ধারিত হবে জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নি-নিবাস। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ভাষায়—'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার সম্পর্কে মিথ্যা হাদীস প্রচার করে সে নরকের মধ্যে তার গৃহ নির্মাণ করুক।' (বুখারী)। 'কল্পনা হতে সতর্ক থাক, কারণ কল্পনাই সর্বাপেক্ষা মিথ্যা হাদীস।' (মিশকাত)। অতএব হাদীস সঙ্কলনের কাজে হাদীস-বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দেসগণ কল্পনামুক্ত সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। আধুনিকতম তর্কবিজ্ঞানে (Logic এ) পরোক্ষজ্ঞান (Indirect Knowledge) যে পদ্ধতিতে অবিকৃতরূপে আহৃত হয় হাদীস আহরণের এ পদ্ধতিকে তার চেয়েও নিপুণ বললে অত্যুক্তি করা হয় না। হাদীস-সংগ্রহের এই সঠিক নিয়মকানুনকে কেন্দ্র করে 'উসূলে হাদীস' বা 'হাদীস প্রমাণ ও পরীক্ষা করার নিয়ম-কানুন' নামে একটা বিশেষ শাস্ত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। এই শাস্ত্রের গ্রন্থসংখ্যা অসংখ্য।

উপযুক্ত সাক্ষীর মাধ্যমে যেমন বহু জটিল বিবাদের সঠিক বিচার কার্য সম্পাদন করা যায়, তেমনি যথাযোগ্য সাক্ষ্যদাতাদের মাধ্যমেই সঠিক বা বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ সংগ্রহ করা যায়। সাক্ষ্যদাতাদের (বা রাবীদের) নাম-তালিকাকে সংশ্লিষ্ট হাদীসের 'সনদ' এবং ঐ সনদ মুখে মুখে বর্ণনা করাকে 'ইস্‌নাদ' বলা হয়। জনাব আল্লামা নেছারুল হক সাহেব বলেন, 'হাদীসের সনদ মুখে মুখে আবৃত্তি করাকে ইসনাদ বলা হয়। তবে সনদ ও ইসনাদকে কেউ কেউ একই অর্থে ব্যবহার করেন।'[৯] সনদের মধ্যে লক্ষ্য

---

[৮] Hughe's Dictionary of Islam—Art Tradition.

[৯] বঙ্গানুবাদ মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড

করতে হয় যে, ১) যত শত বা সহস্র বৎসর পরে ঐ হাদীস সংগৃহীত ও সংকলিত হোক না কেন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) থেকে আরম্ভ করে যতজন সাক্ষীর মাধ্যমে হাদীসটা সংগৃহীত হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের নাম এবং পরিচিতি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা। কোন একজনের নাম বা পরিচয় বাদ পড়লে ঐ হাদীস গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। ২) দ্বিতীয়ত, লক্ষ্য করতে হয় যে, সাক্ষ্যদাতাদের নাম, ঠিকানা, গুণাবলী, স্বভাবচরিত্র এবং কোন্ কোন্ শিক্ষকের কাছে তাঁরা শিক্ষালাভ করেছেন—তা সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লেখা হয়েছে কিনা। ৩) তৃতীয়তঃ লক্ষ্য করতে হয় যে, আগাগোড়া প্রতিটি সাক্ষীই জ্ঞানী সত্যবাদী, সচ্চরিত্র, ভদ্র ও পরহেজগার কিনা। ৪) চতুর্থতঃ লক্ষ্য করতে হয় যে; প্রতিটি সাক্ষীর অর্থাৎ রাবী বা বর্ণনাকারীর স্মরণ-শক্তি সত্যসত্যই সুদৃঢ় কিনা।

'সনদ' বা সাক্ষ্যদাতাদের মাধ্যমে কিভাবে মুহাদ্দেস অর্থাৎ হাদীস-বিশেষজ্ঞগণ বিশুদ্ধ হাদীস সংগ্রহ করেন একটা উদাহরণের সাহায্যে সে বিষয়টাকে পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া যাক। 'ইন্নামাল আ'মালো বিন্নিয়ত'—অর্থাৎ 'আমল বা কাজ উদ্দেশ্য বা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল'—রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এই বাণী বা হাদীস বুখারী শরীফে আছে। কিন্তু ইমাম বুখারী রঃ (হি. ১৯৪-২৫৬/খৃী. ৮১০-৮৭২) ঐ হাদীসটি পেলেন কোথায়? তিনি তো আর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মুখে ঐ হাদীসটি শোনার সৌভাগ্য লাভ করেননি, কারণ তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মৃত্যুর (হি. ১১/খৃী. ৬৩২) প্রায় দু'শ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে "তিনি (অর্থাৎ ইমাম বুখারী রঃ) বলেন, বিশিষ্ট মুহাদ্দেস হোমায়দী আমাকে শিক্ষাদান করে' আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি (অর্থাৎ হোমায়দী) সুফিয়ান নামক মুহাদ্দেসের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে' তাঁর মুখে শুনেছেন, তিনি (সুফিয়ান) ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আনসারীর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে' তাঁর মুখে শুনেছেন, তিনি (ইয়াহ্ইয়া) মুহম্মদ ইবনে ইব্রাহীম তায়মীর কাছে শিক্ষা লাভ করে সাক্ষ্যগ্রহণ করেছেন যে; তিনি (মুহম্মদ) আলকামা ইবনে আবি অাক্কাছের মুখে নিজ কানে শুনেছেন, তিনি (আলকামা) ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে মিম্বারের (মসজিদের বেদীর) ওপরে দাঁড়িয়ে সর্বসাধারণের সামনে এই ঘোষণা করতে শুনেছেন যে—আমি নিজের কানে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে বলতে শুনেছি—'আমল নিয়তের ওপরে নির্ভরশীল।'"[১০] অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মুখ থেকে ঐ হাদীসটি যিনি স্বকর্ণে শুনিয়েছিলেন তিনি হলেন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী নামে পরিচিত ওমর ফারুক (রাঃ)। অতএব তাঁর সত্যনিষ্ঠতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এবং তিনি যে নবীর বাণী হাদীস আমাদের দান করেছেন তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তিনি ছাড়া আরো যে পাঁচজন সাক্ষ্যদাতা বা বর্ণনাকারীর মাধ্যমে সপ্তম ব্যক্তি ইমাম বুখারী (রঃ) হাদীসখানা সংগ্রহ করেছেন তাঁরাও সবাই সত্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান এবং প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বলে' ইতিহাস-বিখ্যাত। আর ইমাম বুখারী (রঃ) তো স্বয়ং সত্যসর্বস্ব। অতএব ঐ সাক্ষীতালিকা বা চরিত্রবান বর্ণনাকারীদের সনদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীসটি মিথ্যা হতে পারে না।

কিন্তু ঐ সাক্ষীতালিকাবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের চারিত্রিক পবিত্রতা যাচাই করার

[১০] বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড—আজিজুল হক অনূদিত।

উপায় কি? উপায় হল 'আসমাউর রেজাল' নামে পরিচিত হাদীস-বর্ণনাকারী পাঁচ লক্ষ রাবী বা সাক্ষীর বিস্তারিত জীবনেতিহাস। এই আসমাউর রেজালের কষ্টিপাথরে হাদীস-বর্ণনাকারীদের চরিত্র যাচাই করা না হলে সে হাদীস গ্রহণ-যোগ্য হয় না। এই 'আসমাউর রেজাল' প্রসঙ্গে বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ স্প্রেঙ্গার 'আল-এসাবাহ্' নামক গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন, 'অতীতে বা বর্তমানে পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যে জাতি মুসলমানদের মত আসমাউর রেজাল শাস্ত্রের আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। সেই শাস্ত্রের সাহায্যে পাঁচ লক্ষ মানুষের জীবনেতিহাস জানা যায়।'

সনদ-বর্ণিত সাক্ষীদের চরিত্র ও নির্ভরযোগ্যতা যে কি অপরিসীম সাবধানতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে যাচাই করে তবেই এক একটা হাদীসকে সঠিক বা বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করা হত তার একটা বিস্ময়কর উদাহরণ আছে। কথিত আছে, মক্কা-মদীনায় হাদীস-সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত করে' ইমাম বুখারী (রঃ) খবর পেলেন, অমুক জায়গায় অমুক লোকের কাছে একটা হাদীস পাওয়া যাবে। খবর পেয়ে শত শত মাইল পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে' তিনি তার কাছে উপস্থিত হলেন। কিন্তু গিয়ে দেখলেন, লোকটা ভুষির একটা টুকরী দেখিয়ে একটা ঘোড়া ধরার চেষ্টা করছে। কাছে গিয়ে দেখলেন, টুকরীতে ভুষি বা অন্য কিছুই নেই—টুকরী শূন্য। তখন তিনি ভাবলেন, এ তো দারুণ ধোকাবাজ লোক! যে লোক একটা পশুকে এমন ভাবে ধোকা দিতে পারে, নাম কেনার লোভে হাদীসের ব্যাপারে সে তো অনায়াসে তাঁকেও ধোকা দিতে পারে। অতএব তিনি ঐ অমানুষিক পরিশ্রম ও পদব্রজে শত শত মাইল পথপরিক্রমার পর তার কাছ থেকে সে হাদীস গ্রহণ না করেই ফিরে গেলেন।

এই ভাবে পরিশ্রম, নিষ্ঠা, যুক্তিবিচার এবং উসূলে হাদীসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে' 'হাদীসসম্রাট' ইমাম বুখারী (রঃ) এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ইমাম মুসলিম (রঃ) হাদীস সংগ্রহ করেছেন। এঁদের প্রতিটি হাদীস তাই সহীহ্ বা বিশুদ্ধ বলে আজ বারো শ বছরেরও অধিক কাল ধরে সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃত। এঁরা শত সহস্র সাক্ষ্যদাতার দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে লক্ষ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর চালুনীতে যেমন করে' আটা চালে, তেমনি করে সেই হাদীসগুলোকে সুক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে' সেই বিপুল সংখ্যক হাদীসের মধ্য থেকে সামান্য কয়েক হাজার মাত্র হাদীস নিয়ে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন।' ইমাম বুখারী (রঃ) ৬ লক্ষেরও অধিক হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। তার মধ্য থেকে ১৮০০ জন সাক্ষ্যদাতার মাধ্যমে মাত্র চার হাজার হাদীস সংকলন করেছেন। ইমাম মুসলিম (রঃ) তিন লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। তার মধ্যে থেকে বাছাই করে মাত্র ১২০০ হাদীস নিয়ে তিনি তাঁর মুসলিম শরীফ সংকলন করেছেন। তবে তকরারী হাদীস বাদ দিলে সহীহ্ বুখারীর মত সহীহ্ মুসলিমের হাদীস সংখ্যা চার হাজারই হয়। ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম সম্মিলিত ভাবে 'আসমাউর রেজাল' বর্ণিত পাঁচ লক্ষ রাবীর মধ্যে সচরাচর পরিচিত ৮৫ হাজার রাবী বা সাক্ষ্যদাতাকে সুক্ষ্ম বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করেছিলেন। তারপর দুধ মন্থন করে যেমন ভাবে মাখন বের করে' নেওয়া হয় সেইভাবে সেই বিপুল সংখ্যক রাবীদের সর্বদিক দিয়ে যাচাই করে মাত্র ২৩০৫ জন রাবীকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বলে' বাছাই করে' নিয়েছিলেন।

পরে তাঁদের সাক্ষ্যদ্বারা সংগৃহীত হাদীস সংকলিত করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) মক্কা, মদীনা, ইয়েমেন, কুফা, বাগদাদ, বসরা, সিরিয়া প্রভৃতি মুসলিম জগতের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রগুলো সফর করে দশ লক্ষ (কারো কারো মতে সাতলক্ষ পঞ্চাশ) হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন এবং লক্ষাধিক হাদীস কণ্ঠস্থ করেছিলেন। তারপর সেই বিপুল সংখ্যক হাদীস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করার পর মাত্র ৩০ হাজার হাদীস বাছাই করে নিয়ে তিনি তাঁর সুবিখ্যাত মসনদ রচনা করেছেন। পরে তাঁর দুই পুত্র ওর সঙ্গে আরো ১০ হাজার হাদীস সংযুক্ত করেছেন। হাদীস সম্বন্ধে ইমাম হাম্বলের ঐ মসনদখানিই আজো বৃহত্তম গ্রন্থ। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) পাঁচ লক্ষ হাদীস মন্থন করে তাঁর 'সুনানে আবু দাউদ' গ্রন্থে মাত্র চার হাজার হাদীসের স্থান দিয়েছেন। পূর্বে যে 'সিহাহ্ সেত্তা' বা 'বিশুদ্ধ ছয় হাদীসের' উল্লেখ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এ নিয়মের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রয়োগ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করার মত।

কিন্তু কেবল 'মুয়াত্তা' বা 'সমতল' পথ ব্যতীত 'সিহাহ্ সেত্তার' ৬ খানা হাদীসই একই কালে সংকলিত হয়েছে। তাই ঐসব গ্রন্থের সংকলক মুহাদ্দেসগণ পরস্পরের গ্রন্থ চোখে দেখার সুযোগ পাননি। ফলে একই হাদীস বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অনেক সময় আবার একই হাদীস একই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাবসাদৃশ্য বশতঃ অপরিবর্তিত অথবা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে পুনরুল্লিখিত হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিটি হাদীসের পশ্চাতে সনদ বা বর্ণনাকারীদের দীর্ঘনাম-তালিকা বর্ণিত হয়েছে। ফলে সাধারণ হাদীস-পাঠকদের পক্ষে হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়নের পথে পুনরুক্তি ও বর্ণনাকারীদের নাম বাহুল্যজনিত গোলকধাঁধার বাধা সৃষ্টি হয়েছে। এই সব অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে আল্লামা হাফেজ আবুল হোসেন বিন রাজী বিন মাবিয়া বিশুদ্ধ হাদীস-গুলোকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করলেন এবং বর্ণনাকারীদের দীর্ঘশৃঙ্খল বা নাম-তালিকা বর্জন করলেন। তাঁর হাদীস সংকলনের নাম 'তাজরীদুল আহাদীস।' এরপর ৫২০ হিজরীতে আবুল হোসেন বিন রাজীর মৃত্যুর পর আল্লামা মাজদুদ্দীন আবুস্সায়াদাত 'জামেয়েল উসুল' নাম দিয়ে উক্ত তাজরীদুল আহাদীসকে নতুন আকারে প্রকাশ করলেন। ৬০৬ হিজরীতে মোসুলে তাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটে। মাজদুদ্দীনের মৃত্যুর পর ঐ 'জামেয়েল উসুলের' তকরীরী বা সমর্থনমূলক হাদীসগুলো বর্জন করে' কাজীউলকুজ্জাত আল্লামা শরফুদ্দীন ঐ হাদীসের একটা নতুন ধরনের সংস্করণ প্রকাশ করলেন। এরপর ৯০৭ হিজরীতে আল্লামা আব্দুর রহমান বিন শিবানী ঐ হাদীসের একটা অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করলেন। এই সংস্করণে তিনি হাদীসের ভাষাকে সহজ ও সরল করলেন, কঠিন কঠিন হাদীসের অর্থ সন্নিবেশিত করলেন, এবং কতকগুলো হাদীস বর্জন করে কিছু কিছু নতুন হাদীস সংযুক্ত করলেন।

এরপর প্রায় পাঁচশ বছর হাদীস সংকলনের ইতিহাসে নিশ্চেষ্টতার অন্ধকারময় যুগ। এই অন্ধকারময় যুগের অবসানে ১৩২৩ হিজরীতে হাদীস সম্পর্কে নতুন প্রয়াসের আলো জ্বলে উঠল ভারতবর্ষে। হায়দারাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি মৌলবী সৈয়দ আবুল হোসেন সাহেব ঐ 'জামেয়েল উসুল' নামক হাদীসের একখানা উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করলেন। বর্তমান দুষ্প্রাপ্য ঐ উর্দু অনুবাদের নাম 'তালখিসাহ্ সিহাহ্'। কিন্তু এই খানেই ভারতীয় মুহাদ্দেসগণের প্রয়াস নিঃশেষিত

হয়ে গেলনা। তাঁরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেসগণদ্বারা সংকলিত 'মিশকাত' বা 'মিশকাতুল মাসাবিহ্' নামক হাদীস-সংকলনের সঙ্গে তাঁদের অনলস কর্মপ্রয়াস যুক্ত করে দিলেন। মিশকাতের সঙ্গে উপরোক্ত 'জামেয়েল উসূলের' কোন সম্পর্ক না থাকলেও এটা 'সিহাহ্ সেত্তা' এবং অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীসের একটা নিষ্ঠাপূর্ণ সংকলন। এতে 'মুয়াত্তার পরিবর্তে ইবনে মাজা'কে 'সিহাহ্ সেত্তার' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সিহাহ্ সেত্তা এবং অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীস সহ মোট ৪৪৩০ টি হাদীস নিয়ে মহীউস্সুন্নত আবু মুহম্মদ হোসায়েন ইবনে মাসউদ 'মিশকাত' নাম দিয়ে ঐ বিশ্ববিখ্যাত হাদীস সংকলন খানা প্রকাশ করেন। ৫১৬ হিজরীতে মহীউস্সুন্নত পরলোকগমন করেন। পরে শাহাবুদ্দীন ফজল উল্লাহ বিন হোসায়েন তরকী হানাফী 'তফবীর' নাম দিয়ে এর একখানা ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। 'তনবীর' নাম দিয়ে শেখ মুহম্মদ বিন মুজাফ্ফা খালখালী আর একখানা অনুবাদ প্রকাশ করেন। এরপর 'মিশকাতুল মাসাবিহ' নাম দিয়ে শেখ অলীউদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ ওরফে খতীব তাবরেজী এর একখানা নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতে মোট ২৪৩৪ টি সহীহ (বিশুদ্ধ) এবং ২০৫০ টি হাসান (উত্তম) হাদীস সংকলিত হয়েছে। মুসলিম জগতে হাদীসের ব্যাপক প্রচার বর্তমান এই গ্রন্থটিরই ওপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। এরপর 'আলকাশেফ' নাম দিয়ে অলীউদ্দীনের ওস্তাদ মোঃ হোসায়েন বিন আব্দুল্লাহ্ তীবী (হি. ৭৪৩) ঐ গ্রন্থের একখানা শরাহ (অর্থাৎ টীকা বা ভাষ্য) প্রকাশ করেন। এটাই মিশকাতের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ শরাহ্। এরপর মোল্লা আলী তারেমী আকবরাবাদী (হি. ৯৮১) 'শরাহ মিশকাত' রচনা করেন। পরে দিল্লীর সুবিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও মুহাদ্দেস শেখ আব্দুল হক দেহলবী (হি. ১০৫২) ভারত-সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে 'আশেয়াতুল লমআত' নাম দিয়ে ঐ গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ ও আরবী শরাহ (ভাষ্য) প্রকাশ করেন। চারখণ্ড সম্পূর্ণ মিশকাতের এই সুবৃহৎ এবং সুবিখ্যাত শরাহ্-এর ভূমিকায় হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন চরিত, হাদীসের ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও শ্রেণীবিন্যাস সন্নিবেশিত করা হয়। এরপর উনবিংশ শতাব্দীতে দিল্লীর বিখ্যাত মুহাদ্দেস মাওলানা নওয়াব কুতুবুদ্দীন খাঁ দেহলবী (হি. ১২৭৯) মিশকাতের একটা উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন। 'মজাহারে হক' নামে পরিচিত ঐ গ্রন্থে তিনি প্রথমে প্রত্যেক হাদীসের উর্দু অনুবাদ করেছেন। তারপর মুহাদ্দেস শেখ আব্দুল হক দেহলবীর 'আশেয়াতুল লমআত'-এর উর্দু অনুবাদ এবং তাঁর গুরু হজরত শাহ্ ইসহাক দেহলবীর আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার উল্লেখ করেছেন। উর্দুপ্রেমিক পাঠক-পাঠিকাদের কাছে 'মজাহারে হক'-এর সমাদর দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিহাসের এই ধারায় জনাব আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী এবং শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলবীর নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাদীস সংকলনের এ ঐতিহাসিক ধারায় আমাদের এ সামান্য প্রয়াস নিতান্ত নগণ্য। সাগরের সঙ্গে যেমন গোষ্পদের তুলনা চলেনা, তেমনি ঐ সব বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দেসগণের অসাধারণ প্রয়াসের সঙ্গে আমাদের এ অক্ষম প্রয়াসের কোন তুলনাই হয়না। তবু আমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মহান আদেশ 'বাল্লেগু আন্নি অলাও আয়াহ্'—'আমার কাছ থেকে একটা বাক্য হলেও তা সকলের কাছে পৌঁছে দাও' এবং পশ্চিম বাংলার হাদীস-প্রেমিক পাঠক-পাঠিকাদের প্রাণের পিপাসার কথা স্মরণ করে মহানবী মুহম্মদ (সঃ)-এর বাণী ও কর্মাদর্শ এই হাদীস সংকলনের মাধ্যমে যৎসামান্য পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। অনুবাদ আমরা করিনি, স্বনামধন্য হাদীস-

শাস্ত্রবিদ্‌দের অনুবাদকে আমরা সংকলিত করেছি মাত্র। তবে অনুবাদের ভাষাকে ঢাকার বাংলা একাডেমীর আদর্শ অনুসারে সরল, প্রাঞ্জল ও সর্বজন-বোধ্য করার চেষ্টা করেছি।

'পৃথিবী হল পরলোকের শস্যক্ষেত্র'[১১]—এই মহান উপদেশবাণী স্মরণ করে হাদীসগুলোকে আমরা প্রধানত ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক দুটি খণ্ডে বিভক্ত করেছি। ইহলোকে পবিত্র জীবন-যাপনের মাধ্যমে কিভাবে পরলোকের পবিত্রতম বেহেশ্‌তী জীবন লাভ করা যায়—এতে তা সুস্পষ্ট হবে। জীবনের বিচিত্র জটিল সমস্যার সমাধানে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় হাদীস যাতে আমরা অল্প আয়াসে খুঁজে পেতে পারি তার জন্যে ঐ দুটি খণ্ডকে আবার অনেকগুলো অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়ানুগ নামকরণ করেছি। হাদীস শরীফ কোরআন শরীফেরই ব্যাখ্যা। তাই প্রায় প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে পবিত্র কোরআন শরীফের কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি মুদ্রিত করে তারপর ঐ বিষয় সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে সন্নিবেশিত করেছি। হাদীস-সম্রাট ইমাম বুখারী (রঃ)-ও তাঁর বহুবিখ্যাত বুখারী শরীফে কোরআনের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির পর হাদীসগুলোকে সন্নিবেশিত করেছেন।[১২] কোরআনের উদ্ধৃতির পাশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সূরার ক্রমিক সংখ্যা এবং সঙ্গে বন্ধনীমধ্যে আয়াত বা বাক্যের সংখ্যা দিয়েছি। কোথাও বন্ধনী মধ্যে প্রথমে সূরার ক্রমিক সংখ্যা তার পর বিসর্গ চিহ্ন দিয়ে বাক্যের ক্রমিক সংখ্যা দিয়েছি। বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয়গত প্রয়োজনের অনিবার্য দাবী ব্যতীত পুনরুল্লেখকে আমরা যথাসাধ্য বর্জন করেছি। ইতিহাস-বিমুখ জাতির পতন অনিবার্য। তাই তৃতীয় খণ্ডের 'আদম থেকে মুহম্মদ' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা সৃষ্টির একবারে আদিকালে অবতীর্ণ আদি মানব এবং আদি পয়গম্বর হজরত আদম (আঃ)-এর কাল থেকে সর্বশেষ পয়গম্বর হজরত মুহম্মদ (সঃ) পর্যন্ত ইসলাম তথা মানব সভ্যতার ইতিহাসের ধারাকে কোরআন এবং হাদীসের আলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নেবার চেষ্টা করেছি। সবশেষে, উল্লেখযোগ্য মোহাদ্দেস-গণের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক জীবনীও সংযোজন করেছি।

বিংশ শতাব্দীর সমাজ জীবন মর্মান্তিক ভাবে সমস্যা-কণ্টকিত। এই সমস্যার সমাধান-কল্পে আমরা সচরাচর রাজনীতি অথবা অন্যকোন সমাজ-নীতির (social science) আশ্রয় নিই। অথচ পবিত্র হাদীস শরীফের মধ্যেই তো তার সমাধানকে থরে থরে সঞ্চিত করে' রাখা হয়েছে যুগ যুগ ধরে। প্রাণচঞ্চল যুগের প্রয়োজনেই যে হাদীস শাস্ত্র ঐতিহাসিক ভাবে একদিন প্রথম সংকলিত হয়েছিল খলীফা দ্বিতীয় ওমরের কালে, একালের বাংলা ও বাঙালীর প্রবলতর প্রয়োজনের কথা স্মরণ করে' আমরা সেই বিশালায়তন হাদীসের আদর্শে একটা অতি সামান্যকার সংকলন প্রকাশ করলাম। আল্লাহ্‌তা'লাই জানেন, দীন ইসলামের খেদমত করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য (নিয়ত) নেই। মানুষ মাত্রেই অপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতা এবং অসাবধানতা বশতঃ যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে আমরা পরম ক্ষমাশীল ও করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। আমাদের দেশের অথবা অন্য কোন দেশের যাঁরা যথার্থ হাদীস-শাস্ত্র-

[১১] আদ্দুনিয়া মাজেরাতুল আখেরাহ্‌।

[১২] বোখারী শরীফ—আজিজুল হক অনুদিত।

বিশারদ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আজো বিদ্যমান তাঁদের কাছে অনুরোধ—তাঁরা যেন আমাদের উদ্দেশ্যের আন্তরিকতার কথা স্মরণ করে এই সংকলনের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টি-গোচর হওয়ামাত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমাদের জানিয়ে সাহায্য করেন। আমরা বিশ্বাস করি—'যারা আন্তরিকতার সাথে কাজ করে, আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করেন।'

হাদীসশাস্ত্র বিশ্বের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মহাসমুদ্র তুল্য। বিশ্বের দিগ্-দিগন্তের কতশত মহাজ্ঞানী মনীষী তাঁদের সমগ্র জীবন ব্যাপী অনলস সাধনার আলোয় এর প্রতিটি পৃথক তরঙ্গকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে যাচাই বাছাই করে এক একটা সংকলনের আধারে তার কিছু কিছু ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সবার কাছে আমরা ঋণী। আল্লাহ্ তাঁদের প্রত্যেকের রূহ্ মুবারকের ওপর তাঁর পরম শান্তি বর্ষণ করুন। ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম. এ., পি. এইচ-ডি. খানবাহাদুর আব্দুর রহমান খান, এম. এ, বি. টি, ডক্টর মুহাম্মদ সিরাজুল হক এম. এ, পি. এইচ-ডি., মওলানা মুস্তাফীজুর রহমান মুমতাযুল-মুহাদ্দেসীন, প্রমুখ দশজন সুবিখ্যাত হাদীস-শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত কর্তৃক অনূদিত বিভিন্ন খন্ডে সংকলিত 'তাজরীদুল বুখারী' এবং মুহম্মদ আযহারউদ্দীন সংকলিত 'হাদীসের আলো'র কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নেই। ঋণ স্বীকৃতির তালিকায় এর পরই স্মরণীয় মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের 'বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা'সহ সাত খন্ডে প্রকাশিত 'বোখারী শরীফ'। এর পর জনাব আল্লামা নেছারুল হক সাহেবের 'বঙ্গানুবাদ মুসলিম শরীফ', জনাব মাওলানা নূরমোহাম্মদ আ'জমীর 'বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ' বিভিন্ন খন্ডে প্রকাশিত 'মেশকাত শরীফ', 'বঙ্গানুবাদ শামায়েলে তিরমিজী', অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরী অনূদিত 'হাদীসে রসূল' এবং ইংরাজী ও বাংলায় প্রকাশিত হাদীস সংক্রান্ত আরো অনেকগুলি গ্রন্থ। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে আমরা এইসব গ্রন্থ ও গ্রন্থ-কারদের নাম উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ তা'লা এঁদের সকলের ওপর কল্যাণ বর্ষণ করুন। কোরআনের অনুবাদ এবং আরো কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা মাওলানা মুহাম্মদ তাহের সাহেবের 'আলকুরআন-তরজমা ও তফসীর' (৫ খন্ড), মোঃ মোবারক করীম জওহর সাহেবের 'কোরআন শরীফ' এবং আজিজুল হক সাহেবের বঙ্গানুবাদ 'বোখারী শরীফ'-এর সাহায্য নিয়েছি। এঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। নবী (সঃ)-এর জীবনচরিত রচনার কাজে শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহাম্মদ তাহের সাহেবের 'শেষ নবীর' কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই। কাজী আবদুল ওদুদের 'হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম', গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী', মাওলানা আকরম খাঁর 'মোস্তফা চরিত', অধ্যাপক K. Ali-র A Study of Islamic History এবং আরো অনেক গ্রন্থ থেকেও আমরা সাহায্য নিয়েছি। এঁদের সকলকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। জনসাধারণের কাছে এই সংকলনটিকে সহজলভ্য করার দায়িত্ব নিয়েছেন হরফ প্রকাশনীর কর্তৃপক্ষগণ, তাঁদেরও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। সুপন্ডিত এবং উদার-হৃদয় শ্রীরণব্রত সেন কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে বহু পরিশ্রম করে হাদীসগ্রন্থসংক্রান্ত নির্ঘন্টটি প্রস্তুত করে দিয়েছেন। তাঁর আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ ও ঋণী। বর্ণমালা প্রেসের শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বেরা, অতীন্দ্র বাগ এবং অন্যান্য কর্মীকে তাঁদের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াসের জন্য ধন্যবাদ।

এই সংকলনবর্গকে সুষ্ঠুভাবে ধর্মীভক্ত এবং সর্বজনের প্রয়োজনোপযোগী

করার উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘকাল আমাকে বহু-সংখ্যক হাদীসগ্রন্থ নিয়ে পড়াশুনা ও চিন্তাভাবনা করতে হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লার কাছে হাজার হাজার শোকর যে এত অসংখ্য হাদীস আমার মত এক অধম মুসলমানের চোখে দেখার সৌভাগ্য হল। হাদীসের হীরক-খনির মধ্যে প্রবেশ করে' কোনটা ফেলে কোনটা গ্রহণ করি এমন সমস্যায় আমাকে পড়তে হয়েছে বারে বারে। ডাঃ ফকীর মোহাম্মদ সাহেব তাঁর সংগৃহীত অনেকগুলো হাদীসের বঙ্গানুবাদ আমাকে ব্যবহার করতে দিয়ে পরলোক-গমন করেছেন; আল্লাহ্‌ তাঁর আত্মার শান্তি বিধান করুন। আমার হাদীস-রসিক সুসাহিত্যিক পিতামহ মরহুম হাজী মোহাম্মদ দেরাজুদ্দীন সাহেব এবং ধর্মনিষ্ঠ পিতা মরহুম ডাক্তার আব্দুল আজিজ এম. সি. পি. এস. সাহেবের মহামূল্য দোয়া একাজে আমাকে সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত করেছে। আল্লাহ্‌ তাঁদের কবরকে নূরের আলোকে পরিপূর্ণ করুন। মরহুম মাওলানা আব্দুল হক সাহেবের আশীর্বাদ-মধুর সদাপ্রসন্ন হাসিমুখ বার বার আমার মনে জাগ্রত হয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে—আল্লাহ্‌ তাঁকে অনন্ত শান্তি দান করুন। বহু স্বনামধন্য আলেম আমার বহু প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছেন, আল্লাহ্‌ তাঁদের কল্যাণ দান করুন। আমার পুণ্যময়ী মা ফাতেমা বেগম, চাচাজী এস. এম. আব্দুল ওয়াজেদ সাহেব এবং অগ্রজ ডাঃ মোঃ সফিউল্লাহ্‌ সাহেব সংকলনকালে সর্বক্ষণ আমার জন্য দোয়া করেছেন। আল্লাহ্‌ তাঁদের কল্যাণ করুন। আমার সহধর্মিনী বেগম শেরিনা রফিক এই সুদীর্ঘকাল আমার সাংসারিক দায়িত্বের বোঝা বহুল পরিমাণে লাঘব করে এবং অনেক সংকলনযোগ্য হাদীস সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে' আমাকে অঢেল সুযোগ ও সাহায্য দান করেছেন। আল্লাহতা'লা তাঁকে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিগণকে য়েন ইহকাল ও পরকালের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য জ্যোতির্ময় ঈমান দান করেন। সমগ্র মুসলিম জাহানকে করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লা যেন ঈমান-সুন্দর পবিত্র জীবন যাপন করার এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার শক্তি দান করেন। পৃথিবীর সকলের ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক! আমীন!

সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও এ গ্রন্থে কিছু কিছু মুদ্রণ-ত্রুটি থেকে গেছে। আশাকরি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবর্গ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ক্ষমা করবেন।

পরিশেষে, অত্যন্ত সংকুচিত চিত্তে একটা অপ্রাসঙ্গিক (?) কথা বলে বর্তমান প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করতে চাই। হাদীস অধ্যয়নকালে আমার বারবার মনে হয়েছে যে, ধর্মীয় মূল্য ছাড়াও হাদীসের একটা চিরকালীন সাহিত্য-মূল্য আছে। কেননা যা সত্য, তা সুন্দর—আর হাদীসের প্রতিটি বাণীতে সেই সত্যের সন্দেহাতীত সৌন্দর্য-দ্যুতি। এই সত্য-সৌন্দর্যের দীপ্তি-উদ্ভাসিত হাদীস বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। আধুনিক সাহিত্যের নীতিহীন বিকারের গ্লানি যখন মনকে ক্লিষ্ট করে, তখন হাদীস মণিমুক্তার মত মনের মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানি তুলে অনাস্বাদিতপূর্ব বেহেশতের সওগাত রচনা করে। হাদীসের ঘটনা ও সত্য আখ্যানগুলো সেই বেহেশ্‌তী কাহিনীরসে আমাদের মনকে অনায়াসে আকৃষ্ট ও আপ্লুত করে। একদিন রসুলুল্লাহ (সঃ) শিষ্যপরিবৃত অবস্থায় হঠাৎ বলে উঠলেন—'আল্লাহ্‌র কসম (শপথ) সে মোমেন নয়, আল্লাহ্‌র কসম সে মোমেন নয়, আল্লাহ্‌র কসম সে মোমেন নয়।'

বিস্মিত শিষ্যবৃন্দের চোখ জিজ্ঞাসায় জ্বল জ্বল করে উঠল। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে রসূলুল্লাহ, কে মোমেন (অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান) নয় ?'

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'যে নিজে দুবেলা পেট পুরে আহার করে, আর তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে।' এ সংলাপের অব্যর্থ কার্যকারিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ক্রোধে অন্ধ হয়ে যখন আমরা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হই, তখন নবী (সঃ)-এর কণ্ঠে শুনতে পাই, 'তিক্ত ঔষধ যেমন মধুকে নষ্ট করে, ক্রোধ তেমন ঈমানকে নষ্ট করে।' (মিশকাত)। 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ক্রোধ গলাধঃকরণ করেছে, তার মত উত্তম পানীয় আর কেউ পান করেনি।' (মিশকাত)। কারণ ক্রোধকে পান বা দমন করতে পারলেই তো সত্য সত্যই স্বর্গীয় সুধা পান করার আনন্দ লাভ করা যায়। আবার 'নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি' নবী (সঃ) সম্পর্কে নবীসহচর জাবের ইবনে সামের (রাঃ) যখন বলেন, 'আমি এক চাঁদের-আলোয় উদ্ভাসিত রাতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে দেখেছিলাম।···আমি একবার রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দিকে আর একবার চাঁদের দিকে তাকালাম—অবশ্য তিনিই চাঁদ অপেক্ষা অধিক সুন্দর' (তির)—এবং নবী (সঃ) যখন বলেন, 'আল্লাহ্ নিজে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন' (তিরমিজী)—তখন দ্যুলোক ভূলোক ভরা এক নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যের অনুভূতি-ধারায় আমাদের সৌন্দর্যপিপাসু মন কানায় কানায় ভরে যায়। যখন শুনি, 'সমস্ত মানুষ স্বর্ণরৌপ্যের খনি সদৃশ' (মুসলিম)—তখন আমরা মনুষ্যত্বের এক অকল্পনীয় মূল্যবোধে আত্মবিশ্বাসে দীপ্ত হই ; ভাবি, মানুষ হীন নয়, হেয় নয়, মানুষ আল্লাহ্‌তা'লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'আশ্‌রাফুল মখলুকাত'। যখন শুনি, 'তোমরা হিংসা থেকে সাবধান হও কারণ আগুন যেমন তৃণকে দগ্ধ করে, হিংসা তেমন সৎকর্মকে ধ্বংস করে' (আবু দাউদ)—তখন উপদেশের অঙ্গ ভরা এই অলংকার-বিভূষিত-সৌন্দর্যের মনোরম প্রকাশ মনের দিগন্তে যেন নতুন সূর্যোদয়ের সূচনা করে। তখন মনে হয়, শিল্পের জন্য শিল্প (art for art's sake) নয়, জীবনের প্রয়োজন সাধনেই শিল্পের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। যখন শুনি, 'মূর্খতা অপেক্ষা বড় দারিদ্র্য নেই' (সগির) এবং তার পাশেই, 'জ্ঞান রত্নাগার আর প্রশ্ন তার কুঞ্জিকা' (সগির), 'যে জ্ঞানী মানুষকে সদুপদেশ দেয় অথচ নিজে তা পালন করে না, সে সেই প্রদীপের তুল্য যে আলো দান করে কিন্তু নিজের আত্মাকে দগ্ধীভূত করে' (সগির)—তখন ভাবি একি হাদীস, না 'সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ'-বিভূষিত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিতা ? দেশজোড়া ঘনঘন দল-বদলের কালে যখন শুনতে পাই, 'মোনাফেক (বা কপট ব্যক্তি) সেই ষানডাকা ছাগীর মত যে দুপাল ছাগলের মধ্যে একবার এপালের দিকে আর একবার ওপালের দিকে দৌড়াদৌড়ি করে' (মুসলিম) এবং নিরন্তর বন্ধুবিচ্ছেদের ঘন অন্ধকার যখন শুনতে পাই, 'বন্ধুর সাথে পরিমিত রূপে বন্ধুত্ব স্থাপন কর, কারণ হয়তো সে একদিন তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে ; এবং শত্রুর সাথেও পরিমিত শত্রুতা কর —সম্ভবত সেও একদিন তোমার বন্ধু হতে পারে' (সগির)—তখন মনে হয়, হাদীস কি সেই জীবন-সমালোচনা, কবিতা যার নামান্তর মাত্র ? এই জন্যই কি Arnold বলতে পেরেছেন, 'Poetry is the criticism of life ?' তবু স্মরণ করি, এ বানানো কবিতা নয়, কল্পনার বিলাস নয়—এ চির সত্য আল্লাহ্‌তা'লার ইঙ্গিত-ময়তা-ধন্য নিরক্ষর নবী (সঃ)-এর বাণী—এ সত্য, তাই সুন্দর। সুন্দর সুতরাং চিরস্থায়ী !!

হাজীকুটীর, রফিক উল্লাহ্

মনিরতট, ২৪ পরগণা। ফাতেহাদোয়াজদাহম, ১০।২।৭৯।

আল-কোরআনের আহ্বান

মানুষ ও তার কর্তব্য

কোরআন শরীফ আল্লাহ্‌র বাণী। মানুষের জীবনকে সুন্দর, পবিত্র ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার জন্য এ মহাগ্রন্থে আল্লাহ্ নানান বিধি-নিষেধের উল্লেখ করেছেন, সহজতম উপদেশ দান করেছেন, মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার জন্যই আল্-কোরআনের অবতারণা। সুতরাং কোরআন শরীফ হল বিশ্বমানুষের জন্য ঐশ্বরিক সংবিধান, এ মহাগ্রন্থে পাওয়া যাবে ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে সঠিক চলার অভ্রান্ত পথ-নির্দেশ।

বিপুলায়তন কোরআন শরীফে মানুষের জন্য উপদেশাবলী ও কর্মপন্থার নির্দেশ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। আমরা এখানে তার সামান্য অংশ চয়ন করলাম। এই অংশটুকু পাঠ করলে মানবীয় জীবনে কোরআন শরীফের গুরুত্ব যে কতখানি আশাকরি সে সম্পর্কে পাঠকের মনে কিছুটা ধারণা গড়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র কোরআন শরীফ হল অসীম জ্ঞানভাণ্ডার—প্রতিটি বাক্যই অভ্রান্ত সত্য-নির্দেশক। বাংলা ভাষায় কোরআন শরীফ এখন সহজলভ্য। যাঁরা এ গ্রন্থটি এখনো পাঠ করেননি—আমরা তাঁদের, যত দ্রুত সম্ভব, গ্রন্থটি সম্পূর্ণ পাঠ করতে অনুরোধ জানাই।

মানুষের সৃষ্টি ও তার পরিণতি, সাংসারিক ও পার্থিব জীবনে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি সম্পর্কে আল্-কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশগুলি লক্ষ্য করুন:

[উদ্ধৃতিগুলির শেষে '২(১১৮)' এরূপ সাংকেতিক সংখ্যা দ্বারা মূলের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। প্রথম সংখ্যা সূরার, বন্ধনীর মধ্যস্থিত সংখ্যাটি আয়ত (বাক্য)-নির্দেশক। প্রথম উদ্ধৃতটির শেষে মূলের উৎস হিসেবে '৮৬(৬-৭)'-এর উল্লেখ আছে। এখানে ৮৬ সংখ্যক সূরার ৬ ও ৭ নং আয়তের উদ্ধৃতি বুঝতে হবে।]

তাকে (মানুষকে) সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে, এ নির্গত হয় নরের মেরুদণ্ড ও নারীর পঞ্জরাশির মধ্য হতে। ৮৬(৬-৭)

তিনি ওকে (মানুষকে) শুক্র হতে সৃষ্টি করেন, পরে ওর বিকাশ-সাধন করেন। অতঃপর ওর জন্য পথ সহজ করে দেন; তারপর ওর মৃত্যু ঘটান এবং ওকে সমাধিস্থ করেন। এরপর যখন ইচ্ছা তিনি ওকে পুনর্জীবিত করবেন। ৮০(১৯-২২)

মানুষকে আমি শ্রমনির্ভর করেই সৃষ্টি করেছি। ৯০(৪)

আমি তাকে (মানুষকে) কি দুটি পথই দেখাই নি? সে তো কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বন করেনি। তুমি কি জান—কষ্টসাধ্য পথ কি? এ হচ্ছে: দাসমুক্তি। অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান পিতৃহীন আত্মীয়কে। অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে। তদুপরি বিশ্বাসীদের এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যারা পরস্পরকে ধৈর্যধারণের ও দয়াদাক্ষিণ্যের উপদেশ দেয়। ৯০(১১-১৭)

যে সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য এবং কারো প্রতি অনুগ্রহের প্রতিদান প্রত্যাশায় নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য; সে তো সন্তোষ লাভ করবেই। ৯২(১৮-২১)

...পিতৃহীনদের প্রতি রূঢ় হয়ো না এবং সাহায্য-প্রার্থীকে ভৎসনা করো না। ৯৩(৯-১০)

কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, নিশ্চয়ই আছে কষ্টের সাথে স্বস্তি। অতএব যখন অবসর পাও পরিশ্রম করো এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ কর। ৯৪(৫-৮)

দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। যে অর্থ সঞ্চয় করে এবং তা বার বার গণনা করে। সে ধারণা করে যে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনও না—সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হোতামায় (নরকের নাম)। হোতামা কি, তা কি তুমি জান? এ আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত হুতাশন, যা হৃদয়কে গ্রাস করে। এ ওদের পরিবেষ্টন করে রাখবে, দীর্ঘায়িত স্তম্ভে। ১০৪(১-৯)

তুমি কি দেখেছ তাকে যে কর্মফলকে অস্বীকার করে? সে তো সেই যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ দেয় না। সুতরাং দুর্ভোগ সে সমস্ত নামাজ আদায়কারীদের, যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন, যারা তা করে (নামাজ পড়ে) লোক দেখানোর জন্য এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সাহায্যদানে বিরত থাকে। ১০৭(১-৭)

...তোমরা যে সৎকাজ কর আল্লাহ্ তা জানেন এবং তোমরা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ কর, এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। ২(১৯৭)

...জেনে রাখ যে আল্লাহ্ সাবধানীদের সাথে থাকেন। ২(১৯৪)

এবং তোমরা একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, এবং মানুষের ধনসম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে উৎকোচ দিও না। ২(১৮৮)

তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না। ২(৪২)

তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। ২(৪৫)

আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবিকা হতে তোমরা পানাহার কর এবং দেশের বুকে অনর্থ (শান্তি ভঙ্গ) করে বেড়িও না। ২(৬০)

...তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকারও উপাসনা করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, নামাজকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং জাকাত (দান) প্রদান করবে। ২(৮৩)

...তোমরা কেউ কারও রক্তপাত করবে না...২(৮৪)

এবং পিতৃহীনদের তাদের ধন সম্পদ সমর্পন করবে এবং উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্ট বদল করবে না, এবং তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের (পিতৃহীনদের) সম্পদ মিশ্রিত করে গ্রাস করো না; এ মহাপাপ। ৪(২)

যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে, আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন না। ৪(৩৭)

...এবং আল্লাহ্ তাদের যা প্রদান করেছেন তা থেকে (সৎ কাজে) ব্যয় করলে তাদের কি ক্ষতি হত? ৪(৩৯)

আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত (গচ্ছিত সম্পদ) তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। ৪(৫৮)

…পার্থিব ভোগ সামান্য! এবং যে সংযমী তার জন্য পরকালই উত্তম। ৪(৭৬)

তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। ৪(৭৮)

আর তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম যে পরোপকারী হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে…৪(১২৫)

বস্তুতঃ আপোষ করা অতি উত্তম। ৪(১২৮)

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়-বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে—যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক আল্লাহ্ উভয়ের যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়-বিচার করতে কামনার অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল তবে (জেনে রাখ) যে তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। ৪(১৩৫)

মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ ভালবাসেন না…৪(১৪৮)

…তারা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্তদের ভালবাসেন না। ৫(৬৪)

আর তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর; যারা পাপ করে তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি তাদের দেওয়া হবে। ৬(১২০)

…আর ফসল তোলার দিনে ওর দেয় (বাগানের ফলমূল এবং ক্ষেতের শস্য থেকে কিছু অংশ গরীবদের দেওয়া আল্লাহ্ নির্ধারিত করেছেন—কতটা দেওয়া হবে তা মালিকের উপর নির্ভর করবে) প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না, কারণ তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। ৬(১৪১)

কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে এবং কেউ কোন অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু একটিরই প্রতিফল দেওয়া হবে। ৬(১৬০)

প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না। ৬(১৬৪)

…সাবধানতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। ৭(২৬)

প্রত্যেক নামাজের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। ৭(৩১)

পানাহার করবে কিন্তু অপচয় করবে না। তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না। ৭(৩১)

পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর ওতে বিপর্যয় ঘটাবে না, আল্লাহ্‌কে ভয় এবং আশার সঙ্গে ডাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী। ৭(৫৬)

সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে। লোকেদের তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটিও না।…৭(৮৫)

তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসকে শ্রেয় জ্ঞান করে তবে ওদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। ৯(২৩)

...আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত এ মোচনকারী আর কেউ নেই এবং আল্লাহ্ যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তা রদ করার কেউ নেই। ১০(১০৭)

প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে অধিকতর জ্ঞানীজন। ১২(৭৬)

আল্লাহ্ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘন নিষেধ করেন। ১৬(৯০)

তুমি বদ্ধমুষ্টি (কৃপণ) হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্ত (অবিবেকী দাতা) হয়ো না। হলে—তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে। ১৭(২৯)

তোমার প্রতিপালক তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। ওদের একজন অথবা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় থাকাকালে বার্ধক্যে উপনীত হলেও ওদের বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং ওদের ভর্ৎসনাও করো না, ওদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলবে। অনুকম্পায় ওদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! ওদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে ওরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' ১৭(২৩-২৪)

আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দেবে এবং অভাবগ্রস্ত ও পথচারীকেও; এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। যারা অপব্যয় করে তারা অবশ্যই শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। ১৭(২৬-২৭)

এবং তুমি নিজেই যখন সম্পদলাভের প্রত্যাশায় ওর সন্ধানে থাক তখন ওদের (তোমার কাছে যারা সাহায্য প্রার্থনা করে) যদি বিমুখই কর ওদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো। ১৭(২৮)

তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না, ওদের এবং তোমাদের আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই ওদের হত্যা করা মহাপাপ। ১৭(৩১).

অবৈধ যৌন-সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, এ অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। ১৭(৩২)

পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্যে ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করো; প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ৎ তলব করা হবে। ১৭(৩৪)

মাপ দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপ দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে, এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর। ১৭(৩৫)

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেবিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না ··১৭(৩৬)

ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না। তুমি তো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না। ১৭(৩৭)

আল্লাহ্‌র কাছে ওদের (কুরবানী করা পশুর) মাংস এবং রক্ত পেঁছায় না বরং তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা (আন্তরিকতা) পেঁছায়। ২২(৩৭)

যাতে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারে এ উদ্দেশ্যে কি তারা দেশ ভ্রমণ করেনি? বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। ২২(৪৬)

. ···তোমরা যথাযথভাবে নামাজ পড়, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি। ২২(৭৮)

যারা নিজেদের নামাজে বিনয়নম্র, যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে, যারা জাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে,···এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান তারাই হবে অধিকারী,. অধিকারী হবে ফিরদাউসের—যাতে ওরা চিরকাল থাকবে। ২৩(২-১১)

কিয়ামতের দিন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রাখ এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। ৩৯(১৫)

আমি তো মানুষকে মাটির উপাদান হতে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে এক নিরাপদ আধারে স্থাপন করি। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে। অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে মাংস দ্বারা ঢেকে দিই, অবশেষে ওকে আরো এক রূপ দান করি। সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান! এরপর অবশ্যই তোমরা মৃত্যু বরণ করবে, অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে। ২৩(১২-১৬)

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—ওদের প্রত্যেককে একশো কশাঘাত করবে; আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের অভিভূত না করে···২৪(২)

যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাদের আশীবার কশাঘাত করবে ··২৪(৪)

পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর, এ তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড···৫(৩৮)

বিশ্বাসীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। ২৪(৩০)

বিশ্বাসী নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে।. তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ করে থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষোদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, সেবিকা যারা তাদের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌন কামনারহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন-অঙ্গ-সম্বন্ধে-অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর,. যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। ২৪(৩১)

হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে একেকে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন। ২৫(২০)

আল্লাহ্র উপাসনা করার ও অসৎ (বিশৃঙ্খলা) বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল (প্রেরিত পুরুষ) পাঠিয়েছি। ১৬(৩৬)

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। ৪০(১৯)

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎ কাজ করে এবং বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পণকারী' তার কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা আর কার? ৪১(৩৩)

ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। ভালর দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; ফলে যারা তোমার সাথে শত্রুতায় আছে তারা হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল...৪১(৩৫)

মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তিবোধ করে না কিন্তু যখন তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে সম্পূর্ণ রূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। ৪১(৪৯)

মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। ৪১(৫১)

তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল...৪২(৩০)

...তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ; কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে (পারলৌক জীবনে) তা উত্তম ও স্থায়ী...৪২(৩৬)

যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়ে ক্ষমা করে দেয়; যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, নামাজ পড়ে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসম্পাদন করে এবং তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে,...যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট আছে।...৪২(৩৭-৪০)

...নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। ৪২(৪০)

কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। ৪২(৪২)

কেউ ধৈর্য ধারণ করলে এবং ক্ষমা করে দিলে তা হবে বীরত্বের কাজ। ৪২(৪৩)

যে সৎকাজ করে সে তার কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সেই ভোগ করবে।...৪৫(১৫)

যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদের সাবধানী হবার শক্তিদান করেন। ৪৭(১৭)

...তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না।...৪৯(১১)

...তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না।...৪৯(১২)

আমিই মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তরের নিভৃত কু-চিন্তা সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। ৫০(১৬)

মৃত্যু যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে, এ হতে তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছ।·৫০(১৯)

আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণের উৎস ও প্রতিশ্রুতি সমস্ত কিছু। ৫১(২২)

তা (কোন মানুষ) একে অপরের কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে না, এবং মানুষ তাই পায় যা সে করে। ৫৩(৩৮-৩৯)

দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান

করে তাদের দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। ৫৭(১৮)

তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা ও ধনে-জনে প্রাচুর্যলাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়, ওর উপমা বৃষ্টি, যা দিয়ে উৎপন্ন শস্য-সম্ভার অবিশ্বাসীদের চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়।...৫৭(২০)

...যে ব্যক্তি পরকাল পরিত্যাগ করে পৃথিবীতে মশগুল রয়েছে, তার জন্য পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। ৫৭(২০)

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ হয়; আল্লাহ্‌র পক্ষে এ খুবই সহজ। ৫৭(২২)

...তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ্ উদ্ধত ও অহংকারীদের ভালবাসেন না। ৫৭(২৩)

যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। ৫৭(২৪)

আল্লাহ্ এ জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র, তাঁর রসূলের, রসূলের স্বজনগণের এবং পিতৃহীন বালক-বালিকার, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।...৫৯(৭)

হে বিশ্বাসীগণ! জুমুয়ার দিনে যখন নামাজের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ত্বরা করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখবে, এইটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা বাইরে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। ৬২(৯-১০)

আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদই আপতিত হয় না...৬৪(১১)

...যে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন...৬৪(১১)

তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা...৬৫(১৫)

তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য ভয় কর, তাঁর আদেশ শোন, তাঁর আনুগত্য কর ও ব্যয় কর; এতে তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ রয়েছে, যারা কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম। ৬৫(১৬)

যিনি (আল্লাহ্) মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন —কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? ৬৭(২)

যারা দৃষ্টির অগোচর তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। ৬৭(১২)

তোমরা গোপনেই কথা বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তর্যামী। ৬৭(১৩)

এবং অনুসরণ করো না তার যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগায়, যে কল্যাণ কার্যে বাধাদান করে, যে সীমালংঘনকারী—পাপিষ্ঠ।…৬৮(১০-১২)

উপাসনার জন্য রাত্রি জাগরণ কর, রাত্রির কিছু অংশ বাদ দিয়ে। অর্ধরাত্রি জাগতে পার কিংবা তদপেক্ষা অল্প অথবা তদপেক্ষা বেশী।…৭৩(২-৪)

উপাসনার জন্য রাত্রি জাগরণ গভীর অভিনিবেশ ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অতিশয় অনুকূল। ৭৩(৬)

তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু পূর্বাহ্নে সঞ্চয় করবে তোমরা তা আল্লাহ্‌র নিকট উৎকৃষ্টতররূপে এবং পুরস্কার হিসাবে বর্ধিত পরিমাণে পাবে। ৭৩(২০)

এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার ভূষণ পবিত্র কর, অপবিত্রতা হতে দূরে থাক। ৭৪(৩-৫)

অধিক পাওয়ার আশায় অন্যকে কিছু দিও না। ৭৪(৬)

এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর। রাত্রিতে তাঁর প্রতি সিজ্‌দাবনত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। ৭৬(২৫-২৬)

জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। ৩(১৮৫)

…তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর! ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা কর…৩(২০০)

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ কল্যাণকারীদের ভালবাসেন। ৩(১৩৪)

…তোমরা ক্রমবর্ধমান হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর।… ৩(১৩০)

আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন। ২(২৭৬)

সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও।…২(২৭৮)

যদি (খাতক) অভাবী হয়, তবে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি ঋণ মাফ করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম, যদি তোমরা তা জানতে। ২(২৮০)

…তাদের (পিতৃহীনদের) উপকারের চেষ্টা করাই উত্তম। ২(২২০)

ধর্মের জন্য কোন জোর জবরদস্তি নেই।….২(২৫৬)

তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল, আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভাল। ২(২৭১)

যে সকল লোক রাতদিন গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার আছে। ২(২৭৪)

দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করো না। ২(২৬৪)

যে দানের পর কষ্ট দেওয়া হয় তার চেয়ে মিষ্টি কথা বলা এবং ক্ষমা করা উত্তম। ২(২৬৩)

আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক। ৩(৬৮)

অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। ৩(৭৩)

তোমরা কখনো পুণ্যলাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মমতার জিনিষ (তোমরা যে জিনিষ ভালবাস) আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর। ৩(৯২)

যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ২(২৭)

পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব (ঐশী গ্রন্থ) এবং নবীগণকে (প্রেরিত পুরুষ) বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে, নামাজ যথাযথভাবে পড়লে ও যাকাত (দান) করলে এবং প্রতিশ্রুতি পালন করলে আর দুঃখ, কষ্ট ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী এবং সাবধানী। ২(১৭৭)

আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে, তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যান। ২(২৫৭)

কিয়ামত ও দোজখ (নরক)

যে সকল মানুষ সৎকর্মশীল এবং পুণ্যপথযাত্রী, যাঁরা তাঁদের মহান প্রতি-পালকের প্রতি বিশ্বাসী, নির্ভরশীল এবং কৃতজ্ঞ—আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি অত্যন্ত সদয়। কিয়ামতের (শেষ বিচারের দিনের) পর তাঁদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত স্বর্গীয় সুখ-সম্ভোগ। কিন্তু যারা দুর্জন, অকৃতজ্ঞ—যারা পৃথিবীতে কেবল অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়িয়েছে; যারা কৃপণ সত্যত্যাগী পাপী—তাদের জন্য রয়েছে কঠোর দুর্ভোগ। জীবন-মৃত্যুর মত কিয়ামত (বিচারের দিন বা কর্মফল দিবস) সত্য, কিয়ামতের দিনে সকলেরই বিচার হবে—সেদিন দুর্জনদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ কোরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে যা উল্লেখ করেছেন —তার কিছু অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম। কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ পরিবেশ এবং দোজখের (নরকের) মধ্যে অকৃতজ্ঞদের প্রতি কঠোরতম শাস্তির কিছু আভাস এ সকল উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাবে। এগুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়—পৃথিবীতে সৎ হয়ে চলা, এক আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণ করে কল্যাণ-কর্মে আত্মলীন হওয়া। বিচার-দিন নির্ধারিত আছে; সেদিন শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বহু ফাটল হবে, এবং পর্বত উন্মূলিত হয়ে মরীচিকাবৎ হবে, জাহান্নাম (নরক) প্রতীক্ষায় থাকবে, এ হবে সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থল। সেখানে তারা যুগযুগ ধরে অবস্থান করবে, সেখানে ওরা কোন শীতল বস্তু উপভোগ করবে না, পানীয়ও নয়—আস্বাদ গ্রহণ করবে কেবল ফুটন্ত পানি ও পুঁজের, এটিই উপযুক্ত প্রতিফল. কারণ ওরা (পাপীরা) হিসাবের (শেষ বিচারের দিনের কর্মফলের) আশংকা করত না (ফলে ইচ্ছামত পৃথিবীতে পাপাচার করেছে)। ৭৮ (১৭-২৭)

সেদিন (বিচারের দিন) জিব্রাঈল ও ফেরেশ্তাগণ সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলবে না এবং সে যথার্থ বলবে। এদিন সুনিশ্চিত; অতএব যার অভিরুচি সে তার প্রতিপালকের শরণা-পন্ন হোক। ৭৮ (৩৮-৩৯)

সেদিন প্রথম শিংগা-ধ্বনি বিশ্বকে প্রকম্পিত করবে, পরে দ্বিতীয় শিংগা-ধ্বনি

হবে, সেদিন হৃদয় সন্ত্রস্ত হবে, মানুষের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে।...এতো কেবল এক মহাগর্জন, এবং তখনই ময়দানে ওদের আবির্ভাব হবে। ৭৯ (৬-৯, ১৩-১৪)

যেদিন কিয়ামত উপস্থিত হবে, মানুষ তার ভ্রাতা, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের পরিহার করবে। সেদিন ওদের প্রত্যেকে অপরের চিন্তা না করে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। অনেকের মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেকের মুখমণ্ডল সেদিন ধূলি-ধূসর ও কালিমাচ্ছন্ন হবে; এরাই সত্যপ্রত্যাখানকারী ও দুষ্কৃতিকারী। ৮০ (৩১-৪২)

সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে, যখন নক্ষত্র খসে পড়বে, পর্বতসমূহ যখন অপসারিত হবে, যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী (আরবদের পরম সম্পদ কিন্তু তার দুধ ও বাচ্চাকে কিয়ামতের ভয়ে ত্যাগ করা হবে) উপেক্ষিত হবে, যখন বন্য পশুর একত্র সমাবেশ হবে, সমুদ্র যখন স্ফীত হবে, দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে, যখন আমলনামা (কর্মবিবরণী) উন্মোচিত হবে, যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, জাহান্নামে যখন অগ্নি উদ্দীপিত হবে এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী হবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কি (সৎকর্ম বা অসৎকর্ম, পাপ বা পুণ্য) নিয়ে এসেছে। ৮১ (১-১৪)

(বিচারের দিন) যাকে তার আমলনামা (পার্থিবজীবনের সে যা করেছে তার বিবরণী) ডান হাতে দেওয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজেই হয়ে যাবে, এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্ল চিত্তে ফিরে যাবে। এবং যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পশ্চাৎ দিক হতে (বাঁহাতে) দেওয়া হবে সে তার ধ্বংসের জন্য বিলাপ করবে এবং জাহান্নামে (নরকে) প্রবেশ করবে। সে তার স্বজনদের মধ্যে (পৃথিবীতে) আনন্দে ছিল, সে ভাবত যে সে কখনই আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে না। ৮৪ (৭-১৪)

তোমার কাছে কি কিয়ামতের সংবাদ এসেছে, সেদিন অনেকেই হবে অধোবদন, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। ওরা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। ওদের অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হতে পান করান হবে; ওদের জন্য যরারী (কাঁটা গাছ—যা অত্যন্ত বিষাক্ত এবং কিছুতে খায় না, যা মরু অঞ্চলে জন্মায়) ব্যতীত খাদ্য থাকবে না—যা ওদের পুষ্ট করবে না এবং ওদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে না। ৮৮ (১-৭)

আমি তোমাদের লেলিহান অগ্নিসম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি; ওতে প্রবেশ করবে সেই যে নিতান্ত হতভাগ্য, যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৯২ (১৫-১৬)

মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয় কি? মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কি জান? সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের মত। ১০১ (১-৫)

কিয়ামতের দিন আমি ওদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় ওদের সমবেত করব। ওদের অবাসস্থল জাহান্নাম, যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন ওদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দেব। ১৭ (৯৭)

এবং অপরাধীদের তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব। ১৭ (৮৬)

যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক; তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে-যাতে ওদের চামড়া এবং উদরে

যা আছে তা গলে যাবে এবং ওদের জন্য থাকবে লৌহ মুদ্গর। যখনই ওরা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বেরুতে চাইবে তখনই তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে ওতে। (বলা হবে)'আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা।' ২২ (১৯-২২)

দূর হতে অগ্নি যখন ওদের দেখবে তখন ওরা এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার শুনতে পাবে এবং যখন ওদের হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন ওরা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। (ওদের বলা হবে) আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করো না, বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাক। ২৫ (১২-১৪)

যেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের এবং অবিশ্বাসীদের জন্য সেদিন হবে কঠিন। সীমালংঘনকারী সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম।' 'হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!' ২৫ (২৬-২৮)

কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে তাঁর করায়ত্ত। পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা যাকে অংশী করে তিনি তাঁর উর্ধ্বে। সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে; তবে যাদের আল্লাহ্ রক্ষা করতে ইচ্ছা করবেন তারা নয়। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ ওরা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। বিশ্বপ্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে বিশ্ব, আমালনামা উপস্থিত করা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীদের উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণফল দেওয়া হবে।…৩৯ (৬৭-৭০)

সত্যপ্রত্যাখানকারীদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন ওরা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন এর প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়া হবে।…ওদের বলা হবে, 'জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য ওখানে প্রবেশ কর।' কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল। ৩৯ (৭১-৭২)

যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

যখন ওদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে। ওদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর ওদের অগ্নিতে দগ্ধ করা হবে…৪০ (৭১-৭২)

ওদের জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হলে তুমি ওদের দেখতে পাবে, অপমানে অবনত এবং ভয়ে ওরা অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।…ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করেছে।…৪২ (৪৫)

অপরাধীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের শাস্তিভোগ করবে, ওদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং ওরা শাস্তি ভোগ করতে করতে হতাশ হয়ে পড়বে।…ওরা চীৎকার করে বলবে, 'হে মালিক (নরকের অধিকর্তা), তোমার প্রতিপালক আমাদের নিঃশেষ করে দিন।' সে বলবে, 'তোমরা তো এ ভাবেই থাকবে।' ৪৩ (৭৪-৭৭)

সেদিন একবন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং ওরা সাহায্যও পাবে না। ৪৪ (৪১)

নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ (একপ্রকার বিষাক্ত কাঁটা গাছ) হবে পাপীর খাদ্য। গলিত তাম্রের মত: তা উদরে ফুটতে থাকবে, ফুটন্ত পানীর মত। তাকে বলব, 'ওকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যে।।.. অতঃপর ওর মস্তকে ফুটন্ত

পানী ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও এবং বল, আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। তোমরা তো এ শাস্তি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলে।' ৪৪ (৪৩-৫০)

শোন, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হতে আহ্বান করবে, যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনতে পাবে মহাগর্জন, সেদিনই উত্থানের দিন। ৫০(৪১-৪২)

সেদিন দেখবে বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীগণকে, তাদের সম্মুখভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে।···সেদিন কপটচারী পুরুষ ও কপটচারী নারী বিশ্বাসীদের বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু পাই।' বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর।' অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরভাগে আশিস এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি।··· মোহ তোমাদের (কপটচারীদের) মৃত্যুকাল পর্যন্ত কুহকাচ্ছন্ন করে রেখেছিল; আল্লাহ্ সম্পর্কে মহাপ্রতারক তোমাদের প্রতারিত করেছিল···জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটিই তোমাদের যোগ্যস্থান, কত নিকৃষ্ট এ পরিণাম।···৫৭ (১২-১৫)

···যার আমলনামা (কর্মলিপি) তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, 'হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হত, 'এবং আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম। হায়, আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত। আমার ধনসম্পদ আমার কোন কাজেই এল না। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।' ফেরেশ্তাদের বলা হবে, 'ধর ওকে, গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও এবং নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। পুনরায় শৃঙ্খলিত কর—সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে, সে মহান আল্লাহ্তে বিশ্বাসী ছিল না এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে অন্যকে উৎসাহিত করত না।' অতএব এই দিন সেখানে তার কোন সুহৃদ থাকবে না এবং ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত কোন খাদ্য থাকবে না, যা অপরাধী ব্যতীত কেউ খাবে না। ৬৯ (২৫-৩৭)

ফেরেশ্তা এবং রূহ্ (আত্মা) আল্লাহ্র দিকে ঊর্ধ্বগামী হবে এমন একদিনে (কিয়ামতের দিনে) যেদিনটি পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। ৭০ (৪)

জাহান্নাম সে ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্য হতে পলায়ন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল; যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করত এবং তা আঁকড়িয়ে ধরে রাখত। মানুষ তো স্বভাবতই অতিশয় অস্থিরচিত্ত। সে বিপদগ্রস্ত হলে হাহুতাশ করতে থাকে এবং ঐশ্বর্যশালী হলে কৃপণ হয়ে পড়ে। ৭০ (১৭-২১)

তবে তারা নয় (নরকগামী) যারা নামাজ পড়ে, যারা তাদের নামাজে সদা নিষ্ঠাবান, যাদের সম্পদের মধ্যে (গরীবদের জন্য) একটি অংশ নির্ধারিত রয়েছে, প্রার্থী ও অপ্রার্থীর (বঞ্চিতের), এবং যারা কর্মফলদিবসকে সত্য বলে জানে, যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত—তাদের প্রতিপালকের শাস্তি এমন নয় যা হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় এবং যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে,···এবং যারা আমানত (গচ্ছিত) ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, যারা (সত্য) সাক্ষ্যদানে অটল এবং নিজেদের নামাজে যত্নবান তারাই সম্মানিত হবে স্বর্গে। ৭০ (২২-৩৫)

সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। তোমরা যাকে অস্বীকার করতে আজ তোমরা চল তারই দিকে। তিনটি কুণ্ডলীর আকারে উত্থিত ধূম্র-পুঞ্জের ছায়ার দিকে চল, যে ছায়া শীতল নয় এবং যা অগ্নিশিখার উত্তাপ হতে রক্ষা করে না, এ উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ অট্টালিকাতুল্য স্ফুলিঙ্গ, অথবা পীতবর্ণ

উষ্ট্রশ্রেণী-সদৃশ, যেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। ৭৭ (২৮-৩৪)

বেহেশ্‌ত (স্বর্গ)

যারা এক আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণকারী, যারা তাদের নামাজে (উপাসনায়) বিনম্র, দানশীলতায় উদার, সৎকর্মে উৎসাহী, পিতৃহীন আত্মীয়-স্বজন ও অভাব-গ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং যাবতীয় অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকে, তারাই সফলকাম, তারাই হবে বেহেশ্‌তের (স্বর্গের) অধিবাসী। স্বর্গীয় সুখ-সম্ভোগ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ কোরআন শরীফে যা বর্ণনা করেছেন তার কিছু অংশ এই :

যারা বিশ্বাস করে (এক আল্লাহ্‌তে) ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে জান্নাত (স্বর্গ), যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ; এটিই মহাসাফল্য। ৮৫ (১১)

অনেকের বদনমণ্ডল সেদিন হবে আনন্দোজ্জ্বল, নিজেদের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত। সুমহান জান্নাতে—সেখানে তারা অসার বাক্য শুনবে না, সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ, উন্নত মর্যাদা-সম্পন্ন শয্যা, প্রস্তুত থাকবে পান-পাত্র, সারি সারি উপাধান, এবং বিছানা গালিচা। ৮৮ (৮-১৬)

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন—যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তাদের স্বর্ণ-কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে। এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। ২২ (২৩)

তাদের (আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধচিত্ত দাসের) জন্য আছে নির্ধারিত জীবনোপকরণ ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত, সুখদ কাননে তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে। তাদের ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরা, শুভ্র উজ্জ্বল পাত্রে, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। ওতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং ওতে তারা মাতালও হবে না। তাদের সঙ্গে থাকবে লজ্জা-নম্র, আয়তলোচনা তন্বিগণ, সুরক্ষিত ডিম্বের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ৩৭ (৪১-৫০)

তোমরাই তো আমার আয়াতে (বাক্যে) বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে ; তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিনীগণ আনন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। ওদের খাদ্যও পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্রে ; সেখানে রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়, সমস্ত কিছু।··· ৪৩ (৬৯-৭১)

সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে—প্রস্রবণবহুল জান্নাতে, ওরা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে ; ওদের আয়তলোচনা হুর (স্বর্গীয় নারী) দেব। সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। ইহকালে মৃত্যুর পর তারা জান্নাতে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। তোমার প্রতিপালক তাদের জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন নিজ অনুগ্রহে। এটাই মহাসাফল্য। ৪৪ (৫১-৫৭)

সেদিন আল্লাহ্‌, নবী ও তাঁর বিশ্বাসী সাক্ষীদের অপদস্থ করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে বিচ্ছুরিত হবে এবং যারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণত্ব দান কর এবং ক্ষমা কর, তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।' ৬৬ (৮)

ধর্মে বাড়াবাড়ি নিষেধ

ধর্মকে কেন্দ্র করে যখন আমাদের দেশে অকল্যাণ ও অশান্তির সৃষ্টি হয় তখন আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। ইসলাম অর্থ শান্তি—সুতরাং ধর্মকে কেন্দ্র করে অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে না অথচ ব্যাপারটা প্রায়শই ঘটে থাকে। বিষয়টি নিয়ে বিষদ আলোচনার স্থান এটা নয়। আমরা কেবল এ সম্পর্কে আল-কোরআনের নির্দেশগুলির কিছু অংশ উদ্ধৃত করব।

ধর্মকে কেন্দ্র করে অশান্তির মূলে আছে অসহিষ্ণুতা। আমরা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অসহিষ্ণু ও ধৈর্যহীন। ফলে অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করি এবং ধর্মান্ধ হয়ে উঠি। সেই ধৈর্যহীনতা থেকেই অশান্তির দাবানল জ্বলে ওঠে। ধৈর্য সম্পর্কে আল্-কোরআনের উদ্ধৃতি সমূহ 'মানুষ ও তার কর্তব্য' অধ্যায়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে—এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অশান্তির দ্বিতীয় কারণ ধর্মে অত্যধিক বাড়াবাড়ি। অথচ আল্লাহ্ বলেন "...কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বাড়াবাড়িকারীদের পছন্দ করেন না।" ২(১৯০)

ধর্মে জোর জবরদস্তির কোন স্থান নেই। নিজের ধর্মমত জোর করে অন্যের উপর চাপান বাঞ্ছনীয় নয়, করলে ধর্মের প্রতি অত্যাচার করা হয়। আমাদের মনে রাখা উচিত "আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তার ধর্মকে সাহায্য করে" ২২(৪০)। জোর জবরদস্তিতে নিজের ধর্মকে সাহায্য করা হয় না বরং আল্লাহ্র নির্দেশকে অবহেলা করা হয়। "ধর্মের জন্য কোন জোরজবরদস্তি নেই, নিশ্চয় সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে।" ২ (২৫৬) পবিত্র আচরণের মাধ্যমে নিজ ধর্ম-সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বাঞ্ছনীয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন ইসলামের অভ্যুদয়-লগ্নে ধর্মের উদার রীতি-নীতি এবং সৌন্দর্যগুলি হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জীবনাচরণের মাধ্যমে এমন ভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল যে বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়েছিল এবং মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে স্বইচ্ছায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সেখানে জবরদস্তির কোন স্থান ছিল না। হজরত মুহম্মদের (দঃ) প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ ছিল কেবল কোরআনের আয়ত (বাক্য)গুলি জগদ্বাসীর কাছে প্রচার করা, সত্য এবং মিথ্যাকে মানুষের কাছে তুলে ধরা, জ্যোতি এবং অন্ধকারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ..."তোমাকে (হজরত মুহাম্মদকে দঃ) ওদের ওপর জবরদস্তি করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি, সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কোরআনের সাহায্যে উপদেশ দান কর" ৫০ (৪৫)। সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও যদি কেউ মিথ্যাকে আশ্রয় করে থাকে, জ্যোতির্ময়ের উদার অভ্যুদয়ের পরও যদি কেউ অন্ধকারে নিমগ্ন থাকে তার বিচার করবেন আল্লাহ্—হজরত মুহম্মদের (দঃ) তাতে কোন দায়িত্ব নেই—তিনি কেবল প্রচারক। লক্ষ্য করুন :..."ওরা (যাদের কাছে কোরআনের আয়ত পেঁৗছে দেওয়া হয়েছে) যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার (হজরত মুহম্মদের দঃ) কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট বাণী পেঁৗছে দেওয়া"। ১৬ (৮২)। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হজরত মুহম্মদ (দঃ) পৃথিবীর মানুষের জন্য হলেন প্রচারক এবং স্পষ্ট সতর্ককারী : "আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি" ৪৮ (৮), "আমি (মুহম্মদ সঃ) তো কেবল একজন মানুষ, একজন রসূল" ১৭ (৯৩)।

আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে বলেছেন রসূলের কাজ হল কেবল প্রচার করা : "প্রচার করা ছাড়া রসূলের অন্য কোন কর্তব্য নেই" ৫ (৯৯)—জোরজবরদস্তি করে নিজ ধর্মমতে অন্যকে দীক্ষা দিতে আল্লাহ্ কোথাও নির্দেশ দেন নি।

কোরবানী সম্পর্কেও আমরা অনেকেই বাড়াবাড়ি করে থাকি। কোরবানীকে উপলক্ষ্য করে আমরা অনেকেই ধনের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠি, কোন কোন সময় এমনও হয় যে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মনে আঘাত দিয়ে ফেলি। এ সম্পর্কে আল্লাহ্র নির্দেশ এই : "আল্লাহ্র কাছে ওদের মাংস এবং রক্ত পৌঁছায় না বরং তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা পৌঁছায়" ২২ (৩৭)। এখানেও জোর দেওয়া হয়েছে ধর্মনিষ্ঠার ওপর —বাড়াবাড়িকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হয়েছে।

বাস্তবে চলার পথে অনেক সময় আমাদের আর একটি বেদনাজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ্কে বিশ্বাস না করে পৃথিবীর অনেক মানুষ ও সম্প্রদায় কোন বস্তু, দ্রব্য বা মূর্তিকে আল্লাহ্ বা আল্লাহ্র অংশ বলে মনে করেন এবং তাদের মত, বিশ্বাস ও সংস্কার অনুযায়ী তাদের আল্লাহ্র উপাসনা করেন। এতে অনেক বিশ্বাসী ব্যক্তি অসন্তুষ্ট ও অধৈর্য হয়ে প্রাণহীন বস্তুগুলিকে (অংশীবাদীগণ যাদের ঈশ্বর বলেন) গালাগালি দিতে শুরু করে। এইসব অবিবেকী মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্ কঠোর কণ্ঠে বলেন : "এবং তারা (অংশীবাদীগণ) আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদের ডাকে তাদের তোমরা গালি দেবে না, তারা (সীমানালংঘন করে) অজ্ঞানবশতঃ আল্লাহ্কেও গালি দেবে ৬(১০৮)।" যে অন্যের উপাস্যকে গালিগালাজ করে বুঝতে হবে সে তার আল্লাহ্র প্রতি যথেষ্ঠ শ্রদ্ধাশীল নয়। আল্লাহ্ সকল সময় মানুষকে গর্বিত কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তাছাড়া এভাবে গালিগালাজের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঘৃণাভাব বাড়বে—যা আল্লাহ্ কখনই ভালবাসেন না। এক আল্লাহ্তে বিশ্বাসস্থাপনকারী প্রত্যেক মানুষকে এই অপূর্ব আয়াতটির তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন করতে অনুরোধ জানাই। পূর্বেই বলেছি ইসলাম বাড়াবাড়ি ও জবরদস্তি সমর্থন করে না। কোরআন শরীফের ১০৯ তম সূরার সেই বিখ্যাত ষষ্ঠ আয়াতটি পড়ুন : "তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার কাছে (প্রিয়)।" অর্থাৎ যে যার ধর্মমতে থাকতে চায় থাকুক—যেন কোথাও কোন জবরদস্তি না হয়। তবে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্য ধর্মের প্রচারের নির্দেশ দান করে আল্-কোরআন —কেননা মানুষ মাত্রই আলোর পিপাসী, তারা অন্ধকার পিছনে ফেলে আলোকোজ্জ্বল পথে চলতে চায়—কোরআন সেই জ্যোতির্ময় পথের দিশারী।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিখ্যাত হাদীস স্মরণ করছি : 'লোকেরা বললো, 'হে রসূলুল্লাহ্! পৌত্তলিকদের অভিশাপ দিন।' তিনি বললেন, 'আমি কখনো অভিশাপ দেবার জন্য প্রেরিত হইনি বরং শুধু দয়া প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়েছি।' "

ইসলাম ও অংশীবাদ

ইসলাম কোন নতুন ধর্ম নয়। পৃথিবীতে যত ধর্মমত প্রচলিত আছে—ইসলাম তাদের মধ্যে প্রাচীনতম। এই ধর্মমতের সঙ্গে অন্যান্য অনেক ধর্মমতের মিল আছে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সকল ধর্মমতেই অনেক বিষয় মিল লক্ষ্য করা যায়। কোন

ধর্মই মানুষকে মিথ্যা কথা বলতে উপদেশ দেয় না, চুরি-ডাকাতিকে সমর্থন করে না, পিতা-মাতার অবাধ্য হতে বলে না, কোন প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে না। ইসলাম ধর্মও এগুলিকে সমর্থন করে না, কোন অংশীবাদী ধর্মও এগুলিকে প্রশ্রয় দেয় না। ইসলাম ও অংশীবাদী ধর্মে এতসব মিল থাকা সত্ত্বেও নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র স্বরূপকে কেন্দ্র করে উভয় ধর্মমতের মধ্যে পার্থক্য দুস্তর হয়ে উঠেছে।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুকে আল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করানো কিংবা আল্লাহ্‌র অংশ ভাবার নামই 'অংশী' স্থাপন করা। এক আল্লাহ্ ছাড়া বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করাই হল অংশীবাদী ধর্মমত বিশ্বাস করা। ইসলাম এটা সমর্থন করে না। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী আল্লাহ্ এক, অনাদি, সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, সকল কিছুর নির্ভরস্থল—তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই: "আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনি যুগপৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।···তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু ভূমি হতে নির্গত হয় ও আকাশ হতে যা কিছু বর্ষিত হয় ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা দেখেন।" ৫৭ (২-৪)

"তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই রাজা, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা-বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহংকারের অধিকারী; ওরা যাকে অংশী স্থির করে আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ্, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" ৫৯ (২৩-২৪)

তিনি কোনদিন মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না, তিনি জনক নন, তিনি জাতকও নন। বিরুদ্ধবাদীগণ একত্রিত হয়ে যখন হজরত মুহম্মদের (দঃ) কাছে আল্লাহ্‌র স্বরূপ জানতে চাইল তখন এই সূরা অবতীর্ণ হয়: "(হে মুহম্মদ, তুমি) বল, 'তিনি আল্লাহ্ অদ্বৈত। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ের নির্ভর (স্থল)। তিনি জনক নন এবং জাতকও নন। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" ১১২ (১-৪)

অবতারবাদ ইসলাম সমর্থন করে না। তবে প্রয়োজনবোধে মহান আল্লাহ্ এই পৃথিবীর মানুষকে পথপ্রদর্শনের জন্য মাঝে মাঝে এক একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন: ··"পর্যায়ক্রমে রসূলগণকে প্রেরণ করেছি"···২ (৮৭); "প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রসূল"···১০ (৪৭); "আল্লাহ্‌র উপাসনা করার ও অসৎ (বিশৃঙ্খলা) বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি।" ১৬ (৩৬)

এই প্রতিনিধিগণও মানুষ, একেবারেই রক্তমাংসের মানুষ। "তোমার পূর্বে আমি যে সব রসূল প্রেরণ করেছি তারা সকলেই তো আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত।" ২৫ (২০) এঁরা অবতার নন—সকলেই আল্লাহ্‌র দাস। তবে পার্থক্য এই যে এঁদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপা আছে। এঁরা কখনই আল্লাহ্‌র অংশ নন।

এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুকে আল্লাহ্ ভাবা বা তাঁর অংশ বলে

স্বীকার করা এবং সেই বিশ্বাসে তাঁকে অর্চনা করা ইসলামে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্-কোরআনে বার বার বলা হয়েছে : "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।"

"তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য স্থির করো না।" ৫১ (৫১)

"তাঁর (আল্লাহ্‌র) সাথে অন্য কোন উপাস্য নেই ; যদি থাকত তবে প্রত্যেক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ত এবং একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইত।" ২৩ (৯১)

যারা পরমপ্রভু আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য স্থির করে তারাই অংশীবাদী।

কোরআন শরীফের এই একেশ্বরবাদ বহুবছর পূর্বে বেদ এবং উপনিষদে কিভাবে এসেছে সে বিষয়ের উপর এখানে সামান্য আলোকপাত করা যেতে পারে।

"সুপ্রাচীনকালে সরল আর্যগণ প্রকৃতির প্রতিটি বিস্ময়কর ঘটনা ও কার্যে একটি করে দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়েছিলেন। এই অনুমান ও কল্পনার ফলেই অগ্নি বায়ু ইন্দ্র পূষা ত্বষ্টা সোম সূর্য উষা বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি অসংখ্য দেবতার উদ্ভব হল। সভ্যতার ক্রমোন্নতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে এই আর্যগণই উপলব্ধি করলেন প্রকৃতির সকল কাজ একই নিয়মে চলে। ফলে তাঁরা এসব কিছুর মূলে একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করলেন। তাঁরা বললেন : এক ছাড়া দ্বিতীয় নেই। এক হতেই সব। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চান্ন সূক্তটিতে সকল কার্যকরণের মূলে ঐশ্বরিক বলের ঐক্যের কথা সুন্দর রূপে বিবৃত হয়েছে। প্রকৃতির অনন্ত কার্য পরম্পরাকে ভিন্ন ভিন্ন দেবের নামে স্তুতি করা হয় সে কার্য পরম্পরায় একতা দেখে বেদের ঋষিগণ স্বীকার করে নিয়েছেন যে দেবগণের কার্যসমূহ ভিন্ন নয়, তাঁরা একই দৈব ক্ষমতার অধীন, একজন ঈশ্বরই তাঁদের পরিচালিত করছেন, তাঁদের যে দৈবক্ষমতা তা সেই পরমেশ্বরেরই দান, সকল কিছু তাঁরই অধীন, সকল কিছুই সেই অনন্ত অসীম দয়াময়ের কৃপার ফল। সুতরাং ঈশ্বর বহু নন, এক। তিনি অসীম, তিনি করুণাময়, তিনি হতেই সব কিছুর সৃষ্টি, তিনি হতেই সব কিছুর লয়। তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চান্ন সূক্তে সর্বমোট বাইশটি ঋক্ আছে। প্রতিটি ঋকের শেষে এই কথাটি আছে : 'মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্' অর্থাৎ 'মহৎ দেবানাং অসুরত্বং একং' যার বাংলা অর্থ 'দেবগণের মহৎ বল একই।' সায়ণাচার্য এর অর্থ করেছেন 'দেবানাং একং মুখ্যং অসুরত্বং…প্রাবল্যং মহৎ ঐশ্বর্যং।' পণ্ডিত Wilson-এর অর্থ হল : 'great and unequalled is the might of the gods'. বেদের অভ্রান্ত ব্যাখ্যাদাতা মহাপণ্ডিত Max Muller এর অর্থ করেছেন : 'The great divinity of the gods is one'. 'The divine power of the gods is unique' বলেছেন Muir. অর্থাৎ সব কিছুর মূলে সেই সর্বশক্তিমানের লীলাখেলা বিরাজমান। ঐশ্বরিক বল এবং দেবতাদের কাজ—এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বিশ্বনিখিলের সর্বত্র যে কাজ হয়ে চলেছে প্রকৃতপক্ষে তার মূলে কোন দেবতা নেই (আর্যগণ 'দেবতা আছে' এরূপ কল্পনা করে এক একটি দেবের নাম দিয়েছিলেন মাত্র), আছেন কেবলমাত্র এক ঈশ্বর। সকল কিছুই তাঁর অধীন, তাঁর নিয়ন্ত্রণে সকল কিছুই। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় নেই।…প্রথম মণ্ডলে ঋষির মনে একেশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে 'যিনি এ ছয় লোক স্তম্ভন করেছেন, যিনি জন্মরহিত রূপে নিবাস করেন তিনি কি সেই এক' (১।১৬৪।৬)? এ প্রশ্নই তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চান্ন সূক্তে স্থিতিলাভ করেছে ঐশ্বরিক বল ও দেবতাদের কাজের সমন্বয়ের মধ্যে, বাষট্টি সূক্তে তা জগদ্বিখ্যাত গায়ত্রী 'বরেণ্যং ভর্গঃ' অর্থাৎ বরণীয়

জ্যোতি ("আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি,...আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর জ্যোতির দিকে পথনির্দেশ করেন" ২৪।৩৫। সুতরাং কোরান শরীফেও এই 'বরেণ্যং ভর্গঃ' বা বরণীয় জ্যোতির সমর্থন পাচ্ছি) রূপে নিখিল মানব হৃদয়ে বিস্তার লাভ করেছে। এ সকল সূক্তে ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন নেই। তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত, তিনি এক এবং তিনিই অদ্বিতীয়।... প্রকৃতির নানান বিস্ময়কর ক্রিয়াকাণ্ডের মর্মমূলে মহান ঈশ্বরের অস্তিত্বই তাঁরা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন।"[১]

একেশ্বর চিন্তা উপনিষদে আরো ব্যাপক এবং গভীর। শংকরভাষ্য মতে 'যে বিদ্যায় ব্রহ্মকে পাওয়া যায় তাই উপনিষদ।' উপনিষদের এই ব্রহ্ম চিন্তা রামমোহনের মধ্যে বিরাট আলোড়ন এনেছিল। তিনি লিখেছেন: "এই সকল উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বর এক সর্বত্রব্যাপী আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন তাহারি উপাসনা প্রধান।"[২] রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঈশ্বর চিন্তা আরো সুস্পষ্ট, আরো প্রখর এবং জীবন-সর্বস্ব। মোট কথা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মহান ভারত-ভূমিতে একেশ্বর চিন্তা বারে বারে নানান ভাবে দেখা দিয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হবার পূর্বেই একেশ্বর চিন্তা ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।

এই একেশ্বরবাদই ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি। এ বিষয়ে সেখানে কোন আপোষ নেই। অংশীবাদ সম্পর্কে তাই আল্-কোরআনে কঠোর মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। অংশীবাদ সম্পর্কে কোরআন শরীফের উক্তিগুলির কিছু অংশ এই:

"তুমি কি সে ব্যক্তির (নমরূদের) কথা ভেবে দেখনি যে ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলল, 'তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান', সে বলল, 'আমিও তো জীবনদান করি ও মৃত্যু ঘটাই।' ইব্রাহীম বলল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান তুমি তাকে পশ্চিমদিক থেকে উদয় করাও।' সে (নমরূদ) তখন হতবুদ্ধি হয়ে গেল।" ২ (২৫৮)

"অতঃপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে (ইব্রাহীম) নক্ষত্র দেখে বলল, 'ঐটিই আমার প্রতিপালক।' অতঃপর যখন ঐটি অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না।' অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, 'এটি আমার প্রতিপালক।' যখন সেটি অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথ ভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব।' অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, 'এটি আমার মহান প্রতিপালক।' যখন সেটিও অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্র অংশী কর, তা থেকে আমি নির্লিপ্ত।' নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" ৬ (৭৬-৭৯)।

"আমি (আল্লাহ্) অবশ্য এর পূর্বে ইব্রাহীমকে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলাম। যখন সে তার পিতা

[২] ভূমিকা: উপনিষদ ২য় খণ্ড—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃ ২৮
[১] ঋগ্বেদ ১ম খণ্ডের ভূমিকা। পৃ ১৬-১৭

ও তার সম্প্রদায়কে বলল, 'এইযে মূর্তিগুলি, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ, এগুলি কি ?' ওরা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এদের পূজা করতে দেখেছি।' সে বলল, 'তোমরা নিজেরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ, তোমাদের পিতৃপুরুষগণও ছিল।' ওরা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, না তুমি কৌতুক করছ ?' সে বলল, 'বরং তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি ওদের সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি।' 'শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব।' অতঃপর সে ওদের প্রধানটি (মূর্তিটি) ছাড়া অন্যান্য মূর্তিগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল, যাতে ওরা এর (প্রধান মূর্তিটির) শরণাগত হয়। ওরা বলল, 'আমাদের দেবতাগুলির প্রতি এরূপ করল কে ? নিশ্চয়ই সে সীমালংঘনকারী।' কেউ কেউ বলল, 'এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি ; তাকে বলা হয় ইব্রাহীম।' ওরা বলল, 'তাকে লোক সম্মুখে উপস্থিত কর, যাতে ওরা সাক্ষ্য দিতে পারে।' ওরা বলল, 'হে ইব্রাহীম, তুমিই কি আমাদের দেবতাগুলির প্রতি এরূপ করেছ ?' সে বলল, 'এদের (মূর্তিগুলির) এই প্রধানই (সব চেয়ে বড় মূর্তিটি) এ (মূর্তি ভাঙার কাজ) করেছে। এদের জিজ্ঞাসা করে দেখ না যদি এরা কথা বলতে পারে।' তখন ওরা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল, 'তোমরাই সীমালংঘনকারী ?' অতঃপর ওদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং ওরা বলল, 'তুমি তো ভালই জান যে এরা (মূর্তিগুলি) কথা বলে না।' ইব্রাহীম বলল, 'তবে কী তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না ?' 'ধিক্ তোমাদের এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের ! তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?' ২১ (৫১-৬৭)।"

"তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত কেবল প্রতিমার পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণ দানে অক্ষম। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহ্‌র নিকট এবং তাঁরই উপাসনা কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট (মৃত্যুর পর) প্রত্যাবর্তিত হবে।" ২৯ (১৭)।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের আহ্বান কর, তারা তো তোমাদেরই ন্যায় দাস, তোমরা তাদের আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক্। তাদের কি চলার পা আছে ? তাদের কি ধরার হাত আছে ? কিংবা তাদের কি শোনার কান আছে ?" ৭ (১৯৪-৯৫)

"আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না, যা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না"...১০ (১০৬)

"ওরা (অংশীবাদীগণ) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা ওদের কোন অপকার করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না ; এটিই চরম বিভ্রান্তি ! ওরা এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতিই ওর উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এ অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এ সহচর !" ২২ (১১-১৩)

"যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা। যে নিজের জন্য ঘর তৈরী করে এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি ওরা জানত।" ২৯ (৪১)

"আল্লাহ্ সঠিকভাবে বিচার করেন, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ওরা যাদের ডাকে তারা বিচার করতে অক্ষম।" ৪০ (২০)

"তোমরা (অংশীবাদীগণ) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্রিত হলেও। এবং মাছি যদি তাদের নিকট থেকে কিছু নিয়ে চলে যায় এ-ও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না। অক্ষম যাচ্ঞাকারী ও যার নিকট যাচ্ঞা করা হয় সে। ওরা আল্লাহ্‌কে যথোচিত সম্মান করে না। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।" ২২ (৭৩-৭৪)

অংশীবাদীগণ আল্লাহ্‌র অংশী করলেও একমেবাদ্বিতীয়ম্ আল্লাহ্‌কেও বিশ্বাস করেন। আল্-কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে: "(অংশীবাদীদের) জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা জান তবে বল, 'এই পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কার?' ওরা বলবে, 'আল্লাহ্‌র।' বল, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?' জিজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্তাকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি?' ওরা বলবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?' জিজ্ঞাসা কর, 'যদি তোমরা জান, তবে আমাকে বল, সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি রক্ষা করেন এবং যাঁর উপর (কোন) রক্ষক নেই?' ওরা বলবে, 'আল্লাহ্‌র।' বল, 'তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ?'" ২৩ (৮৪-৮৯)

"তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়; সিজদা কর আল্লাহ্‌কে যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই দাসত্ব কর।" ৪১ (৩৭)

কোরআন শরীফে বার বার বলা হয়েছে: আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন অংশী নেই, কোন সমকক্ষ নেই। যদি কোন সমকক্ষ থাকত তা হলে অবশ্য উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিত এবং সৃষ্টিজগতে তার প্রভাব পড়ত। পূর্বে উদ্ধৃত ২৩ (৯১) সংখ্যক আয়তে আমরা পড়েছি: "তাঁর (আল্লাহ্‌র) সাথে অন্য কোন উপাস্য নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইত।"

ঠিক একই কথার প্রতিধ্বনি শুনি অন্যত্র: "ওদের (অংশীবাদীদের) কথামত যদি তাঁর (আল্লাহ্‌র) সঙ্গে আরও উপাস্য থাকত তবে তারা আরশ-অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অন্বেষণ করত।" ১৭ (৪২)

"এক ব্যক্তির প্রভু অনেক যারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আর এক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন; এদের দুজনের অবস্থা কি সমান?" ৩৯(২৯)

সুতরাং সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। তিনি এক এবং মহান দয়ালু। তিনি সকলের উপর সর্বশক্তিমান। তাঁর উপরে কেউ নেই। তিনি আমাদের একমাত্র উপাস্য।

মহানবীর জীবন ও বাণী-বৈশিষ্ট্য

হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর উজ্জ্বল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বহুমুখী কর্মধারার সফল ফলশ্রুতিগুলির প্রতি দৃষ্টি দেবার আগে তাঁর মহান মানবিক প্রতিচ্ছবিটি বিশেষরূপে স্মরণে রাখতে চাই। সংগ্রামশীল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ—পরিপূর্ণ মানুষ। মানুষের কল্যাণকামনাই তাঁর সারা জীবনের সাধনা। অসাধারণ প্রতিভার এবং অতিমানবীয় কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েও তিনি নিজের প্রতি কখনো অলৌকিকত্ব বা দেবত্বের আরোপ করেন নি। সকল সময় তিনি নিজেকে একজন মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ও তাঁকে একজন মানুষ হিসেবে দেখতেই ভালবাসেন—এই আয়তটির মর্মার্থ লক্ষ্য করুনঃ "আমি তোমাদের বলি না যে আমার নিকট আল্লাহ্‌র কোষাগার আছে এবং আমি ভবিষ্যৎ জ্ঞাত আছি এবং আমি তোমাদের বলি না যে আমি একজন ফেরেশ্‌তা। আমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আমি শুধু তাই অনুসরণ করি।"

এই বিজ্ঞানালোকিত বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের দিনেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ প্রতিভাধর মনীষীদের প্রতি দেবত্বের আরোপ করা হয়। যীশুখৃষ্টকে তো তাঁর অনেক ভক্ত কেবল অতিমানব বলে তুষ্ট নন বরং তাঁর মধ্যেই তাঁরা ভগবানের অস্তিত্ব খোঁজেন, তাঁর মধ্যেই মুক্তি অন্বেষণ করেন। অনেক সম্প্রদায়ের কাছে তাঁদের ধর্মনেতাগণ তো স্বয়ং ভগবানরূপে অর্চিত হন। কিন্তু হজরত মুহম্মদ (সঃ) নিজের সম্বন্ধে বার বার বলেছেনঃ আমি তোমাদের মত একজন মানুষ—আল্লাহ্‌র দাস। তবে শুধু পার্থক্য এই যে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়। নিজেকে তিনি কেবলমাত্র মানুষ বলেই ক্ষান্ত হননি—লোকান্তরিত হবার পর তাঁর প্রতি দেবত্ব আরোপ করে যাতে ব্যক্তিপুজার সৃষ্টি না হয় সেজন্য মৃত্যু-শয্যায় তিনি সকলকে সাবধান করে বললেনঃ "আমার কবরকে সেজদার (ভূমিতে অবনত মস্তকে প্রণতিপাতের) জায়গায় পরিণত করো না।" এভাবে অতিমানবরূপে পুজিত হবার সম্ভাবনাকে তিনি চিররুদ্ধ করে গেছেন এসব স্মরণীয় উক্তিতে। অনেক ধর্মনেতা নিজেদের সম্বন্ধে এ ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করেননি বলেই পরবর্তীকালে তাঁদের কেন্দ্র করে নানান বিভ্রান্তি ও বেদনাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এতে যেমন তাঁর সশ্রদ্ধ বিনয় প্রকাশ পেয়েছে অন্যদিকে তেমনি প্রকাশিত হয়েছে প্রখর দূরদর্শিতা।

"আমি (মুহম্মদ) তো কেবল একজন মানুষ, একজন রসুল (প্রেরিত দাস)" ১৭(৯৩)—আল্-কোরআনের এ বাণীকে হজরত মুহম্মদ (সঃ) চিরদিনই স্মরণে রেখেছিলেন। অতি সাফল্য এবং অতিপ্রশংসার দিনেও তিনি তাঁর মানবীয় স্বরূপকে ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হননি। পৃথিবীতে তাঁকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ ঘোষণা করেনঃ "হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী-রূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহ্‌র দিকে আকর্ষণকারী ও আলোক-বিচ্ছুরণকারী মশাল রূপে" ৩৩(৪৫-৪৬)। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ্ও তাঁকে পাপ থেকে মানুষকে সতর্ক এবং কল্যাণমুখী করার জন্য পাঠিয়েছেন।

রসূলুল্লাহ্ তাঁর সমগ্র জীবনাচরণের মাধ্যমে সে সাধনাই করে গেছেন। ইসলাম-তত্ত্ববিদ মহামতি স্টানলি লেনপুল তাই ঠিকই বলেছেন: The life of Muammad is not the life of a god but of man from first to last, it is intensely human. অর্থাৎ নবী মুহম্মদের (দঃ) জীবনী কোন দেবতার জীবনী নয়, বরং একজন মানুষের জীবনী—প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত তা গভীর ভাবে মানবোচিত।

আমাদের এ আলোচনার বিভিন্ন স্থানে তাঁর এই মানবীয় জীবন-সাধনার কথা নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

যে-কালে এবং যে-পরিবেশে মহানবী মুহম্মদ (সঃ) জন্মগ্রহণ করেন, সেই বিষাক্ত পরিবেশে মানবতার বিকাশ ঘটা সম্ভব ছিল না, বরং তার অপমৃত্যুই ছিল অনিবার্য। হিংসা-দ্বেষ, হানাহানি, গৃহযুদ্ধ-হত্যা-রক্তপাত, ব্যভিচার-লুণ্ঠন-মদ্যপান-জুয়া—নৈরাজ্যবাদের চূড়ান্ত অবস্থা! আল্লাহ্র নির্দেশ সম্বল করে হজরত মুহম্মদ (সঃ) এই অন্ধকারেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আত্মিক উন্নতি এবং মুক্তির জন্য তিনি দূরে তপোবনে গিয়ে ধ্যানমগ্ন হলেন না বরং মানবিকতার জয়গান গেয়ে ঘোষণা করলেন "ইসলামে কোন সন্ন্যাসধর্ম নেই।" এই দ্বন্দ্ব-সর্বস্ব পতিত মানবসমাজকে পরিত্যাগ করে নয়, বরং অসংখ্য বন্ধনকে স্বীকার করে তীব্র জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি হত্যাকারী দুর্দান্ত আরব বেদুইনদের প্রেম ও প্রীতির মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন, ত্যাগ-ক্ষমাসমুজ্জ্বল মানবীয় সাধনার মধ্য দিয়েই তিনি এই রক্তক্ষয়ী নির্দয় সম্প্রদায়ের আত্মিক-তিমির-বলয়ে কল্যাণ ও সত্যের আলোক প্রজ্বলিত করলেন। অনেক জটিল পথ অতিক্রম করে এগিয়ে চলল তাঁর এই মানবতার সাধনা। তিনি মানুষের ব্যথা-বেদনা, দৈন্য-দুর্দশা, আশা-নিরাশা, পাপ-পুণ্য, আকাঙ্ক্ষা ও অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন—তাই মানুষের জন্য যা কঠোর ও দুঃসাধ্য সেসব নীতি পরিত্যাগ করে যা সহজসাধ্য এবং মঙ্গলজনক সেগুলিরই নির্দেশ দিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ এবং অনন্ত জীবন—তাঁর ধর্মীয় এবং পার্থিব সহজ-সরল বিধানগুলি আমাদের সেই গন্তব্যের দিকেই এগিয়ে নিয়ে যায়। এই কল্যাণপ্রসূ নীতিগুলি দিয়েই তিনি আমাদের খণ্ড জীবনের বিচিত্র ধারাগুলিকে সংযত ও সংহত করে মানবিকতার বিকাশের মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। বহু যুগ পর আরব মরুতে পুনরায় মানবিকতা তার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল, ধর্মজীবনের পূর্ণ বিকাশে আমাদের বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হল জ্যোতির্ময় এক বিশাল আধ্যাত্মিক জগৎ—যে জগতের সন্ধান ইতিপূর্বে অজ্ঞাত ছিল।

ইসলামের পূর্ণ বিকাশের অর্থই হল মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ-সাধন। ইসলামে জগৎ এবং ধর্ম দুই-ই সমান গুরুত্ব পেয়েছে। ধর্মকে বাদ দিয়ে সংসার নয় আবার সংসারকে পৃথক করলে ধর্মের পূর্ণ মর্যাদা থাকে না। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে: দোজখের (নরকের) কঠিন শাস্তি সম্পর্কে যখন পর পর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হল তখন মহানবীর কয়েকজন সহচর স্থির করলেন যে তাঁরা সারা রাত জেগে নামাজ পড়বেন কিন্তু নিদ্রা যাবেন না, রোজা (উপবাস) রাখবেন কিন্তু ইফতার (উপবাস ভঙ্গ) করবেন না, স্ত্রী সংসর্গ ত্যাগ করবেন ইত্যাদি। সহচরদের এধরনের সিদ্ধান্তের কথা মহানবীর কর্ণগোচর হতেই তিনি তাঁদের ডেকে বললেন: তোমাদের থেকে আমি আল্লাহ্কে বেশী ভয় করি কিন্তু আমি রাতে নামাজ পড়ি এবং নিদ্রা যাই, রোজা রাখি এবং ইফতার করি

এবং আমি স্ত্রীদের পরিত্যাগ করি নি। এসব উক্তির মাধ্যমে ধর্মীয় জীবনের গুরুত্ব যেমন স্বীকৃত হয়েছে তেমনি পার্থিব জীবনের গুরুত্বও উপেক্ষিত নয়। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ "রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিজের জুতো নিজে মেরামত করতেন, নিজের কাপড় নিজে সেলাই করতেন, তোমাদের প্রত্যেকের মত তিনিও ঘর-সংসারের কাজ করতেন। মানুষের মধ্যে তিনিও একজন মানুষ ছিলেন—নিজের কাপড় নিজে ধুতেন, নিজের ছাগী নিজে দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজে করতেন।" অন্য একটি হাদীসে আছে ঃ "রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বাড়ীতে পরিজনদের সঙ্গে কাজ করতেন, তারপর নামাজের সময় হলে নামাজ পড়তে যেতেন।" আরো একটি উল্লেখযোগ্য হাদীস এই ঃ 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট যে পৃথিবীর জন্য পরকাল এবং পরকালের জন্য পৃথিবীকে পরিত্যাগ করে না"...। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-জীবন এবং গার্হস্থ্য-জীবনের সম্মিলিত রূপ হল ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ। একটির অভাবে অপরটিতে পরিপূর্ণতা আসে না, আপন সৌন্দর্যে বিকশিতও হতে পারে না। হজরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁর সারা জীবনের সাধনা দিয়ে এই উভয় দিকের পরিপূর্ণ রূপটি ইসলাম ধর্মে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মানব-জীবনের উন্নতির জন্যে তিনি যে আচরণ বিধিগুলি নির্দিষ্ট করেছেন সেগুলি নৈতিক সৌন্দর্যে যেমন সমুজ্জ্বল, তেমনি চিন্তাধারার দিক দিয়েও আধুনিক। সর্বোপরি উপদেশগুলির বিশ্বজনীনতা এবং ব্যবহারযোগ্যতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। জগতের অনেক মহামানব এবং ধর্মনেতা যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন তাদের মধ্যে কোন কোনটি নীতি হিসেবে মানুষের আপাত-শ্রদ্ধা অর্জন করলেও, তাদের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে দ্বিধা ও কুণ্ঠা প্রকাশ পায়, পরিণামে নীতিগুলির অব্যবহারযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের অনেক মহাপুরুষ পাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কামিনী-সংসর্গ পরিত্যাগের কথা ঘোষণা করেছেন। কৌমার্য ব্রতের মাধ্যমে আত্মসংযম—নীতি হিসেবে যত মহৎ হোক না কেন আজ পর্যন্ত এটি কোথাও (ন্যূনতম ব্যতিক্রম সর্বত্র আছে) পালিত হয়নি। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রানুযায়ী এই নীতি শরীর, মন ও স্বাস্থ্য কোনটির জন্যও অনুকূল নয়। মনোবিজ্ঞানেও এটি সুস্থ মানসিক বিকাশের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়েছে। চিন্তাজগতেও এটি ক্লীবত্বের প্রতীক। বংশধারার প্রবহমানতাকে ধ্বংস করা—আর যাই হোক—কোন উচ্চতর কল্যাণমুখী চিন্তা ও নীতির লক্ষ্য হতে পারে না। সুতরাং ঐসকল আচরণ বিধির সীমাবদ্ধতা সহজেই চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে মহানবী মুহম্মদ (সঃ) আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। মানব সাধারণের কল্যাণ এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে তিনি বিবাহকে একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে বিধান দিলেন। বললেন ঃ "যখন কোন বান্দা বিবাহ করে, সে তার ধর্মকে অর্ধেক পূর্ণ করে। সে যেন বাকী অর্ধেকের জন্যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে।" গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে এ বিধান যেমন মধুর, তেমনি আত্মিক উৎকর্ষণার গুরুত্বও এখানে সমান ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। "বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং গুপ্তস্থানকে (তথা সামগ্রিকভাবে চরিত্রকে) রক্ষা করে" উক্তির মধ্যে বিশ্বনবীর চিন্তার ব্যাপকতা ও পবিত্রতা লক্ষ্য করে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। বোঝাই যায় তাঁর চিন্তাগুলি শূন্যোগর্ভ হাউইবাজীর রঙীন স্ফুলিঙ্গ নয়। বাস্তব সমস্যা সমাধানে তিনি পলায়নী মনোবৃত্তি গ্রহণ করেননি—এসব ক্ষেত্রে তাঁকে বলিষ্ঠ মানবপ্রেমিক রূপে সমস্যার মূল কেন্দ্রে অবতীর্ণ হতে দেখি।

মানব-জীবনের ঐতিহ্যগুলি যখন পাশব পরিবেশের বিভীষিকায় সম্পূর্ণরূপে কলঙ্কিত ও পর্যদস্ত সেই ভয়ংকর দিনে আরব মরুতে হজরত মুহম্মদের (দঃ) জন্ম। ধর্মীয়, নৈতিক এবং সামাজিক—কোন জীবনেই মনুষ্যত্বের এতটুকু স্পর্শ ছিল না। এক এক গোত্রের লোক খণ্ড খণ্ড হয়ে এক-এক জায়গায় বসবাস করত। কোন গোত্রের সঙ্গে কোন গোত্রের মিল ছিল না। অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে 'রক্তের বদলে রক্তের' সংগ্রাম শুরু হয়ে যেত এবং কথনো কথনো সেই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম বংশপরম্পরায় পরিব্যাপ্তি লাভ করতো। রাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় আরব জনগণের জীবন ও ধনসম্পদ কোন সময় নিরাপদ ছিল না। অবক্ষয়ী নৈতিকজীবনের কোন বুনিয়াদ ও বাঁধন না থাকায় অবাধে লুণ্ঠন, হত্যা ও ব্যভিচারে জীবন অভিশাপে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সর্বজনগ্রাহ্য সামাজিক রীতিনীতির অভাবে জীবনযাত্রার পবিত্রতা যেমন বিলুপ্ত হয়েছিল. অনাচারের প্রভাবে সমগ্র দেশ হতে ধর্মানুবর্তিতা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। সামাজিক এবং ধর্মীয় এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে মহানবী মুহম্মদ (সঃ) কেমন ভাবে মঙ্গল-দ্বীপ প্রজ্বলিত করলেন তা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করার মত।

প্রথমে ধর্মীয় পরিস্থিতির কথা ধরা যাক। সমসাময়িক আরবেরা ধর্মের দিক দিয়ে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—পৌত্তলিক, অংশীবাদী এবং নাস্তিক। পৌত্তলিক-দের দেবতার সংখ্যা কত সম্ভবতঃ তা তারা নিজেরাই জানত না। একমাত্র কাবাতেই তিন শো ষাটটি মূর্তি ছিল। মূর্তির সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ত—যে যার ইচ্ছামত আপন দেবতার প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করে তার পূজায় নিরত থাক্‌ত। ইচ্ছা হলে পুরাতন দেবতাকে পরিত্যাগ করে নতুন দেবতা তৈরী করতেও কোন দ্বিধাবোধ করত না। সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস ও আরাধনা করার চাইতে এই সব দেবতাদের শুভাশিস্‌ কামনায় তারা অধিকতর ব্যগ্র ছিল, এমন কি এই সকল অপদেবতাদের অসন্তুষ্টি হতে আত্মরক্ষার জন্যে তারা সকাতর প্রার্থনায় নিরত থাকত। অংশীবাদীরা চন্দ্র সূর্য সর্প অগ্নি প্রভৃতিকে ঈশ্বরের মর্যাদাদান করে পূজো করত। কেউ কারো ঈশ্বর বা দেবতাকে হেয় জ্ঞান করলে জীবনধ্বংসী সংগ্রাম শুরু হয়ে যেত, বাহুবলে আপন ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত না করা পর্যন্ত এই পাশব সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটত না। নাস্তিকরা তো এ সবের উর্ধ্বে ছিল—ঈশ্বরকে তারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতেই ভালবাসত, নিজেদের শক্তিসামর্থ্যই ছিল তাদের দেবতা, তাদের নিয়ন্তা।

হজরত মুহম্মদ (সঃ) সর্বপ্রথম ঘোষণা করলেন মহান আল্লাহ্‌র কথা। বল্‌লেন ঃ আল্লাহ্‌ই এ বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সকলের প্রভু। বললেন ঃ আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই. তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। এ ঘোষণায় আরবের ধর্মজগতে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হল, বলা যেতে পারে এক মহান বিপ্লবের সূচনা হল। তিনি আরবদের দেবতাকেন্দ্রিক অসংখ্য চিন্তাধারা ও ভক্তিকে এক আল্লাহ্‌তে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করলেন। ফলে আল্লাহ্‌র প্রতি অটল বিশ্বাসে এবং এক নবচেতনার সঞ্চারে তারা যেন এক নতুন জাতিতে পরিণত হল। এক আল্লাহ্‌কে কেন্দ্র করেই শতধা বিভক্ত আরবজাতি আবার মহান ঐক্যে একত্রিত হল, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ই হলেন তাদের সকল শক্তির উৎস, সকল কর্মের প্রেরণা। প্রকৃতপক্ষে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' এই মহামন্ত্রকে সম্বল করে তারা যেন নিদ্রা থেকে জেগে উঠল এবং অকস্মাৎ এক নবীন ও মহৎ জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রসূলকে কেন্দ্র করে আরবদের এই যে মহাজাগরণ—অচিরে নানান কল্যাণমুখী চিন্তাধারার প্রবর্তনায় তা এক মহান মঙ্গলপ্রসূ কর্মযজ্ঞে

রূপায়িত হল। একতাই শক্তির উৎস। "মুসলমানগণ পরস্পর ভাই" বলে মহানবী সকল আরবকে এক উদ্দীপ্ত চেতনায় আশ্চর্যরূপে একতাবদ্ধ করলেন। জামাতে নামাজ পড়ার এবং একসঙ্গে আহার করার প্রথারও সূচনা করলেন তিনি। এ সকল প্রয়াসে আরবরা কেবল একতাবদ্ধই হল না, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন এবং শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠল। ক্রোধ, প্রতিহিংসা এবং সংকীর্ণতার স্তর অতিক্রম করে মানসিক উদারতায় তারা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছালো যে মক্কার বাস্তু-ত্যাগী মুসলমান ভাইদের জন্য মদীনার আনসারেরা আপন ধনসম্পত্তির অর্ধেক দান করতে কুণ্ঠিত হল না, এমন কি যার একাধিক স্ত্রী ছিল সে বাস্তুত্যাগী ভাইয়ের জন্য একজনকে পরিত্যাগ করতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করেনি। উদারতা এবং অনুরাগের এ ধরনের মহতী দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবতঃ দ্বিতীয় পাওয়া যাবে না।

কোন্ রীতি-নীতির ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে হজরত মুহম্মদ (সঃ) দুর্দান্ত আরবদের এমন ভাবে বিনয়-নম্র এবং কল্যাণমুখী কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন এখন সেদিকে একে একে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

পারিবারিক জীবনের নব রূপায়ণ

নারীজাতির মর্যাদাদান

হজরত মুহম্মদ (সঃ) অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন, তাঁর কালে সুস্থ পারিবারিক জীবন বলতে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। নৈতিক অধঃপতন তার প্রধান কারণ। ব্যভিচার একটি প্রচলিত প্রথায় দাঁড়িয়েছিল। একই পুরুষ অসংখ্য নারীকে দখলে রেখে বীরত্বের প্রকাশ ঘটাত, একই রমণী একই সঙ্গে একাধিক পুরুষকে সঙ্গ দান করে নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করত। পিতা সদ্যজাত কন্যা-সন্তানকে হত্যা করতে দ্বিধা করত না, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে জঞ্জালের মত পরিত্যাগ করতেও পুত্রের কোনরূপ বেদনাবোধ ছিল না। বিধবা বিমাতাকে বিয়ে করা বৈধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে বৃহত্তর সমাজজীবনের প্রাথমিক ভিত্তি যে পারিবারিক জীবন—তা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। স্নেহশীল পিতা নেই, বিশ্বাসী স্বামী নেই, সতী স্ত্রী নেই, কর্তব্যপরায়ণ পুত্র নেই—চারদিকে কেবল অবিশ্বাস, খুন-জখম এবং ব্যভিচার। এই বিপর্যস্ত সমাজের পুনর্গঠনে আত্ম-নিয়োগ করে সর্বপ্রথম হজরত মুহম্মদ (সঃ) নারীজাতির নৈতিক চরিত্রের উন্নতি এবং সমাজে তাদের মর্যাদাদানের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দিলেন। প্রকৃতপক্ষে নারীজাতির যথার্থ মর্যাদাদানই হল হজরত মুহম্মদের (দঃ) প্রধান সংস্কারমূলক কর্মগুলির অন্যতম। ব্যভিচার সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ: "অবৈধ যৌনসংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, এ অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ" ১৭ (৩২)। "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী —ওদের প্রত্যেককে একশো করে কশাঘাত করবে"...২৪ (২)। তিনি নিজে বললেন: "শেরেকের পর ব্যভিচার অপেক্ষা গর্হিত পাপ আর নেই।" "ব্যভিচার

দারিদ্র্য সৃষ্টি করে, মুখের জ্যোতি হরণ করে এবং আয়ু হ্রাস করে।" এসব মহত্তর ঘোষণায় ব্যভিচার-ক্লিষ্ট আরবদের মধ্য থেকে এ পাপ-প্রথা একেবারে নির্মূল হয়ে গেল। সমাজ তার নির্মলতা ফিরে পেল।

নারীজাতিকে অস্থাবর সম্পত্তির মত ব্যবহার করা হত। কোন কিছুতে তাদের অধিকার ছিল না—না স্বামীতে, না স্বামীর ধনসম্পদে। প্রয়োজনে পুরুষ তাকে ব্যবহার করত আবার দাসীর মত তাড়িয়েও দিত। এই বেদনাজনক পরিস্থিতির পরিসমাপ্তি ঘটাল আল-কোরআন, সেখানে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অধিকার ঘোষিত হল: "এবং পুরুষদের উপর তাদের ঠিক সেরূপ ন্যায্য অধিকার আছে যেমন তাদের উপর আছে পুরুষদের" ২ (২২৮)। "তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের অঙ্গাবরণ এবং তোমরা তাদের অঙ্গাবরণ" ২ (১৮৭)। এভাবে নারীজাতির মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের অধিকার জন্মাল। এখন তারা আর অস্থাবর সম্পত্তির মত যখন তখন পরিত্যাজ্য নয়, প্রায় পুরুষের সমকক্ষ। পুরুষদেরও আপনাপন পত্নীগণের প্রতি যত্নবান হতে নির্দেশ দেওয়া হল: "কোন মুসলিম তার স্ত্রীকে ঘৃণা করবে না। সে যদি তার একটি দোষের জন্য অসন্তুষ্ট হয় তবে অন্য আর একটি গুণের জন্য তার ওপর সন্তুষ্ট থাকবে।" ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জে মহানবী ঘোষণা করলেন: "তোমাদের পত্নীগণের সঙ্গে সদয় ব্যবহার কর…নিশ্চয় তোমরা খোদার জামিনে তাদের গ্রহণ করেছ।"…তিনি আরো বললেন: "তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ।" "ইসলামে কোন সন্ন্যাস ধর্ম নেই" বলে তিনি বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করলেন। এসবের ভিতর দিয়ে আরবদের মধ্যে নতুন প্রেরণার সঞ্চার হল, শুরু হল এক বিশ্বস্ত পারিবারিক জীবন।

জনক-জননী ও জাতকের সম্পর্ক

মাতাপিতার প্রতি সম্ভ্রমবোধকে তিনি ফিরিয়ে আনলেন। মাতাকে ভক্তি করা, পিতাকে শ্রদ্ধা করা—আরব বেদুইনেরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। এতে নৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি বিশেষরূপে বিঘ্নিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ মানবজাতিকে সতর্ক করে বললেন: পৃথিবীর সবচেয়ে চারটি বড় পাপের একটি হল "পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।" বললেন: "পিতার কাছ থেকে ফিরে যেও না; পিতার কাছ থেকে যে ফিরে যায় সে ধর্মদ্রোহী।" পরপর আল্লাহ্‌র নির্দেশ এল তাঁর কাছে: "তোমার প্রতিপালক…মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন। ওদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবিত থাকাকালে বার্ধক্যে উপনীত হলেও ওদের বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং ওদের ভর্ৎসনাও করো না, ওদের সাথে সম্মান সূচক নম্রকথা বল, অনুকম্পায় ওদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো"… ১৭ (২৩-২৪)

"আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি।' ৪৬ (১৫)

হজরত মুহম্মদ (সঃ) এতীম ছিলেন—মাতৃগর্ভে পিতৃহীন হন, ছ বছর বয়সে হন মাতৃহীন। সুতরাং পিতামাতার প্রতি সেবা যত্নের সুযোগ তাঁর ঘটেনি। পরিণত বয়সে দুধ-মাতা হালিমার আগমনে মাথার পাগড়ি বিছিয়ে বসতে দেবার

মাধ্যমে তাঁর মাতৃভক্তির গভীরতার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় মাত্র। একবার এক ব্যক্তি জেহাদে যেতে চাইলে রসূলুল্লাহ তাঁকে বলেন: তুমি তোমার মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর সেবা কর। জননীর প্রতি অকুণ্ঠ ও নিঃশেষকর সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বললেন: "বেহেশ্‌ত জননীর চরণ-প্রান্তে।" পিতার দাবীও স্বীকৃত হল সঙ্গে সঙ্গে। ঘোষণা করলেন: "পিতার সন্তোষেই আল্লাহ্‌র সন্তোষ, পিতার অসন্তোষেই আল্লাহ্‌র অসন্তোষ।" এ সব যুগান্তরকারী ঘোষণায় আরবীয়েরা নতুনতর সম্ভ্রমবোধে জাগ্রত হল। মাতা-পিতার প্রতি তাঁদের অনুগত্য হল লক্ষণীয়, সম্পর্ক হল পবিত্র এবং মাধুর্যমণ্ডিত।

সন্তানের দায়িত্বকে তিনি যেমন নতুন রূপে চিহ্নিত করলেন, মাতাপিতার কর্তব্যবোধকেও তিনি নতুন চেতনায় জাগ্রত করলেন। শিশুকন্যা হত্যা, যেটি আরবদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, নিষিদ্ধ হল। সকলকে আদর্শ পিতা হতে তিনি আহ্বান জানালেন। কর্তব্যপরায়ণ পুত্র পেতে হলে আগে নিজেকে হতে হবে স্নেহশীল পিতা: "তোমরা তোমাদের সন্তানকে স্নেহ কর। কারণ তাদের স্নেহ করা উপাসনা বিশেষ।" সন্তানদের ভালবাসা, ভরণ-পোষণ এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন: "ভিক্ষুককে একবস্তা আটা দান করা অপেক্ষা তোমাদের সন্তানগণকে শিক্ষাদান করা উৎকৃষ্টতর।"

ভাইয়ের দাবীও উপেক্ষিত হল না। এ সম্পর্কে তাঁর অমৃতময় বাণী এই: "ছোট ভাইদের ওপর বড় ভায়ের দাবী পিতার উপর পুত্রের দাবীর সমান।"

দায়িত্বশীল পবিত্র পারিবারিক জীবনের জন্য এই উপদেশগুলি মন্ত্রের ন্যায় কাজ করল। সকলের সম্মিলিত কর্তব্যবোধে শান্তি ও পবিত্রতা ফিরে এল।

সামাজিক বিপ্লব

সাম্য ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি এবং সেই অভিশাপের প্রকোপে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত অশান্তি ও রক্তপাত ঘটেছে, অন্য কোন কিছুকে কেন্দ্র করে তেমনটি ঘটেনি। বিজ্ঞানালোকিত বিংশশতাব্দীতে মানবিক বোধের চরম উৎকর্ষের দিনেও এই ঘৃণ্য মনোবৃত্তিকে কী অপরিসীম জঘন্যতায় বিস্তারলাভ করতে দেখছি। সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব পৃথিবীর আজ একটি শীর্ষস্থানীয় সমস্যা। ব্রাহ্মণ-শূদ্র, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের (হরিজন) দ্বন্দ্ব আজ ভারতীয় জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে রেখেছে। অনেক আইন প্রনয়ণ এবং বিপুল পুলিশ মোতায়েন করেও নিগ্রো সমস্যা এড়ানো যাচ্ছে না, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা এখন সংঘর্ষে রূপায়িত এ ছাড়াও জাতি, বর্ণ, গোত্র, ধর্ম ইত্যাদির উদ্ধত ও ঊর্ধ্ব প্রাচীরের তলদেশে সাম্য ও মানবিকতা ক্লিষ্ট, জীর্ণ। অথচ যেকোন মুসলিম রাষ্ট্রগুলি আদৌ কোন সমস্যা নয় সেখানে সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব নেই, ব্রাহ্মণ-হরিজনের প্রশ্ন নেই—ধর্মীয় বাঁধনে সেখানে সব মানুষই এক। এর জন্য পৃথক কোন আইন প্রণয়ন করতে হয় না। সেনাবাহিনী মোতায়েনেরও প্রয়োজন নেই। সাম্য ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এ

হজরত মুহম্মদের (দঃ) একটি গৌরবময় সাফল্য এবং এর মূলে তাঁর উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই ক্রিয়াশীল। কালো হাবশী ক্রীতদাস বেলালের মুক্তির পর তিনি তাঁকে ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেন। এই বলিষ্ঠ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তিনি বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতার মূলে কুঠারাঘাত হানেন। কৃষ্ণকায় বেলালের আহ্বানেই দীর্ঘ দেহী উজ্জ্বল আরবীয়েরা মসজিদে ছুটে আসতেন। কোরআন শরীফে আল্লাহ্ বলেন: "সমস্ত মানবমণ্ডলী একজাতি" ২ (২১৩)। রসূলুল্লাহ্ বলেন: "মানুষ মাত্রই আদমের সন্তান।" সুতরাং মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই, ধর্মে সব মানুষের সমান অধিকার, কর্মেও তাই। আল্লাহ্র চোখে সকলেই সমান। সুতরাং ঘৃণাভরে কাউকেও দূরে সরিয়ে দিও না, অহঙ্কারের বশে কাউকেও হেয়জ্ঞান করো না। মনে রেখো: অহংকারীকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না। বংশ, জাতি ও বর্ণের অধিকারে অন্যকে ছোট ভাবা মহাপাপ।

সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র, আশরাফ-আতরাফ এসবের দিকে জোর না দিয়ে বিশ্বনবী মুহম্মদ (সঃ) জোর দিয়েছেন ধর্মনিষ্ঠার ওপর, সত্যের প্রতি অবিচল আস্থার ওপর, আল্লাহ্র প্রতি পরম নির্ভরতার ওপর, শিক্ষা এবং আন্তরিকতার ওপর। তাই দেখা যায় একজন শূদ্র-মুসলমান যদি আদর্শ শিক্ষিত ও আন্তরিকভাবে ধর্মনিষ্ঠ হয়—সাধারণ মানুষ তো বটেই, সেই দেশের রাজা-বাদশাও অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁর পিছনে নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে যান। নামাজের সময় কোন ভিখারী যদি পূর্বে মসজিদে এসে সামনের লাইনে দাঁড়িয়ে যায় এবং পরে সে দেশের বাদ্শা আসে, তাহলে বাদশাকেই পিছনের লাইনে দাঁড়িয়ে ভিখারীর পিছনে নামাজ পড়তে হয়—ভিখারীকে পিছনে আসতে হয় না। হজরত মুহম্মদের (দঃ) এ শিক্ষা এবং নীতি ইসলামকে এক অপূর্ব গৌরব দান করেছে। সাম্য ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠায় এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্যত্র দুর্লভ। পৃথিবীর অসংখ্য দেশ এবং জাতির কোটি কোটি ইতরজনেরা (?) এমনতর মুক্তি ও মর্যাদা প্রাপ্তির আশায় উন্মুখ হয়েছিল এবং ইসলামের মধ্যেই তারা সেটা পেয়েছিল। তাই প্রথম যুগেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার এমন দ্রুততর হয়েছিল।

ক্রীতদাস প্রথার অবসান

হজরত মুহম্মদের আবির্ভাব কালে পৃথিবীতে মানবতাহানিকর যতরকম কুপ্রথা প্রচলিত ছিল দাস প্রথা তাদের মধ্যে অন্যতম। কেবল আরবে নয়—সমসাময়িক কালে সারা পৃথিবীতে এই প্রথা মর্মান্তিক জঘন্যতায় বিস্তারলাভ করেছিল। সঙ্গতিসম্পন্ন প্রভুদের তুলনায় দাসদাসীরা সংখ্যায় ছিল অধিক। এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠেরা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের গোলামে পরিণত হয়েছিল। হাটে-বাজারে পশু ক্রয়-বিক্রয়ের মত তাদের কেনাবেচা হত। প্রভুরা ইচ্ছে করলেই তাদের যে কোন শ্রমসাধ্য কাজে নিয়োগ করা ছাড়াও যেকোন মুহূর্তে মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদান করতে পারতেন। যত রকম পাশবিক অত্যাচার অনাচার হতে পারে তার সব কিছুই দাস শ্রেণীর নরনারীর উপরে প্রতিনিয়ত প্রয়োগ করা হত এবং তার প্রতিবাদ তো দূরের কথা বিনিময়ে ক্ষুধার অন্নটুকুও যথানিয়মে পেত না। যুগের পর যুগ দাসেরা বংশপরম্পরায় দাসেই পরিণত হত, এর থেকে তাদের মুক্তির কোন পথ

ছিল না। এই হৃদয়-বিদারক হীন প্রথা হজরত মুহম্মদ (সঃ) কে বিশেষরূপে বিচলিত করেছিল। দাস-মুক্তির নানান উপায় তিনি চিন্তা করতেন। 'ওকাজ' মেলা থেকে একবার নবী-পত্নী বিবি খাদিজার জন্য যায়েদ নামক একটি বালককে কিনে আনা হয়েছিল। হজরত মুহম্মদ (সঃ) এই প্রথম একজন দাসের প্রভু হলেন। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে মুক্ত করে দিয়ে বললেন, 'যায়েদ আমার পুত্র।' গোলামের এত বড় সম্মান এর আগে আর কেউ কাউকে দেয় নি। হজরতের স্নেহচ্ছায়ায় যায়েদ বড় হল, তিনি তাঁর বিবাহ দিলেন এবং সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন যে যায়েদও তাঁর একজন ওয়ারিস। বহু যুদ্ধে যায়েদ সেনাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। দাস-বিবাহ (৪।২৫), দাস-মুক্তির জন্য অর্থদানের ঐশ্বরিক নির্দেশ (২।১৭৭) এল তাঁর কাছে। কোরআন শরীফে স্পষ্ট করে বলা হলঃ "আমি কি তাকে (মানুষকে) দুটি পথই দেখাইনি ? সে তো কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বন করেনি। তুমি কি জান কষ্টসাধ্য পথ কি ? এ হচ্ছে ঃ দাসমুক্তি" ...(৯০।১০-১৩)। আল্লাহ্‌র এসব নির্দেশ জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে তিনি বাস্তবে রূপায়িত করেছেন।

কেবল দাসব্যবসা বন্ধ করা ও দাসপ্রথা রহিত করা নয়—তিনি তাদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে এই প্রথার মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। তাইতো দেখি কাফ্রী ক্রীতদাসকে তিনি আপন পুত্র করেছেন, ফুফাতো বোনের সঙ্গে হাবসী গোলামের বিয়ে দিয়েছেন, এক সঙ্গে আহার-বিহার করেছেন, নামাজ পড়েছেন, সেনাপতির পদে বরণ করেছেন, এমনকি ক্রীতদাসীকে নিজে বিবাহ করে আশরাফ-আতরাফের ব্যবধান সম্পূর্ণরূপে ঘুচিয়ে দিয়েছেন। মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এতবড় মহান দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও আছে বলে আমাদের জানা নেই।

শত সহস্র যুদ্ধবন্দীদের প্রতিও তিনি অনুরূপ আচরণ করেছেন, কাকেও দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখেন নি। নবদীক্ষিত মুসলমানদের তিনি দাস-দাসী মুক্তির উপদেশ দিতেন, তাদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ করার জন্যে তাঁর নির্দেশ ছিল আরো কঠোর। একবার আবু মাসউদ আল বাদাবী (রাঃ) তাঁর ক্রীতদাসের উপর প্রহারে উদ্যত হতেই হজরত মুহম্মদ (সঃ) থামিয়ে দিলেন। বললেন, "হে আবু মাসউদ ! ক্রীতদাসের ওপর তোমার ক্ষমতা যতটুকু, তোমার ওপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশী।" বললেন ঃ "যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসের সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করে সে বেহেশ্‌তে যাবে না।" ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণে হাজার হাজার আবেগ-ব্যাকুল জনতার সম্মুখে তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ "এবং তোমাদের ক্রীতদাসগণ ! দেখো তোমরা যা আহার কর তা-ই তাদের আহার করতে দাও এবং তোমরা যা পরিধান কর তা তাদের পরিধান করতে দাও। এবং যদি তারা এমন কোন অপরাধ করে যা তোমরা ক্ষমা করতে ইচ্ছা কর না তবে তাদের মুক্ত কর ; কারণ তারা আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌ এবং অত্যাচারের পাত্র নয়।"

মৃত্যু শয্যায় ক্ষীণকণ্ঠে সকলকে সাবধান করে শেষবারের মত উচ্চারণ করলেন ঃ "তোমাদের দাসদাসীগণ—সাবধান ! সাবধান" !!

এরপর সমগ্র মুসলিম জাহানে ব্যাপকভাবে দাসমুক্তির প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। ভূ-লুণ্ঠিত মানবতা আবার আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। প্রথম যুগে ইসলাম যে ব্যাপকভাবে বিশ্বের নানান ভূখণ্ডে বিস্তারলাভ করেছিল, মানবিক মর্যাদার প্রতি হজরত মুহম্মদের (দঃ) এই মহান দৃষ্টিভঙ্গি তার অন্যতম প্রধান কারণ। এই উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি হজরত মুহম্মদের (দঃ) প্রতিষ্ঠাকেও দ্রুততর করেছিল।

চৌর্যবৃত্তি, হত্যা, মদ্যপান

চৌর্যবৃত্তি, খুনজখম, মদ্যপান এবং জুয়া ইত্যাদি অনাচারগুলি সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। পূর্ব থেকেই আরবরা ছিল দুর্দান্ত এবং সীমাহীন ভাবে উচ্ছৃংখল। তাদের নিয়ম-নীতির শৃংখলে আবদ্ধ করা খুব সহজ ছিল না। অবশ্য পাপাচারের বিরুদ্ধে ইসলামের আপোষহীন রীতিগুলি অত্যন্ত কঠোর। এখানে কোনরকম দয়া-মায়া নেই। আল্-কোরআনে চুরির শাস্তির বিধান দেওয়া হল এভাবে ঃ "নর বা নারী চুরি করলে তাদের হাত কেটে ফেল" ৫ (৩৮)। হজরত মুহম্মদ (সঃ) কঠোর কণ্ঠে সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন ঃ "সিকি দীনার বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মাল চুরি করলে তার হাত কাটা হ'বে।" অন্য আর একটি হাদীসে আছে ঃ "একজন চোরকে রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে আনা হলে তিনি তার হাত কাটলেন। তারা বললল, 'আমরা ভাবিনি, তাকে এই শাস্তি দেবেন।' তিনি বললেন, ফতেমাও (নবীজীর কন্যা) যদি চুরি করত, নিশ্চয় আমি তার হাত কাটতাম।" চুরির বদলে হাতকাটার শাস্তি হয়তো কিছুটা কঠোর মনে হতে পারে কিন্তু এভাবে কয়েকজনের হাতকাটা পড়তেই আশ্চর্যরকম দ্রুততায় চুরি হ্রাস পেয়ে গেল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই, বলা যেতে পারে, দীর্ঘদিনের এই হীন পাপাচারের অবসান ঘটল। বর্তমান আরবের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ—সেখানে চৌর্যবৃত্তি নেই বললেই চলে।

আমাদের দেশে, কেবল আমাদের দেশ কেন—পৃথিবীর অন্যান্য অনেক প্রান্তে, চৌর্যবৃত্তি বন্ধের জন্যে নানান রকম আইন প্রণয়ন করা হয়েছে ও হচ্ছে, পুলিশ-জেল ইত্যাদি বিরাট ক্রিয়াকান্ড বর্তমান অথচ এ বৃত্তি প্রতিদিন ক্রমবর্ধমান। বলিষ্ঠ নীতিহীনতার জন্য (যে নীতিহীনতা ইসলামিক বিধানে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ) নানান আইনের কায়দা কানুনের মাধ্যমে হয়তো আমরা চৌর্যবৃত্তিকে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়েই চলেছি।

হত্যা, মদ্যপান ও জুয়া ইত্যাদি সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে কঠোরতম সতর্কবাণী উচ্চারিত হল। বলা হল ঃ "কখনো মদ্যপান করো না, কারণ ও সমস্ত কুকার্যের কুঞ্জিকা (চাবি)।" তিন ব্যক্তির জন্য বেহেশ্‌ত হারাম—ওদের মধ্যে এক ব্যক্তি হল মদ্যপায়ী।

হত্যার ব্যাপারে ইসলামের নীতি আরো কঠোর। হত্যাকারীকে ছেড়ে দেওয়ার নীতি ইসলাম গ্রহণ করেনি—হত্যার বদলে হত্যা—অবশ্য এ হত্যা যদি অন্যায়ভাবে করা হয় তবেই। "ন্যায় সঙ্গত কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করো না।" "নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের (বিনিময়ের) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে"··· ২ (১৭৮)। অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে হত্যাকারীকে ইসলামের আইন অনুযায়ী হত্যা করা যাবে। এ বিধান প্রচলিত হওয়ায়, খুনজখম যে আরবীয়দের প্রতিদিনের ঘটনা ছিল, তা একেবারেই হ্রাস পেল এবং অচিরে অবলুপ্ত হল। বর্তমান আরবেও এ নীতি প্রতিপাল্য। কিছুদিন আগেও সৌদী আরবের রাজাকে হত্যা করার অপরাধে হত্যাকারীকে প্রকাশ্য দিবালোকে অসংখ্য জনতার সম্মুখে হত্যা করা হয়েছে। এই কঠোর নীতি ও দৃষ্টান্তের ফলে হত্যা আজ এসকল দেশে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টো পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা হত্যাকারীর বেদনায় ব্যাকুল হই এবং তার জী

(খুনীর জীবন !) অমূল্য জ্ঞান করে তাকে মুক্তি দিই। ফলে সে আরো দশ জন সঙ্গী তৈরী করে এবং অনিবার্যরূপে অসংখ্য নিরীহ নাগরিক তাদের হিংস্র শিকারে পরিণত হয়।

দুষ্টের দমনের ব্যাপারে হজরত মুহম্মদ (সঃ) কখনো শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি —এবং করেননি বলেই দুর্দান্ত আরবদের তিনি অল্পকালের মধ্যেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পেরেছিলেন।

নৈতিকবোধের উজ্জীবন

শিক্ষা

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নৈতিকবোধ জাগ্রত করতে না পারলে সুস্থ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের স্বপ্ন দেখা অবাস্তব হয়ে পড়ে। শিক্ষা এই নৈতিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। শিক্ষা ছাড়া মানুষের চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশও অসম্ভব। কি কর্মক্ষেত্রে, কি ধর্মীয় সাধনায় শিক্ষা অপরিহার্য। এজন্যে হজরত মুহম্মদ (সঃ) শিক্ষার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। জ্ঞান-সাধনাকে তিনি নরনারীর প্রধান কর্তব্য বলে স্থির করলেন ঃ "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর পক্ষে জ্ঞানশিক্ষা করা ফরজ।" আল্লাহ্‌র সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশের সর্বপ্রথম বাণী "পাঠ কর"-এর মধ্যেও শিক্ষার কথা ব্যক্ত হয়েছে। জ্ঞান-সাধকের উচ্চ-মর্যাদা সম্পর্কে বিশ্বনবীর অবিস্মরণীয় উক্তিটি এই ঃ "জ্ঞান সাধকের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র।" শিক্ষার অসাধারণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এ ধরনের দ্বিতীয় উক্তি আজ পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি। তিনি পরপর ঘোষণা করলেন ঃ "শয়তানের কাছে সহস্র সাধক অপেক্ষা একজন শিক্ষক অধিক আশঙ্কার কারণ।"

"যে জ্ঞানান্বেষণ করে, সে আল্লাহ্‌কে অন্বেষণ করে।"

"জ্ঞানান্বেষণ আল্লাহ্‌র কাছে নামাজ, রোজা, হজ্জ্ ও জেহাদ অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যজনক।"

"প্রত্যেক বস্তু লাভ করার পথ আছে—বেহেশ্‌তলাভের পথ জ্ঞানান্বেষণ।"

"মূর্খদের মধ্যে শিক্ষার্থী—মৃতদের মধ্যে জীবিতের তুল্য।"

"জ্ঞানীর নিদ্রা অশিক্ষিত ব্যক্তির উপাসনা অপেক্ষা উত্তম।"

"শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।"

"রাতে একঘণ্টা জ্ঞানানুশীলন করা সমস্ত রাত্রি জেগে উপাসনা করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।"

কেবল ধর্মীয় শিক্ষা নয়—জাগতিক শিক্ষার দিকেও রসুলুল্লাহ্‌র বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁর এই বিখ্যাত হাদীসটি লক্ষ্য করুন ঃ "জ্ঞানানুসন্ধানের জন্য যদি সুদূর চীন দেশ পর্যন্ত যেতে হয়—যাও।" চীন দেশে নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্ম বিষয়ক উপদেশ শিক্ষার্থে তিনি কাউকে যেতে বলেননি—জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতর পঠন-পাঠনের জন্যই বিদেশ ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। যে সকল মুসলমান ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া অন্য কিছুই বোঝেন না—এই হাদীসটিকে তাঁদের বিশেষরূপে অনুধাবন করতে অনুরোধ জানাই।

শিক্ষার প্রতি এরূপ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করায় নানান সুফল ফলতে শুরু করেছিল। বিদ্যানুশীল বেড়ে গিয়েছিল, নানান কুসংস্কারের গ্লানি থেকে দেশ মুক্ত হয়েছিল, আরবীয় মনীষায় সমকালীন বিশ্ব চমৎকৃত হয়েছিল।

বর্তমান মুসলিম জগৎ সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ্‌র এই মহান শিক্ষা-নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে! মুসলিম-জগতে শিক্ষার দীনতা আজকাল বিশেষরূপে চোখে পড়ে।

মানুষের প্রতি কর্তব্য

আজকাল অনেকে ইসলামের এক সংকীর্ণ ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাঁদের মতে কেবলমাত্র নামাজ, রোজা ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলি পালন করার নামই ইসলাম। মানুষের প্রতি মানুষের যে একটা কর্তব্য আছে একে তাঁরা পার্থিব মনে করে এড়িয়ে যান। অথচ এঁরাই গর্ব ভরে প্রচার করেন: ইসলাম সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক ও মানবিক ধর্ম। মানুষের প্রতি কর্তব্যকে অবহেলা করলে ধর্মের মধ্যে মানবিকতার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। মানুষকে বাদ দিয়ে ইসলাম নয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষকে বাদ দিলে কোন ধর্মের কোন অস্তিত্বই থাকে না। আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, অনাথ-আতুর, অতিথি-প্রতিবেশী সকলের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার নামই ইসলাম। ইসলাম অর্থ যদি 'শান্তি' হয় তবে সকলের সঙ্গে শান্তিতে বাস করাই সে ধর্মের একটি অন্যতম শর্ত। নামাজ-রোজা ইত্যাদির সঙ্গে এগুলি অবশ্য পাল্য। আল্লাহ্‌র আদেশও তাই, রসূলুল্লাহ্‌র নির্দেশগুলিও সেকথাই সমর্থন করে। প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্‌ ছিলেন একজন আদর্শ পুরুষ, একজন পরিপূর্ণ মানুষ—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনধারা গভীরভাবে মানবোচিত। সুতরাং তাঁর জীবনব্যাপী আচরণে ও বাণীতে এই মানবিক চিন্তাগুলি নানানভাবে বিকাশলাভ করেছে। সেগুলি তৎকালীন নীতিহীন আরবদের মধ্যে পবিত্র নৈতিকবোধ জাগরণের জন্যে তো বটেই, বিশ্বমানুষেরও মানবিকতা জাগরণে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। নীতিগুলির গ্রহণযোগ্যতা ও আধুনিকতার জন্য এগুলি আজও সমানভাবে মঙ্গলপ্রসূ।

অনাথ পালন

মাতৃগর্ভে পিতৃহীন এবং বাল্যে মাতৃহীন হওয়ায় এতীম-অনাথদের জীবন-যন্ত্রণার তিনি একজন প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী। সমাজে এইসব দীন-দুঃখীরা অত্যন্ত অবহেলিত এবং নানান ভাবে অত্যাচারিত হত। পিতৃহীনদের প্রতি তাই তাঁর সমবেদনার অন্ত ছিল না। এদের সম্পর্কে কোরআন শরীফে নির্দেশ দেওয়া হল: "পিতৃহীনদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়"...৪ (৬)। "তাদের (পিতৃহীনদের) উপকারের চেষ্টা করাই উত্তম"...২ (২২০)। "নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।" ৪ (১০)

বিশ্বনবী বার বার সকল মানুষকে অনাথদের প্রতি সদয় ব্যবহারের আহবান জানিয়েছেন। বার বার বলেছেন মানুষ যেন তাদের দান বিতরণের জন্য বিশেষরূপে এতীমদের নির্বাচন করে। তিনি বললেন ঃ "সেইটি উৎকৃষ্ট মুসলিম-গৃহ যেখানে অনাথ আছে আর তার প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয়।" এভাবে তিনি দীন-দুঃখীদের প্রতি মানুষের দায়িত্বকে সচেতন করে তুললেন।

আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার

মানুষ সামাজিক জীব। তাই প্রথম থেকেই হজরত মুহম্মদের (দঃ) লক্ষ্য ছিল প্রেম-প্রীতির বন্ধনে মানুষের সামাজিক দৃঢ়তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গেই আমাদের এই প্রেম-প্রীতির বন্ধনের প্রশ্নটা আসে সর্বাগ্রে। তাই এদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের প্রতি হজরত মুহম্মদ (সঃ) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য বাণীগুলি লক্ষ্য করুন ঃ

"যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে সে বেহেশ্তে যেতে পারবে না।"

"আত্মীয়তার বন্ধন পরিবারের মধ্যে ভালবাসা লাভের উপায়, ধর্মবৃদ্ধি উপকরণ এবং মৃত্যুকে বিলম্বিত করার পথ।"

যে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি সম্মান জানায়—সকল মানুষও তাকে সম্মান জানায়, তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় এমন কি স্বয়ং আল্লাহ্ও তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। রসূলুল্লাহ বলেন ঃ "আল্লাহ্র কাছে সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট যে তার পরিজনের প্রতি দয়ালু ও সদাশয়।" এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন ঃ "যে ব্যক্তি তার জীবিকা বৃদ্ধি ও দীর্ঘ জীবন লাভ করতে আশা করে সে যেন তার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে।" যে সম্পর্করক্ষার উপর এমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, সঠিক ভাবে সে সম্পর্ক কে রক্ষা করে চলে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বনবী বলেন ঃ "প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তা-রক্ষাকারী ঐ ব্যক্তি যে আত্মীয়তাছিন্নকারীর সঙ্গেও আত্মীয়তা রক্ষা করে।"

প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক

যে কারণে আত্মীয়তা রক্ষার উপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) গুরুত্ব দিয়েছেন ঠিক সেই একই কারণে প্রতিবেশীর সঙ্গে মধুর সম্পর্ক রক্ষার উপরও তিনি সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মহানবী (সঃ)বিশেষ রূপে লক্ষ্য করেছিলেন সামাজিক নবরূপায়ণের জন্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-স্নেহ-ভালবাসার একান্ত প্রয়োজন। এগুলির অভাবেই হানা-হানি শুরু হয়, রক্তপাত ঘটে, গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। সুতরাং পরস্পরের প্রতি মিলন ও ভ্রাতৃভাবপ্রতিষ্ঠায় তিনি সদ্ভাবের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রতিবেশীও আত্মীয়ের সমতুল্য—কোন কোন ক্ষেত্রে নিকট প্রতিবেশী আত্মীয়েরও অধিক। আকস্মিক বিপদ-আপদে দুয়ার প্রান্তের প্রতিবেশীই মানুষের প্রথম প্রয়োজনে আসে। সুতরাং ঃ "আত্মীয়-প্রতিবেশী এবং অন্যান্য প্রতিবেশীর প্রতি সৎ" হবার কথাই ঘোষণা করেছে আল্-কোরআন। প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রতি

মানুষ সৎ হলেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সহজ হয়ে ওঠে। তাই প্রতিবেশীদের প্রতি আচরণে মহৎ হবার নির্দেশ দিলেন মহানবী: "সে (প্রতিবেশী) তোমার সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করবে, সে তোমার কাছে ঋণ চাইলে তাকে ঋণ দেবে, সে অভাবগ্রস্ত হলে তাকে সাহায্য করবে, সে অসুস্থ হলে তাকে শুশ্রূষা করবে, তার মৃত্যু হলে জানাজাতে যোগ দেবে…।" অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন প্রতিবেশী আর একজন প্রতিবেশীর যথার্থ উপকারী বন্ধু হওয়া উচিত। প্রতিবেশীদের ক্ষতি করা থেকে নিরস্ত হবার জন্যে তিনি কঠোর ভাষায় সকলকে হুঁশিয়ার করে দিলেন: "যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন এবং যে তাকে কষ্ট দেবে আল্লাহ্ তাকে কষ্ট দেবেন।" বললেন: "যার অত্যাচার থেকে প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয়, সে কখনো বেহেশ্তে যাবে না।" এ সম্পর্কে তাঁর একটি অতি বিখ্যাত উক্তি এই: "যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরে খায় আর তার নিকটতম প্রতিবেশীকে অভুক্ত রাখে, সে কখনো মুসলমান নয়।" লক্ষণীয় বিষয়, এখানে তিনি প্রতিবেশীর উপকার করাকে মুসলমান হবার একটি অতি আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য এখানে উচ্চ কণ্ঠে স্বীকৃত এবং সে কর্তব্য ধর্মের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। যখন আমরা রসুলুল্লাহ্‌কে বলতে শুনি: "যখন তোমরা তরকারি রান্না কর, তার ঝোল বৃদ্ধি করো এবং তোমার প্রতিবেশীগণকে তা থেকে কিছু দিও" তখন তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা, উক্তির বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতা লক্ষ্য করে অবাক না হয়ে পারি না। এসব উক্তিগুলি পড়তে পড়তে আমাদের মাঝে যেন তাঁর মহান উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। মনে হয় তিনি এখনো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। দ্বন্দ্ব সর্বস্ব এবং স্বার্থপরতা-ক্লিষ্ট এ সংসারে আমাদের মানসিক অনুদারতা লক্ষ্য করে তিনি বলছেন: "তার (প্রতিবেশীর) অনুমতি ব্যতীত তোমার গৃহকে এত উঁচু করবে না যাতে তার বাড়ীতে বাতাস প্রবেশ করতে বাধা পায়।" এসব উক্তির ব্যাপকতা আমাদের বিস্মিত করে। এই স্মরণীয় বাণীটির মানবিক দিকটি তো সবিস্ময়ে লক্ষ্য করার মত। এসব উদার এবং কল্যাণমুখী চিন্তাধারার জন্যেই ইসলাম ধর্ম বেশীমাত্রায় মানবিক হতে পেরেছে।

অহঙ্কার ক্রোধ ধৈর্য ক্ষমা

আরবদের চারিত্রিক অধঃপতনের নানা কারণের মধ্যে উদ্ধত অহংকার এবং বিবেকহীন মাত্রাতিরিক্ত ক্রোধ ছিল অন্যতম। কমবেশী প্রত্যেকেই ছিল অহংকারী, অধিকাংশই ক্রোধের অগ্নিকুণ্ড। অতিতুচ্ছ কারণে উভয় রিপুর বহুৎসব শুরু হয়ে যেত। অহংকারীদের সতর্ক করে হজরত মুহম্মদ (সঃ) প্রচার করলেন আল্লাহ্‌র এ প্রত্যাদেশ: "আল্লাহ্ উদ্ধত অহংকারীদের ভালবাসেন না" ৫৭(২৩)। বললেন উদ্ধত হয়ো না এবং "পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না—তুমি তো কখনই পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না" ১৭(৩৭)। "অহংকারী এবং কর্কশভাষী কখনো বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না।" তাদের স্থান দোজখের অগ্নিতে এবং সেখানে "নরকবাসীদের মল ও মূত্র তাদের পান ও আহারের জন্য দান করা হবে।"

ক্রোধ সম্পর্কে বললেন: "ক্রোধ করো না, কারণ তা বিবাদের সৃষ্টি করে।"

"তিক্ত ঔষধ যেমন মধুকে নষ্ট করে, ক্রোধ তেমন ঈমানকে (বিশ্বাস, চরিত্র) নষ্ট করে।" সুতরাং সর্বাবস্থায় এই ঘৃণ্য রিপুকে পরিত্যাগ করে চলা উচিত। "অতিরিক্ত ক্রুদ্ধ ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক অপ্রিয়" অপরপক্ষে ক্রোধ দমনের মাধ্যমেই আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ সহজ হয়। তাই মহানবী (সঃ) ঘোষণা করেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ক্রোধ গলাধঃকরণ করেছে, তার মত উত্তম পানীয় আর কেউ পান করেনি।" ক্রোধ-সংযমের মধ্যেই মনুষ্যত্বের বিকাশ নির্ভরশীল ঃ "মল্লযুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করার মধ্যে প্রকৃত বীরত্ব নেই, ক্রোধের সময় আত্মসংযমের মধ্যেই প্রকৃত বীরত্ব নিহিত।"

এভাবে নানান সতর্কতামূলক উপদেশের মাধ্যমে মহানবী মুহম্মদ (সঃ) অহংকারী আরবদের বিনীত করলেন, ক্রুদ্ধ বেদুইনদের করলেন সংযত ও শান্ত। ধৈর্য, ক্ষমা অনুতাপে উচ্ছৃংখল জীবনাচরণ থেকে ফিরিয়ে এনে তিনি তাদের দৃষ্টিকে এক উদার পবিত্র পটভূমিকার দিকে প্রসারিত করলেন। তিনি তাঁদের শিক্ষা দিলেন ধৈর্যের, তিনি তাঁদের উদ্বুদ্ধ করলেন ক্ষমায়। ধৈর্য ছাড়া পৃথিবীতে কোন বড় কাজ হতে পারে না।—"আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন" ৩(১৪৬)।

তিনি বললেন ঃ "ধৈর্যশীল ব্যক্তিই ইহকাল ও পরকালের নেতা।"

"ধৈর্যই বিপদের প্রাথমিক পরীক্ষা।"

"যদি মানুষের ধৈর্য থাকে তবে সে অবশ্যই ভাগ্যবান হয়।"

ধৈর্যকে তিনি উপসনার সঙ্গে তুলনা করে বললেন ঃ "বিপদে ধৈর্যধারণ করা উপাসনা বিশেষ।"

আল্লাহ্ কোরআন শরীফে বার বার ধৈর্যের কথা বলেছেন এবং তিনি ওয়াদা করেছেন ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।" মহান প্রতিপালকের এই নির্দেশকেই হজরত মুহম্মদ (সঃ) নিজস্ব বাণী ও জীবনাচারণের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আরবরা কোন বিষয়ে যেমন ধৈর্যধারণ করতে প্রস্তুত ছিল না, তেমনি ক্ষমা চাওয়া বা ক্ষমা করার ব্যাপারেও ছিল নিতান্ত অনুৎসুক। এই দুই মহৎ মানবীর শিক্ষার প্রতি মহানবী বিশেষরূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আল্লাহ্র বাণী তাঁর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল ঃ "ক্ষমা করা উত্তম কাজ" ২(২৬৩) এবং "যারা সচ্ছল ও অসচ্ছলঅবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ (সেই) কল্যাণকারীদের ভালবাসেন" ৩(১৩৪)। তিনি নিজে বললেন ঃ আল্লাহ্র কাছে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত "ক্ষমতাশালী হয়েও যে ক্ষমা করে।" চলার পথে মানুষের ভুলভ্রান্তি হতে পারে কিন্তু সেই ত্রুটির জন্যে সে যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায় তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। কেননা "আল্লাহ্র ক্ষমা তোমার (মানুষের) পাপের চেয়ে বড়।" ক্ষমাপ্রার্থনাই হচ্ছে পাপের প্রতিষেধক ঃ "প্রত্যেকটি ব্যাধির প্রতিকার আছে এবং পাপের প্রতিকার ক্ষমা প্রার্থনা।" এবং সত্যকার "অনুতপ্ত পাপী নিষ্পাপ ব্যক্তির তুল্য" হয়ে ওঠে। হজরত মুহম্মদ (সঃ) "প্রতিদিন সত্তর বারের অধিক আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা" করতেন। তিনি বার বার বলেছেন ঃ "অনুতাপ পাপের বিনিময়।"

হজরত মুহম্মদ (সঃ) নিজেই ছিলেন ক্ষমার জীবন্ত প্রতীক। মক্কাবাসীগণ নানাভাবে তাঁর প্রতি অত্যাচার করেছে। পথে কাঁটা বিছিয়ে কিংবা বিষ প্রয়োগে জীবন নাশের চেষ্টায় নিষ্ফল হয়ে তারা উন্মুক্ত তরবারির আঘাতে হত্যা করতে

বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল। এই বেদনাজনক পরিস্থিতিতে মহানবী হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। কিন্তু তাতেও তিনি নিষ্কৃতি পাননি। মক্কাবাসীগণ তাঁকে হত্যা করার জন্যে বার বার মদীনা আক্রমণ করেছে। ওহোদ যুদ্ধে তাঁকে ভীষণভাবে আহত করা হয় এবং দেহ স্থির হলে তিনি নিহত হয়েছেন ভেবে তারা ওহোদ প্রান্তর পরিত্যাগ করে। এরপরও কোরেশবীরগণ মদীনা আক্রমণে ব্যস্ত থাকে কিন্তু কোন বারেই সাফল্যলাভ করতে পারেনি, শেষে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে তারা মদীনার মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। অবশেষে সত্যের বিজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। নবম হিজরীতে মহানবী মুহম্মদ (সঃ) তাঁর দশ সহস্র অনুচর নিয়ে যখন বিজয়ীর বেশে মহাসমারোহে মক্কানগরীতে প্রবেশ করেন তখন মক্কার শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দকে বন্দী করে তাঁর কাছে আনা হয়। হজরত মুহম্মদের (দঃ) উপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হয়েছিল সে কথা স্মরণ করে এবং আশু নৃশংস প্রতিশোধ প্রাপ্তির আশঙ্কায় যখন কোরেশ নেতৃবৃন্দ বিবর্ণ নেত্রে মহানবীর নির্দেশের অপেক্ষায় ম্রিয়মাণ, তখন চিরশত্রু এই সকল নেতৃবৃন্দের উপর কোন রকম প্রতিশোধমূলক আচরণ না করে করুণাসাগর মুহম্মদ (সঃ) ঘোষণা করলেন ঃ 'তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আমার কিছু বলার নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করবেন—কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যাও—তোমরা মুক্ত।' এরূপ অপূর্ব ক্ষমা ও উদারতার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল। এই ভাবে উপদেশকে তিনি কেবলমাত্র নীতিকথায় আবদ্ধ না রেখে বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করেছিলেন। তাঁর বাণী এবং ব্যবহার বিশ্ববাসীর জন্য তাই আদর্শ দৃষ্টান্ত-স্থল।

যে সকল সংকীর্ণ-চিত্ত মানুষ প্রচার করেন যে 'এক হাতে তরবারি এবং অন্য হাতে কোরআন' নিয়ে মুহম্মদ (দঃ) ইসলাম প্রচার করেছেন—তাঁরা রসুলুল্লাহ্‌র এই ক্ষমাসুন্দর মহিমাময় রূপটির দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করেন নি। করলে নিজেরাই নিজেদের মন্তব্যের জন্য লজ্জা পেতেন। জীবন এবং সত্যরক্ষার জন্য শত্রুদের বিরুদ্ধে অবশ্যই তাকে তরবারি হস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে—কিন্তু সে তরবারি কখনো এক মুহূর্তের জন্যও সীমালঙ্ঘনকারী ও অত্যাচারী হয়ে ওঠেনি।

নির্জন দ্রাক্ষাকুঞ্জের সেই ঐতিহাসিক প্রার্থনাটি মহানবীর ক্ষমার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল হয়ে আছে।

তায়েফ নগরে ইসলাম প্রচারে গেলে মহানবীর প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করা হয় পৃথিবীতে তেমন নৃশংসতার দৃষ্টান্ত বিরল। তায়েফে তিনি দশ দিন ছিলেন। প্রথম দিকে অবিশ্বাসীরা কটূক্তি করতো, পরে গালিগালাজ দিতে আরম্ভ করে, শেষে তাঁর উপর শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন। পাষণ্ডদের ইষ্টক ও প্রস্তরের আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে, সর্বাঙ্গ দিয়ে শোণিতধারা প্রবাহিত হয়, অবশেষে তিনি চৈতন্যহারা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন জায়েদ—তিনিও আহত। অতি কষ্টে তিনি নবীজীকে নগরের বাইরে এক দ্রাক্ষাকুঞ্জে নিয়ে এলেন। আঘাতে চরণযুগল স্ফীত হয়ে উঠেছিল, তার উপর ছিল জমাট বাঁধা রক্তের চাপ—ফলে তাঁর জুতো এমনভাবে পায়ে বসেছিল যে জায়েদকে অতিকষ্টে গায়ের জোরে তা খুলতে হয়েছিল। এ দৃশ্যে জায়েদ ক্রন্দনরত অবস্থায় নবীজীর শুশ্রূষা করছিলেন। এক সময় তিনি চৈতন্য ফিরে পেলেন। প্রথমেই তাঁর মনে হল নামাজ পড়ার কথা। অজু করে নামাজ পাঠান্তে অত্যাচারে জর্জরিত বিশ্বনবী সেই নির্জন দ্রাক্ষাকুঞ্জে বসে মহান প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

"হে আল্লাহ্, হে আমার প্রভু—আমি তোমাকে আহ্বান করি ! অবিশ্বাসীরা না বুঝে আজ যে গুরুতর অপরাধ করেছে তার জন্যে তুমি অনুগ্রহ করে তাদের শাস্তি দিও না—তাদের ক্ষমা করো, অবিশ্বাসীরা আজ যে তোমার নবীকে গ্রহণ করছে না, তারজন্য তাদের দোষ নেই—সে আমারই দুর্বলতা, আমারই অক্ষমতা ! এই দুর্বলতার জন্যে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি।…তুমি সন্তুষ্ট থাকলে কোন লাঞ্ছনা, কোন গ্লানি, কোন আপদ-বিপদ, কোন দুঃখ-বেদনাকেই আমি ভয় করি না।"…

অসীম ধৈর্য, অটল নির্ভরতা এবং তুলনাহীন ক্ষমার জন্য এই স্মরণীয় প্রার্থনা পৃথিবীর ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে।

শ্রমের মর্যাদা দান

কর্মবিমুখ মানুষকে সৃষ্টিশীল কর্মে উজ্জীবিত করা হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সফল সংগ্রামশীল জীবনের আর একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। বিলাসিতা ও কর্ম-বিমুখতা সকল মানুষের ধ্বংসের কারণ, সকল জাতির অধঃপতনের মূলসূত্র। কোরআন শরীফে বার বার মানুষের কর্মের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন : "মানুষকে আমি শ্রমনির্ভর করেই সৃষ্টি করেছি"—৯০ (৪)। বলা হয়েছে : "প্রত্যেকের স্থান তার কর্মানুযায়ী"—৪৬ (১৯)। আল্-কোরআনে স্পষ্টভাবে আরো উল্লেখ করা হয়েছে : "নিশ্চয়ই মানুষের জন্য তাই রয়েছে যার জন্য সে চেষ্টা করে। তার পরিশ্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করে হবে।"

মহানবীর সমগ্র জীবন তো এক বিশাল কর্মধারারই ইতিহাস। কর্মহীন জীবনকে তিনি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করতেন। শৈশবে দূর প্রান্তরে বা উচ্চ উপত্যকা ভূমিতে মেষ চরাণোর মাধ্যমে যে সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত, মদীনায় অবস্থানকালে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের প্রচার ও বিস্তারের মাধ্যমে সেই কর্মমুখর জীবনের অবসান। মাঝের দিনগুলি সংখ্যাতীত সংগ্রাম ও কর্মোন্মাদনায় গতিশীল। মদীনায় পদার্পণে প্রথম মসজিদ নির্মাণের সময় তিনি নিজে মাথায় করে মাটি ও পাথর বহন করেছেন। তাঁকে এভাবে দিন-মজুরের কাজ করতে দেখে মদীনা-বাসীদের মধ্যে সে কি উন্মাদনা—সকলেই তাঁর অনুসরণে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের সময় তিন হাজার গজ পরিখা খননের জন্য মহানবী সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করে দিনের পর দিন সকলের সঙ্গে সেখানে মজুরের কাজ করেছেন—সন্ধ্যায় তাঁর ধুলিধুসর দেহকে চিনতে কষ্ট হত। কর্মের প্রতি মানবরূপী মহানবীর এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সে দিন মদীনাবাসীদের মধ্যে যে বিপুল উদ্দীপনা ও কর্মপ্রেরণা দান করেছিল—ইসলামের বিজয় অভিযানে এবং এবং মানবিকতা প্রতিষ্ঠায় তা এক মৌল উপাদান রূপেই কাজ করেছে। তিনি ছিলেন কর্মশক্তির এক অফুরন্ত উৎস। সংসার-জীবনেও তাঁকে হাজার কর্মে ব্যাপৃত থাকতে দেখি। মা আয়েশার উক্তিতে আমরা দেখেছি তিনি নিজের জুতো নিজে মেরামত করতেন, নিজের কাপড় নিজেই পরিষ্কার করতেন, ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করতেন, ছাগী দুইতেন, এমন কী মেথর সেজে মলমূত্র পরিষ্কার করেছেন—এভাবে সংসারের প্রতিটি কর্ম তিনি নিজ হাতে সম্পন্ন করতেন। প্রতিটি যুদ্ধের মোকাবিলায় রসূলুল্লাহ্‌কে এক বিপুল শক্তি-সম্পন্ন অতিমানব বলেই মনে হত। আল্লাহ্‌র

প্রতি পরম নির্ভরতা, সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং কর্মের প্রতি তাঁর অটল মনোভাব সকল সৈনিকের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত। সত্য ও ন্যায়ের জন্য সকলেই বিপুলভাবে কর্মচঞ্চল ও উৎসর্গীকৃত প্রাণ হত! সত্য-সেনাদল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কেবলমাত্র নির্দেশের প্রতীক্ষা!

এই হল মহানবীর জীবন-সংগ্রামের চিত্র!

আজকাল আমরা এই সংগ্রামশীল জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এখন মুসলিম জাহানে কোন বিপদ এলে আমরা মসজিদে মসজিদে 'আমীন আমীন' রবে প্রার্থনা করি—যখন জীবনক্ষেত্র থেকে কর্মের বিপুল আহবান আসে তখন আমরা তা কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে কেবলমাত্র 'দোয়া'তে কাজ সারি। এভাবে যদি কার্যোদ্ধার হত তা হলে হজরত মুহম্মদকে (দঃ) বর্ম পরিধান করে যুদ্ধে যেতে হত না; কেননা আপনার আমার দোয়ার থেকে রসুলুল্লাহ্ (সঃ)র দোয়া আল্লাহ্‌র কাছে অনেক বেশী গ্রহণীয়।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে আমাদের জীবনধারা ইসলামী শিক্ষাধারার বিপরীতে চলেছে। মনে রাখা দরকার: ধৈর্যহীন কর্ম এবং কর্মহীন দোয়ায় কোন সাফল্য আসে না।

ব্যবসা ও ভিক্ষাবৃত্তি

স্বাবলম্বী হওয়া রসুল-চরিত্রের আর একটি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য। জীবনে তিনি কোন সময় পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন নি। বিভিন্ন শ্রমের মর্যাদাদানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের মধ্য দিয়েই তিনি জীবিকার অন্বেষণ করতে বলেছেন। "ব্যবসায়ী আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র"—এ ঘোষণার দ্বারা মানুষকে তিনি গতিশীল জীবন এবং ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কল্যাণমূলক কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকার্জন যেমন তাঁর কাছে প্রিয় ছিল—ভিক্ষাবৃত্তিতে তেমনি ছিল তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণার বস্তু। তিনি বলেছেন: "ভিক্ষাবৃত্তি বৈধ নয়।"

"ভিক্ষা করা আর নিজের মুখে আঘাত করা সমান। অতএব যার খুশী সে তার মুখ (অক্ষত) রাখুক আর যার খুশী সে তা ক্ষতবিক্ষত করুক।"

"যে কখনো কিছু চাইবে না বলে আমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়, আমিও তাকে বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতি দিই।"

"যে ব্যক্তি ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে আল্লাহ্ তার জন্য অভাবের দ্বার উন্মুক্ত করেন।"

সুতরাং একদিকে তিনি যেমন মানুষকে কর্মে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি অলস জীবন ও যাচ্ঞাকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছেন। মানুষকে দানে উদ্বুদ্ধ করেও তিনি কোন সময় ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেননি। একবার এক দরিদ্র ব্যক্তি তাঁর কাছে কিছু ভিক্ষা চাইলে তিনি তার বাড়ীতে কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। লোকটি বলে যে একটি বাঁটহীন কুড়ুল ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি সেটিকে আনতে বলেন। সেটি নিয়ে আসা হলে, তিনি নিজ হাতে একটি ভাল বাঁট লাগিয়ে দিয়ে তাকে কাঠ কেটে জীবিকার্জনের উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন: "আমার কাছে হাত পাতার চেয়ে দড়ি নিয়ে জঙ্গলে যাওয়া এবং সেখান থেকে কাঁধে করে

জ্বালানী কাঠ বহন করে তার দ্বারা জীবিকা উপার্জন করা তোমাদের পক্ষে উত্তম। কারণ অন্যের কাছে হাত পাতলে সে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।"

কর্মবিমুখ বেদুইনদের তথা মানুষকে কর্মমুখী করার জন্যে রসুলুল্লাহ্‌র এ উপদেশগুলি আশ্চর্যরূপে ফলপ্রসূ হয়েছিল। এবং এ নীতিকথাগুলি আজো সমান ভাবে সমগ্র মানব সমাজের জন্য প্রযোজ্য।

বিলাসিতা ও আড়ম্বরহীন জীবন

বিলাসবহুল জীবন যাঁর করায়ত্ত ছিল—সত্যের জন্য স্বেচ্ছায় তিনি বেদনার পথে পা বাড়ালেন। একবার কোরেশ নেতাগণ মহানবীর কাছে প্রস্তাব পাঠান: যদি তিনি ইসলাম প্রচারে বিরত হন তা হলে তাঁরা তাঁকে দেশের মধ্যে সব থেকে ধনী ব্যক্তি করে দেবেন এবং সকলের নেতা বলে স্বীকার করে নেবেন। মহানবী উত্তর দেন: যদি কোরেশরা এক হাতে চাঁদ অন্য হাতে সূর্য এনে উপহার দেয় তা হলেও তিনি সত্য-ধর্মের প্রচার থেকে বিরত হবেন না।

ধনের লালসা কোন সময় তাঁর বিবেককে আচ্ছন্ন করেনি, বিলাসবহুল জীবন কোন দিনই তাঁর কামনায় স্থান পায় নি। ধনলিপ্সা এবং আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাত্রাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করতেন। তিনি "নগ্ন গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ" করতেন এবং যে শয্যায় শয়ন করতেন তাতে কেবলমাত্র কয়েকটি খেজুর ডাল বিছান থাকত—নিদ্রাভঙ্গ হলে দেখা যেত মোটা দাগগুলি তাঁর সারা দেহে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিম্নের হাদীসগুলি থেকে তাঁর কঠোর জীবন যাত্রা এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের কিছু আভাস পাওয়া যায়:

মা আয়েশা (মহানবীর স্ত্রী) বলেন:

"মহানবীর পরিবারবর্গ পরপর দুদিন পেটভরে উত্তম আটার রুটি খেতে পারেন নি। তারমধ্যে একদিন খেজুর খেতেন।"

"(সময় সময়) আমাদের পরিজনদের একটা মাস অতিবাহিত হত, কিন্তু তার-মধ্যে আমরা উনুনে আগুন জ্বালাতাম না। শুধু খেজুর, পানি ও কিঞ্চিৎ মাংস ব্যতীত কিছুই আহার্য ছিল না।"

"নো'মান বিন বশির (রাঃ) বলেছেন, তোমরা কি তৃপ্তিভরে পানাহার করছ না? নিশ্চয় আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে তোমাদের নবী (সঃ) একটা দিনও পেট ভরে খাবার মত পোকায় খাওয়া খেজুরও পাননি।"

"আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবার পূর্ব পর্যন্ত যবের পাতলা রুটি চোখে দেখেছেন বলে আমি জানি না।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে তিনি যে খাদ্য গ্রহণ করতেন তা প্রয়োজনের তুলনায় যেমন ছিল অপ্রতুল, তেমনি ছিল দিন-মজুরের খাদ্য অপেক্ষাও নিম্নমানের। যে খাদ্য জীবনধারণের জন্যই অপর্যাপ্ত—তা নিয়ে বিলাসিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

জীবনযাত্রায় তিনি যেমন বিলাসকে পরিত্যাগ করেছেন, তেমনি সঞ্চয়ী মনোভাবকেও কোন দিন প্রশ্রয় দেননি। তাঁর কাছে যখন যে অর্থ-সম্পদ এসেছে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা বিতরণ করে দিয়েছেন। সম্পদই যদি আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের সূচনা হয়—তিনি অঙ্কুরে তা বিনাশ করে দিয়েছেন। আনাস (রাঃ) বলেছেন: "রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) কখনো আগামী দিনের জন্য কিছু রেখে দিতেন না।"

একদা প্রত্যুষে মহানবী সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে ফজরের নামাজ পড়ছিলেন। নামাজ শেষ হতেই তিনি অতি দ্রুত মসজিদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন এবং কিছু পরে ফিরে এলেন। সাহাবীদের জিজ্ঞাসু চাহনীর উত্তরে বললেন: ঘরে কিছু দীনার ছিল। হঠাৎ সে কথা মনে হওয়ায় মানসিক পীড়ন অনুভব করলাম। সেগুলি বিলি করার নির্দেশ দিয়ে এখন আমি স্বস্তি পাচ্ছি।

মৃত্যু শয্যার ঘটনাটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে কখনো তিনি জ্ঞান হারাচ্ছেন, কখনো আবার তা ফিরে পাচ্ছেন। ঘরে শেষ সম্বল ছয়টি দীনার ছিল যা বিতরণের নির্দেশ পূর্বেই দিয়েছিলেন। চৈতন্যলাভ করে যখন শুনলেন যে তা বিতরণ করা হয়নি তিনি সেগুলি আনতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে দীনারগুলি তাঁর নিকট আনা হল—তিনি কয়েকটি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে তা বিতরণ করে দিলেন। তাঁর বুকের উপর থেকে যেন একটি বড় ভার নেমে গেল, মুখমণ্ডল পরম প্রশান্তিতে ভরে উঠল। আনন্দাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বললেন: "এখন আমার শান্তি হল, দীনারগুলি রেখে আমার প্রভুর নিকট উপস্থিত হলে কী লজ্জার কথাই না হত!"

মৃত্যুর পর তাঁর কোন সঞ্চয় ছিল না। আমর বিন হারেস (রাঃ) বলেন: "রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর মৃত্যুর পর একটা শ্বেত গর্দভ, কয়েকখানা অস্ত্র এবং কিছু ভূমি যা তিনি পথিকদের দান করেছিলেন—তাছাড়া কোন দীনার-দিরহাম, কোন ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী বা অন্য কোন জিনিষ রেখে যাননি।"

তাঁর সাজ-সজ্জার মর্মন্তুদ বিবরণ পাওয়া যায় আবু বরদাহ্‌র (রাঃ) এই বর্ণনায়: "হজরত আয়েশা (রাঃ) আমাদের একখানা তালিযুক্ত চাদর আর একখানা মোটা কাপড়ের লুঙ্গি দেখালেন এবং বললেন, এই দুখানা কাপড়েই রসুলুল্লাহ্‌র (দঃ) মৃত্যু হয়েছে।"

যখন তিনি ইন্তেকাল করেন প্রকৃতপক্ষে তখন তিনি অর্ধেক আরবের বাদশাহ্, অথচ এই দীন বেশে তাঁর মৃত্যু!

আজকাল আমরা বেশীমাত্রায় বিলাসী এবং অপব্যয়ী হয়ে উঠেছি। রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) এই আড়ম্বরহীন কর্মবহুল জীবন কি আমাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে না!!

বলিষ্ঠ জীবনবাদ

ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে বলিষ্ঠ জীবনবাদ। মানুষের মধ্যে যে মহান শক্তি নিহিত রয়েছে, ইসলাম নবরূপে তাকে জাগ্রত করেছে। চলার পথে বিনয়, নম্রতা, ধৈর্য ও ক্ষমার যেমন প্রয়োজন—তেমনি প্রয়োজন দৃঢ়তা, বীরত্ব, সংগ্রাম এবং কঠোরতার। বিনয় যেমন জীবনে আনে সুষমা, বীরত্ব তেমনি দান করে পৌরুষ-ব্যঞ্জনা। কেবল বিনয় এবং নম্রতা মানুষের জীবনে ক্লীবত্ব আনে—গতিশীল জীবনের জন্য চাই কল্যাণমুখী সংগ্রাম। "একগালে চড় খেলে অন্য গাল বাড়িয়ে দাও"—ইসলাম এ নীতি গ্রহণ করে না। এ নীতি ভীরু ও দুর্বলের নীতি। বাণী হিসেবে এ উক্তি যত মূল্যবানই মনে হোক, যে ধর্মনেতা এ হিতোপদেশ দিয়েছিলেন তাঁর অনুবর্তীগণও এ নীতি পালন করেন নি। বরং চড় খাওয়ার আগেই অন্যের গালে চড় মেরেছেন। বোঝাই যায় আদর্শের দিক দিয়ে এ নীতি স্বাভাবিক নয়,

গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে এ নীতি ব্যর্থ। অত্যাচারিত হলে ইসলাম প্রথমে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নির্দেশ দেয়—পরের স্তর সংগ্রামের। প্রয়োজনবোধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা যেতে পারে। একজন মুসলমান তাই যেমন নিরীহ, তেমনি নির্ভীক। অন্যায় করা এবং অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া উভয়ই সমান। ভীরুর মত বসে বসে অন্যায়কে সহ্য করার নীতি ইসলাম কোন দিন গ্রহণ করেনি। ভীরুতাকে হজরত মুহম্মদ (সঃ) চিরদিনই সর্বাপেক্ষা ঘৃণা করেছেন। ইসলাম বীরের ধর্ম—সততা যার কেন্দ্রীয় শক্তি, বলিষ্ঠ জীবনবাদে যার মহিমাদীপ্ত বহিঃপ্রকাশ।

এ জন্যে মহানবী মুহম্মদ (সঃ) যুদ্ধকে বর্জন করে চলতে পারেননি। সত্য এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সকল অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে তাই তাঁকে উলঙ্গ তরবারি হস্তে অসমসাহসী বীরের মত যুদ্ধ করতে দেখি। তাঁর পৌরুষদীপ্ত সৈনাপত্যে সকল মানুষকেও দেখি অকুতোভয় সৈনিক হিসেবে। তিনি কোন দিন ভীরু এবং ক্লীবের মত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেননি। ওহোদ যুদ্ধে আহত এবং অর্ধমৃত অবস্থাতেও তাঁকে সেনাপতির কর্তব্যে অটল থাকতে দেখি। জীবনে সাতাশটি যুদ্ধে যোগদান করে এবং নয়টি যুদ্ধে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি এক অনন্যসাধারণ নজীর সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মনেতাকে সম্ভবতঃ এভাবে এত অধিক সংখ্যক অন্যায় প্রতিরোধকারী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়নি, অন্য কোন ধর্মপ্রচারকের মধ্যে এই অজেয় বীরবেশ, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং সুদৃঢ় মনোবল দেখা যায় নি। এর ফলে, তাঁর জীবিতকালেই, ইসলাম সমগ্র বিশ্বে এক অজেয় শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।

সকল ভীরুতা এবং ক্লীবত্বকে পিছনে ফেলে বীরের মত সত্যের জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার এই যে বীর্যদীপ্ত নীতি—মুসলমান তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এ এক মূল্যবান শিক্ষা।

এই গতিশীল জীবনবাদের সঙ্গে যখন বিনয়, ধৈর্য এবং ক্ষমার সংযোগ ঘটে তখন মাটির পৃথিবীতেই নেমে আসে বেহেশ্তের প্রতিচ্ছবি। আদর্শ মানবিকতা প্রতিষ্ঠায় সত্যের সঙ্গে শক্তির সমন্বয় অপরিহার্য।

উপসংহার

ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম। এর প্রধান বিধানগুলি তিনিই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর প্রেরিত পুরুষ মুহম্মদ (সঃ) সেই বিধানগুলির ব্যাখ্যাদাতা এবং রূপকার। এছাড়া তিনি আল্লাহ্‌র ইংগিতে যে নীতিগুলির নির্ধারণ করেছেন সেগুলিও আল্লাহ্‌র নিয়ম-নীতির-পরিপূরক। এ সকল বিধি-বিধানের ভিত্তিভূমি হল মানব-জীবন। মানব-জীবনের জন্য যা সুন্দর এবং স্বাভাবিক, যা সহজ এবং কল্যাণকর—সেগুলিকে কেন্দ্র করেই এ নীতিগুলি গড়ে উঠেছে। যা মানব জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না এমন কোন বিধান হজরত মুহম্মদ (সঃ) দেন নি। এগুলি বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে মানুষকে অস্বাভাবিক এবং দুঃসাধ্য কাজ করতে হয় না, কঠোর এবং শ্রমসাধ্য কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় না। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এ সকল উপদেশের প্রত্যেকটি নৈতিকসৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল; আদর্শ চরিত্র গঠন এবং মানবিক গুণাবলী বিকাশের একান্ত অনুকূল। অসামান্য

অনাচারের মধ্যে মানুষকে সংপথ প্রদর্শনের জন্য এগুলি উৎসুক অন্ধকার বিচ্ছুরণকারী মশালরূপে কাজ করেছে।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি ধর্মীয়, নৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে হজরত মুহম্মদ (দঃ) আমূল সংস্কার এবং পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রবর্তক এবং একই সঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই" বলে তিনি যেমন ইসলামের মূলশক্তির উৎস একেশ্বরবাদে সকলকে দীক্ষা দিলেন তেমনি ঐ একই মন্ত্রে বহুঈশ্বরবাদ বা পৌত্তলিকতার মূলোচ্ছেদ করলেন; "আল্লাহ্ উদ্ধত অহংকারীদের ভালবাসেন না" প্রচারে তিনি যেমন উদ্ধত বেদুইনদের সংহত করলেন তেমনি "অনুতপ্ত পাপী নিষ্পাপ ব্যক্তির তুল্য" বলে তাদের পাপাচারী মনকে অনুতাপের অগ্নিতে দগ্ধীভূত করলেন; 'ক্রোধ করো না, কারণ তা বিবাদের সৃষ্টি করে" ঘোষণায় উত্তেজিত ক্রুদ্ধ জনতাকে সংযত করার সঙ্গে সঙ্গে "নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন" বলে তাদের শ্রেষ্ঠ মানবিকগুণে ধৈর্যধারণ করতে শিক্ষা দিলেন; 'জ্ঞানীর নিদ্রা অশিক্ষিত ব্যক্তির উপাসনা অপেক্ষা উত্তম' ঘোষণার দ্বারা তিনি যেমন মূর্খতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করলেন তেমনি "জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র" বলে শিক্ষার মর্যাদার প্রতি সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন; "ভিক্ষা করা বৈধ নয়" এবং "যে ভিক্ষা করে আল্লাহ্ তার অভাবের দ্বার মুক্ত করেন" বলে তিনি ভিক্ষাকে যেমন লজ্জাজনক ও অপমানকর বৃত্তি বলে ঘোষণা করলেন তেমনি "ব্যবসায়ী আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র" বলে সকলকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হবার আহ্বান জানালেন; "ঋণ ধর্ম ও মর্যাদা নষ্ট করে" বলে ঋণগ্রহণে সকলকে নিরুৎসাহ করার সঙ্গে সঙ্গে 'মানুষ নিজ হাতে যা উপার্জন করে" সেই স্বোপার্জন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা বলে সকলের দৃষ্টিকে কর্মময় জীবনে কেন্দ্রীভূত করলেন; 'মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট দোষ অতিশয় কৃপণতা' বলে তিনি যেমন কার্পণ্যকে ঘৃণার বিষয় করলেন তেমনি "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে দান না করা পর্যন্ত কিছুতেই পুণ্যলাভ করবে না" এ বাণী প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে দানশীলতায় উদ্বুদ্ধ করলেন; একদিকে বৈরাগ্যকে নির্বাসন দেবার জন্যে তিনি যেমন ঘোষণা করলেন "ইসলামে বৈরাগ্য নেই" তেমনি "বিবাহ ধর্মের অর্ধেক" বলে সংসার ও দাম্পত্য-জীবনকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন; আপন শিশুকন্যা হত্যা মহাপাপ বলে তিনি যেমন এ ঘৃণ্যপ্রথার অবসান ঘটালেন তেমনি 'সন্তানকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া ভিক্ষুককে এক বস্তা আটা দান করা অপেক্ষা অধিক পুণ্যজনক" বলে আপন সন্তানদের শিক্ষাদানে ও ভরণপোষণে সকলকে উৎসাহিত করলেন; বিভিন্ন উপদেশের মাধ্যমে ক্রোধ-প্রতিহিংসা প্রভৃতি বিচ্ছিন্নতামূলক শক্তিগুলিকে তিনি যেমন অবদমিত করলেন তেমনি "প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই" বলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করলেন এবং একতাকে সবার উপরে স্থান দিলেন; ব্যভিচারের মূলোচ্ছেদ ঘটিয়ে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন "অবৈধ যৌনসংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, এ অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ" সঙ্গে সঙ্গে 'সংযম শ্রেষ্ঠ ধর্ম" বলে মানুষকে আত্মসংযমের পুণ্যব্রতে উদ্বুদ্ধ করলেন; "আল্লাহ্ সুদকে ধ্বংস করেন" এ বাণীর মাধ্যমে সুদকে সম্পূর্ণ অবৈধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে "দানে ধন কমে না" এবং "দান কর তোমাকেও দান করা হবে" বলে মানুষের হৃদয়ের প্রসারতার বৃদ্ধি ঘটালেন; নম্রতা শিক্ষা দিয়ে তিনি একদিকে যেমন বললেন "ভদ্রতা ও বিনয় ঈমানের দুটি

শাখা'' তেমনি "বৃথা বাক্য ও অহঙ্কার কপটতার শাখা" বলে মানুষকে সংযমের ধর্মে আবৃত করলেন।

এভাবে উপদেশ ও আপন জীবনাচরণের মাধ্যমে হজরত মুহম্মদ (সঃ) মানুষের ধর্মজগৎ এবং ব্যবহারিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করলেন। যারা ছিল উদ্ধত তারা বিনম্রী হল, যারা ছিল হত্যাকারী তারা হল শান্তির দূত। আদর্শ এবং সুখী পরিবারের বুনিয়াদ গঠনের জন্য তাঁর মানবিক নীতিগুলি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল। তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম-ভালবাসাপূর্ণ পারিবারিক জীবন, ঐক্যবদ্ধ শৃঙ্খলিত এক সুদৃঢ় সামাজিক বুনিয়াদ—তা তিনি পেরেছিলেন। দীর্ঘদিন পর আরববাসী আবার ফিরে পেল বিশ্বাসী স্বামী এবং স্বাধ্বী স্ত্রী, স্নেহশীল পিতা এবং মমতাময়ী মাতা, বিনয়-নম্র পুত্র এবং করুণাময়ী কন্যা, ভাতৃবৎসল ভ্রাতা এবং সেবাপরায়ণ ভগ্নী, কর্তব্যনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বিশ্বস্ত প্রতিবেশী। মনোজগৎ এবং বহির্জগতের এতবড় একটা বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তনের জন্য কোনরূপ আইনের প্রয়োজন হয়নি, জোরজবরদস্তিরও নয়—মানবপ্রেমিক মহানবী মুহম্মদের (দঃ) মুখের বাণী ও কাজই ছিল যথেষ্ট। এর থেকে তাঁর গৃহীত নীতিগুলির গভীর বাস্তবমুখীনতা ও গ্রহণযোগ্যতা আশ্চর্যরূপে প্রমাণিত হয়। এ সকলের উপর ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর নীরব বিপুল ব্যক্তিত্ব। তিনি যেমন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক, তেমনি ছিলেন এক যুগান্তকারী বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর চিরন্তন বাণীর সঙ্গে এই বিশাল ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণ অভিদ্রুত এক অসাধারণ কল্যাণময় ফলশ্রুতি বহন করে এনেছিল—মাত্র দশ-এগার বছরের কর্মময় জীবনে অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎবাসীর সম্মুখে নতুন জীবনবোধ-দীপ্ত উজ্জ্বল ইসলাম ধর্মকে এক অসাধারণ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

মহানবী মুহম্মদ (সঃ)-এর বংশতালিকা

[মহানবী মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রথম যুগের জীবনীকার ইবনে ইস্হাকের সীরাৎ-ই-রসূলুল্লাহ্', স্যর সৈয়দ আহ্মদ প্রণীত Essays on Muhammad and Islam এবং গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী' গ্রন্থে এই বংশতালিকাটি মুদ্রিত হয়েছে ।]

১. আদম
২. শীশ
৩. ইউনুস
৪. কাইনান
৫. মহলিল
৬. ইয়াদ
৭. ইদ্রিস
৮. মাতুশালাখ
৯. লমক
১০. নূহ্
১১. শাম
১২. আরফাখ্শাদ
১৩. সালিক্
১৪. আইবর
১৫. ফালিস
১৬. রাউ
১৭. সরুগ
১৮. নাহুর
১৯. তাহির (আযর)
২০. ইব্রাহীম
২১. ইস্মাইল
২২. কাইজার
২৩. আওয়াম
২৪. ঔস্
২৫. মর্রহ্
২৬. সমষ্ট
২৭. রোজাহ্
২৮. নাজিব
২৯. মোয়াসির
৩০. ঈহাম
৩১. আফ্তাদ
৩২. ঈসা
৩৩. হাসান
৩৪. আনফা
৩৫. অরওয়া
৩৬. বলখা
৩৭. হারী
৩৮. হারী
৩৯. ইয়াসিন
৪০. হুমরান
৪১. আল্রুয়া
৪২. ওবাইদ
৪৩. আনুক
৪৪. আস্কী
৪৫. মাহী
৪৬. মাখুর
৪৭. ফাজেম
৪৮. কালেহ্
৪৯. বদ্লান
৫০. ইয়ালদারুম
৫১. হেররা
৫২. নাসিল
৫৩. আবিলআউরাম
৫৪. মাতাসাবিল
৫৫. বরু
৫৬. ঔস
৫৭. সলমান
৫৮. হামিসা
৫৯. উদ্দ
৬০. আদনান
৬১. মুঈদ
৬২. হমল
৬৩. নবিত
৬৪. সলমান

৬৫. হুমিসা
৬৬. আল্ঈসাউ
৬৭. উদ্দ
৬৮. উদ্
৬৯. আদনান
৭০. মা'দ্
৭১. নজর
৭২. মুদার
৭৩. ইলিয়াস
৭৪. মুদ্রিকা
৭৫. খুজাইমা
৭৬. কিনান
৭৭. নযর
৭৮. মালিক
৭৯. ফিহির (কোরেশ)
৮০. গালিব
৮১. লোবাই
৮২. কা'ব
৮৩. মোরা
৮৪. কিলাব
৮৫. কোসাই
৮৬. আবদে মন্নাফ
৮৭. হাশিম [এই নামানুসারে বনিহাশেম গোত্র
৮৮. আবদুল মুত্তালিব
৮৯. আব্দুল্লাহ্
৯০. মুহম্মদ (সঃ)

মহানবীর বংশ-চিত্র

[হজরত ইব্রাহীম (আঃ) থেকে হজরত মুহম্মদ (সঃ) পর্যন্ত]

ইব্রাহীম (আঃ) আ. খ্রী. পূ. ২২০০

↓

ইসমাইল (আঃ)

↓

ফিহির (কোরেশ)

[ইব্রাহীমের ৬০তম উত্তর পুরুষ]

↓

কোসাই

[ফিহিরের সপ্তম উত্তর পুরুষ]

↓

আব্দে মান্নাফ

- আব্দে শামস
  - ↓ উমাইয়াহ্
  - ↓ হারব
  - ↓ আবুসুফিয়ান
  - ↓ মুয়াবিয়া
- হাশেম
  - ↓ আবদুল মুত্তালিব
    - আল-আব্বাস
    - আবদুল্লাহ
      - ↓ মুহম্মদ (সঃ) খ্রী ৫৭১
    - আবুতালেব
      - ↓ আলী (খ্রী ৬০০)

মহানবী মুহম্মদ (সঃ)

'আরব' আরবী শব্দ, অর্থ মরুভূমি। অতি প্রাচীনকালে আরবদেশ সাহারা মরুভূমিরই অংশ ছিল, আজো এদেশের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে মরুভূমির বহুৎসব। এখানে মাইলের পর মাইল কোথাও আল-দাহ্‌নার লাল বালির ওপরে মধ্যাহ্ন-সূর্যের অনলবর্ষী কিরণ ধু ধু ক'রে জ্বলছে, আবার কোথাও আল্-নাফুদের সাদা বালি প্রখর সূর্যালোকে মরীচিকার মত মায়া বিস্তার করছে। অথচ এর দিকে-দিকে দুর্গম গিরি, তিন দিকে দুস্তর পারাবার।

যে দেশ কেবল পানি আর পানির পারাবার-ঘেরা 'জাজীরাতুল আরব' বা 'আরব দ্বীপ' হিসেবে বিখ্যাত সে দেশকে শুধুমাত্র মরুভূমি হয়ে নীরস শুষ্কতার মধ্যে নিষ্ফল হতে দেবার বাসনা বোধ হয় বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌তা'লার ছিল না। তাই করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লা মরুর বুকে তাঁর অফুরন্ত করুণানির্ঝরের মত রহমতুল্লিল-আ'লামীন হজরত মুহম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে অবতীর্ণ করলেন। সাহারাতে পুষ্পোৎসব শুরু হল।

সেদিন ছিল ৫৭০ খ্রীস্টাব্দের ২৯ শে আগস্ট—চান্দ্রমাস রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ, সোমবার।* শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। তারায় তারায় তারি আলোর রেশ কিযেন এক গভীর রহস্যের বার্তা নিয়ে কানাকানি করছে। মাটির পৃথিবীতে নিদ্রানিঝুম ঘরে ঘরে নির্বিরোধ অন্ধকার। এমন সময় সুখ-স্বপ্নে বিভোর পূর্ণ গর্ভবতী মুহম্মদ-জননী আমিনার ঘুম ভেঙে গেল। সেই ঘুম-ভাঙা-ভোরে তাঁর কোলে ভূমিষ্ঠ হলেন ভোরের আজানের মত পবিত্র স্নিগ্ধ সৌন্দর্য-মণ্ডিত এক মহান মানবশিশু। আকাশ থেকে ফেরেশতারা যেন বিশ্বনিখিলের উদ্দেশ্যে ঘুম ভাঙানিয়া আজান দিল—আস্‌সালাত খায়রুম মিনান্নাওম্—জাগো, তোমরা জাগো, নিদ্রার চেয়ে যে নামাজ শ্রেষ্ঠ।

তখন নিদ্রামগ্ন আরবের বুকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের রাজত্ব বিস্তার করেছিল 'আইয়ামে জাহেলিয়াতের' অজ্ঞানতার অন্ধকার। সে অন্ধকার থর থর করে কেঁপে উঠল। নরহত্যা, নারীহত্যা, শিশুহত্যা, ব্যভিচার আর মদ্যপানের উন্মত্ত তাণ্ডব যেন আচমকা থমকে গেল। আভিজাত্যের অহংকার, জাল-জুয়াচুরি, লুণ্ঠন আর স্বার্থসর্বস্ব পুরোহিত-তন্ত্রের নির্মম হৃদয়হীনতা যেন অকস্মাৎ শিউরে

*কাজী আব্দুল ওদুদ তাঁর 'হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম' নামক গ্রন্থে বলেন, 'হজরত মোহম্মদের জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন তাঁর জন্ম ৫৭০ খ্রীস্টাব্দের ২০ শে আগস্ট তারিখে, কেউ বলেছেন ৫৭১ খ্রীস্টাব্দের ২০, ২১ অথবা ২২ শে এপ্রিলে। তাঁর ভূমিষ্ঠ হবার বৎসরে মক্কায় একটি বড় ঘটনা ঘটে—সেটি হচ্ছে ইয়েমেনের খ্রীস্টান শাসক আব্রাহার মক্কা-আক্রমণ।' 'মোস্তফা চরিত' রচয়িতা মাওলানা আকরম খাঁর মতে ২০ শে এপ্রিল ৫৭১ খ্রীস্টাব্দ—৯ই রবিউল আউয়াল। 'বিশ্বনবী' রচয়িতা গোলাম মোস্তফা সাহেব বলেন, ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার ধরলে মুহম্মদ (সঃ)-এর জন্ম তারিখ ২৯ শে আগস্ট ৫৭০ খ্রীস্টাব্দই সঠিক।

উঠল। আদিমতম উপাসনালয় কাবাগৃহের অভ্যন্তরে সারি সারি সাজিয়ে রাখা ৩৬০ টি দেবমূর্তির ভিত ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠল। অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌কে যারা দেবতা বানিয়ে লাৎ, মানাৎ আর ওজ্জাকে[২] তাঁর তিন সুন্দরী কন্যা রূপে কল্পনা করে শরীক সৃষ্টি করেছিল—তাদের শেরেকির অন্তঃসারশূন্য আস্ফালন মহাত্রাসে শিউরে উঠল। নির্যাতিত শোষিত বিশ্ব তাদের শোষণ ও বঞ্চনামুক্তির 'নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার' উদ্ঘাটিতে হতে দেখে 'মারহাবা মারহাবা'[৩] বলে' স্বতোচ্ছ্বসিত আনন্দধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করল। সকল অশান্তি, উৎপীড়ন, অসাম্য ও অসত্যের মূর্ত প্রতিবাদ করুণানির্ঝর মুহম্মদ (সঃ) মক্কার মরুদিগন্তে ভূমিষ্ঠ হলেন।

বংশ-পরিচয় ঃ কিন্তু কোথা থেকে এলেন এই মুহম্মদ (সঃ) ? কি তাঁর পরিচয় ? এ প্রশ্নের উত্তর ইতিহাসের অতল গভীরে। হজরত মুহম্মদ (সঃ) 'খাতামুন্নাবিইন'—অর্থাৎ সর্বশেষ নবী। কিন্তু আ'লেমুল গায়েব আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর সৃজনচিন্তার আদিম ঊষায় সর্বপ্রথম তাঁরি নূরকেই অর্থাৎ 'নূরে মুহাম্মদী'কেই সৃষ্টি করেছিলেন।[৪] তারপর নূর নবীর ঐ নূরের আলোকে উপলক্ষ করে তিনি সমগ্র বিশ্বনিখিলকে সৃষ্টি করলেন। আদিমানব হজরত আদম (আঃ)-কে সারণ (সিংহল বা শ্রীলংকা) দ্বীপে এবং তাঁর স্বর্গসঙ্গিনী আদি মানবী বিবি হাওয়াকে আরবের ইয়েমেন প্রদেশে প্রেরণ করলেন। আদম (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার কোন্ নিগূঢ় ইঙ্গিতে তাঁর অস্তিত্বের অতলে কি এক সুগভীর আকুলতা অনুভব করলেন। কত দুঃখ-দুর্গম কান্তার মরু পার হয়ে আরবে গিয়ে বিবি হাওয়ার সাথে মিলিত হলেন, ঘর বাঁধলেন, চাষবাস করলেন, বংশ বিস্তার করলেন—আর অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌তা'লার উপাসনার জন্য পৃথিবীর আদিমতম উপাসনালয় কা'বাশরীফ নির্মাণ করলেন। ইস্‌লামী দর্শনের আদিমতম ধারণা এই অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র ধারণা —লা-শরীক আল্লাহ্‌তে নিঃশর্ত বিশ্বাস।

কালক্রমে নূহের প্লাবনের তলায় বিশ্বসভ্যতার শতসহস্র স্বর্ণস্মরণীর মত এই আদিমতম উপাসনালয় কা'বাশরীফও তলিয়ে গেল।

যুগযুগ পরে এই কা'বাশরীফ পুনর্নির্মাণের জন্য ব্যাবেল বা ব্যাবিলনে আবির্ভূত হলেন আধুনিক আরবদের জাতির জনক এবং হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর বংশের আদি পূর্ব-পুরুষ হজরত ইব্রাহীম (আঃ)। পৌত্তলিকতার তমসাবৃত ব্যাবিলনে অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌তা'লার বাণী প্রচার করার অপরাধে তাঁকে দেশত্যাগ করে মিশরে আসতে হল।[৫] এখানে এসে তাঁর বন্ধ্যাপত্নী সায়েরার পরামর্শক্রমে মিশরের তৎকালীন ফারাও-এর উপহার সুন্দরী মিশর-কুমারী হাজেরাকে তিনি বিবাহ করলেন। কিন্তু হাজেরার গর্ভে পুত্র ইসমাইলের জন্ম লাভের সঙ্গে সঙ্গে

---

২ 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' বা 'অজ্ঞানতার যুগে' আরবরা 'লাৎ' কে উজ্জ্বল তারকার দেবী, 'মানাৎ' কে সৌভাগ্যের দেবী এবং 'ওজ্জা' কে ভোরের তারার দেবীরূপে কল্পনা করত।

৩ ধন্য ধন্য।

৪ হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, 'আউয়ালা মা খালাকাল্লাহু নূরী' অর্থাৎ সর্বপ্রথম আল্লাহু যা সৃষ্টি করেন তা আমার নূর।'

৫ স্মরণীয় যে ইব্রাহীমের বংশধর হজরত মুহম্মদ (সঃ)-কেও তাঁর জন্মভূমি পৌত্তলিক মক্কায় একেশ্বরবাদ প্রচারের অপরাধে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছিল।

সায়েরার মনে সপত্নী বিদ্বেষ ও ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হল। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশে শিশুপুত্র ইসমাইল সহ হাজেরাকে আরবের অন্তর্গত সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী মরুপ্রান্তরে নির্বাসিত করলেন। সেখানে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর শিশু-ইসমাইলের করুণ কান্নায় অতিষ্ঠ হয়ে হাজেরা পানাহারের সন্ধানে উক্ত সাফা ও মারওয়া নামক পর্বতদ্বয়ে উন্মাদিনীর মত সাত সাতবার ছুটোছুটি করলেন। তারপর ফিরে এসে দেখলেন, শিশুর চরণ-প্রান্তে অলৌকিক উপায় সৃষ্ট জমজমের ঝরনা-ধারা ঝর ঝর করে বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ-জাগা-সে-পানি প্রবাহিত হয়ে নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় হাজেরা সে ঝরনার চারদিকে আল দিয়ে তাকে কূপে পরিণত করলেন। এই কূপই বর্তমানে বিশ্বমুসলিমের শত সহস্র স্বপ্ন আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা পবিত্র জমজম কূপ।[৬]

কিন্তু সেই ঝরনার পানি প্রবাহিত হবার ফলে সেখানকার সরস মাটিতে তৃণলতার সৃষ্টি হল। জুরহাম (বা জুরহুম) গোত্রের একদল বণিক সেখানকার আকাশে একঝাঁক পাখীকে উড়তে দেখে সেখানে গেলেন এবং মরুপ্রান্তরে এ মরুদ্যানের সজল শ্যামল মায়ায় আকৃষ্ট হয়ে মা হাজেরার সম্মতিক্রমে তাঁদের পশুপাল সহ সেখানে বসতি স্থাপন করলেন। ফলে মরুভূমি জনারণ্যে পরিণত হল এবং বণিক-নগরী মক্কার আবির্ভাব ঘটল। এতদিনে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) মিশর থেকে প্যালেস্টাইনে এসেছেন এবং প্যালেস্টাইন থেকে নির্বাসিতা হাজেরা ও ইসমাইলের সঙ্গে তাঁর সাহচর্যকে ঘনিষ্ঠতর করেছেন। এখানেই তিনি পূর্বোল্লিখিত নূহের প্লাবন-বিপর্যস্ত কা'বা শরীফের ভিটার ওপরে আদিমতম উপাসনালয় কাবাগৃহটি পুনর্নির্মাণ করলেন। এখন থেকে এই কা'বাগৃহকে কেন্দ্র করে হজ্জ্ এবং পুত্র ইসমাইলের ৭ বছর বয়সে সংঘটিত কোরবানীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশু কোরবানীর প্রথা প্রচলিত হল। এই সব কারণে যুগ যুগ ধরে মানুষ মরুমক্কায় তীর্থ করতে আসে আর এই মক্কাতীর্থকে কেন্দ্র করে আরবের সকল সমৃদ্ধি। ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানদের আদি ধর্মগুরু হজরত ইব্রাহীম (আঃ)কে তাই আরবদের জাতির জনক আখ্যা দিয়ে এবং ইসমাইলীয় নামে পরিচিত হজরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধরগণকে কা'বাশরীফের সেবাকর্মের বিশেষ অধিকার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

কালক্রমে এই ইসমাইলীয় বংশে হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ৬০তম উত্তরপুরুষ 'ফিহির' জন্মগ্রহণ করলেন। ফিহির পূর্বপুরুষদের মত বণিকবৃত্তিতে তাঁর অপরিসীম পারদর্শিতার জন্যে 'কোরেশ' উপাধিতে ভূষিত হলেন। এই কোরেশ উপাধি থেকেই কোরেশ গোত্রের সূত্রপাত। 'কোরেশ' শব্দের অর্থ বণিক বা ব্যবসায়ী। ক্রমে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল। খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কোরেশ ফিহিরের সপ্তম উত্তরপুরুষ কোসাই মধ্য আরবে অবস্থিত এই মক্কামদীনা সহ সমগ্র হেজাজ প্রদেশের শাসন-কর্তৃত্ব অধিকার করলেন।[৭] কোসাই-এর চতুর্থ উত্তর-

---

৬ এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৭২৪ সংখ্যক হাদীস দেখুন। পৃ. ৩১২।

৭ One of the descendants of Fihr, Qusayy by name united all the tribes of the Quraysh, and took Possession of Hijaz and the charge of the Kabah. For the convenience of administration he built a Counsel Hall (Dar un-nadwa) where the leaders of the Quraysh used to assemble from time to time for public business. Qusayy

পুরুষ আব্দুল মুত্তালিব-ও এই হেজাজ প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। আব্দুল মুত্তালিবের পিতা হাশেম সাহসিকতা, মহানুভবতা ও শাসনকর্মে সবিশেষ দক্ষতার জন্য স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন—তাই তাঁর বংশধরগণকে বনিহাশেম নামে অভিহিত করা হয়। কোরেশ গোত্রের এই বনিহাশেম গোষ্ঠীর আব্দুল মুত্তালিবের দুই পুত্র আব্দুল্লাহ্ এবং আবুতালিব বণিক হিসেবে সুনামের অধিকারী ছিলেন। পুরুষানুক্রমিক রক্তগত প্রবণতাই হয়তো তাঁদের এই বণিকবৃত্তির প্রতি আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিল। যে আব্দুল্লাহ্-পুত্র-মুহম্মদ (সঃ) পরবর্তীকালে ঘোষণা করবেন 'আত্তাজেরা হাবিবুল্লাহ্' অর্থাৎ 'ব্যবসায়ী আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র', যাঁর প্রচারিত ধর্মে সদুপার্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যকে সুন্নত বলে ঘোষণা করা হবে—বণিক কোরেশের বংশে বণিক আব্দুল্লাহ্র ঔরসে তাঁকে ধরাধামে অবতীর্ণ করে আল্লাহ্তা'লা তাঁর বিশ্বসৃষ্টির মর্মমূলে নিহিত নিয়মশৃঙ্খলার ধারাবাহিকতাকেই যেন দীপ্ত করে তুললেন।

মুহম্মদ-জনক আব্দুল্লাহ্ যখন বালক তখন আরবে একবার তীব্র পানির কষ্ট দেখা দিল। শাসক হিসেবে পূর্বপুরুষ কোসাই-এর মত আব্দুল মুত্তালিবের ওপরেই তীর্থযাত্রীদের জন্য পানি সরবরাহের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তিনি আপ্রাণ প্রয়াস করেও পানিসংগ্রহের কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারলেন না। এমন সময় তাঁর মনে পড়ল জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ) আর ইসমাইল (আঃ)-এর সেই জমজম কূপের কথা। তিনি ভাবলেন, নিশ্চয় এই মরুমৃত্তিকায় নিভৃত অভ্যন্তরে কোথাও সেই পবিত্র প্রস্রবণ সুপ্ত হয়ে আছে। তিনি মানত করলেন, যদি সেই হারানো জমজমের কূপ তিনি আবিষ্কার করতে পারেন তাহলে তাঁর 'দ্বাদশ পুত্র এবং ছয় কন্যার'[৮] মধ্যে একজনকে কা'বামন্দিরে নিয়ে গিয়ে পূর্বপুরুষ ইসমাইলেরই মত কোরবানী (বা বলিদান) করবেন। আল্লাহ্তা'লার অপার করুণায় তিনি সেই জমজম আবিষ্কার করলেন। 'যুগযুগান্তর পর আবার বহিতে লাগিল ইব্রাহীমী অমৃতের ফল্গুধারা—শারাবন তহুরা।' (শেষ নবী—মুহাম্মদ তাহের)। তখন লটারীতে ঐ কোরবানীর পাত্র হিসেবে তাঁর প্রিয়তম পুত্র আব্দুল্লাহ্র নাম উঠল। তিনি ইব্রাহীম (আঃ)-এরই মত দ্বিধাহীন চিত্তে পুত্র আব্দুল্লাহ্কেই কোরবানী করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু আব্দুল মুত্তালিবের কাল যে হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কালকে কয়েক হাজার বছর পেছনে ফেলে এসেছে। তাই দেশবাসী তাদের প্রিয় আব্দুল্লাহ্কে এইভাবে বলিদানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। তখন দৈবজ্ঞের ব্যবস্থাপনায় ১০০ উট কোরবানী দিয়ে আব্দুল মুত্তালিব পুত্র-কোরবানীর দায় থেকে রেহাই পেলেন।

এই আব্দুল্লাহ্র বিবাহ হল মদীনা-নন্দিনী বনুজোহ্‌রা গোত্রের ওহাবের কন্যা আমিনার সাথে।[৯] বিবাহের পর কিছুদিন শ্বশুরালয়ে অবস্থান করে, ব্যবসায়ী

proved himself a capable administrator by supplying food and water to the pilgrims during the period of pilgrimage. (A Study of Islamic History by Prof. K. Ali).

৮ এ তথ্য মুহাম্মদ তাহের সাহেবের। কাজী আব্দুল ওদুদ সাহেব দশ পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন।

৯ 'হযরত আব্দুল মুত্তালিব হযরত ইসমায়ীল আলাইহিসসালামেরই একটি বংশগোত্র মদীনার অধিবাসী বনু জুহ্‌রা সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সর্দার ওহাবের

আব্দুল্লাহ্ সিরিয়ায় বাণিজ্য-যাত্রা করলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র মহিমা বোঝার সাধ্য মানুষের নেই। বাণিজ্য থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আব্দুল্লাহ্ মদীনায় পরলোক গমন করলেন। সুযোগ বুঝে, দক্ষিণ-আরবের ইয়েমেন-রাজ আব্রাহা তাঁর নিজ-রাজ্যে নিজের নির্মিত নকল কাবার মর্যাদা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মক্কায় অবস্থিত আদিমতম উপাসনালয় কা'বা শরীফ ধ্বংস করতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু করুণাময় আল্লাহ্ প্রবল ঝটিকা আর প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টির আঘাতে তাঁর সে অপপ্রয়াস ব্যর্থ করে দিলেন। আব্রাহার এই বিনাশ আর জমজমের আবিষ্কার যে-মহামানবের মহান আবির্ভাবের 'নিকট-পূর্ব লক্ষণ' ছিল 'আব্রাহা-অভিযানের পঞ্চান্ন দিন পর রবিউল আউয়াল মাসের বারই তারিখে'[১০] জমজম ও কা'বার সেই মহান মর্যাদারক্ষাকারী মুহম্মদ (সঃ) মা হাজেরার স্মৃতিসুরভিধন্য পবিত্র মক্কানগরীতে জন্মগ্রহণ করলেন। পূর্বপুরুষ ইসমাইলকে কোরবানী করার আয়োজন করা হয়েছিল এবং তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ্-ও কোরবানী হতে হতে রেহাই পেয়ে গিয়েছিলেন— তাই মুহম্মদ (সঃ)কে 'দুই কোরবানীর পুত্র' বলা হয়। ইসমাইলীয় নামে পরিচিত আরবদের কোরেশ গোত্রে জন্মগ্রহণকারী মুহম্মদ (সঃ)-এর রক্তধারায় এই দুই ইতিহাস-বিখ্যাত ত্যাগবীরের শোণিত-ঐশ্বর্য বিদ্যমান বলেই বোধহয় বিশ্বের ইতিহাসে রাজর্ষি মুহম্মদ (সঃ)-এর ত্যাগের তুলনা বিরল। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা—তৎকালীন বিশ্বের পরিচিত এই তিন মহাদেশের কেন্দ্রস্থলে ছিল আরবদেশের অবস্থান। এই বিশ্বকেন্দ্র আরবে ব্যাবিলনবাসী ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমে সুপ্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার, ইসমাইলজননী মিশরকুমারী হাজেরার মাধ্যমে বিশ্ববিশ্রুত মিশরীয় সভ্যতার এবং ইসমাইল পত্নী সাঈদার মাধ্যমে মক্কা প্রতিষ্ঠাকারী বণিক-জুরহাম গোত্র-সৃষ্ট অবিস্মরণীয় আরবীয় সভ্যতার—সুমহান শোণিত-ঐশ্বর্য নিয়ে মুহম্মদ (সঃ) ভূমিষ্ঠ হলেন। আর এইভাবে ভূমিষ্ঠ হবার মাধ্যমেই যেন ভবিষ্যৎকালে তাঁর 'বিশ্বনবী' হওয়ার সুবিপুল সম্ভাবনা সুন্দরভাবে আভাসিত হল। যাঁকে উদ্দেশ্য করে পবিত্র কোরআন শরীফে স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, (কোন সম্প্রদায় বা দেশবিশেষের জন্য নয়), 'আমি আপনাকে সমস্ত মানবের জন্য একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি—কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' (৩৪ : ২৮)—তাঁর বংশ-পরিচয়ের গভীর মর্মমূলে বিশ্ব-ইতিহাসের সুগভীর রহস্যরসধারাকে তিনি এইভাবে সঞ্চার করে দিলেন।

যিনি সমস্ত মানবের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হবেন, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে প্রচলিত বহু ধর্মনায়ক ও ধর্মগ্রন্থ তাঁর আবির্ভাবের সুসংবাদ পরম ভক্তিভরে যুগ যুগ ধরে ঘোষণা করছিল। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ 'তৌরাৎ' বা তোরাতে মূসা (আঃ) [বা Moses] বলেছিলেন, 'তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের ভ্রাতাদের মধ্য থেকে আমার মতই একজন পয়গম্বরের উত্থান ঘটাবেন, তাঁর কথা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে।' (Duet 15 : 18)। মূসার মতই এই আর 'একজন পয়গম্বর' যে হজরত মুহম্মদ (সঃ) ছাড়া আর কেউ নন, ইহুদীধর্মের শ্রেষ্ঠ এবং সুঅভিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ তা স্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে নবী চরিত-বিশেষজ্ঞ ইবনে ইসহাক তাঁর সীরাত-ই-রসুলুল্লাহ নামক গ্রন্থে বলেন—মুহম্মদ (সঃ)-এর

কন্যা আমিনার সঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ্‌র বিবাহ দেন।' শেষ নবী—মুহাম্মদ তাহের। ১ম সংস্করণ। পৃ. ১১।

১০ শেষ নবী—মুহাম্মদ তাহের।

আবির্ভাবের এক হাজার বছর পূর্বে ইয়েমেন (ইমন) দেশের বাদশা তুব্বা-বিন-হাসান, একবার মক্কায় যান, মক্কা থেকে ফেরার পথে মদীনায় পদার্পণ করেন। কিন্তু মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় বাদশাহর সঙ্গী ৪০০ ইহুদী পণ্ডিত তাঁকে জানান যে তাঁরা বাদশাহর সঙ্গে মদীনা ত্যাগ করবেন না, কারণ মদীনাতেই শেষ নবী মুহম্মদ (সঃ) হিজরত করবেন—তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় তাঁরা সেখানেই পথ চেয়ে বসে থাকবেন। হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী নবী ঈসা (আঃ) বা যীশুখ্রীস্টও পবিত্র ইঞ্জিল (অর্থাৎ বাইবেল) গ্রন্থে বলেছিলেন, 'যদি তোমরা আমাকে ভালবাস, তবে আমার উপদেশ মত কাজ করো, আমি স্বর্গীয় পিতার কাছে প্রার্থনা করব যাতে তিনি তোমাদের আর একজন শান্তিদাতা প্রেরণ করেন—যিনি চিরদিন তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারবেন।'[১১] খ্রীস্টান সাধু বুহায়রা রাহিব মুহম্মদ (সঃ)-কে দেখেই সেই 'আর একজন শান্তিদাতা' বলে চিনতে পেরেছিলেন (খ্রী. ৫৮২)। ইহুদী, খ্রীস্টান এবং মুসলমানদের আদি ধর্মগুরু হজরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্র ইসমাইল (আঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে কা'বা-নির্মাণ সুসম্পূর্ণ করার পর (আ. খ্রী. পূ. ২১০০-২০৫০ অব্দ) এই 'আর একজন শান্তিদাতা'র জন্য করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লার কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের বংশধরগণের মধ্য থেকে······একজন রসূল প্রেরণ কর, যে তোমার বাণী সমূহ তাদের কাছে আবৃত্তি করবে, তাদের গ্রন্থ ও জ্ঞানশিক্ষা দান করবে এবং তাদের পবিত্র করবে।' (কোরআন)। সেই 'ইব্রাহীমী দুআ' এবং সেই সব ঐতিহাসিক প্রার্থনার ফলশ্রুতিস্বরূপ সেই 'আর একজন শান্তিদাতা' রূপে 'নূরে মুহাম্মদীর প্রকাশ' ঘটল—শান্তি ও করুণার মূর্ত প্রতীক 'রহ্‌মতুল্লিল আ'লামীন' মুহম্মদ (সঃ) আবির্ভূত হলেন।

জন্মের সপ্তম দিবসে (৪ঠা সেপ্টেম্বর, ৫৭০ খ্রী.) ইব্রাহীমী প্রথা অনুসারে তাঁর নামকরণ করা হল। চমকে উঠলেন সবাই! প্রচলিত প্রথা অনুসারে দেবদেবীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম না রেখে আব্দুল মুত্তালিব পৌত্রের নাম রাখলেন কিনা 'মুহম্মদ'—যার অর্থ 'প্রশংসিত'! স্মরণ করা যেতে পারে, সুদূর অতীতে আর্যদের অথর্ববেদেও ঘোষণা করা হয়েছিল, 'ইদঃ জনা উপশ্রুত নরাশংস-স্তবিষ্যতে'—"হে মানবমণ্ডলী, শ্রবণ কর, মানুষের মধ্য থেকেই 'প্রশংসিতজন' আবির্ভূত হবেন।" তবে কি ইনিই সেই প্রশংসিত জন? তাই আল্লাহ্‌তা'লার ইঙ্গিতে পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব প্রচলিত প্রথার ঊর্ধ্বে উঠে এঁর নাম রাখলেন মুহম্মদ? মা আমিনা নম্রকণ্ঠে বললেন, ওর নাম থাক না 'আহ্‌মদ' যার অর্থ 'প্রশংসাকারী'? এই আহ্‌মদ নামটিও পার্শীদের ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দাবেস্তা' ঘোষণা করেছে যুগ যুগ আগে—বলেছে, 'হে স্পিতাম জরথুস্ত্র, পবিত্র আহ্‌মদ নিশ্চয়ই আসবেন।'[১২] 'যখন পার্শীরা নিজেদের ধর্ম ভুলে গিয়ে নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হবে, তখন আরব দেশে তিনি আবির্ভূত হবেন।' 'কা'বা প্রতিমামুক্ত হবে। সেই মহাপুরুষের শিষ্যগণ বিশ্ববাসীর পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ হবেন।' (দসাতির)।[১৩]। মুহম্মদ ও আহ্‌মদ—প্রশংসিত ও প্রশংসাকারী—নাম দুটো তাই আকস্মিক নয়, ঐতিহাসিক এবং অর্থহীন শব্দমাত্র নয়, সুগভীর অর্থবহ ও সর্বজনীন। স্বয়ং

[১১] বিশ্বনবী—গোলাম মোস্তফা।

[১২] Zend-Avesta, Part I, Translated by Max Muller.

[১৩] Muhammad in World Scriptures—by A. Huq Vidyarthi.

আল্লাহ্ তা'লা যাঁকে 'রহমতুল্লিল আলামীন' বা 'সমগ্র পৃথিবীর জন্য মূর্তিমান করুণা' বলে প্রশংসা করেছেন তাঁর মত 'প্রশংসিত' আর কে? আর যে 'আহ্মদ' বহু ঈশ্বরবাদ-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীকে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করতে শিখিয়েছেন এবং নিজেও চরমভাবে প্রশংশা করেছেন, তাঁর মত 'প্রশংসাকারী' আহ্মদই বা আর কে?

জীবনচরিত: যিনি নিজের নন বিশ্বজনের—জন্মলাভের পরে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লাই যেন সেই শিশু মুহম্মদ (সঃ)কে মায়ের কোলে বন্দী না রেখে ধাত্রী-মায়ের কোলে মুক্ত করে দিলেন। জন্মের মাত্র পনেরো দিন পরে সা'দ বংশীয় ধাত্রী হালিমা তাঁকে লালনপালনের জন্য নিয়ে গেলেন। পিতৃহারা অনাথ শিশুকে নিয়ে তাঁর যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হবে না ভেবে হালিমা হয়তো প্রথম প্রথম একটু মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা হালিমাকে আশাতীত সৌভাগ্য দান করলেন। মূর্ত করুণা মুহম্মদ (সঃ) তাঁর ঘরে যাবার পর ঊষর মরুতে বর্ষণ নামল; তাঁর শস্যক্ষেত্র সরস ও সবুজ হল, বাড়ীর উট, দুম্বা আর মেষের পাল পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দুধ দিতে আরম্ভ করল। এইভাবে রহমতুল্লিল আ'লামীন জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই বিশ্বনিখিলের জন্য রহমত বা করুণারূপে মূর্ত হতে লাগলেন।

ক্রমে শিশু মুহম্মদের বয়স ৪ বছর হল। এখন কারো গলগ্রহ হয়ে থাকতে তাঁর আর মন চাইল না। তিনি দুধ ভাই আব্দুল্লার সাথে মেষ চরিয়ে নিজের হালাল রুজি নিজেই উপার্জন করে নিতে চাইলেন। শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ গোয়ের সাহেব বলেন, 'পয়গম্বরদের রীতি অনুসারে প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামও তাঁহার ব্যয়ভারের দায়িত্ব কাহারো উপর ন্যস্ত করেন নাই। তিনি মেষ চরাইয়াছেন।'[১৪] যিনি স্বাবলম্বন ও স্বাবলম্বী জগৎ গঠনের মূর্ত প্রতীক হবেন,—যিনি ভিখারীর হাতে কুঠার তুলে দিয়ে আত্মসম্মানপূর্ণ স্বাবলম্বনের শিক্ষা দান করবেন—তাঁর নিজের জীবনে নিতান্ত শৈশবে এইভাবে সেই স্বাবলম্বনের মহান আদর্শের সূত্রপাত হল।

তিনি পাহাড়ের ধারে ধারে মেষ চরান আর মাঝে মাঝে পাহাড়ের মাথায় উঠে দূর দিগন্তে আকাশ ও পৃথিবীর কোলাকুলির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। অনন্ত নীলাকাশ ওখানে কি কথা বলছে ঐ মাটির পৃথিবীর কানে? সেই গোপনকথা কি তিনি জানতে পারবেন না? আ'লেমুল-গায়েব আল্লাহ্ তাঁর সে ব্যাকুলতা লক্ষ্য করেই যেন তাঁর হৃদয়কে সেই গোপন কথার অবতরণ পাত্র হিসেবে উপযুক্ত করে' নিলেন। একদিন মেষ চরাবার সময় ফেরেশ্তাদের সাহায্যে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে জমজমের পানিতে তা উত্তমরূপে ধৌত করে পবিত্র করে দিলেন (খৃী. ৫৭৪)। ইতিহাসে এই ঘটনা 'ছিনাচাক' বা বক্ষোবিদারণ নামে পরিচিত।

এর পরেই হল তাঁর মাতৃবিয়োগ। জন্মের পর যিনি পিতৃস্নেহ এবং মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, ধাত্রীগৃহ থেকে মাতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই তিনি মাতৃহারা হলেন (খৃী. ৫৭৬)। আমিনা প্রিয় পতির স্মৃতি বিজড়িত শিশু মুহম্মদ (সঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় পতির কবর জিয়ারত করে ফেরার পথে 'আল-আবওয়া' নামক স্থানে পরলোক গমন করলেন

[১৪] শেষ নবী—মুহাম্মদ তাহের।

(খৃী. ৫৭৬)। মুহম্মদ (সঃ) মাতৃগর্ভেই পিতৃহারা হয়েছিলেন, এখন মাত্র ৬ বছর বয়সে মাতৃহারা হয়ে পরিপূর্ণ অনাথ হলেন। দু বছর পরে তাঁর পরম সান্ত্বনার স্থল পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবও পরলোক গমন করলেন (খৃী. ৫৭৮)। পরবর্তী জীবনে যিনি হবেন অনাথ-এতীমদের পরম নির্ভরস্থল, দীন-দুনিয়ার বাদশা হয়েও যিনি বলবেন, 'আমি এবং অনাথদের অভিভাবক পরলোকে একসঙ্গে থাকব যেমন আমার তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি প্রায় পরস্পরকে স্পর্শ করেছে' (বুখারী)—আঘাতের পর আঘাত দিয়ে পরম করুণাময় আল্লাহ্ বুঝি তাঁকে এইভাবে তার উপযুক্ত করে তুললেন।

চাচাজী আবুতালেব এবারে তাঁর এই অনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রের লালন-পালনের সর্ববিধ দায়িত্ব নিলেন। না-দেখা-পিতার স্মৃতি তাঁর রক্তে বসে' যেন বিশ্বের নশ্বরতা সম্পর্কে সত্যোপলব্ধির বাঁশি বাজাত, মা-আমিনার মধুর স্নেহচুম্বনের রেশ যেন তাঁর মনকে অকারণে আনমনা করে দিত। তিনি কারো সাথে তেমন মেলামেশা, খেলাধুলা কিছুই করতেন না। সব সময় আপন মনে একা-একা থাকতে ভালবাসতেন। বণিকেরা কাফেলা সাজিয়ে উত্তরে সিরিয়া এবং দক্ষিণে ইয়েমেনে বাণিজ্য করতে যেত। তা দেখে তাঁর বুকের ভেতরে বণিক-রক্ত ব্যাকুল হত। তিনি নিজের অজান্তে যেন বলে উঠতেন, 'যাবই আমি যাবই, ওগো বাণিজ্যেতে যাবই।' পিতৃব্য আবুতালেব তাঁর অনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রের এই মনের কথা বুঝতে পেরে ১২ বছরের কিশোর মুহম্মদ (সঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ায় বাণিজ্য যাত্রা করলেন (খৃী. ৫৮২)। 'যাত্রাপথে বসরায় বুহায়রা রাহিবের সঙ্গে দেখা।'[১৫] বুহায়রা রাহিব নেস্টোরীয় সম্প্রদায়ভূত একজন সুপণ্ডিত খৃীস্টান সাধু। তিনি একেশ্বরবাদী এবং তৎকালীন খৃীস্টানদের পৌত্তলিকতার ঘোরতর বিরোধী। তিনি কিশোর মুহম্মদ (সঃ)-কে দেখা মাত্রই বাইবেল-বর্ণিত এবং মুসা ও ঈসা কর্তৃক পূর্বঘোষিত শান্তির দূত ও সর্বশেষ পয়গম্বর বলে চিনতে পারলেন। উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে উঠলেন, এই তো সেই বিশ্বমানবের পথপ্রদর্শক। এই তো সেই যীশুর প্রতিশ্রুত শান্তিদাতা!' ঈশ্বর এঁকেই তো নিখিল বিশ্বের আশীর্বাদ স্বরূপ পাঠিয়েছেন!' কিশোর মুহম্মদের মধ্যে কি দেখেছিলেন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধু বুহায়রা যাতে তিনি অনায়াসে তাঁকে অনাগত দিনের রহমতুল্লিল আ'লামীন বা নিখিল বিশ্বের মূর্তিমান করুণা ও আশীর্বাদ রূপে চিনতে পারলেন? বুহায়রা আবুতালেবকে সব কথা জানিয়ে মুহম্মদ (সঃ) সম্পর্কে সাবধান হতে বললেন। কারণ সত্যপথিকের শত্রুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত। আবুতালেব সেই পরামর্শে সেবারকার মত বাণিজ্য-সফর সংক্ষিপ্ত করে ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

কিন্তু বাণিজ্যে যাবার জন্য মুহম্মদ (সঃ)-এর কিশোর মন আকুলি বিকুলি করে। কারণ ওযে একাধারে ভ্রমণ স্বাধীন জীবিকার্জন আর উপাসনার নামান্তর। অথচ সুযোগ মেলে না। ইতোমধ্যে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে হরব-ই-ফুজ্জার বা অন্যায় সমর। বাংলার কবিগানের মত এক কবিতার লড়াই-এ বিরোধী গোত্রের কুৎসাকাহিনী প্রচারকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধের সূত্রপাত। ক্রমে সারা দেশে শুরু হল পরস্পরের রক্তপানের পৈশাচিক উন্মত্ততা—ভাই হয়ে ভায়ের বুকে ছুরি হানার উন্মত্ত বর্বরতা! তা দেখে মানবপ্রেমিক মুহম্মদ (সঃ) শিউরে

উঠলেন। তাঁর তাজা তরুণ মন নির্যাতিত মানবতার এই নির্মমতম নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। তিনি সংঘবদ্ধভাবে এই হানাহানি প্রতিরোধ করার জন্যে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন। ঐ যুদ্ধের তীর-সংগ্রহকারী কনিষ্ঠ পিতৃব্য জুবায়েরের সাহায্য এবং সহযোগিতায় 'হলফুল ফজুল' অর্থাৎ 'কল্যাণের শপথ' নামে তিনি এক মহান সেবা-সংঘ গঠন করলেন (খৃী. ৫৯৫)। সংঘ-সদস্যরা মানব-সেবা ও মানবকল্যাণের মহান আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শপথ নিলেন যে—১) অন্যায় সমরের অর্থহীন অশান্তিকে তাঁরা দেশ থেকে নির্মূল করে দেবেন, ২) নিঃস্ব অসহায় ও দরিদ্রদের সেবা ও সাহায্য করবেন, ৩) অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতকে সাহায্য করবেন, এবং ৪) গোত্রে গোত্রে প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলাকে সুরক্ষিত করবেন। তরুণ মুহম্মদ (সঃ)-এর মানবকল্যাণের এ প্রাণবান্ কর্মকান্ড মানুষের মনে মনে প্রবল প্রেরণা সঞ্চার করল। তাঁর ব্যক্তিত্বের জাদুদণ্ড তাদের মনে তাঁর প্রতি প্রবলতর আকর্ষণ সৃষ্টি করতে লাগল। দেশবাসী তাঁকে নির্বিবাদে বিশ্বাস করতে লাগল। শেষে শুধু বিশ্বাস করেই ক্ষান্ত না হয়ে তারা তাঁকে চির-বিশ্বাসী বা 'আল-আমীন' উপাধিতে বিভূষিত করল। সেবার বন্যাবিপর্যস্ত কা'বাগৃহ সংস্কার সাধনের পর কা'বা শরীফের আদিমতম ভিত্তিপ্রস্তর নামে পরিচিত এবং আদম (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ)-এর পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত 'হাজরে-আসওয়াদ' বা 'কৃষ্ণপ্রস্তর' পুনঃসংস্থাপনের বিষয় নিয়ে গোত্রে গোত্রে আর একবার অন্যায় সমরের দাবানল জ্বলে ওঠার উপক্রম দেখা দিল। তখন তরুণ মুহম্মদ (সঃ) তাঁর এই সর্বজনস্বীকৃত বিশ্বস্ততা, চরিত্রের আকর্ষণীয়তা এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে দেশকে সে অভিশাপ থেকে মুক্ত করলেন (খৃী. ৫৯৫)। সকল গোত্রই সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রস্তর পুনঃসংস্থাপন করতে চাইছিল। সেই জন্যেই সংঘর্ষের উপক্রম। বুদ্ধিদীপ্ত মুহম্মদ (সঃ) একখানা চাদরের ওপর পাথরখানা স্থাপন করে সকল গোত্রের সর্দারদের চাদরের বিভিন্ন প্রান্ত ধরে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁর এই শানিত শুভ বুদ্ধির পরম সৌভাগ্য লাভ করে দেশ অনিবার্য সংঘর্ষ থেকে মুক্তিলাভ করল।

ঠিক এই সময় মুহম্মদ (সঃ)-এর দূর সম্পর্কের চাচাতো বোন বিধবা খাদিজার বিশাল ব্যবসায় অবিশ্বাসী কর্মচারীদের লুব্ধতার করালগ্রাসে বিলুপ্ত হতে বসেছিল। তাদের কাউকেই আর খাদিজা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। দেশবাসীর মনের বাইরেকার এই অন্যায় সমরের মত তাদের মনের মধ্যেও যেন নীতিহীন অবিশ্বাসের প্রলয়ঙ্করী অন্যায় সমর শুরু হয়েছিল। তাই তিনি বুদ্ধি ও বিশ্বাসের উজ্জ্বলতম প্রতীক আল-আমীন মুহম্মদ (সঃ)-কে তাঁর বাড়ীতে ডেকে এনে তাঁর ধ্বংসোন্মুখ ব্যবসায়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। জানালেন যে তাঁর মত একজন অসহায়া বিধবাকে যদি মানবদরদী মুহম্মদ (সঃ) সহায়তা না করেন তাহলে সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পাবার তাঁর আর উপায়ান্তর নেই। সে সময় খাদিজার একার বাণিজ্য-সম্ভার মক্কার সমবেত বণিকদের বাণিজ্যসম্ভারের সমপরিমাণ ছিল। অতএব খাদিজার সর্বনাশের পরিমাণ উপলব্ধি করে মানব-প্রেমিক মুহম্মদ (সঃ) সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। তিনি খাদিজার ব্যবসায়ের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। তারপর খাদিজার ভৃত্য মায়সারাকে সঙ্গে নিয়ে খাদিজার সেই বিপুল বাণিজ্যসম্ভার সহ শাম নামে সুপরিচিত সুদূর সিরিয়ায় বাণিজ্য যাত্রা করলেন। 'আল্লাহ্‌তা'লা পরোপকারীদের পছন্দ করেন'। ৩ (১৪৮) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্

পরোপকারীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।' ২১(১১৫)। তাই তিনি মুহম্মদ (সঃ)-এর সেই পরোপকারের প্রয়াসকে অধিকতর সাফল্য দ্বারা পুরস্কৃত করলেন। ব্যবসায়ে তাঁর বিপুল লাভ অর্জিত হল। হজরত মুহম্মদ (সঃ) আরো একধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন সিরিয়ার বাজারে এমন কিছু পণ্যসামগ্রী আছে যা মক্কার বাজারে রীতিমত দুর্মূল্য। মুহম্মদ (সঃ) সেই সব পণ্য সংগ্রহ করে গৃহমুখী উটের পিঠে সাজিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। তারপর মক্কার বাজারে তা বিক্রী করে দ্বিগুণ লাভের অধিকারী হলেন। কিন্তু এক যাত্রায় এই দুই বাণিজ্যের অর্জিত উপার্জন থেকে তিনি নিজে কিছু গ্রহণ করলেন না। একজন দায়িত্বশীল নিষ্ঠাবান কর্মচারীর মত তিনি বিবি খাদিজাকে তন্ন তন্ন করে সেই বাণিজ্যের সকল হিসেব বুঝিয়ে দিলেন। আশ্চর্য হলেন বিবি খাদিজা! নিজের বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও যোগ্যতা দ্বারা যে অর্থ মুহম্মদ উপার্জন করলেন তার সবটুকু তাঁরই হাতে তিনি অকাতরে তুলে দিয়ে গেলেন! সেই শাঠ্য আর ষড়যন্ত্রে ভরা জাহেলিয়াতের যুগে এ হেন দৃষ্টান্ত যে অকল্পনীয়! ভৃত্য মায়সারাও মুহম্মদ (সঃ)-এর সততা, বিশ্বস্ততা এবং কর্তব্যনিষ্ঠতার ভুরি ভুরি কাহিনী মুগ্ধ ভক্তের মত বর্ণনা করল। অবিশ্বাস আর 'অন্যায় সমরের' দাবদাহ ভরা দেশে মুহম্মদ (সঃ) সত্য সত্যই আল-আমীন, সত্য সত্যই জীবন্ত বিশ্বাসের মূর্তিমান প্রতীক। তাই বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে কত মানুষ তাঁর কাছে কত অমূল্য জিনিস গচ্ছিত রাখে। বিবি খাদিজা এখন তাঁর কাছে তাঁর ধন মান প্রাণ সব কিছু গচ্ছিত রাখতে চাইলেন। তরুণ মুহম্মদ (সঃ)-এর অসামান্য রূপ গুণ আর সাধুতায় তিনি তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু মুহম্মদ (সঃ) যদি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন? তাই তিনি তাঁর সহচরী নাফিসাকে সব কথা বুঝিয়ে বলে মুহম্মদ (সঃ)-এর মনের ভাব জানার জন্য প্রেরণ করলেন।[১৬] বিবি খাদিজা রূপে গুণে বংশমর্যাদায় এবং ধনসম্পদে সেকালের আরবে অতুলনীয়া মহিলা ছিলেন। ইতোপূর্বে তিনি আবুহালা নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহিতা হন এবং বিধবা হন। বৈধব্যের বেদনা কিন্তু তাঁর চরিত্রের পবিত্রতাকে দীপ্ততর করেছে! তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা এবং শুদ্ধাচারিতার জন্য তিনি সারা দেশে 'তাহেরা' অর্থাৎ শুদ্ধাচারিণী বা সতী নামে সুপরিচিত ছিলেন। মুহম্মদ (সঃ) তাই খাদিজার আত্মনিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করলেন না। পরবর্তীকালে নিখিল নারীত্বের মুক্তিদূত হিসেবে যিনি বিধবাবিবাহের এক প্রধান হোতা হবেন, বিধবা বলে খাদিজাকে বিবাহ করতে তাঁর মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা দুর্বলতা দেখা গেল না।[১৭] তিনি চাচাজী আবুতালেবের সম্মতি নিয়ে খাদিজাকে বিবাহ করলেন (খৃঃ. ৫৯৫)। বিবাহ-বাসরে উপস্থিতদের

[১৬] হাদীসে রসুল—অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরী।

[১৭] বিধবা বিবাহ সম্পর্কে আসল বাধাটা আইনের নয়, মনের। তাই এই ঘটনার ১২০০ বছর পরে আমাদের দেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের আইন পাশ করলেও ভারতীয় হিন্দু সমাজে আজো বিধবা বিবাহ অবহেলিত। আজো কোন বিধবাকে বিবাহ করতে সহৃদয় মার্জিতরুচি প্রগতিশীল ব্যক্তিরাও সঙ্কুচিত। কিন্তু হাজার বছরেরও অধিক কাল আগে মুহম্মদ (সঃ)-এর মনে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংকোচ বা দ্বিধা দেখা দেয় নি। এ ক্ষেত্রে তাঁর মানসিক প্রগতিশীলতার কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সত্যিই তিনি শুধু সেকালের নন, সর্বকালের অবহেলিতা বিধবাদের মুক্তিদূত।

মধ্যে হজরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের চাচা হজরত আবু তালেব, হজরত হামজা, হজরত আব্বাস এবং খাদিজা রাজিআল্লাহু আনহার চাচাত ভাই ওরাকা বিন নওফেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাত্রের পক্ষ থেকে হজরত আবুতালেব এবং পাত্রীর পক্ষ থেকে ওরাকা বিন-নওফেল বিবাহের খোৎবা পাঠ করলেন। আল-আমীন মুহম্মদের সঙ্গে তাহেরা খাদিজার এই মিলনে শুদ্ধাচারিতা বা পবিত্রতার সঙ্গে পরম বিশ্বাসের মিলন হল।

মুহম্মদ (সঃ) যখন খাদিজাকে বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স ২৫ বছর আর খাদিজার বয়স ৪০ বছর। পরস্পরের বয়সের এই অসামঞ্জস্য কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতা ও প্রেমের নিবিড়তায় নিতান্ত অর্থহীন ও গৌণ হয়ে দাঁড়াল। দীর্ঘ ২৫ বছর তাঁরা দাম্পত্যজীবন যাপন করেছিলেন। মুহম্মদ (সঃ)-এর পুত্রকন্যাদের সবাই এই খাদিজারই গর্ভে জন্মলাভ করেছিলেন। পৃথিবীতে বিধবাদের জীবনে যেকালে যন্ত্রণা ও দুঃখ ছাড়া অন্য কোন উল্লেখযোগ্য প্রাপ্য ছিল না, সেকালে মুহম্মদ (সঃ)-এর এই বিধবাবিবাহ এবং বয়োজ্যেষ্ঠা বিধবাকে নিয়ে এই পরম প্রেমপূর্ণ দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনযাপন ইতিহাসে অতুলনীয়।

বিবাহের পরে দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। 'হাজার হাজার লোক অন্নাভাবে মারা' যেতে লাগল। কেউ কারো পাশে এসে দাঁড়ায় না, কেউ কারো প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করেনা। এমন দুর্দিনে মানবপ্রেমিক মুহম্মদ (সঃ) খাদিজার বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেন। কিন্তু এই বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে চিরযৌবনের প্রতীক মুহম্মদ (সঃ) ভোগ-সুখে মগ্ন হলেন না। তিনি সংকীর্ণ সুখের খাঁচা পরিত্যাগ করে জাগ্রত যৌবনের মত মানব-সেবার মহান দুঃখকেই বরণ করে নিলেন। তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের মধ্যে তাঁর নবলব্ধ ধনসম্পদ অকাতরে বিতরণ করতে লাগলেন। দিন নেই রাত নেই মানুষ দলে দলে আসে আর প্লাবনের মত মুহম্মদ (সঃ)-এর করুণাসিন্ধু থেকে প্রয়োজন মত সংগ্রহ করে হাসিমুখে বিদায় নেয়। মানবপ্রেমিক মুহম্মদ (সঃ)-এর সে এক অপরিসীম মহিমময় পরিতৃপ্ত মূর্তি। বিবি খাদিজা শুধু মুগ্ধনেত্রে তাই দেখেন আর মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রতি তাঁর প্রেম এবং শ্রদ্ধাবোধ নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়। মানুষকে সেবা করার মধ্যে মানুষের যে এমন মহিমান্বিত সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে তা বোধহয় এত বেশী করে এর আগে 'কল্যাণের শপথ'-রচনাকারী মুহম্মদের (সঃ) মধ্যে খাদিজা প্রত্যক্ষ করেননি !

তখন পৃথিবীর বহুদেশের মত আরবেও ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। একালের ওলিম্পিকের মত সেকালের মক্কায় ওকাজের মেলা অনুষ্ঠিত হত। এই ওকাজ মেলা থেকে খাদিজা জায়েদ নামে এক দাস বালককে ক্রয় করেছিলেন। বিবাহের পর এই জায়েদকে খাদিজা স্বামী মুহম্মদের সেবার জন্য নিযুক্ত করলেন। কিন্তু মহাসাম্যের উদ্গাতা মুহম্মদ (সঃ) তো কাউকে দাস করে রাখার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন নি। যিনি বলবেন, প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের ভাই, প্রত্যেকেই এক অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্ট, যাঁর আদর্শে একদিন ক্রীতদাস বেলাল হবেন পৃথিবীর প্রথম মুয়াজ্জিন, জায়েদকে ক্রীতদাস করে রাখার কথা সেই মুহম্মদ (সঃ) কল্পনাও করতে পারলেন না। তিনি জায়েদকে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে পুত্রাধিক স্নেহে পালন করতে লাগলেন। সবাই জায়েদকে 'জায়েদ-বিন-মুহম্মদ' বা 'মুহম্মদের পুত্র জায়েদ' বলে সম্বোধন করতে লাগল। পুত্রহীন মুহম্মদের পুত্রস্নেহ যেন জায়েদকে কেন্দ্র করে পুলকিত ও পল্লবিত হতে লাগল। এমন সময় জায়েদের

পিতা হারিস এবং পিতৃব্য কা'ব এসে উপযুক্ত মুক্তিপণ দিয়ে জায়েদকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। মুক্তিপণের আগেই যে জায়েদকে তিনি মুক্ত করে দিয়েছেন তাকে তারা সেই মুহূর্তেই নিয়ে যেতে পারেন বলে মুহম্মদ (সঃ) সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু জায়েদ যেতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, 'হজরত, আপনিই আমার পিতা; আপনার সেবার সৌভাগ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।' ফলে হতাশ হারিস ও কা'ব ফিরে গেলেন। তখন মুহম্মদ (সঃ) জায়েদকে সঙ্গে নিয়ে কা'বাগৃহে সমবেত কোরেশ নেতৃবৃন্দের সামনে ঘোষণা করলেন, 'সকলে সাক্ষী থাকো, এই জায়েদ আমার পুত্র; সে আমার উত্তরাধিকারী, আমি তার উত্তরাধিকারী।' যেকালে ক্রীতদাসপ্রথা ছিল নারকীয় নৃশংসতার নামান্তর মাত্র, ক্রীতদাসের জীবন যৌবন সবকিছু ছিল খেয়ালীপ্রভুর খেলার সামগ্রী—ক্রীতদাস প্রথার সেই বিশ্বব্যাপী হৃদয়হীনতার কালে এক সামান্য ক্রীতদাসকে সেদিনের স্বনামধন্য মুহম্মদ (সঃ) এবং অনাগতদিনের বিশ্বনবী এই ভাবে পুত্ররূপে বরণ করার সাম্য ও মনুষ্যত্বের অমর মহিমা আর নিছক কথার কথা হয়ে না থেকে বাস্তব সত্যে রূপায়িত হল। সাম্য ও সহানুভূতির এমন প্রাণবন্ত পরশ পেলে কত সামান্য মানুষও যে কত অসামান্য যোগ্যতা ও কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারে পরবর্তী কালের এক দুর্ধর্ষ অভিযানের[১৮] Commander-in-chief বা প্রধানসেনাপতি হয়ে জায়েদ তার সত্যতাকে জীবন্ত করে তুলতে হয়েছিলেন।

যারা ভেবেছিল খাদিজার বিপুল ঐশ্বর্য মুহম্মদ (সঃ)কে ভোগসুখে মগ্ন করে ফেলবে, কালক্রমে মুহম্মদ (সঃ) বিলাস আর আলস্যে কাল যাপন করবেন, তারা মুহম্মদ (সঃ)-এর এই সর্বত্যাগী মানবকল্যাণময় মহিমান্বিত মূর্তি দেখে বিস্মিত হল। মুহম্মদ (সঃ)-এর কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কিসে মানুষের কল্যাণ হবে, কিভাবে মানুষের দুঃখজয়ের বাস্তবপথকে প্রশস্ততর করা যায় সেই চিন্তাতেই তিনি মশগুল রইলেন। ক্রমে তাঁর অন্তরের এই কল্যাণের ব্যাকুলতা গভীর থেকে গভীরতর হল। তিনি জানতে চাইলেন—এই দেশ জোড়া দুর্বিপাক আর অকল্যাণের প্লাবনের মধ্যে কে তাঁর মনে এমন কল্যাণের প্রেরণা সঞ্চার করে? কে সেই সর্বকল্যাণময় সর্বান্তর্যামী? তিনি কি ঐ সারি সারি সাজিয়ে-রাখা কাবা-মন্দিরের দেবমূর্তিগুলোর মধ্যে বিরাজ করেন? কে তিনি? কোথায় থাকেন তিনি? এই বিশ্বকে কে সৃষ্টি করেছেন? জন্ম কি? মৃত্যু কি? কে সকল কিছুর অধীশ্বর?[১৯] এমনি প্রশ্নের পর প্রশ্নের অসংখ্য মিছিল তাঁর মনের মধ্যে দল বেঁধে ছুটে চলে, কিন্তু উত্তর মেলেনা। সেই উত্তরের সন্ধানে তিনি হেরা পর্বতের নিভৃত গুহায় ধ্যানমগ্ন হন। হেরা-গুহা মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এই গুহার দৈর্ঘ্য চারগজ, প্রস্থ পৌনে দুগজ। সেখানে কয়েক-দিনের মত আহার্যদ্রব্য সঙ্গে নিয়ে গিয়ে প্রশ্নব্যাকুল মুহম্মদ (সঃ) ধ্যানে মগ্ন হন। আহার্য ফুরিয়ে গেলে আবার গৃহে ফেরেন। তাঁর দুঃখসুখের প্রিয়সঙ্গিনী খাদিজা নিজে হাতে তাঁর সাধনপথের সকল উপকরণ যুগিয়ে দেন। ৩৫ বছর বয়স থেকেই তাঁর এমনিভাবে ঘর-বার করে কাটতে থাকে। ক্রমে তিনি চল্লিশে পদার্পণ করলেন। ধ্যান-মগ্ন অবস্থার ভেতর দিয়ে ঊর্ধ্বজগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মধুরতর

---

১৮ মুতারযুদ্ধ

১৯ Carlyle : Vol. VI

ও নিকটতর হতে লাগল। 'আধ্যাত্মিক এবং অদৃশ্যলোকের রহস্যদ্বার' তাঁর কাছে ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। "স্বপ্নমধ্যে অদৃশ্য লোকের মধুর দৃশ্য' অনাবিল সৌন্দর্যে ঝলমল করে উঠল। তাঁর এসব স্বপ্ন ছিল স্বচ্ছ; ভোরের আলোর মত মধুর সুস্পষ্ট।' এসময় স্বপ্নের মত কে যেন তাঁকে শুনিয়ে যেতে লাগল, 'ইয়া মুহম্মদ, আনতা রসূলুল্লাহ্'—'হে মুহম্মদ, তুমিই আল্লাহ্‌র রসূল!' চোখের সামনে যেন সেই গুহা-অন্ধকার বিদীর্ণ করে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মহান আল্লাহ্‌র চিরপবিত্র নূরানী জ্যোতি। কানে শুনতে পান—ইয়া মুহম্মদ আনতা রসূলুল্লাহ্—'হে মুহম্মদ, তুমিই আল্লাহ্‌র রসূল।' মাঝে মাঝে যেন তার ঘোর কেটে যায়, আলো নিভে যায়—ধ্যানী মুহম্মদ (সঃ) সুদূর স্বপ্নলোকে পথ হারিয়ে ফেরেন। শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহাম্মদ তাহের সাহেব প্রায় অর্ধবর্ষব্যাপী এই যুগকে মুহম্মদ (সঃ)-এর জীবনের 'স্বপ্নযুগ' বলে বর্ণনা করেছেন। এ যুগ তাঁর 'নবুওতের অন্যতম অঙ্গ।'[১০]

মুহম্মদ (সঃ)-এর নবীত্বলাভের সময় এখন নিকটতর হতে লাগল। মার্মাডিউক পিকথল বলেছেন, 'নবীত্বলাভের পূর্বে হজরত ছিলেন হানিফিয়াপন্থী।' এই হানিফিয়া মতবাদ মূলত আরবদের জাতির জনক ইব্রাহীম (আঃ)-এর একেশ্বরবাদের নামান্তরমাত্র ছিল। ঠিক এই কারণেই মুহম্মদ (সঃ) সারাজীবন কখনো মূর্তি-পূজা করেননি। বরং এক বাৎসরিক উৎসবের দিনে তিনি এবং আব্দুল্লাহ্-বিন-জহ্‌শ্ প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তি পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব যেমন ইব্রাহীমের স্মৃতিবিজড়িত হারানো জমজমের কূপকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন, মদান্ধ আব্রাহার আক্রমণকে বিপর্যস্ত করে ইব্রাহীম কর্তৃক পুনর্নির্মিত কাবার মর্যাদাকে সুরক্ষিত করেছিলেন, মুহম্মদ (সঃ) ও তেমনি সেই জমজম ও কা'বার মহান সৃষ্টিকর্তা অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌তা'লার সত্যপরিচয়কে প্রত্যক্ষ করার জন্য হেরাপর্বতের নিভৃত গুহার মধ্যে বার বার স্বপ্ন দেখছিলেন।

সেই স্বপ্নমাখা চোখে মুহম্মদ (সঃ) নিয়মিত হেরাগুহায় যান—ধ্যানতন্ময় অন্তরে পরম সত্যের সন্ধান করেন। হেরাপর্বত আর সিনাই পর্বতের উচ্চ শিখরগুলো তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেয় না। ঊর্ধ্বে নীল কটাক্ষময়ী নক্ষত্ররাজি নীরব থাকে। তবু তিনি যান। হেরাপর্বতের নির্জন গুহায় বিনিদ্র দিনরজনী ধ্যানে অতিবাহিত করেন। নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তিনি? কোথায় তিনি? কি তাঁর পরিচয়? উত্তর আসি-আসি করে, কিন্তু আসে না। সেদিন ছিল রমজান মাসের ২৭ তারিখ। মহামহিম আল্লাহ্‌তা'লার পরম জ্যোতির প্রদীপ জেলে আকাশভরা তারারা সেই মহিমান্বিত রজনীতে ধ্যানমগ্ন মুহম্মদ (সঃ)-এর দিকে অপলকনেত্রে তাকিয়ে আছে। এমন সময় সহসা প্রকৃত সত্য তাঁর সামনে এসে উদ্ভাসিত হল। অন্ধকার গুহাখানা যেন অকস্মাৎ আলোর আলোয় পরিপ্লাবিত হল। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জিব্রাইল (আঃ) প্রত্যাদেশ বহন করে প্রকাশ্যভাবে মুহম্মদ (সঃ)-এর সামনে এসে দেখা দিলেন। বললেন, 'আপনি পড়ুন।' কিন্তু মুহম্মদ (সঃ) ছিলেন 'উম্মী' অর্থাৎ নিরক্ষর। তিনি বললেন, 'আমি তো কখনো পড়তে শিখিনি।' জিব্রাইল (আঃ) তখন তাঁকে এমন জোরে আলিঙ্গন করলেন যে তাঁর প্রাণ বের হয়ে যাবার উপক্রম হল। এই দুর্বিষহ যন্ত্রণাযুক্ত অবস্থায় তাঁকে আলিঙ্গনমুক্ত করে জিব্রাইল (আঃ) আবার বললেন, 'আপনি পড়ুন।'

---

১০ শেষ নবী—মুহাম্মদ তাহের

মুহম্মদ (সঃ) ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, 'আমি তো কোনদিন পড়তে শিখিনি।' তখন জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে দ্বিতীয়বার প্রবল বেগে আলিঙ্গন করলেন এবং আলিঙ্গনমুক্ত করে তৃতীয়বার বললেন, 'আপনি পড়ুন।' এবারেও মুহম্মদ (সঃ) পূর্বের মত উত্তর দিলেন, 'আমি তো কোনদিন পড়তে শিখিনি।' তখন জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে তৃতীয়বার সজোরে আলিঙ্গন করলেন। বার বার সেই স্বর্গীয় আলিঙ্গনে মুহম্মদ (সঃ)-এর হৃদয় বিদীর্ণ হবার উপক্রম হল। কিন্তু না, ছিনাচাক বা বক্ষোবিদারণের মাধ্যমে যে হৃদয়কে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর বাণী ও করুণা-অবতরণের পাত্র হিসেবে উপযুক্ত করে নিয়েছেন—তা বিপর্যস্ত হলনা। তখন জিব্রাঈল (আঃ) কাকলিমুখর ভোরের আলোর মত মধুর কণ্ঠে পাঠ করলেন, পবিত্র কোরআনের প্রথম বাণী—'আপনি পাঠ করুন, অপেনার সেই মহিমময় প্রভুর নামে, যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন—সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাঁধা রক্ত থেকে। আপনি পড়ুন, আপনার প্রভু যে অত্যন্ত দানশীল, যিনি কলম দ্বারা জ্ঞানশিক্ষা দান করেছেন—শিক্ষাদান করেছেন মানুষকে যা সে জানত না।' ৯৬ (১-৫)। মুহম্মদ (সঃ) সে বাণী মন্ত্রমুগ্ধের মত পাঠ করলেন।

দেশব্যাপী অকল্যাণের অন্ধকারের মধ্যে বসে মহাকল্যাণের যে মহান সাধক তপস্যা করছিলেন—করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লা আজ তাঁকে সিদ্ধি ও সার্থকতা দ্বারা গৌরবান্বিত করলেন। অন্ধকারের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় কাম্যধন তো আলো। সেই আলোর আর এক নাম জ্ঞান। আর জ্ঞানলাভের সাধারণ মাধ্যমই হল পাঠ। নিরক্ষর মুহম্মদ (সঃ)-এর ওপর সর্ব প্রথম এই পাঠ বা জ্ঞানার্জন করার ঐশ্বরিক আদেশ বিশ্ব-সংস্কৃতির ইতিহাসে তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কোরআন কথাটার মূলে আছে এই পাঠ করা বা 'একরা'। আর 'একরা' থেকেই কোরআন শরীফ অর্থাৎ 'মহান পাঠ্য গ্রন্থ'। মানুষের নবীর প্রতি মানুষের সৃষ্টিকর্তার পাঠের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের এই প্রথম আদেশের মর্মার্থ-পরিস্ফুটন-গ্রন্থটির নাম হল কোরআন শরীফ।

এদিকে অনাস্বাদিত পূর্ব সেই স্বর্গীয় আলিঙ্গনে মুহম্মদ (সঃ) তখনো থর থর করে কাঁপছেন। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে পত্নী খাদিজাকে গিয়ে বললেন, 'আমার গায়ে কম্বল দাও, আমার গায়ে কম্বল দাও।' খাদিজা তাঁকে কম্বল চাপা দিলেন। মুহম্মদ (সঃ) কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে, যে দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হতে চলেছে, বোধহয় আমার শরীরে তা কুলোবেনা, আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে, আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে।' বিবি খাদিজা মুহম্মদ (সঃ)-এর জীবনের পনেরোটি বর্ষাবসন্তের বহু সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার অংশ-ভাগিনী—অন্তরঙ্গতম জীবনসঙ্গিনী। তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'খোদার কসম, করুণাময় আল্লাহ্ কিছুতেই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি তো মানুষের কল্যাণের জন্য আপনার সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিনে দুঃস্থ জনগণের সাহায্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, চির-বিশ্বাসী আমানতদার হিসেবে দেশবাসীর কল্যাণ সাধন করছেন, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি কর্তব্য পালন করছেন, অতিথি অভ্যাগতদের সেবা করছেন, বেকারদের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন, অনাথ অক্ষম অন্ধ বিধবা খঞ্জদের বোঝা বহন করছেন। মনুষ্যত্বের মহিমাসূচক এতগুণ যাঁর চরিত্রে বিদ্যমান আল্লাহ্ কখনো তাঁকে নিষ্ফল হতে দেবেন না।' এই ভাবে সান্ত্বনা দিয়ে খাদিজা তাঁকে তাঁর চাচাত ভাই ওরাকা-বিন-নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন। চাচাতো ভাই ওরাকা তখন আরবের ধর্ম-

পরায়ণ পণ্ডিতরূপে সম্বর্ধিত।'[২১] তিনি ইব্রাহীম (আঃ) প্রচারিত হানিফিয়া ধর্মের সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে 'খ্রীস্টান ধর্মগ্রহণ করেন।'[২২] 'তিনি খ্রীস্টধর্মী; বৃদ্ধ এবং অন্ধ প্রায়; হিব্রু ভাষায় সুপণ্ডিত এবং স্বহস্তে ইঞ্জিল (অর্থাৎ বাইবেল) কপি করেন।' ওরাকা খাদিজার মুখে সব কথা শুনে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কুদ্দুসুন, কুদ্দুসুন (পবিত্র পবিত্র)! যাঁর হাতে ওরাকার জীবন তাঁর শপথ, হে খাদিজা, তুমি যদি আমাকে সত্য বলে থাকো, তবে এই তো সেই নামুস-ই-আকবর (জিব্রাঈল ফিরিশ্‌তা) যাঁকে আল্লাহ্‌তা'লা মুসা আলায়হেস্‌সালামের কাছে প্রেরণ করেছিলেন!' হায়রে কপাল, যদি সেদিন আমি যুবক থাকতাম, যেদিন আপনি আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করবেন! হায়রে কপাল, সেদিন যদি আমি জীবিত থাকতাম, যেদিন আপনার দেশবাসী আপনাকে দেশান্তরিত করে ছাড়বে!!' একথা শুনে মুহম্মদ (সঃ) চমকে উঠলেন। বললেন, 'কি! আমার দেশবাসী আমাকে দেশান্তরিত করবে?' ওরাকা বললেন, 'হাঁ হাঁ, যে সত্যধর্ম আপনি প্রচার করতে এসেছেন সেই রকম সত্যধর্ম যাঁরাই প্রচার করেছেন, দুনিয়ার মানুষ তাঁদের সাথে শত্রুতা না করে ছাড়েনি। আমি যদি ততদিন বেঁচে থাকি তবে প্রাণপণে আপনাকে সাহায্য করব।' কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছা ছিল ভিন্নরূপ! এই ঘটনার অল্পদিন পরেই ওরাকা পরলোকগমন করলেন।

'হেরা গুহার এই ঘটনার পর কিছুদিনের জন্য অহী আসা বন্ধ'[২৩] রইল। 'প্রায় ছয় মাস এই ভাবে' কেটে গেল।[২৪] ফলে মুহম্মদ (সঃ) উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হলেন। ভাবলেন, তবে কি তাঁর প্রভু তাঁকে পরিত্যাগ করলেন? তিনি কি এমন কিছু অপরাধ করেছেন যাতে করুণাময় আল্লাহ্‌ বিমুখ হলেন? এমনিতর অযুত চিন্তায় তাঁর মন অধৈর্য হয়ে পড়ল। সীরাৎ-ই-রসূলুল্লাহ্‌-রচয়িতা ইব্‌নে ইসহাক বলেন, এসময় নবী (সঃ) মাঝে মাঝে এতই অধৈর্য হয়ে পড়তেন যে হজরত জিব্রাঈল (আঃ) কেই এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে যেতে হত। যে প্রভুকে মুহম্মদ (সঃ) এখনো চোখে দেখেননি, কেবল তাঁর বাণী শুনেছেন, অহীর এই বিরতি লগ্নে সেই প্রাণপ্রিয় প্রভুর বিরহে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগল। তখন একদিন হজরত জিব্রাঈল (আঃ) মহান আল্লাহ্‌র বাণী বহন করে এনে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন:

'উষার শপথ এবং অন্ধকার রজনীর শপথ,
আপনার প্রভু আপনাকে পরিত্যাগ করেননি,
কিংবা অসন্তুষ্ট হননি;
নিশ্চয় আপনার ভবিষ্যৎ আপনার অতীত অপেক্ষা উজ্জ্বল।'

'আদ্‌দোহা' নামে পরিচিত উল্লিখিত সূরার শেষাংশে করুণাময় আল্লাহ্‌-তা'লা মহানবী মুহম্মদ (সঃ)-কে আদেশ করলেন, 'আপনার প্রভুর অনুগ্রহের কথা প্রচার করুন।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র আদেশ প্রচার করার জন্যে মনে

[২১] শেষ নবী—মুহাম্মদ তাহের। [এই হাদীস শরীফের ২য় খণ্ডের ১০৯ নম্বর হাদীসে ২০৫ পৃষ্ঠায় ওরাকাকে খাদিজার চাচা বলা হয়েছে। ওটা ছাপার ভুল। এ প্রসঙ্গে ঐ হাদীসটা দেখুন।]

[২২] হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম—কাজী আব্দুল ওদুদ।

[২৩] বুখারী শরীফ।

[২৪] বিশ্বনবী—গোলাম মোস্তফা।

মনে নিজেকে প্রস্তুত করে তুললেন। এমন সময় আবার আদেশ এল, 'হে আমার রসূল, আপনার প্রভু আপনাকে যে সত্য দান করেছেন তা প্রচার করুন, যদি না করেন তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না। আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন।' (সূরা মায়েদা, ৫ ঃ ৬৭)

এবার আর দ্বিধা নয়, দেরী নয়। স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁকে রসূল বলে সম্বোধন করেছেন, তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন। অতএব সদ্য-ঘুম-ভেঙে-জেগে-ওঠা ভোরের পৃথিবীর মত সত্যপথিক মুহম্মদ (সঃ) পরম সত্যের বাণী প্রচারে অবতীর্ণ হলেন। উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্' —আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়, আর মুহম্মদ (সঃ) তাঁর রসূল—তাঁর দূত। ভোরের তারার কোন দেবী নেই, চন্দ্রসূর্যের কোন দেবতা নেই। কাবাশরীফের ৩৬০টি দেবমূর্তির কারো মধ্যে কোন শক্তি বা ঈশ্বরত্ব নেই—সর্বশক্তির অধীশ্বর একমাত্র সর্বস্রষ্টা সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ্, তিনি সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু স্বর্গ-নরক সকল কিছুর অধীশ্বর। আর তিনি মুহম্মদ (সঃ) ঈশ্বর বা ঈশ্বর পুত্র নন, একজন মানুষ, সেই আল্লাহ্র দাস এবং বাণীবাহক পয়গম্বর মাত্র। সমস্ত মানুষ ভাই ভাই, সমস্ত মানুষ এক আল্লাহ্রই সৃষ্টি। অভিজাত-অনভিজাত, ছোট-বড় ধনী-নির্ধনে কোন ভেদ নেই। কাবাশরীফের সেবায়েৎ হতে গেলে কোরেশ হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে পুরোহিতকে ঘুষ দিতে হবে—এমন কোন আইন নেই। মানুষ আল্লাহ্তা'লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। একমাত্র আল্লাহ্কেই উপাসনার জন্য আল্লাহ্ তাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই যে দেবদেবীদের সে নিজে হাতে সৃষ্টি করে তাদের উপাসনা করা মনুষ্যত্বের পক্ষে অসম্মানকর। মানুষ মাত্রই সমান। সেই মানুষই আল্লাহ্তা'লার কাছে সর্বাধিক প্রিয় যে মানুষ মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করে। অসংখ্য দেবদেবী আর অশান্তিময় অসাম্য ও কুসংস্কারের জগতে এ ধর্ম অদ্বিতীয় আল্লাহ্তা'লায় আত্মসমর্পণ করে নিরঙ্কুশ শান্তির পথকে সুনিশ্চিত ও সুপ্রশস্ত করল বলে এধর্মের নাম হল ইসলাম ধর্ম। 'ইসলাম' শব্দের এক অর্থ 'আত্মসমর্পণ', আর এক অর্থ 'শান্তি'।

হজরতের যোগ্য জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদিজা পূর্বেই স্বামীর মধ্যে এক অলৌকিক সত্যের আভাস প্রত্যক্ষ করেছিলেন। স্বামীর নবীত্ব প্রাপ্তিকে ওরাকা-বিন-নওফেলের মত পণ্ডিতজন কর্তৃক স্বীকৃত হতে দেখেছিলেন। এমন একজন ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের পত্নী হবার গৌরবে তিনি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করেছিলেন। তাই নবজাত ইসলামের সেই নবীনতম নিমন্ত্রণকে তিনিই সর্বপ্রথম বরণ করে নিয়ে অকপটে ঘোষণা করলেন—লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্! সেদিনের পৃথিবীতে যে নারীর স্থান ছিল 'সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে'—সেই নারীই বিশ্বের প্রথম মুসলমান হিসেবে পরম সম্মানের আসন অধিকার করলেন। ইস্‌লামে নারী তাই নরকের কীট নয়, মাতা কন্যা বধূজায়ারূপে সে সমাজের পরম সম্মানের অধিকারিণী! মাতারূপী নারীর পায়ের তলায় বেহেশ্ত! ইস্‌লাম নামক বিশ্বব্যাপী এক মহাবিপ্লবের মহান অগ্রপথচারিণী এই নারীর প্রশংসা করে পরবর্তী কালে মহানবী মুহম্মদ (সঃ) তাই বলেছিলেন, 'এমরানের কন্যা (ঈসাজননী) মরিয়ম তাঁর যুগে সর্বোত্তম রমণী ছিলেন, আর এই যুগের সর্বোত্তম রমণী ছিলেন খাদিজা।' (বুখারী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা রাঃ)। বলেছিলেন, যখন তাঁর নবুয়ৎ প্রাপ্তিকে কেউ বিশ্বাস করেনি তখন খাদিজাই তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন, যখন তিনি বন্ধুহীন

হয়েছিলেন তখন খাদিজাই তাঁকে বন্ধুত্ব দান করেছিলেন, যখন তিনি অসহায় ছিলেন তখন খাদিজাই তাঁকে সহায়তা করেছিলেন।[২৫]

ইতোমধ্যে জিব্রাঈল (আঃ) এসে মুহম্মদ (সঃ)কে নামাজ পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে গিয়েছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনামন্ত্র 'সূরা ফাতিহা'ও তখন অবতীর্ণ হয়েছে। রাত্রি যখন গভীর হয়, সমগ্র নগরী যখন গভীর ঘুমে অচেতন, তখন মানুষের নবী সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করেন, 'সমস্ত প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহতা'লারই জন্য, যিনি অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু, যিনি বিচার দিনের প্রভু।' মরু আরবের আঁধার হাওয়ায় যে সুর সুরভিত জ্যোৎস্নার মত দিক্ দিগন্তে ভেসে যায়। তা চোখে পড়ে এক বালকের। বালকের নাম আলী, তিনি হজরতের পিতৃব্য আবুতালিবের পুত্র। তিনি মুহম্মদ ও খাদিজার সংসারেই থাকেন। আলীর বালক-মনে সে সুর গভীর ঝংকার তোলে। দশবছরের আলী অকপটে ইসলাম কবুল করেন। আলীর পর ইস্লাম কবুল করেন ক্রীতদাস জায়েদ; জায়েদের পর হজরতের বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বন্ধু এবং ধনী ব্যবসায়ী আবুবকর। মুহম্মদ (সঃ) প্রত্যাদেশ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা আবুবকরের কাছে ব্যক্ত করলেন ও কোরআনের যে অংশ সেই সময় পর্যন্ত তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল তা পড়ে শোনালেন, আর বল্লেন যে, এক আল্লাহ্র উপাসনা করা আর বিভিন্ন দেবতার পূজা পরিত্যাগ করার আদেশ তাঁকে দান করা হয়েছে, তখন বিন্দুমাত্র সংশয় প্রকাশ না করে আবুবকর (রাঃ) ইসলাম কবুল করলেন। আবুবকরের ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর সহযোগিতায় ক্রমে ক্রমে ওসমান (৩য় খলীফা) আব্দুর রহমান, তালহা, জোবায়ের, আব্বাস প্রমুখ আরো অনেকে ইসলাম কবুল করলেন। নবধর্মের এ নতুন নিমন্ত্রণ গ্রহণে নারীরাও পিছিয়ে রইলেন না। আবুবকর-কন্যা আসমা, ওমর-ভগিনী ফাতেমা প্রমুখ অনেকেই একে একে সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ইসলামের পবিত্র নিমন্ত্রণকে তাঁদের জীবনে বরণ করে নিতে লাগলেন। নর ও নারীতে মিলে যে মানুষের জীবন, নর-নারীর যুগল প্রীতি ও আত্মসমর্পণ লাভ করে সেই জীবনেরধর্ম ইস্লাম তার আবির্ভাব-সঙ্গেই বিপুল শক্তি ও সম্ভাবনার অধিকারী হল। ৬১০ থেকে ৬১৩ খৃীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনবছর এইভাবে গোপন প্রচারের ফলে মহানবী (সঃ)-এর শিষ্য-সংখ্যা চল্লিশে গিয়ে দাঁড়াল।

এ সময় আল্লাহ্তা'লা আদেশ দিলেন, 'তোমার নিকট-আত্মীয়দের সাবধান কর, আর যেসব বিশ্বাসী ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করে তাদের সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ কর।' আদেশ পেয়ে রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আত্মীয়স্বজনদের এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ করলেন, তারপর ভোজনশেষে তাঁদের সামনে অপেক্ষমান মহাবিপদ সম্পর্কে সাবধান করলেন। কিন্তু আবু লাহাবের প্রবল বিরোধিতার ফলে তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হল।

ব্যর্থতাই সার্থকতার পথকে সুপ্রশস্ত করে। তাই তিনি নিরস্ত হলেন না। তিনি একদিন সোজা গিয়ে উঠলেন বিবি হাজেরার স্মৃতি-সুরভি-ধন্য সেই সাফা পর্বতের শীর্ষ দেশে। বিপদকালে এই পর্বতশীর্ষ থেকে সংকেতধ্বনি করে দেশবাসীকে সাবধান করার প্রথা প্রচলিত ছিল। তাই তিনি যখন ঐ পর্বতশীর্ষ থেকে সংকেত ধ্বনি করলেন তখন দলে দলে মক্কাবাসী ভয়ঙ্কর কোন বিপদের আশঙ্কা করে সেই পর্বত-পাদমূলে এসে সমবেত হল। তিনি প্রত্যেক

[২৫] A Study of Islamic History.

গোত্রের মানুষদের সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি আমি বলি এই পর্বতের অন্তরালে একদল প্রবল শত্রু তোমাদের আক্রমণ করার জন্যে অপেক্ষা করছে, তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?' তখন সবাই সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।' কেন না মুহম্মদ (সঃ) যে তাদের কাছে আল-আমীন অর্থাৎ চিরবিশ্বাসী। সত্য ছাড়া তারা কখনো তাঁকে মিথ্যা বলতে শোনেনি। তখন মহানবী মুহম্মদ (সঃ) তাঁদের সম্বোধন করে বললেন, 'তোমাদের সামনে দারুণ বিপদ আসন্ন। শয়তানের সৈন্যবাহিনী তোমাদের সর্বনাশ সাধনের জন্যে অপেক্ষা করছে। তোমরা সাবধান হও। পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ কর। নিরাকার অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌তা'লার উপাসনায় অগ্রসর হও।' তাঁর কথা শুনে আবু-লাহাব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, 'জাহান্নামে যাও।' সঙ্গে সঙ্গে আবু-লাহাবের সাঙ্গপাঙ্গরাও হৈ হৈ করে উঠল। তারা মুহম্মদকে 'আল-আমীন'এর পরিবর্তে 'আল-মজনুন' অর্থাৎ উন্মাদ বলে খ্যাপাতে শুরু করল। তারা বলতে লাগল, মুহম্মদ যদি সত্য সত্যই রসুল হতেন তাহলে তাঁর সাথে নিশ্চয় কোন ফেরেশ্‌তা এসে তাঁর রসুলত্ব সম্পর্কে ঘোষণা করতেন। অথবা আমাদের চোখের সামনে তাঁর কাছে কোন স্বর্গীয় ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হত—তা না হয়ে তিনি আমাদেরই মত মানুষের বেশে খানা পিনা করেন, হাটে বাজারে চলেন—এ কেমন রসুল? পবিত্র কোরআন শরীফে স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা তার উত্তরে বললেন, 'হে নবী; এদের কথায় বিস্মিত ব্যথিত হবার কারণ নেই। এরা এরকমই বলবে। মানবিকতা ও নবুয়ৎ পরস্পর-বিরুদ্ধ নয়; বরং মানুষের জন্য মানুষ রসুল হবে—এটাই আল্লাহ্‌র নিয়ম। আপনার পূর্ববর্তী সকল নবী পানাহার করতেন। হাটে বাজারে যেতেন।' (সুরা ফোরকান)। এতে কোরেশদের ক্রোধবহ্নি দীপ্ততর হল। কিন্তু তাদের ঐ প্রদীপ্ত ক্রোধ-বহ্নিতে মহানবী মুহম্মদ (সঃ)-এর এ মহান নিমন্ত্রণ ভস্মীভূত হল না, বরং মক্কার ঘরে ঘরে পথে প্রান্তরে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুল সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত হল। ফলে এতদিন যে বাণী মুষ্টিমেয় শিষ্যদের মধ্যে গোপনে লালিত হচ্ছিল, প্রবলতর বিরোধিতার সংঘাতে তা প্লাবনের মত মক্কার ঘরে ঘরে বিচ্ছুরিত ও বিস্তারিত হল।

নবজাত ইস্‌লামকে হার মানাতে গিয়ে যখন সংস্কারান্ধ কোরেশদের নিজেদেরই এ ভাবে হার মানতে হল তখন তারা ক্রোধে একেবারে অন্ধ হয়ে গেল। তারা হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর ওপর নির্মম ভাবে নির্যাতন করার জন্য বদ্ধপরিকর হল। একদিন মুহম্মদ (সঃ) যখন কয়েকজন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে কা'বাগৃহে গিয়ে লা-শরীক আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করছিলেন তখন আবু-লাহাবের দল মার মার করতে করতে দলবেঁধে তাঁর ওপরে আক্রমণ করল। নবদীক্ষিত মুসলমানরা কিন্তু তাঁদের প্রাণের বিনিময়েও মুহম্মদ (সঃ)কে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। তাঁরা নিজেদের বুকে শত নির্যাতন সহ্য করেও তাদের প্রিয় নবীর পায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও লাগতে দিতে নারাজ। তাই তাঁরা ঘিরে দাঁড়ালেন তাঁদের প্রিয়তম মুহম্মদ (সঃ)কে। খাদিজার পূর্বস্বামীর ঔরসজাত পুত্র হারেস-বিন-আবুহালা তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। হারেস-বিন-আবুহালাই হলেন ইস্‌লামের ইতিহাসের প্রথম শহীদ।[২৬] হারেসের রক্তের স্বাদ-পাওয়া আবু-লাহাব আবু-জেহেলের দল মাতালের মত যে যেভাবে পারল মুহম্মদ (সঃ) আর তাঁর

---

[২৬] হাদীসে রসুল—অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরী।

অনুচরদের ওপর নির্যাতন শুরু করল। কা'বাগৃহে নামাজরত হলে তারা মুহম্মদ (সঃ)-এর গলায় ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করল। একদিন নামাজ পড়তে পড়তে যেই তিনি সিজদা-নত হয়েছেন অমনি তারা একটা মৃত গলিত উটের দুর্গন্ধময় বিশালকায় নাড়িভুঁড়ি তাঁর পিঠের ওপরে চাপিয়ে দিল। খবর পেয়ে কন্যা ফাতেমা ছুটে এসে অতি কষ্টে তাঁকে রক্ষা করলেন। এ নির্যাতনে কোরেশ-রমণীরাও পিছিয়ে রইল না। আবুজেহেলের স্ত্রী হিন্দা এবং আবুলাহাবের স্ত্রী উম্মুল জামিল তাঁর চলার পথে বিষাক্ত কাঁটা বিছিয়ে দিতে লাগল, আর চলার সময় তাঁর মস্তক লক্ষ্য করে নোংরা আবর্জনা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছোট ছোট পাথরনুড়ি ছুঁড়ে মারতে মারতে তাঁকে তাড়া করতে লাগল। তাঁর দেহ রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। তাঁর অনুচরদের (সাহাবীদের) কারো দেহে লৌহশলাকা দগ্ধ করে ছ্যাঁকা দেওয়া হল, কাউকে বা অগ্নিকুণ্ড রচনা করে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হল, কাউকে বা চাটাইয়ে মুড়ে নাকে ধোঁয়া দিয়ে প্রাণসংহারের চেষ্টা করা হল। বেলালকে নির্মমভাবে প্রহার করে ক্ষত বিক্ষত দেহে নুন মাখিয়ে তপ্তবালুকার ওপর শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপিয়ে রাখা হল। ইয়াসিরের দু পায়ের সঙ্গে দুটো উট বেঁধে দিয়ে দুই বিপরীত দিকে দ্রুত চালিত করে তাঁকে বীভৎস ভাবে হত্যা করা হল। দীনের নবী তবু কাঁটা-বেঁধা রক্তঝরা পায়ে শিষ্যদের নিয়ে দীনের পথে এগিয়ে চললেন। কেন না, চলা-নাচলা তো তাঁর ইচ্ছাধীন নয়, এ যে আল্লাহ্‌র আদেশ—আল্লাহ্‌ স্বয়ং যে তাঁর রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন। অতএব মাভৈঃ। অতএব নির্যাতন যত নির্মমতম হতে লাগল, নতুন উষার স্বর্ণদ্বার-পানে তাঁর যাত্রা তত দ্রুত ও দুর্নিবার হতে লাগল।

ঐতিহাসিক জোসেফ হেল (Joseph Hell) বলেছেন, 'মক্কার প্রধান প্রধান গোত্রের বিরুদ্ধতা মহানবীর ধর্মাদর্শ অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের আদর্শের বিরুদ্ধেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল', কথাটা অযথার্থ নয়। কারণ তিনি ছিলেন, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা (liberty, equality, fraternity) আর মুক্তবুদ্ধি ও সুস্থচিন্তার মহান উদগাতা। মুক্তবুদ্ধি ও সুস্থচিন্তার পরম শত্রু সেদিনের পুরোহিতেরা তাদের মাতব্বরী ও অর্থোপার্জনের পথ রুদ্ধ হবে ভেবে দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়েছিল ; প্রভু ও ক্রীতদাসে কোন পার্থক্য থাকবে না, সুতরাং ক্রীতদাসেরা প্রভুকন্যাকে বিবাহ করতে চাইবে ভেবে অভিজাত শেখেরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, ধনীদের অর্থে জাকাতের নামে দরিদ্ররা অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে ভেবে ক্রুদ্ধ ধনীরা ভয়ঙ্করী মূর্তিধারণ করেছিল। তাই ক্ষুন্নস্বার্থ পুরোহিত এবং ধনী অভিজাতরা তাদের কায়েমী স্বার্থকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশে আবু-জেহেল আবু-লাহাবদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুহম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসরণকারীদের বিরুদ্ধে মরিয়ার মত নির্যাতন চালাতে লাগল। ফলে ভাটা-পড়া অত্যাচারের গাঙে আবার প্রবলবেগে জোয়ার জাগল।

তখন মহানবী মুহম্মদ তাঁর একদল নির্যাতিত শিষ্যকে মাতৃভূমি মক্কা পরিত্যাগ করে আরবের দক্ষিণ পশ্চিমে লোহিত সাগরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত আবিসিনিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নেবার অনুমতি দিলেন। আবিসিনিয়া (বা হাবশা) মক্কাবাসীদের এক প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র, সেখানকার খৃস্টান রাজা নাজ্জাসী অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, বিপন্নের বন্ধু ও মহানুভব। তিনি নির্যাতনকারী কোরেশদূতদের অনুরোধ

অগ্রাহ্য করে বিপন্ন মুসলমানদের আশ্রয় দিয়ে (খৃী. ৬১৫। নবুয়ৎ প্রাপ্তির পঞ্চম বর্ষের সপ্তম মাসে) তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, কি সে এমন নতুন ধর্মাদর্শ যার জন্যে তাঁরা সর্বস্ব এমন কি তাঁদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হননি? উত্তরে আবুতালেবের পুত্র জাফর[২৭] বললেন—'মহারাজ, আমরা এক সভ্যতাবর্জিত জাতি ছিলাম—প্রতিমাপুজা করতাম, মৃতপশু ভক্ষণ করতাম, অনেক ঘৃণিত কাজ করতাম। স্বাভাবিক স্নেহবন্ধনের মর্যাদা রাখতাম না। অতিথিদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতাম, আর আমাদের সবলরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করত। এইভাবেই আমরা চলছিলাম, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে এক রসুল পাঠালেন যাঁর বংশমর্যাদা, সত্যপরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও সদয়তা সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ও আমরা এতদিন ধরে যে মূর্তিপূজা করে আসছিলাম তা বিসর্জন দিয়ে তিনি আল্লাহ্তা'লার একত্ব স্বীকার করতে ও তাঁর উপাসনা করতে আহ্বান জানালেন। তিনি আমাদের সত্যকথা বলতে, অঙ্গীকার পালন করতে, রক্তের বন্ধন ও সদয় অতিথিপরায়ণতা সম্পর্কে মনোযোগী হতে, আর অপরাধ ও রক্তপাত পরিহার করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি আমাদের অশালীন আচরণ না করতে, মিথ্যা কথা না বলতে, অনাথদের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস না করতে, আর সাধ্বী রমণীদের নামে কুৎসা রটনা না করতে নির্দেশ দিলেন। অদ্বিতীয় আল্লাহ্র উপাসনা করতে আর তাঁর কোন অংশীদার স্থাপন না করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। নামাজ, রোজা আর জাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর সে সৎ ও সত্যজীবনাদর্শ আমরা স্বীকার করেছি। ...এসব কারণে আমাদের স্বজাতির লোকেরা আমাদের আক্রমণ করেছে, আমাদের প্রতি কঠোর হয়েছে, আমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করেছে, আর অদ্বিতীয় আল্লাহ্র উপাসনার পরিবর্তে পুনরায় আমাদের মূর্তিপূজায় প্রবৃত্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। যে সব কুকর্ম আমরা পূর্বে করতাম আমাদের দিয়ে তা পুনরায় করাবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। সেইজন্য—যখন তারা আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেই চলল, আমাদের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ করে তুলল, আমাদের ধর্মাচরণে বাধা সৃষ্টি করল, আর আমরা তাদের সাথে পেরে উঠলাম না—তখন আমরা মাতৃভূমি ত্যাগ করে আপনার দেশে (হিজরত করে) চলে এলাম, অন্য কারো আশ্রয় অপেক্ষা আপনার আশ্রয় নেওয়া উত্তম মনে করলাম। আপনার আশ্রয়ে আমরা সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করছি, আর মহারাজ, আমরা আশা করি যে আপনার রাজত্বে আমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।' এসব শুনে নাজ্জাসী মুগ্ধ হলেন। জাফরের মুখে পবিত্র কোরআন শরীফের সুরা মরিয়মের আবৃত্তি শুনে ঝরঝর করে তার চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল; তাঁর পবিত্র দাড়ি ভিজে গেল। উপস্থিত খৃস্টান ধর্মযাজকেরাও অশ্রু মোচন করলেন। নাজ্জাসী সাশ্রু নয়নে বললেন, হজরত ঈসা (আঃ) যে রসুলের আগমনবার্তা পূর্বাহ্নে ঘোষণা করেছেন ইনিই তো দেখছি সেই রসুল। আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি তাঁরি যুগ লাভ করেছি।' এই বলে নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণ করলেন[২৮] এবং মক্কার কোরেশ-প্রতিনিধিদের সকল উপহার প্রত্যাখান করলেন। ইবনে ইসহাক বলেন, 'নাজ্জাসী হজরতের রসুলত্বে

---

[২৭] আবিসিনিয়ায় সফরকারী এই প্রথম দলে জাফর (রাঃ) ছাড়াও হজরত ওসমান (রাঃ) সমেত ১১ জন পুরুষ এবং ওসমানের স্ত্রী সমেত ৪ জন নারী ছিলেন।

[২৮] শেষ নবী—মুহাম্মদ তাহের।

বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হজরত তাঁর আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।' যাই হোক দুমাস আবিসিনিয়ায় কাটাবার পর হিজরতকারী ৯৫ জন মুসলিম নরনারী মক্কায় ফিরে এলেন। তখন নাজ্জাসীর কাছে কোরেশ-প্রতিনিধিদের ব্যর্থতার জ্বালা কোরেশদের মনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তারা আবার নির্যাতন করতে লাগল। ফলে মুসলমানেরা দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন। এই দ্বিতীয় দলে ১৮ জন মহিলা সমেত ১০০ জন মুসলমান দেশত্যাগ করলেন। ইতিহাসে এই সফর আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় সফর নামে খ্যাত।

এত তাড়ন-পীড়নেও যে মুহম্মদ (সঃ) কে কাবু করা গেল না, প্রলোভন দিয়ে তাঁকে করায়ত্ত করার জন্য কোরেশ-নেতৃবর্গ এবার তৎপর হল। তারা ওৎবা-বিন-রাবিয়াকে তাদের প্রতিনিধি করে মুহম্মদের (দঃ) কাছে দূত হিসেবে পাঠাল। ধনী এবং মানী ওৎবা তাদের যোগ্য প্রতিনিধি। সে গিয়ে মধুর কণ্ঠে মুহম্মদ (সঃ) কে বলল, 'ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি কি চাও বলত? অর্থ? বল, আমরা তোমাকে পর্বত-প্রমাণ অর্থ সম্পদ দান করব। রাজসম্মান চাও? তাও বলো, আমরা তোমাকে আরবের সিংহাসনে বসাব। আরবের সেরা সুন্দরীকে বিবাহ করতে চাও? বল, সে ব্যবস্থাও আমরা করব। শুধু তুমি তোমার এই প্রচার-কার্য পরিত্যাগ কর।' উত্তরে মুহম্মদ (সঃ) কেবল পবিত্র কোরআনের সূরা 'হা-মীম'-এর প্রথম আটটি বাক্য আবৃত্তি করলেন—যার শেষাংশে আছে—

(হে নবী!) বলুন, আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ—
শুধু পার্থক্য এই যে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ এসেছে।
আল্লাহ্‌তা'লাই তোমাদের একমাত্র উপাস্য।
অতএব তাঁরি পথ অবলম্বন কর
এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।
দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য, যারা জাকাত প্রদান করে না—এবং
ওরা পরকালে অবিশ্বাসী।
যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে,
তাদের জন্য আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। ৪১ (৬, ৮,)।

কথাগুলোর আবৃত্তি ওৎবা মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করল। মুহম্মদ (সঃ) তো নিজেকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরপুত্র বলে দাবী করেনি, তাদেরই মত একজন মানুষ বলে ঘোষণা করেছে। অথচ তাকে রাজসিংহাসনে বসাবার প্রস্তাবই তো সে নিয়ে এসেছিল! কি সে এমন মহাসত্য যা তাকে এত প্রবলতর প্রলোভনের মুখেও অটল রেখেছে? সেকি সিংহাসন ও সুন্দরী অপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয়? ওৎবা মন্ত্রমুগ্ধের মত চিন্তানতমুখে নীরবে সেখান থেকে চলে গেল। ওদিকে অত্যুৎসাহী কোরেশরা ওৎবাকে ফিরতে দেখে ঝাঁক বেঁধে তাকে ঘিরে ধরল। 'কি হল ওৎবা, জাদুকর মুহম্মদ প্রলোভনে বশ মেনেছে তো?' কিন্তু ওৎবা বলল, 'আমি এমন কথা শুনে এসেছি যা কোন জাদুকরে কখনো বলতে পারে না।' তখন কোরেশরা বলল, 'ওৎবাকেও মুহম্মদ জাদু করেছে।' এখন আর কাকে দিয়ে অন্য কি প্রলোভন মুহম্মদকে দেখালে তিনি ইসলাম প্রচার থেকে বিরত হবেন? মুহম্মদ (সঃ) বললেন, 'আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র এনে দিলেও আমি আমার সত্য-প্রচার থেকে বিরত হব না।'

এমনি ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা দ্বারা উত্তেজিত কোরেশরা নবী (সঃ)-এর ওপর

নির্যাতনের মাত্রাকে আবার বৃদ্ধি করল। নবুয়ৎ প্রাপ্তির ষষ্ঠ বর্ষে (খ্রী. ৬১৬) নবী (সঃ) একদিন সাফা পর্বতে বসেছিলেন। এমন সময় দুরাত্মা আবু-জেহেল সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে নোংরা ভাষায় গালাগালি করতে লাগল। ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্তিমান প্রতীক মুহম্মদ (সঃ) নীরবে তা সহ্য করলেন। এতে পাষণ্ড আবু-জেহেলের ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পেল। সে মুহম্মদ (সঃ)-এর মস্তক লক্ষ্য করে একটা পাথর ছুঁড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে মুহম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র মস্তক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। সাফা পর্বতের নিভৃত হৃদয়ে যেন সে রক্তের দাগ কান্নার মত করুণ হয়ে জেগে উঠল। একথা শুনে মুহম্মদ (সঃ)-এর চাচা মহাবীর হামজা ছুটে গিয়ে তীরের ফলার আঘাতে আবু-জেহেলের মস্তক ক্ষতবিক্ষত করে দিলেন। তারপর মুহম্মদ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'ভাইপো আমার, তুমি শুনে বোধহয় খুশী হবে যে আমি আবু জেহেলের কাছ থেকে তোমাকে আঘাত করার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি।' দীনের নবী মুহম্মদ বললেন, 'চাচাজান, প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করতেন, তাহলেই আমি সত্য সত্যই খুশী হতাম।' সচকিত হয়ে উঠলেন মহাবীর হামজা! কি এমন পেয়েছে মুহম্মদ, যাকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার কোন আকর্ষণকেই সে গ্রাহ্য করে না? স্বপ্নাবিষ্টের মত স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে হামজা ঘোষণা করলেন, 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্!' মহাবীর হামজা মুসলমান হয়ে গেলেন। তলোয়ারের জোরে নয়, মুহম্মদ (সঃ)-এর ধৈর্য, সহনশীলতা ও আদর্শের প্রতি একাগ্রনিষ্ঠার জাদুদণ্ড-বলে। 'আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন' ৩(১৪৬) 'ধৈর্য ধারণকারীদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে'—আল্লাহ্‌তা'লার এ প্রতিশ্রুতি যেন হাতে হাতে বাস্তবায়িত হল। নির্যাতিত মুহম্মদ (সঃ)-এর ধৈর্য ও ধর্মনিষ্ঠতা হামজার বীর হৃদয়কে জয় করে নিল।

হামজার ইসলাম গ্রহণের তিনদিন পরে হজরত ওমর (রাঃ)ও ইসলাম গ্রহণ করলেন। ওমর তৎকালীন আরবে যে-সে মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন কোরেশদের বৈদেশিক বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত, জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও বীর পুরুষ। তিনি যাচ্ছিলেন মুহম্মদ (সঃ)কে হত্যা করতে। কিন্তু তাঁর ভগিনী ফাতেমা এবং ভগিনীপতি সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেছে শুনে ক্রোধে অন্ধ হয়ে তিনি তাদের ওপরই আক্রমণ করলেন। সে আক্রমণে সহোদরা ফাতেমার সর্বাঙ্গ বেয়ে ঝর-ঝর করে রক্ত ঝরতে লাগল। তা দেখে ওমর কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর চৈতন্যোদয় হল। কি সে এমন সত্য যার জন্য তাঁর সহোদরা ফাতেমাও আজ তাঁর প্রাণ বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নন? তিনি ফাতেমার কাছ থেকে কোরআনের 'ত্বা-হা' (হে মানব!) শীর্ষক যে সূরাটি তাঁরা পাঠ করছিলেন তা চেয়ে নিয়ে পাঠ করলেন: 'আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুই আল্লাহ্‌র গুণগান করে। তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ।...তিনিই আদি তিনি অন্ত; তিনিই প্রকট, তিনিই গুপ্ত।...মানুষের অন্তরতলে কি আছে তাও তিনি জানেন। (অতএব হে মানুষ,) আল্লাহ্ এবং রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর।' (৫৭ : ১-৭) খানিকটা পাঠ করার পর ওমর মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি ইসলাম কবুল করার জন্য উদ্গ্রীব হলেন। তার পর সেই নগ্ন তরবারি হস্তে সাফা অঞ্চলে ভক্ত-পরিবেষ্টিত হজরতের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। গৃহের বাইরে কণ্ঠস্বর শুনে অনেক সাহাবী দরজার কাছে এগিয়ে এলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে তরবারি-হস্তে ওমরকে দণ্ডায়মান দেখতে পেয়ে ভয়ে তাঁর বুক শুকিয়ে গেল। তিনি

হজরত (সঃ) কে সেকথা বললেন। বীর হামজা বললেন, 'তাকে আসতে দাও, যদি সে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে এসে থাকে তবে তাকে আমরা স্বাগত জানাব, কিন্তু যদি সে মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে এসে থাকে তবে তার তরবারি দিয়েই তাকে হত্যা করব।' হজরত মুহম্মদ (সঃ) ওমরকে গুহায় প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ওমর অগ্রসর হতেই তিনি তাঁর কোমরবন্ধ ধরে সজোরে টান দিয়ে বললেন, 'তুমি কেন এসেছ খাত্তাবনন্দন (ওমর)?' ওমরের চোখে তখনো ভাসছে ভগিনী ফাতেমার সেই সত্যদীপ্ত ছবি আর সুরা ত্বা-হার সেই জ্যোতিস্নাত প্রাণমাতানো নিমন্ত্রণঃ '(অতএব হে মানুষ,) আল্লাহ্ ও রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর!' ওমর বললেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল, আমি আপনার কাছে এসেছি আল্লাহ্ আর তাঁর রসূলের ওপর এবং রসূল যা এনেছেন তার ওপরে বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন করতে।' তখন ভক্তরা সবাই বজ্রগর্জনে জয়ধ্বনি করলেন 'আল্লাহু আকবর' (আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ)। ইবনে ইসহাক বলেন, ইসলামের ইতিহাসে সেই হল প্রথম উচ্চকণ্ঠ আল্লাহু আকবর ধ্বনি!

ইসলাম ধর্ম তো আরবদের কাছে নতুন কোন ধর্ম নয়, এ ধর্ম যে আরবদের জাতির পিতা ইব্রাহীমেরই ধর্ম। মুসলিম নামটাও তো নতুন কোন নাম নয়, পবিত্র কোরআনের সুরা 'হজ্জ্ এর' ৭৮ সংখ্যক বাক্যে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'এ ধর্ম তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্ম। আল্লাহ্ পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে এবং এতে তোমাদের মুসলিম নামে অভিহিত করেছেন।' ওমর অশিক্ষিত ছিলেন না। তাঁর নির্যাতিতা ভগিনী ফাতেমার রক্ত-আলোকে তিনি যেন জাতির পিতা ইব্রাহীমের সত্য পরিচয়কে আজ চোখের সামনে জীবন্ত রূপে দেখতে পেলেন। লাৎ, মানাৎ, ওজ্জা আর হোবল কালো কালো ছায়ার মত এক মুহূর্তে যেন কোন অর্থহীন মিথ্যালোকে মিলিয়ে গেল। ফলে তিনি শুধু নিজে 'মুসলিম' হয়ে বসে রইলেন না, ইসলামের চরম শত্রু আবু জেহেলেরই কাছে ইসলাম গ্রহণের নিমন্ত্রণ নিয়ে গেলেন। আবুজেহেল তার পরম বন্ধু ওমরের মুখের ওপরেই সশব্দে দুয়ার বন্ধ করে দিল।

এখন আবু জেহেলের দল ওমর ও অন্যান্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রবলতর শত্রুতা শুরু করল। তারা মুসলমানদের (বনি হাশেমদের) বয়কট করল। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা লেনদেন সব কিছু বন্ধ করে তাঁদের একঘরে করল। যে কেউ সে বয়কট অমান্য করবে তাকেও একঘরে করা হবে বলে তারা একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে কা'বার দুয়ারে টাঙিয়ে দিল। ফলে আবুতালেব মুসলমানদের নিয়ে নিকটবর্তী এক পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। একে শীব-ই-আবুতালেব বা আবুতালেবের ঘাঁটি বলা হয়। এই সময় মুসলমানেরা 'অসহ্য অনশন, আবক্ষ পিপাসা, ক্ষুধার্ত শিশুদের কাতর ক্রন্দন এবং সর্বোপরি আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা' দেখেও 'কিছুতেই ধৈর্যহারা' হলেন না। ইসলামের প্রধান শিক্ষা অনুসারে নামাজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ধৈর্যধারণেও অবিচল রইলেন।

ক্রমে মক্কায় বসবাস করা মুহম্মদ (সঃ) এর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। তিনি পালিতপুত্র জায়েদকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার ৭০ মাইল দক্ষিণে তায়েফে গমন করলেন। তায়েফে তাঁর চাচা আব্বাসের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাছাড়া তাঁর মাতুল বংশীয়েরা-ও সেখানে বসবাস করতেন। কিন্তু মক্কার কোরেশদের ভয়ে তারা কেউ তাঁকে কোন সাহায্য করল না। ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যাপারে তায়েফবাসীরা কোরেশদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাছাড়া তায়েফ ছিল ধনী কোরেশদের

গ্রীষ্মনিবাস। সুতরাং তায়েফবাসীরা কোরেশদেরই মত প্রবলতর নির্যাতনে তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলল। তারাও তাঁর চলার সময় পাথর ছুঁড়ে মেরে মেরে সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্তের বন্যা বইয়ে তাঁকে সংজ্ঞাশূন্য করে ফেলল। রক্তের ধারায় তাঁর জুতো ভরে গেল। পা ফুলে গেল। দেখে জায়েদ আর্তনাদ করে উঠলেন। তবু রহমতুল্লিল আ'লামীন মুহম্মদ (সঃ) তাদের অভিশাপ দিলেন না, তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন না, বরং প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ্, অবিশ্বাসীরা আজ না বুঝে যে গুরুতর অপরাধ করছে তার জন্যে দয়া করে তুমি ওদের শাস্তি দিও না, ওদের ক্ষমা করো।' যে মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, 'বিপদে ধৈর্যধারণ করা উপাসনা বিশেষ' (নাসায়ী); বলেছেন, 'ধৈর্যশীল ব্যক্তিই ইহকাল ও পরকালের নেতা' (বুখারী); বলেছেন, 'যে তোমায় বঞ্চিত করে তুমি তাকে ক্ষমা করবে' (বয়হাকী)—কাজের মধ্য দিয়ে এইভাবে তিনি তাঁর কথা ও আদর্শকে বিশ্বজগতের সামনে জীবন্ত করে গেলেন।

তায়েফের পর মুহম্মদ (সঃ) আশ্রয়ের জন্য তৎকালে ইয়াথ্রেবের (বা ইয়াসরেব) নামে পরিচিত মদীনার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। মদীনায় ইব্রাহীম (আঃ)-প্রবর্তিত 'হানিফিয়া' মতাবলম্বীদের মধ্যে কিছু পরিমাণ একেশ্বরবাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। অতএব তাঁরা মুহম্মদ (সঃ)-এর পৌত্তলিকতাবিরোধী একেশ্বরবাদকে সমর্থন করতে পারেন এমন আশা করাটা অসঙ্গত ছিল না। ইয়াসরেবের খাজরাজ বংশীয় ছজন ইহুদী সেবার মক্কায় হজ্জ্ করতে এসে মুসলমানদের একেশ্বরবাদের কথা শুনে মুগ্ধ হলেন (খৃী. ৬২০)। তাঁরা তাদের ধর্মগ্রন্থ তৌরাতের মধ্যে শেষ নবী মুহম্মদ (সঃ)-এর আগমনের সংবাদ পেয়েছিলেন। তাঁরা সেবার দেশে ফিরে সে কথা প্রচার করলেন এবং পর বৎসর (খৃী. ৬২১) হজ্জের সময় মক্কার আল-আকাবা নামক স্থানে দশজন খাজরাজ বংশীয় এবং দুজন আউস [২৯] বংশীয় ইয়াসরেববাসী রসুল (সঃ)-এর হাতে হাত রেখে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ্' বলে ইসলাম কবুল করার শপথ নিলেন। এই শপথই ইসলামের ইতিহাসে আল-আকাবার প্রথম শপথ নামে সুপরিচিত। পর বৎসর (খৃী. ৬২২) অনুষ্ঠিত হল আল-আকাবার দ্বিতীয় শপথ। এইভাবে মাতৃভূমিতে নির্যাতিত নবী (সঃ)এর আশা তাঁর মাতার পিতৃভূমি ইয়াসরেবে পুষ্পিত হবার সুযোগ পেল।

আল-আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ ৬২১ খৃীষ্টাব্দে মুহম্মদ (সঃ)-এর জীবনে মে'রাজ বা আকাশ-ভ্রমণ নামক এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক K. Ali তাঁর A Study of Islamic History গ্রন্থে বলেন, আল-আকাবার প্রথম শপথের পর, 'The hopes of Muhammad (Sm) were now fixed upon Yathrib and he waited patiently for the call from the Yathribites. Just during this period the Miraj took place.' মাওলানা মুহাম্মদ তাহের সাহেব

২৯. ইবনে ইসহাক বলেন, মদীনার আউস ও খাজরাজ গোত্রদুটি ছিল মুহম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবের হাজার বছর পূর্বেকার ইয়েমেন-রাজ ইহুদী তুব্বার মদীনা-যাত্রায় সঙ্গী ৪০০ ইহুদী পণ্ডিতের বংশধর। ঐ পণ্ডিতেরা শেষ নবী মুহম্মদ (সঃ)-এর মদীনায় হিজরতের আশায় সেখানে যুগ যুগ ধরে বসে থাকতে চেয়েছিলেন।

তাঁর 'শেষ নবী' গ্রন্থে বলেছেন, 'যাঁহারা বলেন হিযরতের (খ্রী. ৬২২) নিকট-পূর্ব সময়ে তথা বছর দেড়-বছর পূর্বে মে'রাজ হইয়াছে, তাঁহাদের উক্তি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না; বরং অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ এবং সঠিক বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। মাস তারিখের ব্যাপারে যদিও মতভেদ আছে তবুও অধিকাংশের জোরালো মত এই যে রজব মাসের সাতাইশে তারিখে এই পুণ্য অভিযান ঘটিয়াছে।' ঐ দিন রাতে স্বর্গীয় দূত জিব্রাঈল (আঃ) আনীত 'বোরাক' নামক এক অতি দ্রুতগামী বাহনে চড়ে মুহম্মদ (সঃ) সপ্ত আকাশ পরিভ্রমণান্তে করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি "আল্লাহ্‌র এত কাছে যান এবং আল্লাহ্‌ তাঁহার প্রিয় নবীকে এত সান্নিধ্য দান করেন যে উভয়ের মধ্যে ধনুকের উভয় দিকের মধ্যেকার ব্যবধানের মত ব্যবধান রহিয়া যায়।...কুরআন বলে—'এই শুভ মুহূর্তে আল্লাহ্‌ তাঁহার প্রিয় নবীর সংগে কথা কহিয়াছেন'।"[৩০] এই নৈশ আকাশ-অভিযানের কাহিনী নবী (সঃ)-এর মুখে শোনার সঙ্গে সঙ্গে আবুবকর (রাঃ) বিন্দুমাত্র সংশয় প্রকাশ না করে বিশ্বাস করেছিলেন বলেই এই সময় থেকেই তাঁকে 'সিদ্দীক' বা সত্যসন্ধ উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। মে'রাজের বিচিত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ তাহের সাহেব বলেন, "সুরা বনী ইস্রাঈলের বর্ণিত আয়াত 'ওমা জাআলনা রুইয়াল্লাতি আরাইনাকা ইল্লা ফিৎনাতাল্লিন্নাস' মধ্যে উল্লিখিত 'রুয়ুয়া' এবং সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হযরত আয়েশা এবং আমীর মুয়াভিয়া রাযিআল্লাহু আনহুমার কোন কোন বর্ণনায় মে'রাজের ঘটনা স্বপ্ন, এবং এই অভিযান স্বাপ্নিক বলিয়া কেহ কেহ ধারণা করিলেও তাহাদের এই ধারণা দলিল-প্রমাণের ধোপে টেঁকে না।...হুযুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম কি আল্লাহ্‌কে দেখিয়াছেন?—অবশ্যই দেখিয়াছেন।'[৩১]

মক্কায় মে'রাজের মাধ্যমে এই সত্যসন্দর্শনের পর মদীনা বা ইয়াস্‌রেবে হিজরত (খ্রী. ৬২২) অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াস্‌রেব-রমণী আমিনাকে যেমন আব্দুল্লাহ্‌ বিবাহ করেছিলেন, তেমনি হজরতের প্রপিতামহ হাশিমও সুদূর অতীতে এক ইয়াস্‌রেব-রমণীকেই বিবাহ করেছিলেন। তাছাড়া এই ইয়াস্‌রেবেই ছিল হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসরণকারী পৌত্তলিকতাবিরোধী একেশ্বরবাদী হানিফিয়া পন্থীরা। এই ইয়াস্‌রেবেরই মানুষেরা আল-আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)এর প্রতি তাঁদের প্রগাঢ় ভক্তি নিবেদন করেছেন। পক্ষান্তরে তাঁর মাতৃভূমি মক্কানগরী তাঁকে গোয়েন্দাগীর মত বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর—তার অভিজাত আর পুরোহিতশ্রেণী তাঁর সর্বনাশ সাধনের জন্য সর্বদা সক্রিয়। মদীনায় আউস ও খাজরাজ গোত্রের মত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী গোত্রের সাহায্য পেয়ে ইতোমধ্যেই বহু নবীসহচর মদীনায় পাড়ি দিয়েছেন, এখন স্বয়ং মুহম্মদ (সঃ)-ও সেখানে চলে যেতে পারলে কোরেশদের সকল আশা নিষ্ফল হবে। তাই তারা কোসাই-প্রতিষ্ঠিত 'দারুন-

৩০. শেষ নবী—মুহাম্মদ তাহের।

৩১ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'শবে মে'রাজ' শীর্ষক অধ্যায়ে পরিবেশিত হাদীস-সমূহ পাঠ করার সময় পাঠক যেন শ্রদ্ধেয় মাওলানা তাহের সাহেবের উক্ত আলোচনার কথা মনে রাখেন—এই একান্ত অনুরোধ। এ প্রসঙ্গে কৌতূহলী পাঠক 'শেষ নবী' দেখুন।

নাদওয়া' বা 'পরামর্শকক্ষে' (Counsetl Hall) সমবেত হয়ে সকল গোত্রের পক্ষ থেকে মুহম্মদ (সঃ)কে সম্মিলিতভাবে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল; হত্যাব্যাপারে সকল গোত্র জড়িত থাকলে মুহম্মদ (সঃ)-এর বনি-হাশেম গোত্র আর 'রক্তপণ 'দাবী' করে তাদের বেকায়দায় ফেলতে পারবে না। এখবর জানতে পেরে মুহম্মদ (সঃ) ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁর প্রিয় শিষ্য আবুবকরকে সঙ্গে নিয়ে দেশত্যাগ করলেন। এই দেশত্যাগই ইতিহাসে হিজরত নামে খ্যাত এবং এই সময় থেকেই হিজরী সন গণনার সূত্রপাত হয়। ওদিকে কোরেশরা ঐ রাতেই মুহম্মদ (সঃ)কে হত্যা করার জন্যে পূর্বপরামর্শমত তাঁর বাড়ী ঘেরাও করল। কিন্তু সেখানে হজরতের কাছে জনগণের গচ্ছিত জিনিষ প্রত্যর্পণ করার জন্য প্রতীক্ষারত হজরত আলীকে ছাড়া তারা আর কাউকে দেখতে পেল না। তারপর আবুবকরের বাড়ীতে গিয়ে তারা আবুবকরেরও সন্ধান পেলনা। তখন তারা আবুবকরের যুবতী কন্যা আসমা এবং কিশোরী আয়েশাকে চপেটাঘাত করল। তারপর দলে দলে পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করল। তারা ঘোষণা করল জীবিত অথবা মৃত মুহম্মদ (সঃ) ও আবুবকরকে যে ধরে আনতে পারবে তাকে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে। উট হল আরবের অমূল্য সম্পদ!

রসুলুল্লাহ (সঃ) তখন শিষ্য আবুবকরকে সঙ্গে নিয়ে সওর গিরিগুহার নিভৃত অন্ধকারের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রুরা ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে তাঁদের দিকে। বিচলিত আবুবকর (রাঃ) বললেন, 'হজরত, এখন উপায়? শত্রুরা যে সংখ্যায় অনেক, আর আমরা তো মাত্র দুজন!' হজরত দৃঢ় অথচ শান্তস্বরে বললেন, 'ভুল করছ আবুবকর! আমরা মাত্র দুজন নই, আমাদের সঙ্গে আরো একজন আছেন।' আবুবকর লজ্জিত হলেন। সত্যইতো, আল্লাহ্ মানুষের সর্বসময়ের সঙ্গী। আল্লাহ্‌র আদেশ, 'অল্লাহ্‌র করুণা থেকে হতাশ হয়ো না'। চরম বিপদের মুহূর্তে আল্লাহ্‌র করুণার আশা সুদৃঢ়ভাবে অন্তরে পোষণ করার নামই তো সত্যকার ঈশ্বর-নির্ভরতা। এমন সময় সুরাকা নামক একজন দুর্বৃত্ত কোরেশ-অনুসন্ধানী তাঁদের গুহাদ্বারে এসে হাজির হল। কিন্তু হজরতের দিকে অগ্রসর হতে না হতেই তার অশ্বপদ বালুকা-প্রোথিত হল। যে নবীকে সে হত্যা করতে এসেছিল এখন আত্মরক্ষার জন্য তাঁরই কাছে করুণা-ভিক্ষা করল। শেষ পর্যন্ত তাঁরই করুণায় কোনমতে প্রাণ রক্ষা করে সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। তখন সওর গিরিগুহা থেকে বেরিয়ে হজরত ইয়াসরেবের (মদীনার) নিকটবর্তী কোবা নামক পল্লীতে উপস্থিত হলেন। 'সেদিন রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ সোমবার, নবুওতের ত্রয়োদশ বৎসর। (শেষনবী)। ইতোমধ্যে হজরত আলীও তাঁদের সাথে এসে এখানে মিলিত হয়েছেন। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) স্বয়ং জনমজুরের মত পরিশ্রম করে এখানে একটা মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। দিনশেষে অন্যান্য মুসলমানদের মত কাদামাটি মাখা মুহম্মদ (সঃ)কে যেন আর চেনাই যেতনা! জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ) যেমন পুত্র ইসমাইলকে নিয়ে কাবা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, মহানবী মুহম্মদ (সঃ) তেমনি তাঁর পরম প্রিয় অনুচরদের নিয়ে এই 'মসজিদ-আল-কোবা' নির্মাণ করলেন। এই মসজিদ নির্যাতিত সর্বহারা মুসলমানদের দ্বারা নির্মিত প্রথম উপাসনালয়। ১২ দিন ('মতান্তরে চোদ্দ দিন') কোবায় অবস্থানের পর রসুলুল্লাহ্ (সঃ) ও আবুবকর (রাঃ) আল্-কাসোয়া নামক উটের পিঠে চড়ে ইয়াসরেবে এসে উপস্থিত হলেন।

সেদিন ছিল শুক্রবার—মুসলমানদের ইতিহাস-খ্যাত উৎসবের দিন। আদি-

মানবের আবির্ভাব তথা সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের দিন। বাঁশী বাজিয়ে, নিশান উড়িয়ে, আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে ইয়াসরেব বাসীরা তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় নবী মুহম্মদ (সঃ)কে বরণ করে নিলেন। সবাই নিজ নিজ ঘরে তাঁদের এই যুগযুগান্তরের পরমাত্মীয় পরম পুরুষকে স্থান দেবার জন্য ব্যাকুল হলেন। মাতৃভূমিতে নিরাশ্রয় মহানবীকে আশ্রয় দানের জন্যে ইয়াসরেবের ঘরে ঘরে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। শেষে যে আবুআয়ুবের ঘরের সামনে নবী (সঃ)-এর উট আল্-কাসোয়া হাঁটু গেড়ে বসেছিল সেই আবুআয়ুবের ঘরে নবী (সঃ) আশ্রয় নিলেন।[৩২] আবু আয়ুবের গৃহসংলগ্ন যে জায়গায় আল্-কাসোয়া বসে পড়েছিল, সেখানে একসময় কিছু খেজুর বাগান ছিল, 'মুশরিকদের কিছু কবরও' ছিল। তখনো জায়গাটা যথেষ্ট উঁচুনীচু এবং অসমান। নবী (সঃ) সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে জায়গাটার দুজন এতীম মালিক বিনামূল্যে তা দান করে দিতে চাইল। কিন্তু নবী (সঃ) অনাথ এতীমের সম্পত্তি এমনভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। পবিত্র কোরআন বলছে, 'নিশ্চয় যারা অনাথদের সম্পত্তি অন্যায় ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।' ৪(১০)। এটা অন্যায় ভাবে গ্রাস করা নয়, তবুও যে-মুহম্মদ (সঃ) অনাথ হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অনাথদের হৃদয়-বেদনা তো তাঁর অজানা নয়! তাই দশ দিরহাম উপযুক্ত মূল্য দিয়ে তিনি জায়গাটা ক্রয় করলেন। তারপর জায়গাটার উঁচু নীচু মাটি সমান করে সেখানে নিজে হাতে মসজিদে নবভীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। নবী (সঃ) কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর প্রথমে হজরত আবুবকর (রাঃ) পরে হজরত ওমর (রাঃ) তারপর হজরত ওসমান (রাঃ) একে একে সেই ভিতে একটা একটা করে প্রস্তর স্থাপন করলেন। এইভাবে মসজিদে নবভীর ভিত্তিনির্মাণ-কর্মে নবীসহচরদের প্রস্তরস্থাপনের অগ্রাধিকারের মাধ্যমে যেন পরবর্তীকালের খলীফাদের নামের অগ্রাধিকার-তালিকাটিও আভাসিত হয়ে উঠল। ইতিহাসখ্যাত এই বর্গাকার মসজিদ দৈর্ঘ্য প্রস্থ উভয় দিকেই একশ হাত করে ছিল। মাটি থেকে তিন হাত উঁচু করে পাথর দিয়ে এর ভিত তৈরী। তার ওপর ইটের দেওয়াল। কাঁচা মাটির মেঝে, ওপরে ছাদের পরিবর্তে ছায়া করার জন্যে খেজুর পাতার আচ্ছাদন। বৃষ্টির পানিতে একসময় কাদা হতে থাকলে নবীসহচরেরা পাথর-নুড়ি এনে মেঝেটাকে ঢেকে দেন। 'বা-বু রহমত', 'বা-বুন্নবী' এবং পেছন দিকে আর একটা সহ এ মসজিদে মোট তিনটি দরজা। পরবর্তীকালে খলীফা আবুবকর (রাঃ) এ মসজিদের কিছু সংস্কার সাধন করেন। ওসমান (রাঃ) কারুকার্যখচিত পাথরের দেওয়াল এবং শাল সেগুণের তক্তা দিয়ে এর ছাদ নির্মাণ করেন। খলীফা আব্দুল আজীজ অর্থাৎ দ্বিতীয় ওমরের কালেও এর সবিশেষ সংস্কার সাধন করা হয়। হিজরী প্রথম অব্দ থেকে পরবর্তী যুগ যুগান্ত কাল ব্যাপী এ মসজিদ মুসলিমজগতের ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

৩২ 'সীরাৎ-ই-রসূলুল্লাহ্'-রচয়িতা ইবনে ইসহাক বলেন---নবী (সঃ)-এর আবির্ভাবের হাজার বছর আগে আবু আয়ুব আনসারীর এই গৃহ ইয়েমেনের বাদশা তুব্ব তাঁর সঙ্গী ৪০০ ইহুদী পণ্ডিতদের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর হিজরত-যাপনের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছিলেন। আবু আয়ুব আনসারী ছিলেন ঐ পণ্ডিতদেরই বংশধর। মদীনার আউস ও খাওয়াজ বংশও এই পণ্ডিতদেরই বংশ। (শেষনবী—মুহাম্মদ তাহের)।

ইয়াসুরেবের সর্বসম্প্রদায়ের মানুষ প্রবলতর আত্মকলহ এবং আন্তর্বিরোধের দাবানলের মধ্যে যখন নিজেদের অস্তিত্বকেও ভস্মীভূত হবার উপক্রম দেখেছিল ঠিক তখনই তারা নিখিল বিশ্বের মূর্তকরুণা রহমতুল্লিল আ'লামীন মুহম্মদ (সঃ)কে তাদের দেশে নিমন্ত্রণ করেছিল। তাঁর মদীনায় পদার্পণের দিন তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে থেকে থেকে মুসলমানেরা যখন হতাশ হয়ে ঘরে ফিরছিল তখন একজন ইহুদী হিজরতকারী-মুহম্মদ (সঃ)কে আসতে দেখেই আনন্দে চীৎকার করে বলে উঠেছিলেন, 'ঐযে তিনি আসছেন!' ইয়াসুরেবের ইহুদী খৃষ্টান মুসলমান নির্বিশেষে তাই সবাই তাঁকে তাদের নিজ নিজ ঘরে আশ্রয় দেবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। শেষে নবী (সঃ)কে তারা সবাই মিলে তাদের দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেছিল। শুধু তাই নয়, গোটা ইয়াসুরেব দেশটাকে তারা নবীর পায়ে নজরানা (বা উপহার) দিয়ে দেশের পুরনো নাম বদল করে নতুন নাম রেখেছিল 'নবীর নগর'—যার আরবী প্রতিশব্দ 'মদীনাতুন্নবী'। এই 'মদীনাতুন্নবী' কথাটাই সংক্ষেপে 'মদীনা' রূপে সুপরিচিত।

নবীর নগরের মহান রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয়ে নবী (সঃ) ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এখন সর্ব সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি তাঁর ঐতিহাসিক রাষ্ট্রনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনেও অগ্রসর হলেন। তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং দূরদর্শিতাসমৃদ্ধ পবিত্র প্রয়াসে এ সময় অভ্যন্তরীণ আত্মকলহে ক্ষতবিক্ষত মদীনার সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে এক আন্তর্জাতিক মহাসনদ (Charter) স্বাক্ষরিত হল। ঐ সনদই মদীনার শাসনতন্ত্র (Constitution of Madinah) নামে পরিচিত। ঐ সনদে বলা হল, ১) স্বাক্ষরকারী সমস্ত সম্প্রদায়কে নিয়ে একটা জাতি (Nation) গঠিত হবে, ২) স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায় কখনো কোন শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হলে অন্যসকল সম্প্রদায় সম্মিলিত ভাবে সে আক্রমণ প্রতিহত করবে, ৩) স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায় মক্কার কোরেশদের সঙ্গে মদীনার স্বার্থবিরোধী কোন প্রকার গোপন চুক্তি করবে না বা তাদের সাহায্য ও আশ্রয় দেবে না, ৪) সাধারণতন্ত্রী (Republic) মদীনার ইহুদী মুসলমান তথা সর্বসম্প্রদায়ের মানুষের স্বাধীন ধর্মাচরণে কেউ কোনপ্রকার বাধা দান বা হস্তক্ষেপ করতে পারবেনা; অমুসলমানদের কোন অপরাধ সম্প্রদায়গত অপরাধ হিসেবে গণ্য না করে সাধারণ অপরাধের মতই বিচার করা হবে, ৫) নির্যাতিতদের নিরাপত্তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, ৬) সারা মদীনায় হত্যা, রক্তপাত ও অত্যাচার হারাম (নিষিদ্ধ) বলে পরিগণিত হবে, ৭) সর্বোপরি পয়গম্বর মুহম্মদ (সঃ) এই সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হবেন এবং সর্ববিধ বিবাদ-মীমাংসা ও বিচারের চূড়ান্ত দায়িত্ব তাঁর ওপরেই ন্যস্ত থাকবে। ইসলাম তথা সারা বিশ্বের ইতিহাসে এই রাষ্ট্রীয় সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। ১) বিশ্বের রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে এই হল সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান, ২) এই সনদেই সর্বপ্রথম লিখিতভাবে স্বীকৃত হল যে রাষ্ট্র শাসনের ক্ষেত্রে জাতিধর্ম নির্বিশেষে জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় (অর্থাৎ will, not force, is the basis of state); ৩) স্বীকৃত হল 'তিনি (সঃ) শুধু তাঁর নিজের কালেরই নন, সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব'[৩৩] আর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ধর্মনায়ক হিসেবে যতখানি রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও তার চেয়ে কোন অংশে এই কম নয়।

[৩৩] উইলিয়াম মুয়র।

কিন্তু মদীনায় হজরত মুহম্মদ (সঃ) তো রাজসুখ ভোগ করতে আসেননি, তাহলে তো কোরেশদের কাছেই তিনি রাজা হয়ে থাকতে পারতেন, মাতৃভূমি মক্কাও ত্যাগ করতে হত না। তিনি এসেছেন অদ্বিতীয় আল্লাহ্র ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করতে। যে ধর্ম বলে, 'সকল মানুষ ভাই ভাই', বলে, 'সমগ্র মানবমণ্ডলী এক জাতি' ২ (২১৩)—সেই ধর্মের মহান উদ্গাতা হিসেবে তিনি সর্বাগ্রে ভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের বন্ধনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে মদীনার সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। পরস্পরের বোঝাপড়া ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের (Peaceful Co-existence এর) ভিতকে সুদৃঢ় করলেন। আল্লাহ্তা'লার আদেশে ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত রোজা বা উপবাসব্রত তিনি মুসলমানদের মধ্যে প্রবর্তন করলেন। সম্পূর্ণ রমজান মাস এই উপবাসের মাস হিসেবে নির্ধারিত হল। রমজানের উপবাস শেষে ঈদুল ফিৎর বা দানের উৎসব প্রবর্তিত হল। ইহুদী, খৃস্টান এবং মুসলমানদের আদি ধর্মগুরু জাতির পিতা হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসরণে কোরবানীর ঈদ এবং খাত্না বা লিঙ্গাগ্রচ্ছদাছেদন প্রথা মুসলমানদের মধ্যে প্রবর্তিত হল। বহুবিবাহ এবং ব্যভিচারজীর্ণ জরাগ্রস্ত সমাজে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণজীবন-নির্ভর নির্দেশাবলী প্রণীত হল। নামাজের জন্য সকলকে মসজিদে আহ্বান করার উদ্দেশ্যে আজান বা আহ্বান-প্রথা প্রবর্তিত হল। জেরুজালেমের বয়তুল মোকাদ্দসের পরিবর্তে হজরত উপাসনালয় কাবাশরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে বা কাবাকে 'কেবলা' করে নামাজ পড়ার নির্দেশ প্রদত্ত হল। হিজরতের ষোলো সতেরো মাস পরে শাবান মাসের এক জোহরের সময় মসজিদে নবভীতে এই কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এল। (শেষ নবী)।

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারীদের 'মুহাজের' এবং মদীনায় তাঁদের আশ্রয়দানকারী অউস খাজরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন গোত্রের মানুষদের 'আনসার'—এই দুই সাধারণ আখ্যায় বিভূষিত করে তিনি মুসলমানদের মধ্যেকার সম্ভাব্য আন্তঃগোত্র-কলহের মূলোৎপাটন করলেন। ঘোষণা করলেন, 'সকল মুসলমান ভাই ভাই।' অতএব আনসার মুহাজের ভাই ভাই। তাই আনসার ও মুহাজেরদের মধ্যে 'আকদুল-মুয়াখাৎ' বা 'ভ্রাতৃত্বের বন্ধন' নামক একটা অনুষ্ঠান করে পরস্পরের মধ্যে প্রেমের বন্ধনকে সুদৃঢ় করলেন। ফলে মদীনার কপট ও অকল্যাণকামীরা দেশী-বিদেশীর ধুয়া তুলে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব (Islamic brotherhood) বা 'ইক্রামুল মুস্লেমিন'-এর শক্ত ভিতে চিড় ধরাতে পারলনা। বরং এই মহান আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা তাদের জীবনের সকল সম্পদ ভাই-ভাই-এর মত ভাগ করে ভোগ করতে লাগল। দেখতে দেখতে সেই বিবাদ-প্রিয় মদীনাবাসীদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সম্পাদনের যেন এক মহোৎসব শুরু হল। বিশ্ব-ইতিহাসে রেনেসাঁর আগমনের বহুপূর্বে মদীনায় সে যেন এক অভিনব নবজাগরণ।

মাতৃভূমি মক্কা থেকে বিতাড়িত মুহম্মদ (সঃ) মদীনায় গিয়ে বাদশা হয়েছেন, তাঁর পৌত্তলিকতা-বিরোধী একেশ্বরবাদকে সম্পূর্ণ নিঃবাধে প্রচার, প্রসার এবং সংহত করছেন— দেখে ঈর্ষা ও আভিজাত্যের দম্ভে অন্ধ কোরেশরা তাঁকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য এবার যুদ্ধ করতে বদ্ধ পরিকর হল। ফলে মুসলমানদের সঙ্গে অমুসলমানদের যুদ্ধ অনিবার্য হল। সুতরাং ধর্মীয় বাস্তবতাত এসব যুদ্ধ রাষ্ট্রনীতিক যুদ্ধ নয়, পররাজ্য লোলুপ সাম্রাজ্যবাদের লালসাতুর সংঘর্ষ নয়, এসব যুদ্ধ

নির্যাতিত একদল ধর্মপ্রাণ মানুষের আত্মরক্ষা ও ধর্মরক্ষার জন্য জীবনপণ-যুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধ। ইসলামের শান্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হবার অপরাধে এ যুদ্ধ মুসলমানদের ওপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এসব যুদ্ধ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌বাদের বিরুদ্ধে সেদিনের অহংকারমত্ত বহু ঈশ্বর বা পৌত্তলিকতাবাদের যুদ্ধ—ঐক্য ও সংহতির বিরুদ্ধে অনৈক্য ও উচ্ছৃংখলতার যুদ্ধ। আল্লাহ্‌ এক, তাই তিনি পরম ঐক্যের প্রতীক—আর মুহম্মদ (সঃ) তাঁর দূত, তাই তিনি সেই ঐক্যের উদগাতা। মানব জীবনে ঐক্য ছাড়া কোন বড় কাজ হয় না—যুদ্ধজগতেও ঐক্য ছাড়া কোন বড় জয় ঘটে না। অতএব আল্লাহ্‌কে অনুসরণ কর আর আল্লাহ্‌র রসূলকে অনুসরণ কর—'আতিউল্লাহা অ আতিউর্‌রসূল'। ইসলামের সকলযুদ্ধ, সকল সন্ধি এই মহাসত্যের মহান দীপ্তিতে ভাস্বর। যখন মুসলমানেরা আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রসূলের ওপর অখণ্ড বিশ্বাস নিয়ে পরম নির্ভরতায় অটুট ঐক্য সহকারে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে, তখনই শত্রুসৈন্য অপেক্ষা সংখ্যায় অতি নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা জয়-লাভ করেছে। বদর যুদ্ধ এর জ্বলন্ত উদাহরণ। আবার যখনই তারা এই আদর্শের প্রতি সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করেছে, তখনই তাদের ঐক্য-চেতনায় চিড় ধরেছে, তখনই তারা সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধ এর নির্দয়তর দৃষ্টান্ত। হুদায়বিয়ার সন্ধি আপাতদৃষ্টিতে অসম্মানজনক মনে হলেও—এবং এই সন্ধিকে মর্মান্তিক অপমান মনে করে নবীসহচররা কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়লেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা রসূলের অনুসরণ করেছেন—তাই সেই আপাত-অসম্মানজনক সন্ধিও আল্লাহ্‌তা'লার করুণায় মুসলমানদের জন্য 'ফত্‌হে মুবিন' বা 'মহাবিজয়' রূপে ভাস্বর হয়েছে। বদর, ওহুদ, খন্দক, হুদায় বিয়া সকল কিছুই দোল খেয়েছে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্‌'—এই মহামন্ত্রের মহানতর আনন্দ-দোলায়!

বদর যুদ্ধ (হি. ২/খৃ. ৬২৪) ঃ মদীনার সনদ স্বাক্ষরিত হবার পর বিতাড়িত মুহম্মদ (সঃ)এর এই বিপুল প্রতিপত্তি ও সাফল্য দেখে যখন কোরেশরা ঈর্ষানলে জ্বলে যেতে লাগল এবং মুহম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুচরদের শাস্তিবিধান করার জন্য বদ্ধপরিকর হল, তখন মদীনার অভ্যন্তরে আব্দুল্লাহ্‌-বিন-উবাই নামক এক উচ্চাভিলাষী মোনাফেক (কপট) কোরেশদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। মদীনার অভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগে আব্দুল্লাহ্‌ নিজেই মদীনার রাজা হবার স্বপ্ন দেখছিল, কিন্তু কোথা থেকে মুহম্মদ (সঃ) উড়ে এসে জুড়ে বসে তার বাড়া ভাতে ছাই দিলেন। এতে তার বুকের মধ্যে ঈর্ষানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হল। তারই মত আর একদল ইসলাম-গ্রহণকারী কপট ব্যক্তি মোনাফেক-আব্দুল্লাহ্‌র সাথে যোগদান করে কোরেশদের মদীনা-আক্রমণ করতে প্ররোচিত করতে লাগল। তখন কোরেশ-নেতা আবু সুফিয়ান ৭০জন সঙ্গী নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের উদ্দেশ্যে অর্থোপার্জনের আশায় সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে গেলেন। কোরেশদের আবালবৃদ্ধবনিতা এই বাণিজ্যে মূলধন নিয়োগ করল। তারা প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করল যে এই বাণিজ্যে অর্জিত সকল সম্পদ মুহম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসরণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাজে ব্যয় করা হবে। সে ঘোষণা শুনে কোরেশদের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষের বিপুল সাড়া পড়ে গেল। তাদের আর তর সইল না। তারা আব্দুল্লাহ্‌-বিন-ওবাই এবং আর আর মোনাফেকদের সহায়তায় যুদ্ধের আগেই যুদ্ধ মহড়া শুরু করে দিল। তারা মদীনার মুসলমানদের শস্যহানি এবং পশুহরণ করতে লাগল। কুবায়জা-বিন-জাব নামক জনৈক কোরেশ মদীনার চারণ ক্ষেত্র থেকে

মুসলমানদের বহু উট চুরি করে নিয়ে গেল। রাষ্ট্রনায়ক মুহম্মদ (সঃ) নীরব দর্শকের মত এসব শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে রাজী হলেন না। তিনি এই সব নাশকতামূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধকল্পে মদীনা-সীমান্তে আব্দুল্লাহ-বিন-জাহ্‌শ-এর নেতৃত্বে ৯জন সৈন্যের একটা ছোট দলকে পাহারা দেবার জন্য প্রেরণ করলেন। জাহশ 'নাখ্‌লাহ্‌' নামক স্থানে কোরেশ দুর্বৃত্তদের নায়ক হাজরামিকে হত্যা করলেন। তখন হাজরামি-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোরেশরা মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য ক্রোধে গর্জন করতে লাগল। আবু সুফিয়ানও সিরিয়া থেকে যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে ঠিক এই সময় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন। সংবাদ পেয়ে সুনিপুণ সমর-নায়কের মত মহানবী মুহম্মদ (সঃ) তাঁকে পথিমধ্যেই বাধাদান করার জন্যে প্রস্তুত হলেন। কোরেশরা আবুসুফিয়ান-প্রেরিত জমজম নামক এক দূতের মুখে সে খবর পেয়ে এক হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য, একশত যুদ্ধাশ্ব আর শত শত উট নিয়ে মদীনা থেকে ৩০ মাইল এবং মক্কা থেকে ১২০ মাইল দূরে 'বদর' নামক প্রান্তরে এসে হাজির হলেন। বদর নামক একটা কূপের সঙ্গে সংলগ্ন বলেই প্রান্তরটির নাম বদর-প্রান্তর। মুহম্মদ (সঃ) রাষ্ট্রপতি হয়েছেন কিন্তু যুদ্ধ তো তিনি কখনো করেননি, এমন কি মার খেয়ে পাল্টা মার দেওয়া তো দূরের কথা এতদিন ধরে সে মার কেবল নীরবেই হজম করেছেন। তাই কোরেশদের ঐ বাণিজ্যবাহিনীকে আক্রমণ করে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধায়োজনকে ব্যর্থ করে দেওয়া ছাড়া তাঁর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু সে বাণিজ্যবাহিনী তখন সমুদ্রোপকূল দিয়ে ঘুর-পথে মক্কায় প্রায় পৌঁছে গেল—আর কোরেশ-বাহিনী বদর প্রান্তরে এসে তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষমান। এ অবস্থায় যুদ্ধ না-করাটা মুসলমানদের পক্ষে সবদিক দিয়ে ভয়ংকর ক্ষতিকর। তাই মহাশক্তিমান আল্লাহ্‌তা'লার বিপুল শক্তির ওপরে নির্ভর করে মাত্র ৭০টি উট আর ২টি যুদ্ধাশ্ব সহ ৩১৩ জন সময়-শিক্ষা-শূন্য সাধারণ মুসলমান দ্বারা গঠিত অতি ক্ষুদ্র মুসলমান বাহিনী নিয়ে মুহম্মদ (সঃ) বদর প্রান্তরে এসে হাজির হলেন। প্রান্তরের তিন দিকে ছোট ছোট পাহাড়। পূর্বদিকে অবস্থিত পাহাড় থেকে একটা ক্ষীণ ঝরনাধারা নেমে এসে প্রান্তরের ওপর দিয়ে ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছে। মরুভূমিতে পানি এমনিতেই অতি মূল্যবান, আর যুদ্ধকালে তো তা অমূল্য ! তাই অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তিনি (সঃ) সেই ঝরনার উৎসমুখ অধিকার করে ঘাঁটি গাড়লেন। তার পর সারারাত নামাজ ও প্রার্থনার মধ্যে অতিবাহিত করলেন। ৬২৪ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মার্চ (হি. ২, ৭ই রমজান, শুক্রবার) ভোরে বেলালের কণ্ঠনিঃসৃত মধুর আজানধ্বনিতে বদর-প্রান্তর মুখরিত হল। তিনি সকলকে নিয়ে একতাবদ্ধভাবে উষাকালীন উপাসনা সমাপ্ত করে যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে সেইভাবে সৈন্যসমাবেশ ও ব্যূহরচনা করলেন। সকালে উদীয়মান সূর্যের রশ্মিজাল যাতে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে না পারে সৈন্য-সমাবেশের স্থান নির্ধারণের সময় তিনি সেদিকেও লক্ষ্য রাখলেন। তারপর সৈন্যদের উপদেশ দিলেন 'সাবধান, কেউ স্থানত্যাগ করো না, আমার বিনা অনুমতিতে কেউ অগ্রে আক্রমণ করোনা। শত্রু নাগালের বাইরে থাকলে তীর ছুঁড়ে তীর নষ্ট কর না সামনাসামনি হলেতলওয়ার দিয়ে যুদ্ধ করবে।' এরপর তিনি তাঁবুতে ফিরে, ধ্যানমগ্ন হলেন। ব্যাকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ্‌, তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর; মুসলমানদের এই দল যদি ধ্বংস হয় তাহলে পৃথিবীর বুকে তোমার উপাসনাই বন্ধ হয়ে যাবে।'

(সহীহ্ মুসলিম) তখন অবতীর্ণ হল করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লার মহান আশ্বাসবাণী, 'সৎকর্ম-পরায়ণদের সুসংবাদ দাও : নিশ্চয়ই তোমার প্রভু বিশ্বাসীদের কাছ থেকে শত্রুদের দূরে রাখবেন, কারণ আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের ভালবাসেন না।' (কোরআন—২২ : ৩৭, ৩৮)। যুদ্ধের প্রারম্ভে যুদ্ধজয়ের এই ঐশী আশ্বাস পেয়ে হজরত মুহম্মদ (সঃ) সোল্লাসে ঘোষণা করলেন, 'আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছায় আমরা অবশ্যই জয়লাভ করব।'[৩৪] সেই প্রত্যয়দীপ্ত ঘোষণা সেই স্বল্পসংখ্যক সমর শিক্ষাশূন্য মুসলমানের বুকে অসংখ্য সুনিপুণ সৈনিকের শৌর্য ও শক্তি সঞ্চার করল।

তখন আল্লাহ্‌তা'লার নাম স্মরণ করে মুসলমানেরা তাঁদের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। প্রথমে মল্লযুদ্ধ। কোরেশরা যুদ্ধের জন্য দারুণ লাফালাফি আরম্ভ করেছিল। তাদের পক্ষ থেকে ওৎবা, ওয়ালিদ-বিন্-ওৎবা এবং শাইবা সহুঙ্কারে মুসলমানদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করল। মুসলমানদের পক্ষ থেকে মহাবীর হামজা, ওবায়দা ও আলী সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। কিছুক্ষণ প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধের পর আল্লাহ্‌তা'লার করুণায় মুসলমান বীরদের হাতে তিন কোরেশবীর নিহত হল। তখন মুহুর্মুহুঃ 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে সমগ্র বদর-প্রান্তর প্রকম্পিত হল। মুসলিম-সৈন্যরা প্রেরণা ও প্রাণ-বন্যায় এক একজন এক একশ সৈন্যের সমান শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। শত্রুরা তাদের চোখে সংখ্যা ও শক্তিতে নিতান্ত নগণ্য বলে মনে হতে লাগল। রণক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থানক্ষেত্র বালুকাময় ছিল, চলতে গেলেই বালির মধ্যে পা পুঁতে যেত। পক্ষান্তরে কোরেশ-সৈন্যদের অবস্থান-ক্ষেত্র ছিল 'সমতল এবং পাকা ফরাশের মত শক্ত।' কিন্তু যুদ্ধকালে আল্লাহর রহমতের পানি ঝঞ্ঝাবেগে আকাশ ভেঙ্গে ঝমঝম করে বর্ষিত হল। ফলে মুসলিম সৈন্যদের বালুকাময় অবস্থানক্ষেত্র শক্ত ও সহায়ক হল, আর কোরেশ সৈন্যদের অবস্থানক্ষেত্রের শক্তমাটি 'কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল' হওয়ার ফলে তারা ঘনঘন আছাড় খেতে লাগল। সুতরাং কোরেশ-সৈন্যদের পক্ষে তখন আত্মরক্ষা করাটাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল। এ অবস্থায় সেই প্রবল শীত এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-উপেক্ষাকারী এই অমিতবিক্রম মুসলিম বাহিনীর সম্মুখ থেকে তারা প্রাণপণে পলায়ন করতে লাগল। মুষ্টিমেয় মুসলমান সৈন্যের হাতে সহস্রাধিক কোরেশসৈন্যের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হল। ইসলামের চরমশত্রু আবুজেহেলও এ যুদ্ধে নিহত হল। পক্ষান্তরে মুসলমানদের তেমন কিছু ক্ষতিই হল না—মাত্র ৬জন মুহাজের ও ৮ জন আনসার শহীদ হলেন। এইভাবে এ যুদ্ধ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি 'আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন যে তাঁর ধর্মকে সাহায্য করে ; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী' (২২ : ৪০)—সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হল।

বিজয়ী বীর মুহম্মদ (সঃ) কিন্তু তাঁর জীবনের এই প্রথম সৈন্যাপত্যের অপরিসীম সাফল্যে আত্মবিস্মৃত হলেন না—সবার আগে তিনি এই মহান জয়ের প্রধান কারণ করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। কারণ এ যুদ্ধের আদেশ ও সাফল্য তো তিনিই দান করেছেন। পবিত্র কোরআন শরীফে আছে, "তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায় ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু

[৩৪] আলবিদায়া ৩য় খণ্ড।

এই কারণে যে তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।'' (২২ ঃ ৩৯-৪০)। চরম অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিত মানবতার এই পবিত্র বিজয়ের দিনে পরমভক্তিভরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর মুহম্মদ (সঃ) যুদ্ধ-বন্দীদের নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতে লাগলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি ইসলামের মহান আদর্শ অনুসারে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি যে অকল্পনীয় সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করলেন বিশ্বের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। বিধর্মী মহাশত্রু কোরেশ-যুদ্ধবন্দীদের উটের পিঠে চড়িয়ে তাঁর সৈন্যরা পায়ে হেঁটে চললেন। নিজেরা শুকনো খেজুর খেয়ে যুদ্ধবন্দীদের রুটি খাওয়ালেন। শুধু তাই নয় সামান্য মুক্তিপণের বিনিময়ে হজরত (সঃ) যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থাও করলেন। যে সব বন্দী শিক্ষিত ছিল তারা প্রত্যেকে দশজন করে মুসলমানকে শিক্ষিত করে দিলে তাদের মুক্তি দানের ব্যবস্থা করলেন। নিরক্ষর নবীর শিক্ষার প্রতি এই অসাধারণ আগ্রহ নিখিল বিশ্বের শিক্ষার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্তরূপে চিরভাস্বর হয়ে আছে। যেসব বন্দী অশিক্ষিত এবং দরিদ্র, ভবিষ্যতে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না, শুধু এই প্রতিশ্রুতিতে মুহম্মদ (সঃ) তাদের মুক্তিদান করলেন। ক্ষমা ও মহানুভবতার এই অভিনব নিদর্শন দেখে সাধারণ কোরেশরা মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা দলে দলে ইসলাম কবুল ক'রে ইসলামের জয়যাত্রায় পথকে অবারিত ও সুপ্রশস্ত ক'রে দিতে লাগল। মক্কার কোরেশ পক্ষের অন্যতম যুদ্ধবন্দী ছিলেন নবীকন্যা জয়নবের স্বামী আবুল-আস। জয়নবের বিবাহের সময় নবীপত্নী খাদিজা তাঁকে যে হার উপহার দিয়েছিলেন মুক্তিপণ হিসেবে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সেই হারটিও আবুল-আস হজরতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তা দেখে মুহম্মদ (সঃ)-এর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরতে লাগল। আশ্চর্য, যাঁকে হত্যা করার জন্য আবুল-আস আপ্রাণ যুদ্ধ করেছেন, সেই মুহম্মদ (সঃ) কিনা তাঁরই জন্যে কাঁদছেন? শত্রুতাকারী আত্মীয়ের প্রতি তাঁর এত মমত্ববোধ? তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এই মমতামধুর মানুষটির হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করার জন্যে ব্যাকুল হলেন। কিন্তু কোরেশদের গচ্ছিত ধনের বোঝা ঘাড় থেকে না নামিয়ে দিয়ে পবিত্র ইসলামে দীক্ষা নিতে তাঁর নবজাগ্রত বিবেক রাজী হল না। তিনি মক্কায় ফিরে গচ্ছিত ধন গচ্ছিতকারীদের হাতে তুলে দিয়ে এসে ইসলাম কবুল করলেন। মহানবী (সঃ)-এর ভালবাসা যে তলোয়ার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী এ যুদ্ধে নিঃসন্দেহে তা প্রমাণিত হল

ইসলাম তথা সারা বিশ্বের ইতিহাসে এই বদর-যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। বদর যুদ্ধই মুসলমানদের বিরুদ্ধবাদী শক্তির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করে বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে তাদের অপরিসীম অবদান সৃষ্টির পথ ও প্রেরণাকে সুপ্রশস্ত করেছিল। পবিত্র কোরআন শরীফে তাই এ যুদ্ধকে 'মুক্তির দিন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। সূরা আনফালে বলা হয়েছে, 'যখন কোরেশবাহিনী এবং বাণিজ্য-বাহিনীর কোন একটাকে তোমাদের কবলিত করে দেবার জন্য আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন, আর তোমরা নিষ্কণ্টক (বাণিজ্য) বাহিনী কামনা করছিলে—অথচ আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি-মত সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে আর সীমালঙ্ঘনকারীদের নির্মূল করে দিতে চাইছিলেন।' বস্তুতঃ আল্লাহ্ যথার্থ অর্থে এই যুদ্ধে সীমালঙ্ঘনকারীদের নির্মূল করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সত্য ও মিথ্যার এই যুদ্ধে মিথ্যাকে বাতিল করেছিলেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতেও তাই বলা হয়েছে—'বদর যুদ্ধ মুসলমানদের কাছে যেমন অতিস্মরণীয়, ইতিহাসের চোখে তেমনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই যুদ্ধ মুহম্মদ (দঃ)-এর অবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী করতে

বিপুল ভাবে সহায়তা করেছিল।' অধ্যাপক নিকলসন বলেছেন, 'বদর ম্যারাথনের মতই জগতের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় যুদ্ধ।' (Ibid P. 74). বদর শত্রু ইহুদীদের সামনে যেমন ভীতিসঞ্চারী প্রলয়-নিনাদ, তেমনি মুসলমানদের মানসলোকে যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণা সঞ্চারকারী দামামা-নির্ঘোষ! এই যুদ্ধের অন্যতম সৈনিক পরবর্তীকালে কুফানগরীর প্রতিষ্ঠাতা পারস্যবিজয়ী মহাবীর সা'দকেও তাই আশীবছর বয়সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় বলতে শোনা যায়, 'বদর-যুদ্ধে ব্যবহার-করা-বর্ম আমাকে পরিয়ে দাও; ঐ বর্ম পরে মরব বলে আমি ও এতদিন ধরে তুলে রেখেছি।' সর্বোপরি এ যুদ্ধ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করল যে আল্লাহ্‌র করুণা হলে এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের ওপরে বিশ্বাস গভীর হলে, সংখ্যাস্বল্পতা সত্ত্বেও বহুসংখ্যক শত্রুকে পর্যুদস্ত করা যায়।

ওহুদ যুদ্ধ (হি. ৩/খৃ. ৬২৫): বদরের পরাজয়ের গ্লানি দূর করার জন্য কোরেশরা পরের বছর আবার মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। কাব-বিন-আশরাফ প্রমুখ কোরেশ কবিবৃন্দ তাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে কবিতা রচনা করতে লাগল। মুহম্মদ-প্রচারিত ইসলাম ধর্ম কেবল বেদুইনদের শায়েস্তা করার জন্যই লুণ্ঠনকে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে—এই জাতীয় অপপ্রচার চালিয়ে দুর্ধর্ষ বেদুইনদেরও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হল। ফলে বদর যুদ্ধের পর বছর ৬২৫ খৃস্টাব্দে আবুসুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন হাজার কোরেশ সৈন্যের এক শক্তিশালী বাহিনী মদীনা থেকে ১২ মাইল এবং মক্কা থেকে ১৩৮ মাইল দূরে ওহুদপর্বতের পাদদেশে এসে শিবির সংস্থাপন করল (২১ শে মার্চ)। নবী (সঃ) এগিয়ে গিয়ে ওদের মোকাবিলা না করে মদীনার মধ্যে থেকেই যুদ্ধ করার জন্যে শিষ্যদের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বদরবিজয়ের তপ্ত রক্তধারা তখন তরুণ মুসলমানদের শিরায় শিরায় টগবগ করে নাচছে—তাঁরা এগিয়ে গিয়ে আক্রমণের জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। ফলে রসুলুল্লাহ্‌ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এক হাজার মুসলমান সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে ওহুদ পর্বতের পাদদেশে যাত্রা করলেন। যাত্রা-পথেই বদর যুদ্ধে কুখ্যাত কপট (মোনাফেক) আব্দুল্লাহ্‌-বিন-উবাই ৩০০ সৈন্য নিয়ে সরে পড়ল। ২৩ শে মার্চ শনিবার মাত্র ৭০০ সৈন্য নিয়ে নবী (সঃ) ওহুদ পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হলেন। পেছনে ছিল একটা গিরিপথ, নবী (সঃ) সেখানে ৫০জন মুসলমান সৈন্যের একটা ছোট দলকে পাহারার জন্য মোতায়েন করলেন। পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাদের স্থান ত্যাগ করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করলেন। এমন সময় কোরেশ বাহিনী মুসলমানদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু হামজা, আলী প্রমুখ মহাবীরদের প্রবল প্রতিআক্রমণে তারা অচিরে পরাজয় বরণ করল। বিজয়ী মুসলমান সৈন্যরা উন্মত্তের মত লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হল। গিরিপথ-রক্ষাকারী সেই ৫০জন তীরন্দাজও আল্লাহ্‌র রসুলের আদেশ লঙ্ঘন করে লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হল। তখন রণনিপুণ কোরেশ-সেনাপতি খালেদ-বিন-ওয়ালিদ সেই অরক্ষিত গিরিপথে প্রবেশ করে মুসলিম বাহিনীকে বিপর্যস্ত করলেন। কামিয়ার নিক্ষিপ্ত তীরে রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর দাঁত ভেঙে গেল, তিনি হতচেতন হলেন। মুহূর্তের মধ্যে সুকৌশলে তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হল, ফলে মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আবুসুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা নিহত হামজার নাক, কান ও চোখ উপড়ে নিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরল আর রাক্ষসীর মত তাঁর (হজরত হামজার) কাঁচা হৃৎপিণ্ডটা চিবোতে চিবোতে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল! আহত রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে নিয়ে তখন বিপন্ন মুসলমানরা ওহুদ পর্বতের ওপরে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন।

আবু সুফিয়ান কিন্তু মুহম্মদ (সঃ) ও অন্যান্যরা নিহত হয়েছেন ভেবে মনের আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন, 'সবাই নিপাত হয়েছে।' কিন্তু তাঁর এই দম্ভোক্তি শুনে পর্বত-শীর্ষে আত্মগোপনকারী বীর ওমর (রাঃ) আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'ওরে হতভাগা, তুই মিথ্যা কথা বলছিস, তোকে শাস্তি দেবার জন্যে এদের সকলকেই আল্লাহ্ বাঁচিয়ে রেখেছেন।' তখন পর্বত শীর্ষ আর পাদদেশের মধ্যে বাক্-যুদ্ধ শুরু হল। আবু সুফিয়ান বললেন 'আচ্ছা থাক, আগামী বছর বদর-প্রান্তরে আবার তোমাদের সাথে বোঝাপড়া হবে।' আবু সুফিয়ান আর অধিক বাক্যব্যয় না করে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন কোরেশ মৃতদের প্রতিও মুসলমান শহীদদের-প্রতি-প্রদত্ত কোরেশদের-আচরণের অনুরূপ নৃশংস আচরণ করার জন্য হজরতকে অনুরোধ করা হল। তিনি তাঁর সহচরদের 'ধৈর্যের সাথে অন্যায় সহ্য কর, নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের পরিণাম উত্তম'—কোরআন শরীফের এই মহা-বাণী স্মরণ করিয়ে দিলেন। বদর যুদ্ধের মতই ওহদ যুদ্ধও অনুরূপ উদারতার উদাহরণে দীপ্ত হল। এ যুদ্ধে ৬৫ জন আনসার ও ৫ জন মোহাজের নিয়ে মোট ৭০ জন মুসলমান শহীদ হলেও মাত্র চার পাঁচজন বিখ্যাত মুসলমান বীর শহীদ হলেন। পক্ষান্তরে কোরেশ পক্ষে মাত্র ২৩ জন নিহত হলেও তাদের মধ্যে সবাই বিখ্যাত বীর ও দলপতি—১৭ জন কোরেশ সম্প্রদায়ের আর ৬ জন তাদের মিত্র সম্প্রদায়ের। যুদ্ধ-শেষে মক্কা প্রত্যাবর্তনের পথে রুহা নামক স্থানে কোরেশ সেনাপতি আবু সুফিয়ান তাই যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, 'মুসলমানদের সঙ্গে এ যুদ্ধে আমাদের কোন লাভ হয়নি। আমাদের জয় হয়েছে তা বলতে পারি না। খুব বেশী হলে এ যুদ্ধকে উভয় পক্ষের পক্ষে সমান ফলদায়ক বলা যেতে পারে।'

ওহদযুদ্ধ মুসলমানদের এই শিক্ষা দিল যে সংখ্যা বা শক্তি জয় পরাজয়ের উৎস নয়, আল্লাহ্ তা'লার করুণা ও ইচ্ছাই সকল কিছুর উৎস। তারুণ্যের তেজ বা তপ্তরক্তের জোরে আল্লাহ্‌র রসুলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে ভাল কাজেও মন্দ ফল-শ্রুতি অনিবার্য!

ওহদযুদ্ধ রহমতুল্লিল আ'লামীন মুহম্মদ (সঃ)-এর করুণা ও মহানুভবতার দুর্লভ দৃষ্টান্তে চির ভাস্বর। যে শত্রুরা তাঁর দাঁত ভেঙে দিল, চরম আঘাতে তাঁকে হতচেতন করল, তাদের অভিশাপ দিয়ে ধ্বংস করার জন্য তাঁর কোন কোন অনুচর অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'আমি তো অভিশাপ দেবার জন্য প্রেরিত হইনি, আমি আল্লাহ্‌র পথের আহ্বায়ক এবং রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছি।' তারপর সেই পরম শত্রুদের জন্য তিনি প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ্ তুমি এদের সৎপথ প্রদর্শন কর, এরা আমাকে চেনে না।'

ওহদ যুদ্ধের পর ঐ তৃতীয় হিজরীর শেষের দিকে 'রজির ঘটনা' এবং চতুর্থ হিজরীর প্রথম দিকে 'বি'রে মাউনার ঘটনা' নামক দুটি সকরুণ মহিমোজ্জ্বল আত্মত্যাগের ঘটনা ঘটল। তৃতীয় হিজরীর শেষ দিকে কোরেশদের পরামর্শে আযল ও কাবা গোত্রের ৭ জন লোক মদীনায় গিয়ে মুহম্মদ (সঃ)-এর কাছে তাদের গোত্রের লোকেদের ইসলামে দীক্ষিত করার জন্যে কিছু দীক্ষাদানকারী শিক্ষক প্রেরণ করতে অনুরোধ করল। অনুরোধ মত রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আসিম-বিন-সাবিত (রাঃ)-র নেতৃত্বে দশজন মুসলমানের এক দীক্ষাদানকারী দল সেখানে প্রেরণ করলেন। কিন্তু ঐ দীক্ষাদানকারী দল তাদের সীমানায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা হিংস্র নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদের ৮ জনকে হত্যা করল। হজরত

খুবাইব (রাঃ) ও হজরত জায়েদ বিন দসনা (রাঃ) কে কোরেশদের কাছে বিক্রী করল। হজরত খুবাইব (রাঃ) যে কোরেশ গৃহে বন্দী ছিলেন সেই গৃহের এক ছেলে খেলতে খেলতে একদিন তাঁর কাছে আসল। হয়তো নিজের ছেলের কথা স্মরণ করে আসন্ন মৃত্যুর কথা ভুলে খুবাইব (রাঃ) তাকে নিয়ে কোলে বসিয়ে আদর করলেন। তা দেখে ঐ ছেলের মা ভয়ে শিউরে উঠল। কিন্তু খুবাইব (রাঃ) বললেন, 'তুমি কি মনে কর, তোমার ছেলেকে আমি হত্যা করব? আমি একজন মুসলমান, একজন নিষ্পাপ শিশুর ওপরে এমন হীন প্রতিশোধ আমি নিতে জানি না।' কিন্তু শঙ্কিত কোরেশরা আর বিলম্ব না করে খুবাইবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করল। খুবাইব (রাঃ) দুরাকাত নামাজ পড়ে নিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে হতে বললেন, 'মৃত্যুর ভয়ে আমি নামাজ দীর্ঘ করছি বলে যদি তোমরা মনে না করতে তাহলে আমি আরো নামাজ পড়তাম।' নামাজের প্রতি তাঁর এই নিবিড় নিষ্ঠা ও মৃত্যুভয়হীন প্রীতি দেখে অনেকে মুগ্ধ হল। এরপরই শূলের দ্বারা তাঁর বক্ষ বিদ্ধ করা হল। বক্ষ বিদ্ধ করতে করতে দুরাত্মা ঘাতক ব্যঙ্গ করে বলল, 'তুমি কি ভাবছ, তোমার জায়গায় যদি মুহম্মদ হতেন আর তুমি রেহাই পেয়ে যেতে?' মৃত্যুকরুণ মধুর কণ্ঠে খুবাইব (রাঃ) বললেন 'আল্লাহর শপথ, আমার প্রাণ রক্ষার জন্য মুহম্মদ (সঃ)-এর পায়ে একটা কাঁটার আঁচড়কেও আমি সহ্য করতে পারি না।' তারপর পরম ভক্ত খুবাইব (রাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। যে ধর্মের মানুষ তার ধর্ম আর ধর্মনেতার প্রতি এমন সর্বস্বপণ ভক্তি ও নিষ্ঠার পরিচয় দেয়—তার অগ্রগতিকে প্রতিহত করার সাধ্য পৃথিবীতে কোন্ মহাশক্তির থাকতে পারে? এ ঘটনা 'রজির' ঘটনা নামে বিখ্যাত।

এই ঘটনার পর ৪র্থ হিজরীর প্রারম্ভে 'বি'রে মাউনার ঘটনা' নামক আর একটা ত্যাগ ও নিষ্ঠায় দীপ্ত মহিমোজ্জ্বল ঘটনা ঘটল। আবু-বরা-আমির নামক এক দুর্জন ব্যক্তি নেজ্‌দ অঞ্চলে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষাদান করার জন্য একদল লোক পাঠাতে মুহম্মদ (সঃ) কে অনুরোধ করল। অনুরোধ মত নবী (সঃ) ৭০ জন সুশিক্ষিত মুসলমানের এক দীক্ষাদানকারী দলকে সেখানে প্রেরণ করলেন। কিন্তু দলটি যখন 'বি'রে মাউনা' নামক স্থানে উপস্থিত হল তখন পূর্বষড়যন্ত্র মত নেজ্‌দ-এর শাসনকর্তা আমির-বিন-তুফাইল তাদের হত্যা করল। একের পর এক তাদের বক্ষোদেশে বর্শাবিদ্ধ করে নৃশংসভাবে প্রাণসংহার করা হল। কিন্তু কেউই তাঁদের লাইলাহা ইল্লাল্লাহুর মন্ত্র পরিত্যাগ করতে সম্মত হলেন না। হজরত হারাম-বিন-মিলহান (রাঃ) কে যখন হত্যা করা হয় এবং আততায়ীর তীক্ষ্ণাগ্র বর্শা তাঁর বক্ষ বিদ্ধ ক'রে পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে, তখন তিনি পরম তৃপ্তির সঙ্গে ঘোষণা করলেন—'ফুযতু ও রাব্বিল কা'বা'—'কাবার প্রভুর শপথ আমার মনস্কাম পূর্ণ হল।' আশ্চর্য! কি সে এমন অমৃত, মৃত্যুর মধ্যেও যা তাঁকে যন্ত্রণা না দিয়ে তাঁর মনস্কামকে পরিপূর্ণতা দান করল। হৃদয়হীন আততায়ী জব্বর-বিন-সলমার হৃদয় বিগলিত হল। চোখে আলো ফুটে উঠল। তিনি আবিষ্টের মত মুহম্মদ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। হারামে (রাঃ) র সেই অমৃতমন্ত্র বরণ করে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। এমনি করে দিনে দিনে 'রক্তে যাদের সিক্ত হল পৃথ্বীতল' —আল্লাহতা'লা পৃথিবীতে অচিরে তাদের পরম সম্মানের অধিকারী করলেন। পবিত্র কোরআন শরীফে আছে, 'আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁর ধর্মকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। আমি এদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা যথাযথভাবে নামাজ পড়বে, জাকাত দেবে,

এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে।' ২২ (৪০, ৪১) তাই করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লা এই আদর্শনিষ্ঠ ত্যাগবীরদের প্রতিষ্ঠাপথ এঁদের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিনে দিনে পবিত্র ও প্রশস্ততর করলেন।

পরিখার বা খন্দকের যুদ্ধ (হি. ৫/খৃ. ৬২৭)—মক্কানন্দন মুহম্মদ (সঃ) এবং বহু মুসলমানদের সঙ্গে মক্কার কোরেশদের রক্তের সম্পর্ক ছিল বলেই বোধহয় মুসলমানদের রক্তপান করার জন্যে কোরেশদের বুকে এত প্রবল পিপাসা জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু এই পিপাসাবশতঃ অগ্রসর হয়েও যখন তারা বার বার ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হতে লাগল, তাদের ঘরের লোকেরা মুসলমানদের হত্যা করতে করতে শেষে নিজেরাই দলে দলে মুসলমান হয়ে সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগল, তখন তারা নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের সর্বনাশ সাধন করার জন্য অধিকতর সচেষ্ট হল। তারা বিশ্বাসঘাতক বেদুইন এবং ইহুদীদের মক্কায় পালিয়ে-যাওয়া দুর্ধর্ষ লোকেদের সাহায্যে ৬০০ অশ্বারোহী সমেত ১০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী সজ্জিত করল। সংবাদ পেয়ে মহানবী মুহম্মদ (সঃ) অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার ৩,০০০ সৈন্যের এক মুসলমান বাহিনী প্রস্তুত করলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য সালমান ফারিসী মদীনার চারদিকে পরিখা খনন করার পরামর্শ দিলে, সেই উপায়ে অকারণ রক্তক্ষয় পরিহার করে তিনি শত্রুর গতিরোধ করার জন্য সচেষ্ট হলেন।

রসুলুল্লাহ্ (সঃ) সবার সঙ্গে নিজে মাটি কেটে সেই পরিখা খনন করালেন। তাঁকে মাটি কাটতে দেখে তাঁর অনুচরেরা যেন অনুপ্রেরণায় উন্মাদ হয়ে উঠলেন। তাঁরা শ্রান্তি ক্লান্তি ভুলে গেলেন। নবীসহচর হজরত বারায়া (রাঃ) বলেছেন, "রসুলুল্লাহ্ (সঃ) খন্দকের যুদ্ধে মাটি কাটছিলেন, এমন কি তাঁর উদর কর্দমাক্ত হয়ে গিয়েছিল, আর তিনি গাইছিলেন,

'আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্ ব্যতীত আমরা সৎপথ পেতাম না,
—আমরা দান করতাম না,
—আমরা নামাজ পড়তাম না।
সুতরাং হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ কর।
যুদ্ধের সম্মুখে আমাদের পদদ্বয় সুদৃঢ় কর।
নিশ্চয়ই আমাদের বন্ধুরা বিদ্রোহ করেছে।
তারা যখন যুদ্ধ চায়, আমরা তখন তা চাই না।

মহান শান্তির দূত রহমতুল্লিল আ'লামীন তাঁর এই যুদ্ধবিরোধী মনের শান্তি-পিপাসাকে সুরের শারাবন তহুরার মত করে বার বার সেই কর্মমুখর প্রান্তরে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন, 'আমরা চাই না, চাই না, চাই না।' (বুখারী। ৪৩৭ সংখ্যক হাদীস দেখুন)। আর খননরত মুসলমান সৈন্যেরা বজ্রগর্ভ মেঘমন্দ্রের মত বারংবার সহুংকার আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করছিলেন। আবু সুফিয়ান প্রবল উৎসাহে সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে সে অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে হতাশ ও হতোদ্যম হয়ে গেলেন। এমন সময় আল্লাহ্‌র করুণায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিল। ফলে কোরেশদের সৈন্যশিবির, রসদপত্র, সব কিছুই বিপর্যস্ত হল। তারা প্লাবনের মত এসেছিল আক্রমণ করতে, এখন সর্বস্বান্ত ভাটার মত নীরবে প্রত্যাবর্তন করল।

যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বা একরামুল মুসলেমিন-এর আদর্শ-শক্তির বলে মুসলমানেরা তাদের জয়যাত্রাকে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য

করে তুলেছে এই পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধকালে তার এক অভূতপূর্ব উদাহরণ বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করল। প্রায় অনাহারে নবী (সঃ) এবং তাঁর অনুচরেরা পনেরো দিন ধরে[৩৫]ক এই খন্দক বা পরিখা খনন করছিলেন। নবী (সঃ)-এর অনাহার-মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে নবীসহচর হজরত জাবের-বিন-আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) নবী (সঃ) এবং তাঁর কয়েকজন অনাহার-ক্ষীণ সহচরকে খাওয়াবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। এই উপলক্ষে জাবের তাঁর স্বল্প সামর্থ্য অনুসারে মাত্র একটা মেষের মাংস আর কয়েক সের আটার রুটির আয়োজন করলেন। নবী (সঃ) এবং তাঁর নিমন্ত্রিত সহচরেরা কিন্তু খননকার্যে ব্যাপৃত বহুসংখ্যক মুসলমানকে বাদ দিয়ে তা আহার করতে রাজী হলেন না। তখন সেই সামান্য আহার সেই বহু ক্ষুধার্ত মুসলমান পাশাপাশি বসে' পরম পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করে আল্-হামদুলিল্লাহ্ বলে আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। অনাহারে যারা ঐক্যবদ্ধ, আহারেও তারা ঐক্যবদ্ধ—তাই যুদ্ধক্ষেত্রেও মুসলমানদের ঐক্য ও বীর্যবত্তার তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

এখন থেকে মুসলমানেরা কিন্তু আর কেবল পড়ে পড়ে মার খেতে বা নিছক মার খেয়ে মার রুখতে রাজী হলেন না। কারণ, ক্ষমাকে ইস্‌লাম শ্রদ্ধা করলেও, একগালে চড় মারলে অন্য গাল ফিরিয়ে দেবার নীতি তার নয়। ইসলাম অকারণ রক্তক্ষয়কে ঘৃণা করে—কিন্তু অত্যাচারীর বিষদাঁত ভেঙে দেবার জন্যে যখন প্রয়োজন হয় তখন বীরধর্মকে শ্রদ্ধা করে। তাই পরিখা যুদ্ধের পর তাঁরা মদীনায় আবদ্ধ না থেকে মক্কায় তথা মহাবিশ্বে আত্মপ্রকাশের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

ওমরা ও হুদায়াবিয়ার সন্ধি (খ্রী. ৬২৮) : এই স্বপ্নকে সফল করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লার কাছ থেকে আদেশ এল। পঞ্চম হিজরীতে (খ্রী. ৬২৭) মক্কায় অবস্থিত কাবা শরীফ প্রদক্ষিণ করা বা হজ্ করা মুসলমানদের জন্য ফরজ হল। পর বছর ষষ্ঠ হিজরীতে (খ্রী. ৬২৮) তাই মহানবী মুহম্মদ (সঃ) ১৪০০ সহচরকে সঙ্গে নিয়ে জিল্‌কদ্ মাসে মক্কার পথে যাত্রা করলেন। কিন্তু নিরস্ত্র এই তীর্থ-যাত্রীদের কোরেশরা মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে রাজী হল না। অনেক আলোচনা, অনেক নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের শেষে হুদায়বিয়া নামক একটা কূপের কাছে কোরেশদের সঙ্গে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হল। এই সন্ধিই 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে বিখ্যাত। সন্ধির শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির্‌রহ্‌মানির্‌রহীম' (করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি) কথাটা লেখার ব্যাপারে কোরেশ-প্রতিনিধি সুহাইল ঘোরতর আপত্তি জানাল। সে বলল, 'বিসমিক আল্লাহুম্মা' (অর্থাৎ হে আল্লাহ্, তোমার নামে আরম্ভ করছি) এই কথা লিখতে হবে, আর 'মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ্' (অর্থাৎ মুহম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল) কথাটার পরিবর্তে 'মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্' (আব্দুল্লাহর পুত্র মুহম্মদ) লিখতে হবে। সন্ধিপত্র হজরত আলী (রাঃ) লিখছিলেন, তিনি ইসলামী রীতি অনুসারে প্রারম্ভিক ঐ কথাগুলো লিখেই ফেলেছিলেন। কিন্তু সুহাইলের আপত্তির ফলে রসুলুল্লাহ্ (সঃ) যখন তা কেটে দিতে বললেন তখন হজরত আলী দারুণ মর্মযন্ত্রণা উপলব্ধি করলেন, তিনি তা কেটে দিতে রাজী হলেন না। মাওলানা আকরম খাঁর মোস্তফা চরিতে আছে, "হজরত বলিলেন, 'আমি আব্দুল্লার পুত্র ইহাও মিথ্যা নহে। অতএব রসুলুল্লাহ্ কাটিয়া দেওয়া হউক। তখন মুছলমানদিগের মনস্তাপ ও উত্তেজনা ধৈর্যের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া

[৩৫]ক কারো কারো মতে ২০ থেকে ৪০ দিন।

গেল, এবং তাঁহারা চারিদিক হইতে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আলী সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন, প্রভু! ক্ষমা করিবেন, আমি ঐ শব্দটা কাটিয়া দিতে পারিব না। তখন হজরতের আদেশে আলী ঐ শব্দটা দেখাইয়া দিলে হজরত নিজ হস্তে কলম ধরিয়া তাহা কাটিয়া দিলেন।'' তারপর সন্ধির শর্তাবলী লিপিবদ্ধ করা হল। শর্তগুলো হল—১) এবছর মুসলমানেরা হজ্জ্ না করেই মদীনায় ফিরে যাবে, ২) পরের বছর হজ্জ্ করতে আসতে পারবে, কিন্তু সঙ্গে পথিকদের আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র আনতে পারবে না, ৩) হজ্জ্ করতে এসে মুসলমানেরা ৩ দিন মক্কায় থাকবে—ঐ তিন দিন মক্কাবাসীরা নগরত্যাগ করে চলে যাবে, ৪) কিন্তু যেসব অসহায় মুসলমান মক্কায় বসবাস করে হজ্জ্ করতে এসে তাদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না, ৫) মক্কার কোন লোক মদীনায় পালিয়ে গেলে মুসলমানেরা অবশ্যই তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দেবে, কিন্তু মদীনার কোন লোক মক্কায় পালিয়ে এলে মক্কাবাসীরা তাকে ফিরিয়ে দেবে না, ৬) দশ বছর উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে, ৭) উভয়পক্ষ যোগদানের ব্যাপারে মক্কা ও মদীনার সকল গোত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

আপাতদৃষ্টিতে সন্ধির শর্তাবলী মুসলমানদের পক্ষে অসম্মান জনক ছিল। কিন্তু কিসে সম্মান আর কিসে অসম্মান আল্লাহ্ আর তাঁর রসুলের চেয়ে কোন মানুষই তা বেশী ক'রে জানতে পারে না। ইতিহাস এ সত্যের অসংখ্য স্বর্ণাক্ষরিত সাক্ষ্য জ্বল জ্বল করছে। হুদায়বিয়ার সন্ধিকে পবিত্র কোরআন শরীফে তাই 'ফতুহে মুবিন' বা 'সুস্পষ্ট বিজয়'বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাকে বিজয় দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।' ৪৮ (১) কারণ যতই জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা কোরেশরা করুক না কেন তারা 'বিসমিক আল্লাহুম্মা' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্ তোমার নামে আরম্ভ করছি'—এই কথা লিখে তাদের দেবদেবীদের পরিবর্তে অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌তা'লার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিল। আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ, আল্লাহু আকবর—এই হল ইসলামের বিজয় নির্ঘোষ। সন্ধির ৫ নম্বর শর্তটি প্রসঙ্গে হজরত ওমর তাঁর প্রবল মনোবেদনা প্রকাশ করলে মুহম্মদ (সঃ) তাঁকে বললেন যে, 'মোনাফেক (বা কপট) ছাড়া আমাদের কেউ তাদের কাছে যাবেই না, এবং মোনাফেকদের তো যাওয়াই উত্তম। আর যে মুসলমানকে আমরা ফিরিয়ে দেব অচিরেই আল্লাহ তার মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।' অর্থাৎ এ শর্তও মুসলমানদের পক্ষে তেমন ক্ষতিকর নয়। তাছাড়া এই সন্ধির দ্বারা কোরেশরা নবীর নগর মদীনার স্বাধীনতাকেও স্বীকার করে নিল। এতদিন কারণে-অকারণে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ তো কোরেশরাই করে এসেছে। এখন সেই কোরেশরা যখন দশ বছর স্থায়ী যুদ্ধ-নয়-চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হল, তখন নিঃসন্দেহে তাদের পরাজয় তারা নিজেরাই স্বীকার করে নিল। তাছাড়া দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকায় শান্তির ধর্ম ইসলাম আপন শক্তিকে সংহত ও সম্প্রসারিত করার সুযোগ পেল। গোত্রসমূহের যেকোন পক্ষে যোগদান করার স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ায় এতদিন কোরেশদের ভয়ে যারা মুহম্মদ (সঃ)-এর কাছ থেকে দূরে সরে ছিল, তারা বন্যার বেগে এগিয়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানের প্রাণের দোসরে পরিণত হতে লাগল। মদীনার লোকেদের মক্কায় যেতে বাধা না থাকায় মদীনাবাসী মুসলমানেরা মক্কায় তাঁদের অমুসলমান আত্মীয়-স্বজনদের কাছে যেতে লাগলেন, যথার্থ আত্মীয়ের মত তাঁদের রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা আর নৈরাশ্যে আশা দিতে লাগলেন। ফলে আত্মীয়তা, সহানুভূতি ও প্রেমপ্রীতির

সাথে প্রায়-পরিচয়শূন্য সেদিনের মক্কা-তথা আরববাসীরা দলে দলে সকল অশান্তি ও অসুন্দর-বিনাশী লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ্ এই মহামন্ত্র বরণ করে মুসলমান হয়ে যেতে লাগলেন। জীবনীকার জাহ্‌রীর ভাষায় 'শেষ পর্যন্ত পৌত্তলিকদের মধ্যে এমন কোন জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আর অবশিষ্ট রইলেন না, যিনি ইসলাম গ্রহণে বিরত ছিলেন।' হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে যে নবী মাত্র ১৪০০ অনুচর নিয়ে হজ্ব করতে গিয়েছিলেন, সন্ধির দু বছর পরে মক্কাবিজয়ের (খ্রী. ৬৩০) সময় সেই নবীর সঙ্গী হয়েছিল দশ সহস্র মুসলমান। ইবনে ইসহাক বলেছেন, 'এর আগে ইসলাম যে সব বিজয় লাভ করেছিল সে সবের কোনটিই এর চেয়ে বড় নয়। তার কারণ, সেসব লোকেরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল কেবল যুদ্ধ করতে, এবার যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হল, লোকেরা নিরাপদে পরস্পরের সাথে সম্মিলিত হতে পারল। পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারল, আর আলাপ-আলোচনা করে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করল।' শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহাম্মদ তাহের সাহেব যথার্থই মন্তব্য করেছেন 'এই সন্ধিই ছিল মুখ্যত সকল বিজয়ের সদর দ্বার, স্বয়ং মূর্তিমান বিজয়। এই সন্ধিই ছিল ইসলামের প্রচার প্রসার এবং সমগ্র বিজয়ের মূলভিত্তি।' (শেষ নবী)।

আরবের বাইরে ইসলাম ঃ পরিখা যুদ্ধের পর মহানবী মুহম্মদ (সঃ) দেশে দেশে দেশনায়কদের কাছে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণলিপি পাঠাতে লাগলেন। তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের মত তিনি তো কোন গোত্র বা দেশ বিশেষের জন্য আসেননি, তিনি এসেছেন সারা বিশ্বের জন্য বিশ্বনবী হিসেবে। তাই নিখিল বিশ্বের দেশে দেশে তাঁকে সত্যের নিমন্ত্রণ তো প্রেরণ করতেই হবে। তিনি প্রথমে বাইজান্টাইন রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে ইসলামের শান্তিমন্ত্রকে বরণ করার আমন্ত্রণলিপি পাঠালেন। জেরুজালেমের পথে হিমস্ নামক স্থানে সম্রাট সে আমন্ত্রণলিপি পেলেন, তবে কোন উচ্চবাচ্য না করেই দূতের প্রতি স্বাভাবিক সৌজন্য ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করে তাঁকে বিদায় দিলেন। কিন্তু আরবের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পারস্য সাম্রাজ্যের অধিপতি খসরু মহানবীর আমন্ত্রণ লিপি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর দূতকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিলেন। আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসী পূর্বেই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এখন আম্মানের দুজন রাজাও ইসলাম গ্রহণ করলেন। মিশর-রাজও নবীর দূতদের সসম্ভ্রমে বরণ করে নবীর কাছে উপহার প্রেরণ করলেন। সিরিয়ার গাসসান রাজা ইসলাম গ্রহণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেও পৌত্তলিক প্রজাদের প্রবলতর বিরোধিতার ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যকর করতে পারলেন না। এই ভাবে পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধের পর মুসলমানদের মনে যে আত্মপ্রকাশের স্বপ্ন জাগ্রত হয়েছিল, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ষষ্ঠ হিজরীতেই সে স্বপ্ন শুধু মদীনা মক্কাতেই নয় সারা বিশ্বের দিকে দিকে সম্প্রসারিত হতে লাগল। তলোয়ারের শক্তিতে নয়, তবলীগ বা সত্য প্রচারের মহাশক্তি বলে এ সম্প্রসারণ সংঘটিত হতে লাগল। হুদায়বিয়ার সন্ধি তাই সত্য-সত্যই মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্ট মহাবিজয় বা ফতহে মুবিন। সত্য-সত্যই এ ছিল মুসলমানদের 'সকল বিজয়ের সদর দ্বার।'

মদীনার উত্তরে সিরিয়া সীমান্তে খয়বর নামক স্থান। হুদায়বিয়ার মুহম্মদের চরম পরাজয় হয়েছে ভেবে এখানকার ইহুদীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। হুদায়বিয়া থেকে ফেরার পথে মুহম্মদ (সঃ) এদের বিদ্রোহের খবর পেলেন।

তারপর ২০০ অশ্বারোহী সহ ১৬০০ সৈন্যের এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহ-দমনে অগ্রসর হলেন। মুসলিম বাহিনী একের পর এক ইহুদীদের নাইম, সাব, সালাম প্রভৃতি দুর্গ দখল করে নিলেন। শেষে অমিত বিক্রম হজরত আলী (রাঃ) দুর্ভেদ্য আলকামুস অধিকার করলেন (হি. ৭। খ্রী. ৬২৯)। তখন ইহুদীরা ক্ষমাপ্রার্থনা করল। ক্ষমা ও করুণার মূর্তিমান প্রতীক মুহম্মদ (সঃ) ইসলামের সেই পরম শত্রুদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা তথা সর্ববিধ সুযোগ সহকারে ক্ষমা করলেন। 'মানুষের অসদাচরণ ক্ষমা করার জন্যে আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আদেশ দিয়েছেন' (বুখারী) নবীর নিজের এই পবিত্র বাণীকে নবী (সঃ) নিজেই এভাবে রূপায়িত করলেন।

খয়বর যুদ্ধের বছরেই হুদায়বিয়ার সন্ধিশর্ত অনুসারে হজরত মুহম্মদ (সঃ) দু হাজার অনুচর সহ প্রতিশ্রুত হজ্জ্ পালন করলেন (খ্রী. ৬২৯, মার্চ)। এই হজ্জের সময় উক্ত "সুস্পষ্ট বিজয়ের" আরো দুটি স্মরণীয় সাফল্য অর্জিত হল। মহাবীর খালেদ-বিন-অলিদ এবং আমর-বিন-আস ইসলাম কবুল করলেন। এই দুব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ হুদায় বয়ার সন্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাফল্য।

ইসলামের এই উত্তরোত্তর সাফল্য বাইজান্টাইনীয় রোমান শক্তিকে শঙ্কিত করে তুলল। তাই তাদের বনি সালেম গোত্র ঈর্ষা ও অহংকারে অন্ধ হয়ে নবী (সঃ)-প্রেরিত ৫০ জন ইসলাম প্রচারককে নৃশংস ভাবে হত্যা করল। এর অল্পদিন পরে সিরিয়াসীমান্তে 'ধাত্-আত্‌লা' নামক স্থানে ১৫ জন মৃত্যুভয়হীন মুসলমানের এক প্রচারক দল প্রেরণ করা হল। তাঁরা সেখানকার মানুষদের ইস্‌লাম-গ্রহণের আহ্বান জানালেন। কিন্তু ঝাঁক ঝাঁক তীর ছুঁড়ে তারা সে আহ্বানের জবাব দিল। রক্তে লাল হয়ে উঠল রোম-অধ্যুষিত সিরিয়া-সীমান্ত। একজন মাত্র প্রচারক কোনক্রমে আত্মরক্ষা করে মুহম্মদ (সঃ)কে সে করুণকাহিনী শোনালেন। এরপর বসরার বাইজান্টাইনীয় রোমান শাসনকর্তা শুরাহ্‌বিল মহানবীর দূতকে আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে হত্যা করলেন। তখন নির্যাতিত মানবতার মহান মুক্তিদূত মহানবী মুহম্মদ (সঃ) শক্তিমদমত্তদের এ নৃশংসতা আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ৩০০০ সৈন্যের এক দুর্ধর্ষ বাহিনী শুরাহ্‌বিলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। মুতাহ্ নামক স্থানে (খ্রী. ৬৩০/হি. ৮) উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল। মহানবীর পালিতপুত্র জায়েদ, জাফর, আব্দুল্লাহ্ এই মহাবীরত্রয়—একের পর এক শহীদ হলেন। শেষে সৈন্যাপত্য গ্রহণ করলেন মহাবীর খালেদ। মুসলিম বাহিনী চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে আত্মরক্ষা করল।

ঠিক এই সময় মক্কার কোরেশপক্ষীয় বনি-বকর গোত্রদ্বারা নির্যাতিত হয়ে বনি-খোজা গোত্র হজরতের কাছে আশ্রয় নিল। হজরত (সঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুসারে সে বিষয়ে শান্তি আলোচনার প্রস্তাব পাঠালে আবু সুফিয়ান সদম্ভে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন মহানবী মুহম্মদ (সঃ) মক্কা আক্রমণ করে আবুসুফিয়ানকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য ৬৩০ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ১০০০০ মুসলমানের এক বিশাল বাহিনী সহ অগ্রসর হলেন। মক্কার অনতিদূরে তাঁরা শিবির স্থাপন করলেন। আবু সুফিয়ান রাতের অন্ধকারে গোপনে মুসলমানদের শক্তিসামর্থ্য চাক্ষুষ করতে এসে শঙ্কিত ও বিহ্বল হয়ে গেলেন। পালিয়ে যাবার পথ পেলেন না। তাঁকে বন্দী করে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে নিয়ে আসা হল। আবু সুফিয়ান ভাবলেন তাঁর প্রাণদণ্ড অনিবার্য, কারণ মুহম্মদ (সঃ)এর প্রাণসংহারের জন্য তাঁর প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তির প্রথম

দিন থেকেই আজ বিশ বছর ধ'রে সর্ববিধ প্রয়াস তিনি করেছেন। তবু মুহম্মদ (সঃ) যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ তুমি কি চাও আবুসুফিয়ান?' আবুসুফিয়ান কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'ক্ষমা, ক্ষমা করুন হুজুর।' পবিত্র কোরআন বলছে, 'ক্ষমা করা উত্তম কাজ' ২ (২৬৩)। বলছে, 'যারা ক্রোধসংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ (সেই) কল্যাণকারীদের ভালবাসেন।'৩(১৩৪) অতএব মহানবী মুহম্মদ (সঃ) তাঁর সেই চরম শত্রুকে ক্ষমাই করলেন। মহানবী (সঃ) বললেন, 'যাও, নিরাপদে তুমি তোমার স্বজনদের কাছে ফিরে যাও।' কিন্তু আবু সুফিয়ান ফিরলেন না। রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এই ক্ষমার আঘাতে তাঁর সকল শত্রুতা মুহূর্তমধ্যে চূর্ণবিচূর্ণ হল। সর্ববিধ সামরিক আইনে যে শত্রুতার মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোন দণ্ড নেই—সেই শত্রুতার বিনিময়ে তিনি কিনা তাঁকে ক্ষমা করলেন। বিস্ময়-বিহ্বল আবু সুফিয়ান আল্লাহ্ ও তাঁর মহান রসুলের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন, ইসলাম কবুল করলেন। এখন নবী (সঃ) নবদীক্ষিত আবু সুফিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে বিনারক্তপাতে তাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোরের শতসহস্র স্মৃতিবিজড়িত মক্কায় প্রবেশ করলেন। ঘোষণা করলেন, 'যারাই আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে বা নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ করে দুয়ার রুদ্ধ করে দেবে তারা নিরাপদ।' যে মক্কা একদিন চরম অবমাননা ও উৎপীড়নের নির্মমতা নিক্ষেপ করে' মহানবী মুহম্মদ (সঃ)কে তাঁর মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিল, সেই মক্কা আজ সেই মহানবী (সঃ)কে মহাবিজয়ীরূপে বরণ করে নিল। ইতিহাসে এ এক অসাধারণ রক্তপাতবিহীন গৌরবময় সাফল্য (glorious revolution) ও স্বর্ণ-খচিত কৃতিত্বের উজ্জ্বলতর উদাহরণ! আশ্চর্য, এইভাবে মক্কা বিজয়ের পরই কিন্তু যারা তাঁর ও তাঁর অনুসরণকারীদের ওপরে অমানুষিক অত্যাচার করেছে—নির্বিচারে মুহম্মদ (সঃ) তাদের সকলকেই ক্ষমা করলেন। কারণ ক্ষমাই যে যথার্থ বীরের ধর্ম। প্রতিশোধ অপেক্ষা প্রেমকেই যে প্রেমের নবী অধিক পছন্দ করেন!

হুনায়নের যুদ্ধ (খ্রী. ৬৩০): মক্কায় ১৫ দিন অবস্থান করতে না করতেই তায়েফের দুর্ধর্ষ তীরন্দাজ হাওয়াজিন গোত্র নবী (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। নবী (সঃ) তখন ১২,০০০ মুসলমানের এক বাহিনী নিয়ে সেখানে অগ্রসর হলেন। কিন্তু অব্যবহিত পূর্বেকার মক্কা বিজয় মুসলমানদের মনে আত্ম-সন্তুষ্টি ও অহঙ্কার জাগ্রত করেছিল। তাই তারা শত্রুকে অবহেলা করল। অথচ কে না জানে, 'আল্লাহ্ উদ্ধত অহঙ্কারীদের ভালবাসেন না।' ৫৭ (২৩)। ফলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। এমন সময় স্বয়ং নবী (সঃ) 'আল্লাহু আকবর' বলে হুঙ্কার দিয়ে অগ্রসর হলেন। আল্লাহ্‌নামের সেই হুঙ্কারের মৃতসঞ্জীবনী সেই প্রায়-পলায়ন-পর সৈনিকদের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হল। তখন অহঙ্কারের গ্লানি দূরীভূত হয়ে তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ওপর পরম নির্ভরতা ও আত্মসমর্পণস্পৃহা জাগ্রত হল। মহানবী হাওয়াজিনদের বিতাড়িত করলেন। এই যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে পুনরায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করল যে শুধু সংখ্যাধিক্যের বলে যুদ্ধ জয় হয় না—আল্লাহ্‌তা'লার ওপর নির্ভরতা ও বিশ্বাসই সকল জয়পরাজয়ের প্রধান উৎস। এবার বিতাড়িত হাওয়াজিনরা তায়েফ অঞ্চলের সাকীফ নামে পরিচিত আর এক তীরন্দাজ গোত্রের সাথে যোগ দিল। নবী (সঃ) তাদের বিরুদ্ধেও অভিযান করলেন। কিন্তু ১৮ দিন পরে অবরোধ প্রত্যাহার করে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তারপর আত্তাবকে মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত ক'রে তিনি মদীনায় যাত্রা করলেন।

তাবুক অভিযান (খৃ. ৬৩১) ঃ বাইজান্টাইনীয় রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হিরাক্লিয়াস সকল ঘটনার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলেন। মুতাহ্ যুদ্ধের ব্যর্থতার পর সাকীফগোত্রের সাথে যুদ্ধের ব্যর্থতার ঘটনা হিরাক্লিয়াসকে অনুপ্রাণিত করল। তাঁর চির আকাঙ্ক্ষিত আরববিজয়ের এই উপযুক্ত সময় ভেবে তিনি বিশাল এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিল্কা পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। তখন মুসলমানদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সেই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদাহকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দশ হাজার অশ্বারোহী সহ প্রায় ৪০,০০০ সৈন্য এই বাহিনীতে যোগদান করল। মুসলমানরা তাদের সর্বস্ব পণ করে এই বাহিনীকে সাহায্য করতে লাগলেন। হজরত ওসমান (রাঃ) ১০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা, ৪০০ উট আর অন্যান্য জিনিসপত্র দান করলেন। হজরত ওমর (রাঃ) তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক দান করলেন, আর হজরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর সর্বস্ব দান করলেন। মহানবী মুহম্মদ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার পরিজনদের জন্য তুমি কি রেখেছ আবুবকর?' আবুবকর দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আল্লাহ্ আর তাঁর রসূলকে।' ধর্মের জন্য এইভাবে সর্বস্ব বিসর্জনের মহোৎসব আর সর্বস্বপণকারী বিশাল বাহিনী দেখে সম্রাট হিরাক্লিয়াস সন্ত্রস্ত হলেন। তিনি সসম্মানে পশ্চাদপসরণ করলেন।

ফলে দিকে দিকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আবার কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সবাই সসম্ভ্রমে ভাবতে লাগল—কি সে এমন ধর্ম-বিশ্বাস যার সামনে বিশ্বের সেরা সেরা সামরিক শক্তিও তাদের উদ্যত ফণা অবনত করে আপন বিবরে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়? দলে দলে মানুষ সেই মহান বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে লাগল। জাতিধর্ম গোত্রবর্ণ নির্বিশেষে সবাই 'আল্লাহ্ এক আর মুহম্মদ (সঃ) তাঁর প্রেরিত পুরুষ' এই পরম মন্ত্র বরণ করে ইসলাম কবুল করতে লাগল। বনি তামিম, বনি মুস্তালিক, বনি আজাদ প্রভৃতি বিভিন্ন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করল। বিখ্যাত হাতিম তাঈ-এর কন্যা বন্দিনী অবস্থায় হজরত আলীর কাছে যে উদার ও মধুর ব্যবহার পেয়েছেন মুক্তিলাভের পর তা স্বগোত্রের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করায় তাঈ গোত্রেও ইসলাম কবুল করল। হাতিম তাঈ-এর পুত্র আদী ইবনে হাতিম, কবি কা'ব, বীর তারেক প্রভৃতি শতসহস্র স্বনামধন্য ব্যক্তি ইসলামের মহান পতাকা মাথায় তুলে নিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করতে লাগলেন। যারা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে এসে ইসলাম কবুল করতে পারলেন না সেই দূর দূরান্তের ইসলাম-অনুরাগীরা প্রতিনিধি প্রেরণ করে তাঁদের ইসলাম গ্রহণের খোশ-খবর নবী (সঃ)-কে জানিয়ে দিতে লাগলেন। এইভাবে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে ইসলাম কবুল করার এই কাড়াকাড়ি পড়ে যাবার বছরটি তাই 'প্রতিনিধি প্রেরণের বছর' (খৃ. ৬৩১/ হি. ৯) নামে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরিত। ৬১০ খৃস্টাব্দে নবুয়ৎ প্রাপ্তির অল্পকাল পর থেকেই যে নবী (সঃ)-কে ইসলাম প্রচারের জন্য নির্মমতম নির্যাতনের মধ্যে বার বার নিদারুণ যন্ত্রণা বহন করতে হয়েছে, ৬৩১ খৃস্টাব্দে এই তাবুক অভিযানের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত মাত্র ২১ বছরে অর্জিত তাঁর বিশ্বব্যাপী সাফল্য সেই নবী (সঃ)-কে বিপুল সম্মানের অধিকারী করল। অনাথ মুহম্মদ (সঃ)-এর জীবনের এই একুশ বছর বিশ্ব-ইতিহাসের হাজার হাজার বছরের গতিপথকে প্রবল বেগে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করল।

এরপর মহানবী মুহম্মদ (সঃ)-এর বিদায় হজ্জ, শেষ ভাষণ এবং মহাপ্রয়াণ। ৬৩২ খৃস্টাব্দে মহানবী মুহম্মদ (সঃ)-এর দেড় বছর বয়স্ক পুত্র ইব্রাহীম পরলোক গমন করলেন। শোকের অশ্রু তাঁর হৃদয়ের দুকূল ছাপিয়ে দু-চোখের

কান্নায় কান্নায় উচ্ছ্বসিত হল। তাঁর 'দু'চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরছিল।' (শারখান)। নবী মুহম্মদ (সঃ)-এর বুকের মধ্যে থেকে শোককাতর পিতা মুহম্মদ যেন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তাঁরো কানে কানে কে যেন পরলোকের সুর শুনিয়ে গেল। বিশ্ব থেকে বিদায় নেবার আগে বিশ্বের প্রথম মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মহান কাবা-শরীফ শেষবারের মত প্রদক্ষিণ করার জন্য তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। ভক্তরা তাঁর এ আকুলতা ও ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তাঁর সঙ্গে হজ্জ্ করতে যাবার জন্য দলে দলে প্রস্তুত হলেন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে জানুয়ারী (২৫ জিলকদ, ১০ম হি.) মহানবী মুহম্মদ (সঃ) তাঁর শিষ্য ও পত্নীদের নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে বহু পুণ্যার্থী মুসলমান তাঁদের সঙ্গী হলেন। ৭ই মার্চ (৫ই জিলহজ্জ) তিনি জুল হুলাইফা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে রাত্রি যাপন করলেন। পরদিন প্রত্যূষে সবাই ইহ্রাম (সেলাই বিহীন বস্ত্র) ধারণ করলেন। তারপর সদলবলে মক্কায় প্রবেশ করে সাতবার কা'বাশরীফ প্রদক্ষিণ করলেন। মক্কা-প্রতিষ্ঠাত্রী মা-হাজেরার মহান স্মৃতির কথা স্মরণ করে সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যে সাতবার ছুটোছুটি করলেন। ৮ই জিলহজ্জ্ মহানবী (সঃ) মক্কা পরিত্যাগ করে মীনার পথে যাত্রা করলেন। সেখানে রাত্রিবাস ক'রে পরদিন ভোরে প্রভাতী প্রার্থনার (ফজরের নামাজের) পর তাঁর আল-কাসোয়ায় সওয়ার হয়ে শিষ্যদের নিয়ে আরাফাত ময়দানের দিকে যাত্রা করলেন। সেখানে আরাফাত পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে বিশ্ব মুসলিমের উদ্দেশ্যে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর জীবনের সর্বশেষ ভাষণ দান করলেন। বললেন :

"হে আমার প্রিয় ভক্তবৃন্দ, মনে রেখো, সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই—কেউ কারো চেয়ে ছোট বা কেউ কারো চেয়ে বড় নয়। একদিন আল্লাহ্‌তা'লার কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে।

নারীদের ওপর অত্যাচার করো না, নারীর ওপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীরও তেমনি অধিকার আছে। মনে রেখো আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের গ্রহণ করেছ।

দাস-দাসীদের ওপর অত্যাচার করো না, বরং তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে—তোমরা যা খাবে তাদের তাই খেতে দেবে, তোমরা যা পরবে তাদেরও তাই পরতে দেবে। মনে রেখো, তারা তোমাদেরই মত মানুষ।

মনে রেখো, সুদ খাওয়া হারাম, হত্যা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ, বংশের বড়াই সর্বনাশের কারণ।

সাবধান, নেতাকে অমান্য করোনা। একজন ক্রীতদাস নেতা হলেও নীরবে তাঁর আদেশ পালন ক'রো।

সাবধান, পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হয়োনা, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কারো অংশী স্থাপন করোনা। চুরি করোনা, ব্যভিচার করোনা মিথ্যা কথা বলোনা—চিরদিন সত্যাশ্রয়ী হয়ে পবিত্র জীবন যাপন ক'রো।

আর ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো'না, এই বাড়াবাড়ির ফলে অতীতে বহুজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

মনে রেখো, আমিই শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী আসবেনা।

আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র গ্রন্থ (কোরআন) আর আমার সুন্নত (অর্থাৎ

নিয়ম বা হাদীস) রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা ঐ গ্রন্থকে অনুসরণ করবে, আমার সুন্নতকে অনুসরণ করবে, ততদিন কেউ তোমাদের ধ্বংস করতে পারবে না।

মনে রেখো, একদিন তোমাদের আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে, সেদিন তোমাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

আজ এখানে যারা উপস্থিত নেই, আমার বাণীকে তোমরা তাদের কাছে পেঁৗছে দিও।''

ভাষণ শেষে মহানবী মুহম্মদ (সঃ) নীরব হলেন, তাঁর মুখমণ্ডল জ্যোতির্দীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি ঊর্ধ্বগগনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে করুণ গম্ভীর আবেগ বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, 'হে আমার আল্লাহ্‌, হে আমার প্রভু, আমি কি তোমার বাণী পেঁৗছে দিতে পারলাম?' সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ভক্তকণ্ঠে নিনাদিত হল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' মহানবী মুহম্মদ(সঃ) তখন কাতর কণ্ঠে বললেন, 'প্রভু! সাক্ষী থাকো—এরা বলছে, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।' সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌তা'লা আকাশবাণী (অহী) মারফৎ জানালেন, '(হে মুহম্মদ,) আজ আমি তোমাদের ধর্মকে সম্পূর্ণ করলাম; তোমাদের প্রতি আমার করুণা (নেয়ামত) পূর্ণ করে দিলাম, ইসলামকেই তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম।' ৫(৩)

স্বর্গমর্ত্যের সুর-সৌরভে ভরা সেই আশ্চর্য অভিভাষণের পর মানুষের নবী সেই বিশাল জনসমুদ্রকে সম্ভাষণ করে বললেন, 'বিদায়, বন্ধুগণ, বিদায়।'

এর অল্পদিন পর তিনি সত্য সত্যই বিদায় নিলেন।

কিন্তু তাঁর সেই বিদায়-গোধূলিও মনুষ্যত্বের দুর্লভ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাঁর মৃত্যুকাল সমাসন্ন। তিনি ক্ষণে জ্ঞান হারাচ্ছেন, ক্ষণে জ্ঞান ফিরে পাচ্ছেন। এমন সময় তাঁর মনে পড়ল, 'পয়গম্বরদের সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী নেই।' অথচ তাঁর ঘরে তো তখনো ৬টি দীনার মজুদ। তা তিনি কোন্‌ উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যাবেন? তিনি বিবি আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কাছে যে দীনার গুলো দিয়েছিলাম, সেগুলো কোথায়?' আয়েশা বললেন, 'আমার কাছেই।' হজরত বললেন, 'এখুনি সেগুলো দান করে দাও।' এই বলতে বলতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। খানিক পরে জ্ঞান ফিরে পেয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'দীনারগুলো দান করেছ কি?' আয়েশা বললেন, 'না, এখনো দান করিনি।' মানুষের নবী তখন সেগুলো আনিয়ে নিজ হাতে দান করে দিলেন। পয়গম্বরের 'যাকিছু থাকবে সবই দানের বস্তু।' তাই মৃত্যুর পরে তাঁর উত্তরাধিকারীরা নিতান্ত মূল্যহীন বস্তুগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ব্যতীত কিছুই পেলেন না!

ক্রমে সংকট আরো ঘণীভূত হচ্ছে, আজরাইল বুঝি এখন তাঁর শিয়রে। নবী (সঃ) তার সহচরদের তাঁর শয্যাপার্শ্বে ডাকলেন। তারপর বললেন, 'যদি আমি কখনো কারো প্রতি অন্যায় করে থাকি, তবে আজ সকলের সামনে সে আমার নিন্দা করুক। যদি আমি কখনো অন্যের জিনিস গ্রহণ করে থাকি তবে সে আজ আমার সামনে এসে তার দাবী আদায় করে নিক। কারণ পরলোকে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করার চেয়ে ইহলোকে শাস্তি ভোগ করা অনেক সহজ।'[৩৬] এ কথায় সবার চোখে অশ্রু ছলছলিয়ে উঠল। ভক্ত আক্কাস এই সুযোগে তাঁর পৃষ্ঠপ্রদেশে চুম্বন দান করলেন।

৩৬ Washington Irving—Life of Muhamed P. 316

বিদায়ের আগে তিনি তাঁর ভক্তদের ব্যক্তিপূজা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পুনরায় সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'সাবধান, তোমরা যেন আমার কবরকে পূজা করোনা, পৃথিবীর বহু জাতি এই পাপে ধ্বংস হয়েছে।' তারপর বিবি আয়েশার কোলে মাথা রেখে উর্ধ্বলোকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'হে আমার প্রিয়তম বন্ধু, আমি তোমার কাছে যেতে চাই।' এরপর তাঁর কণ্ঠ চিরকালের মত নীরব হল। (ইন্নালিল্লাহে...)। পরমপ্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের গোধূলি রাগে তাঁর এ বিদায় লগ্ন পরম রমণীয় হল।

তাঁর কণ্ঠ নীরব হল, কিন্তু কণ্ঠনিঃসৃত অমর বাণী আজ বিশ্বের দিক-দিগন্তে অমৃত মন্ত্রের মত চিরসরব চিরঝঙ্কৃত।

আজ এই বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিদীপ্ত বিলীয়মান মধ্যাহ্নে মানুষ অনায়াসে ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষকেই ঈশ্বরজ্ঞানে আরাধনা করে, তাদের সমাধিক্ষেত্রকে বিবিধ উপচারে পূজা করে, ভক্তির প্রাবল্যের নামে ঈশ্বরের সংখ্যাধিক্যকে নিরন্তর বৃদ্ধি করে। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) তাই তাঁর কবরকে পূজা করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছিলেন, নিজেকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরপুত্র বলে জাহির না করে 'তোমাদেরই মত মানুষ আমি' বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর মানুষসত্তাকে ঘোষণা করেছিলেন। নবী হওয়া সত্ত্বেও সকলের কাছে দোষে গুণে ভরা মানুষেরই মত ক্ষমা চেয়েছিলেন।

তিনি ধনবৈষম্যকে দূর করার জন্যে জাকাত (দরিদ্রকর) দানকে ধনীদের ওপর ফরজ করেছিলেন, আর্থনীতিক শোষণকে প্রতিহত করার জন্যে সুদকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন, সুদখোর মহাজনদের মহাশাস্তি সম্পর্কে কঠোর কণ্ঠে সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'আত্‌তাজেরা হাবিবুল্লাহ্' অর্থাৎ 'ব্যবসায়ী আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র' বলে ঘোষণা করে আর্থনীতিক উন্নতির ক্ষেত্রে সকলকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছিলেন—সেই সঙ্গে নামাজকে, রোজাকে, হজ্জ্বকে, জ্ঞানার্জনকে ফরজ করেছিলেন। এক কথায় তিনি 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি' কথাটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সংসার ও স্বর্গ উভয় জগতের প্রতি যথাযোগ্য অনুরাগ প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় মর্তজগৎইতো স্বর্গজগতের শস্যক্ষেত্র—আদ্দুনিয়া মাজেরাতুল আখেরাত। মাটির পৃথিবীতে সৎকর্মের সাধনা না করলে স্বর্গসুখের আশা দুরাশা মাত্র! পার্থিব কাজকর্মের নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পাদনই মানুষকে অধ্যাত্মিক জগতের উর্ধ্বলোকে উন্নীত হবার পথে সোপানের মত সহায়তা করে।

জগৎ ও জীবনকে তাই তিনি নিজেও কোনদিন অস্বীকার করেননি, কাউকে অস্বীকার করার পরামর্শও দেননি। তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে বিন্দুমাত্র ব্যবধান ছিল না। তিনি মানুষকে যা করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন, নিজের জীবনে নিজে তা পালন করে তার আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব, জাকাত—ইসলামের এ পঞ্চ স্তম্ভের প্রতিটি স্তম্ভই তাঁর জীবনে সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাস্তবায়িত হয়েছে। অনাথ আতুরের সেবা, দরিদ্রকে দান, বিপন্ন শত্রুকেও পরিচর্যা—এসব আদর্শ তিনি শুধু মৌখিক উপদেশে সীমাবদ্ধ না রেখে হাতে কলমে রূপায়িত করে জগৎবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। যে ইহুদিনী তার চলার পথে বিষাক্ত কাঁটা দিয়েছে, তার বিপদকালে তিনি নিজে হাতেই তার মলমূত্র পরিষ্কার করে ও সেবা করে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। যারা পাথর ছুঁড়ে মেরে তাঁর দেহকে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাপ্লুত করেছে তাদেরই ছেলেকে তিনি নিজের নির্যাতন ভুলে কোলে তুলে নিয়ে সেবা করেছেন। ক্ষমার আদর্শ শুধু মুখে প্রচার না করে ক্ষমার

অযোগ্য অপরাধীকেও ক্ষমা করে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। স্বাবলম্বনের আদর্শকে শুধু তাঁর কথার রাজ্যে বন্দী না রেখে নিজে শৈশব থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা জগৎবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। 'আত-তাজাওজো নেসফোদ্দীন' বা 'বিবাহ ধর্মের অর্ধাংশ' এ আদর্শ শুধু মুখে প্রচার না করে, ঈশ্বর-দর্শনকারী মহাপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী না হয়ে বিবাহ ক'রে সংসারী হয়েছেন, আদর্শ স্বামী হিসেবে স্ত্রীর সাথে সখীর মত সদ্ব্যবহার করেছেন, আদর্শ পিতা হিসেবে সন্তান-স্নেহে ও অপত্য-কর্তব্যে সর্বদা পরিপূর্ণ থেকেছেন। বিশ্বব্যাপী অসহায় বিধবাদের ব্যর্থ জীবনে আশা ও আশ্বাসের পুষ্পমঞ্জরীকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে তিনি বিধবা বিবাহের আদর্শকে বাস্তবায়িত করেছেন। অন্যায়ের প্রতিরোধের নিছক বাণী প্রচার না করে তিনি সংঘ গঠন করে, সংগ্রাম করে সর্বশক্তি দিয়ে অন্যায়কে প্রতিরোধ করেছেন। দেশব্যাপী তরুণ তাজা প্রাণগুলোর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরিশ্রম করে তিনি শ্রমের মর্যাদাকে এবং আল্লাহ্ যে মানুষকে 'শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি' করেছেন তার মর্যাদাকে ৯০ (৪) জীবন্ত করে তুলেছেন। এক কথায় তিনি কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হয়েছেন। ফলে অজ্ঞানতা ও হতাশায় জর্জরিত সারা পৃথিবীতে যেন কোন মায়ামন্ত্রবলে এক অভূতপূর্ব নবজাগরণের জোয়ার জেগে উঠেছিল। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়ম মুয়র যথার্থই বলেছেন, 'তাঁর শিক্ষা অলৌকিক এবং মহতী কার্য সম্পাদন করেছিল। আদিম খৃষ্টধর্ম[৩৭] যেদিন জগৎকে তার নিদ্রা থেকে জাগ্রত করেছিল এবং পৌত্তলিকতার সাথে জীবনপণ সংগ্রাম শুরু করেছিল সেদিনের পর মানুষ কখনো আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এমন জাগরণ এবং ধর্মের জন্য এমন ত্যাগ স্বীকার দর্শন করেনি।'

যাঁর কথা ও কাজে মিলের কোন অভাব ছিলনা, তাঁর চেহারা এবং চরিত্রেও গরমিলের চিহ্ন ছিলনা। নবী (সঃ)-এর চেহারা ও চরিত্র দুই-ই ছিল চাঁদের মত সুন্দর অথচ চাঁদের চেয়েও নিষ্কলুষ। চেহারা মধ্যমাকৃতি, গায়ের রঙ ফর্সা, উন্নত নাসিকা, বঙ্কিম ভ্রূ, প্রশস্ত ললাট, মুখভরা গুম্ফহীন দাড়ি এবং কর্ণতল-প্রলম্বিত-কুঞ্চিত-কেশদাম। দৌহিত্র হজরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) তাঁর অঙ্গলাবণির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'পূর্ণিমা রাতে উজ্জ্বল চাঁদের মত তাঁর পবিত্র অঙ্গজ্যোতি ঝলমল করত।' (তিরমিজী)। হজরত জাবের-ইবনে-সামের (রাঃ) বলেন, 'আমি এক চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত রাতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে দেখেছিলাম।...আমি একবার রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দিকে আর একবার চাঁদের দিকে তাকালাম। অবশ্য তিনিই চাঁদ অপেক্ষা অধিক সুন্দর।' (তিরমিজী)। তাঁর চাঁদের মত উজ্জ্বল মুখে মুক্তার মত ঝকঝকে দন্তপাতি—তাঁর মৃদু হাসির ঝিলিকের আলোয় সূচে সুতো পরানোটাও বিবি আয়েশার পক্ষে কঠিন ছিল না। এই অপরূপ রূপের-আলোয়-ঝলমল-করা-চেহারার মত তাঁর চরিত্রখানাও অপরূপ মাধুর্যের দ্যুতিতে দীপ্তিমান ছিল। ছোট বড় নির্বিশেষে তিনি সকলের সাথে সমান ব্যবহার করতেন, ক্রীতদাসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন, পরম শত্রুর সাথেও মধুর ব্যবহার করে তার হৃদয়হরণ করতেন। তাঁর চরিত্রমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে মানুষ তাঁর ধর্ম ও আদর্শ গ্রহণ করত। ঐতিহাসিক আমীর আলি বলেছেন, 'কোন রাজকীয় শিবাই তাঁর সাহায্যার্থে এই নতুন বিধান বলপূর্বক প্রয়োগ করার

৩৭ একেশ্বরবাদী খৃষ্টধর্ম

আদেশ নিয়ে উপস্থিত হন নি।'[৩৮] তাঁর প্রেমের বলে, তাঁর ধৈর্যের বলে, তাঁর চরিত্রশক্তির প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য মাধুর্যের বলে নিখিল জগৎ তাঁর কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছে। হজরত হাসান (রাঃ) বলেছেন, 'তিনি সব সময় হাসিমুখে থাকতেন, বিনয় ও সরলতার সাথে সকলের সাথে মেলামেশা করতেন, রুক্ষ মেজাজ, কটু কথা বা অপ্রিয় বাক্য দ্বারা কাউকে অসন্তুষ্ট করতেন না। তিনি কারো দোষের আলোচনা করতেন না বা কাউকে অতিরিক্ত প্রশংসা করতেন না।' (বুখারী)। নিন্দা কাকে বলে তিনি জানতেন না। তিনি ছিলেন পবিত্র কোরআনের সর্ববিধ আদর্শের সুসম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। একবার জনৈক নবীসহচর মা আয়েশার কাছে নবী (সঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'তোমরা কি কোরআন পড় না? পবিত্র কোরআনই তো ছিল তাঁর জীবনচরিত।' শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহাম্মদ তাহের সাহেব যথার্থই বলেছেন, 'কুরআন আল্লাহর কালাম, আল্লাহর কিতাব—প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তার মূর্তিমান ব্যাখ্যা, অনিন্দ্যসুন্দর তফসীর।'[৩৯]

---

৩৮. Life of Mohammad in His Spirit of Islam—Ameer Ali.
৩৯. শেষ নবী।

মুহম্মদ (সঃ) ঃ জীবনপঞ্জী বা সময়-তালিকা (Time Chart)

৫৭০ খ্রী. →জন্ম।
৫৭৪ খ্রী. →ছিনাচাক বা বক্ষোবিদারণ।
৫৭৬ খ্রী. →মা আমিনার মৃত্যু।
৫৭৮ খ্রী. →আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যু।
৫৮২ খ্রী. →মুহম্মদ (সঃ)-এর সিরিয়ায় বাণিজ্য-যাত্রা
ও খ্রীস্টান সাধু বুহায়রার সঙ্গে সাক্ষাৎ।
৫৯৫ খ্রী. →হলফুল ফজুল গঠন।
৫৯৫ খ্রী. →খাদিজার সঙ্গে বিবাহ।
৭০৫ খ্রী. →কাবা-সংস্কার এবং হাজরুল আসওয়াদ পুনঃ স্থাপন।
৬১০ খ্রী. →নবুয়ৎ লাভ। খাদিজা, আবুবকর ও আলীর ইসলাম গ্রহণ।
৬১৪ খ্রী. →প্রথম প্রকাশ্য ইসলাম প্রচার।
~~৬২৫~~ ৬১৫ খ্রী. →মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় আশ্রয় লাভ এবং
আবিসিনিয়া-রাজ নাজ্জাসীর ইস্‌লাম গ্রহণ।
৬১৬ খ্রী. →মহাবীর হামজা এবং ওমরের ইস্‌লাম গ্রহণ।
৬২০ খ্রী. →খাদিজা ও আবুতালেবের মৃত্যু। তায়েফ গমন।
৬২১ খ্রী. →শবে মে'রাজ। আবুবকরের 'সিদ্দীক' উপাধি লাভ।
৬২২ খ্রী. →হিজরত। 'মদীনা' নামের সৃষ্টি।
৬২৪ খ্রী. →বদর যুদ্ধ।
৬২৫ খ্রী. →ওহদ যুদ্ধ।
৬২৭ খ্রী. →পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধ।
৬২৮ খ্রী. →হুদায়বিয়ার সন্ধি।
৬২৯ খ্রী. →খয়বর যুদ্ধ। মহাবীর খালেদ
ও আমর-বিন-আসএর ইসলাম গ্রহণ।
৬৩০ খ্রী. —মুতার যুদ্ধ। মক্কাবিজয়। হুনায়নের যুদ্ধ।
৬৩১ খ্রী. →তাবুক অভিযান।
৬৩২ খ্রী. →বিদায় হজ্জ। মৃত্যু।

শাস্ত্রীয় শব্দের অভিধানিকা

অছিলা—উপলক্ষ।
অজু—পরিচ্ছন্ন। পরিচ্ছন্নতা। জ্যোতি।
অহী—প্রত্যাদেশ। ঐশীবাণী।
আকিকাহ্—নামকরণ-অনুষ্ঠান।
আজান—আহ্বান। নামাজে আহ্বান।
আজাব—শাস্তি।
আদব-কায়দা—শিষ্টাচার।
আমানত—গচ্ছিত ধন।
আয়ত—বাক্য। বহুবচনে আয়াত।
আরিয়াত—বিনামূল্যে কোন সম্পত্তি বন্দোবস্ত দেওয়া।
ইমাম—নেতা। সমবেত নামাজ পরিচালনাকারী।
ইস্‌লাম—আত্মসমর্পণ। শান্তি।
ঈমান—বিশ্বাস। আল্লাহ্ ও রসূলে পরিপূর্ণ বিশ্বাস।
ঈদ—উৎসব। আনন্দ।
এতীম—অনাথ।
এ'তেকাফ—আবদ্ধ রাখা। রমজানের শেষ ১০ দিন নিজেকে নিয়ম-মাফিক মসজিদে আবদ্ধ রাখা।
এফ্‌তার—উপবাস ভঙ্গ।
এস্তেঞ্জা—মলমূত্র ত্যাগের শিষ্টাচার।
এহ্‌রাম—হজ্জ্‌কালে শাস্ত্রসম্মত সেলাই-বিহীন শুভ্র বস্ত্র পরিধান।
ওলিমা—বিবাহে বরপক্ষের ভোজ।
ওয়াক্‌ফ—আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দান।
ওয়ারিস—অংশীদার।
কদর—সম্মান।
কবর—সমাধি।
কবীরা গুনাহ্—মহাপাপ।
কলেমা—বাক্য। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন সংক্রান্ত বিশেষ ৫টি বাক্য বা মন্ত্র।
কাওসার—ঝরনা। দুধের অপেক্ষা সাদা এবং মৃগনাভি অপেক্ষা সুঘ্রাণ-যুক্ত স্বর্গীয় প্রস্রবণ।
কাফের—অবাধ্য। [কুফর ধাতু থেকে উদ্ভূত—যার অর্থ অবাধ্যতা করা]
কাফন—শবাচ্ছাদন বস্ত্র।
কেয়ামত—মহাপ্রলয়।
কোরআন—পাঠ্যগ্রন্থ।
কোরবানী—উৎসর্গ। বলিদান। ত্যাগ।
খাত্‌না—লিঙ্গাগ্রচ্ছদাচ্ছেদন।
খোৎবা—ধর্মীয় বক্তৃতা।
খোশখবর—সুসংবাদ।
গুনাহ্—পাপ।
গোসল—স্নান।
জবেহ্—শাস্ত্রসম্মত হত্যা।
জমজম—মক্কায় অবস্থিত এক পবিত্র প্রস্রবণ।
জাকাত—শুদ্ধিকরণ। উদ্বৃত্ত ধন-সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ বাধ্যতামূলক দান।
জানাজা—মৃত আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা।
জান্নাত—স্বর্গ।
জামাত—ঐক্য।
জামাতে নামাজ—ঐক্যবদ্ধ উপাসনা।
জুম্‌আ—সাপ্তাহিক ঐক্যবদ্ধ নামাজের দিন বা শুক্রবার।
জেহাদ্—ধর্মযুদ্ধ।
তওবা—অনুতাপ। অনুশোচনা।
তকবীর—আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি।
তস্‌বীহ্—সোবহানাল্লাহ্।
তাবেয়ী—যিনি নবী সহচরকে দেখেছেন। বহুবচনে তাবেয়ীন।
তাহ্‌মীদ—আলহামদুলিল্লাহ্।
তায়াম্মুম—মাটি দ্বারা পবিত্র হবার চেষ্টা।
তালাক—বিবাহবিচ্ছেদ।
তালবিয়াহ্—হজ্জ্‌কালে 'লাব্বায়েক' বলা। ইমাম আবু হানীফার মতে এ কাজ ওয়াজেব এবং ইমাম শাফেয়ীর মতে সুন্নত।
তারাবিহ্—রমজান মাসে রাতের নামাজ
তাহাজ্জুদ—নিশুতি রাতের নামাজ।
দরুদ—নবী (সঃ)-এর জন্য শুভ-কামনা।

দাফন—মৃতব্যক্তিকে কবরস্থ করা।
দীন—ধর্ম। দীনদার—ধার্মিক ব্যক্তি।
দোজখ—নরক। দোয়া—প্রার্থনা।
নফল—ঐচ্ছিক। Optional.
নসীব—ভাগ্য।
নামাজ—বিনীত উপাসনা।
নিয়ত—উদ্দেশ্য। সংকল্প।
নূর—জ্যোতি। নেকী—পুণ্য।
পয়গম্বর—বাণীবাহক। দূত। প্রেরিত পুরুষ।
পাক—পবিত্র।
পীর—বন্ধু। জ্ঞানবন্ধু।
পুলসেরাত—সেতুপথ। চুলের চেয়ে সরু, তলোয়ারের চেয়ে ধারাল এই সেতুপথ অতিক্রম করে বেহেশ্‌তে যেতে হবে।
ফরজ—অবশ্য কর্তব্য।
ফিৎরাহ্—রমজান মাসে অবশ্য দেয় দান।
ফিৎনা-ফাসাদ—ঝগড়াবিবাদ।
ফেরেশ্‌তা—আল্লাহ্‌র দূত বা Angel.
বদ-দোয়া—অশুভ কামনা।অভিশাপ।
বদি—পাপ। বদনসীব—হতভাগ্য।
বিস্‌মিল্লাহ্—আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।
বেতের বা বিৎর—বেজোড় নামাজ।
বেদীন—বিধর্মী। বেহেশ্‌ত—স্বর্গ।
মসজিদ—উপাসনালয়। সিজদার ঘর।
মসীহ্—পরশমুক্তি।[১]
মিনার—স্তম্ভ। চূড়া।
মিম্বার—বেদী।
মুমিন বা মোমেন—প্রকৃত মুসলমান।
মুসলমান—আত্মসমর্পণকারী। শান্তিকামী।
মুহম্মদ—প্রশংসিত।
মুনাফিক (মোনাফেক)—কপটচিত্ত। ['যে মুখে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে কাফির, ইসলাম ধর্মকে মানে না।'[২]]
মুত্তাকী—সাধু বা সাবধানী মুসলমান। তাক্‌ওয়া (সাধুতা) শব্দ থেকে জাত। 'কাঁটায় ঘেরা পথে চলিবার সময় কাঁটার ভয়ে যাত্রীর কাপড়চোপড় গুটাইয়া সন্তর্পণে চলার উপর তাক্‌ওয়ার অনুমান করা যাইতে পারে।'[৩]
মুশ্‌রিক—অংশীবাদী। মূল শিরিক ধাতু—অর্থ 'অংশীদার মানা'।
মুহাদ্দেস—হাদীস-শাস্ত্রজ্ঞ।
মোহ্‌রানা—বিবাহে অবশ্য দেয় স্ত্রীধন।
রাবী—হাদীস বর্ণনাকারী।
রিয়া—লোক দেখানর ইচ্ছা। প্রদর্শনেচ্ছা।
রেহান—বন্ধক।
রোজহাশর—মহাবিচারের দিন।
রোজা—উপবাস।
শয়তান—আল্লাহ্‌র আদেশ লঙ্ঘনকারী।
শাফায়াত—সুপারিশ।
শোকর—কৃতজ্ঞতা।
শারাবন তহুরা—পবিত্র মদিরা, অমৃত।
সগীরা গুনাহ্—ছোট পাপ।
সফর—ভ্রমণ। সবর—ধৈর্য।
সালাম—শান্তি। শান্তি-সম্ভাষণ।
সাহাবী—মুহম্মদ (সঃ)-এর সহচর। বহুবচনে আসহাব।
সুন্নত—নিয়ম। রসূলের নিয়ম হাদীস।
হজ্জ্—কাবা পরিদর্শন।
হাজী—যিনি হজ্জ্ করেছেন।
হাফেজ—কণ্ঠস্থকারী। কোরআন-হাদীস কণ্ঠস্থকারী।
হাবিব—প্রিয়। হাম্মামখানা—স্নানাগার।
হালাল—বৈধ। হারাম—অবৈধ।

---

১ 'মসীহ্' শব্দটি ৩য় খণ্ডে ৩২৩ পৃষ্ঠার ৩য় অনুচ্ছেদে আছে। কিন্তু এর পাদটীকা মুদ্রণত্রুটির ফলে ৩২২ পৃষ্ঠার তলায় ছাপা হয়েছে।

২ আলকুরআন (তরজমা ও তফসীর) ৫ম খণ্ড—মোহাম্মদ তাহের।

৩ ঐ।

হাদীসের পরিভাষা

হাদীস : হাদীস শব্দের সাধারণ অর্থ বাণী বা উপদেশ—শাস্ত্রীয় অর্থ মহানবী মুহম্মদ (সঃ)-এর বাণী, তাঁর কাজ এবং অন্যের কাজের প্রতি তাঁর সমর্থন।

সাহাবী : সাহাবী শব্দের অর্থ নবী-সহচর—বহুবচনে আসহাব অর্থাৎ নবী-সহচরগণ। এ'রা স্বয়ং নবী (সঃ)-এর মুখ থেকে শুনে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাবেয়ী ও তাবেয়ে-তাবেয়ী : যাঁরা নবী (সঃ)-কে দেখেননি, কোন নবীসহচর (সাহাবী)কে দেখেছেন, তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষা করেছেন এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন—তাঁদের তাবেয়ী বলে। আর যাঁরা কোন তাবেয়ীর কাছে হাদীসশিক্ষা করেছেন তাঁদের তাবেয়ে-তাবেয়ী বলে।

রেওয়ায়েত : হাদীস বর্ণনা করাকে 'রেওয়ায়েত' বলে।

রাবী : রেওয়াত বা হাদীস বর্ণনাকারীকে রাবী বলে।

সনদ : হাদীসের রাবী পরম্পরাকে অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের নাম-তালিকাকে সনদ বলে।

ইসনাদ : সনদ মুখে বর্ণনা করাকে ইসনাদ বলে।

মতন : বর্ণিত মূল হাদীসকে মতন বলে।

রেজাল ও আসমাউর রেজাল : হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীদের সমষ্টিগতভাবে রেজাল বলে, আর যে গ্রন্থে রাবীদের জীবনী বর্ণনা করা হয় তাকে আসমাউর রেজাল বলে।

আদালত ও আদেল : শেরেক, বেদা'ত, অশালীন আচরণ প্রভৃতি যাবতীয় পাপ থেকে যে শক্তি মানুষকে বিরত রাখে তাকে 'আদালত' বলে। আর যিনি এই 'আদালত' নামক শক্তির অধিকারী তাঁকে আদেল বলে।

জবত ও জাবেত : শোনা বা পড়া-বিষয়কে যে শক্তি বলে মানুষ যখন খুশী সঠিক ভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে 'জবত' বা সঠিক স্মরণশক্তি বলে। এই জবত শক্তির অধিকারীকে জাবেত বলে।

মুহাদ্দেস : হাদীস-বিশেষজ্ঞ ও হাদীস-সঙ্কলককে মুহাদ্দেস বলে। যেমন : ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) ইত্যাদি।

শায়খ : হাদীস শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ বলে।

শায়খাইন : ইমাম বুখারী (রঃ) ও মুসলিম (রঃ)কে শায়খাইন বলে।

মোত্তাফেক আলাইহে : ইমাম বুখারী ও মুসলিম দুজনেই যে হাদীস একই সাহাবীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন তাকে 'হাদীসে মোত্তাফেক আলাইহে' বলে।

সিহাসেত্তা : অর্থ, বিশুদ্ধ ছয় হাদীস। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসায়ী ও ইবনে মাজা (বা মুয়াত্তা)-কে 'বিশুদ্ধ ছয় হাদীস' বলে।

সহীহায়েন : বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফকে একত্রে সহীহায়েন বলে।

সুনানে আরবা : বুখারী ও মুসলিম শরীফ ব্যতীত সিহাসেত্তার বাকী চারখানা হাদীসকে সুনানে আরবা বলে।

হাদীস শরীফ

অতিথি পরায়ণতা

"তোমার কাছে ইব্রাহীমের সম্মানিত অতিথিদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন ওরা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম', উত্তরে সে বলল, 'সালাম।' তার মনে হল, 'এরা তো অপরিচিত লোক।' তারপর ইব্রাহীম তাদের কিছু না বলে তার স্ত্রীর কাছে গেল এবং একটা মাংসল গোবৎস-ভাজা নিয়ে এল।" ৫১(২৪-২৬)

"সে (লূত) বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়!...আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার অতিথিদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে আমাকে হেয় করো না'।" ১১(৭৮)

—আল্-কোরআন।

১. যে লোক আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন অবশ্যই তার অতিথিকে সম্মান করে।—শায়খান। আবুদাউদ। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২. একজন লোক নবী (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বলে জানাল। তখন নবী (সঃ) প্রথমে নিজের ঘরে তাঁর স্ত্রীদের কাছে (তার জন্য খাদ্য চেয়ে) খবর পাঠালেন। তাঁরা সবাই উত্তর পাঠালেন, 'আমাদের কাছে কেবল পানি ছাড়া আর কিছুই নেই।' তখন হজরত (দঃ) আহ্বান জানালেন, '(এমন) কেউ আছে কি যে আজকের রাতে এই ব্যক্তিকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করবে?' মদীনাবাসী এক সাহাবী (নবীসহচর) দাঁড়িয়ে বললেন, 'হাঁ, আমি প্রস্তুত আছি হে রসূলুল্লাহ্‌!' এই বলে' তিনি অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, 'রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর অতিথিকে নিয়ে এসেছি—পুরোপুরি রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর অতিথির উপযুক্ত সম্মান কর, অতিথিকে না দিয়ে কোন কিছু ঘরে জমিয়ে রেখো না।' স্ত্রী বললেন, 'ঘরে কেবল ছেলেমেয়েদের জন্য সামান্য খাদ্য আছে; এ ছাড়া আর কিছুই নেই।' তখন ঐ সাহাবী স্ত্রীকে বললেন, 'ঐ খাদ্যটুকুই অতিথির জন্য প্রস্তুত কর এবং ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। আর (আমাদের ছাড়া অতিথি খাদ্য গ্রহণ করতে চাইবে না, কিন্তু খাদ্য অল্প, আমরা খেলে অতিথির পেট ভরবে না, তাই) খাওয়ার সময় বাতি নিবিয়ে দাও।' স্ত্রী তাই করলেন। ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে দিলেন, আর ঐ খাদ্য অতিথির জন্য প্রস্তুত করে' বাতি জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর গৃহস্বামী অতিথিকে নিয়ে খেতে বসলেন, তখন স্ত্রী বাতির সলতে ঠিক করার ভান করে' বাতি নিবিয়ে দিলেন এবং অন্ধকারের মধ্যে গৃহস্বামী ও তাঁর স্ত্রী হাত নাড়াচাড়া করে অতিথিকে এমন বুঝোলেন যেন তাঁরাও তার সাথে খাচ্ছেন। কিন্তু আসলে তাঁরা কিছুই খাননি, সমস্ত খাদ্যই অতিথিকে খাবার সুযোগ করে দিয়েছেন মাত্র। এইভাবে গৃহস্বামী ও তাঁর স্ত্রী (সপরিবারে) অনাহারে রাত্রি অতিবাহিত করলেন। ভোরবেলা ঐ (অতিথি)-সাহাবী হজরতের কাছে উপস্থিত হলে হজরত (দঃ) বললেন, অমুক স্বামী ও অমুক স্ত্রীর প্রতি আল্লাহতা'লা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদের প্রশংসায় কোরআনের এই বাণী অবতীর্ণ করেছেন: 'তারা ক্ষুধার্ত হয়েও নিজে না খেয়ে অপরকে খাওয়ায়। যে ব্যক্তি নিজের অন্তরকে কৃপণতা থেকে পবিত্র রাখতে পেরেছে সে সফলকাম হবেই।' —বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩. মানুষকে তার মর্যাদা অনুসারে অভ্যর্থনা করবে।—মুসলিম।

৪. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তার উচিত, যতদিন অতিথি আদর-আপ্যায়ন পাবার অধিকারী, ততদিন তাকে সম্মান করা।' জিজ্ঞাসা করা হল, 'ওর সীমা কি (অর্থাৎ কতদিন)?' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, একদিন এক রাত। তিনদিন পর্যন্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা যথেষ্ট হবে। এর অধিক দিন অপেক্ষা করলে অতিথির-জন্য ব্যয়-করা তখনকার পানাহার দান খয়রাতের ন্যায় গণ্য হবে। আর (অতিথির পক্ষে) অতিরিক্ত এতদিন থাকা উচিত হবে না যাতে গৃহস্বামীর কষ্ট হয়।'—বুখারী। শায়খান। বর্ণনায় ঃ আবু শোরায়হ্ (রাঃ)।

৫. আমার পিতা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে রসূলুল্লাহ্, একদিন আমি একজনের কাছে গেলে সে আমার কোনোরকম সমাদর করল না। যদি সে কোনদিন আমার কাছে আসে, তাহলে আমি কি তাকে আদর অভ্যর্থনা করব?' তিনি বললেন, 'হাঁ; তুমি তাকে অবশ্য অভ্যর্থনা করবে।'—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু আহ্ওয়াজ (রাঃ)।

৬. যখন কোন অতিথি কোন সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হয় তখন তার খাদ্যও সেই সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হয়। আর যখন সে চলে' যায় তখন তাদের মার্জনা নিয়ে চলে যায়।—সগির।

৭. খাঁটি মুসলমান ঈমানের খোঁটাতে দড়ি দিয়ে বাঁধা ঘোড়ার মত। ঘোড়া যেমন ঘুরে-ফিরে খোঁটার কাছে ফিরে আসে, খাঁটি মুসলমানও তেমনি ঈমানের দিকেই ফিরে আসে। কাজেই ধার্মিক মুসলমানদের তোমরা খাদ্য দাও এবং উপকার কর।—বয়হাকী। বর্ণনায় ঃ আবুসাঈদ (রাঃ)।

৮. আমরা নবী (সঃ)কে বলেছিলাম, 'যখন আপনি আমাদের কোন কাজে পাঠান, আমরা (কখনো কখনো) এমন সব লোকদের মধ্যে গিয়ে পড়ি যারা আমাদের আতিথ্য স্বীকার করে না। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?' তিনি বললেন, 'যদি তোমরা কোন জাতির লোকেদের কাছে যাও, আর তারা তোমাদের জন্য উপযুক্ত অতিথিসেবার আয়োজন করে, তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর তারা যদি তা না করে, তবে তাদের কাছ থেকে অতিথির হক (ন্যায় সঙ্গত প্রাপ্য) আদায় করে নেবে।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ওকবা ইবনে আমির (রাঃ)।

[ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম. এ. পি. এইচ. ডি মন্তব্য করেছেন, 'এই হাদীস সেই অবস্থার জন্য যখন চুক্তি থাকে কিংবা অত্যন্ত ক্ষুধার অবস্থায় অথবা খাদ্যবস্তু না থাকে। ইহা উপদেশ, আদেশ নহে।']

৯. সাহাবীরা বললেন, 'আমরা খেয়েছি কিন্তু তৃপ্তি পাই নি।' হজরত (দঃ) বললেন, 'বোধহয় তোমরা আলাদা আলাদা (বসে) খেয়েছ।' তাঁরা বললেন, 'হাঁ'। তিনি বললেন, 'একসঙ্গে খাও এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর, বরকত (প্রাচুর্য বা তৃপ্তি) পাবে।'—আবুদাউদ। বর্ণনায় ঃ ওয়াহ্শী (রাঃ)।

১০. দস্তরখান তোলার আগে কেউ যেন না (উঠে) দাঁড়ায়। খাদ্যে তৃপ্ত হলেও সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন না হাত তোলে, অন্যথায় সংগীগণ লজ্জা পেতে পারে। কেননা কারো (হয়তো) আরো খাদ্যের প্রয়োজন থাকতে পারে।—ইব্নে মাজা। বর্ণনায় ঃ ইব্নে ওমর (রাঃ)।

১১. আমার বিধান এই যে গৃহস্বামী তার অতিথির সাথে অন্ততঃ তার বাড়ীর দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হবে।—মিশকাত।

অত্যাচার

'আল্লাহ্ অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না।' ৩ (১৪০)

'অত্যাচারীদের জন্যে আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' ১৪ (২২)

'কিন্তু কেউ অত্যাচার করার পর অনুশোচনা (তওবা) করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' ৫ (৩৯)

'আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরিক করা হল সবচেয়ে বড় অত্যাচার।' ২১ পারা.

'যদি মোমেন মুসলমানের দুটো দল পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করে তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা ও পুনর্মিলন সৃষ্টির চেষ্টা কর। তোমাদের মীমাংসা-চেষ্টা সত্ত্বেও যদি একটা দল অপর দলের ওপর অত্যাচার করে, তবে তোমরা সকল মুসলমান একতাবদ্ধ হয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে' তাকে বাধ্য কর।' (২৬ পারা, ১৩ রুকু—৪৯ : ৯)

—আল্-কোরআন।

১২. অত্যাচার কেয়ামতের দিন (অত্যাচারীর কাছে) গাঢ় অন্ধকার (রূপে প্রতিভাত) হবে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

১৩. অত্যাচারীর জন্য পরলোকে শুধু অন্ধকার।—শায়খান।

১৪. অত্যাচার থেকে সতর্ক থাক, কারণ তা অন্তরকে বিপর্যস্ত করে।—সগির।

১৫. যে ব্যক্তি অত্যাচার করে' কিছু জমি কেড়ে নেবে, (কেয়ামতের দিন) সেই জমির নীচের সাত স্তবক জমি তার গলায় হাঁসুলী করে পরান হবে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ স'ঈদ ইবনে জইদ (রাঃ) :

১৬. যখন মোমেনগণ (অক্ষত দেহে পুলসেরাত পার হয়ে) দোজখের আগুন থেকে মুক্তি পাবে, তখন বেহেশ্ত ও দোজখের মাঝখানে এক পুলের ওপরে তাদের আটক রাখা হবে। তারপর দুনিয়াতে পরস্পরের কাছ থেকে অন্যায় করে (তারা) যা যা নিয়েছিল তার শোধবোধ হবে। শেষে যখন তারা (পাপ থেকে) শোধিত ও মার্জিত হয়ে যাবে, তখন তাদের বেহেশ্‌তে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। তারপর তাঁর শপথ যাঁর হাতে মুহম্মদের জীবন, নিশ্চয় তাদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার বাড়ীকে যেমন চিনত তার চেয়ে বেশি করে' তার বেহেশ্‌তের বাড়ীকে চিনবে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু সঈদ খুদ্‌রী (রাঃ)।

১৭. যে লোক তার ভায়ের ওপর অত্যাচার করেছে তার উচিত—যেদিন দিনার-দিরহাম (অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা-রৌপ্যমুদ্রা) কোন কাজে আসবেনা সেদিন আসার আগেই তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা। নতুবা তার সঞ্চিত পুণ্য তার অত্যাচারের বিনিময়ে গ্রহণ করা হবে ; আর যদি তার কোন পুণ্য না থাকে তবে সে যার ওপর অত্যাচার করেছে তার পাপের শাস্তি তাকে বহন করতে হবে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৮. অত্যাচারিতের প্রার্থনাকে ভয় কর, কারণ তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আকাশে উত্থিত হয়।—সগির।

১৯. অত্যাচারিতের প্রার্থনাকে ভয় কর, কারণ তার প্রার্থনা ও আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন আবরণ নেই।—শায়খান।

২০. অত্যাচারিতের প্রার্থনা হতে সাবধান হও, কারণ সে খোদার কাছে তার ন্যায্য অধিকার প্রার্থনা করবে, আর খোদা কখনো কারো ন্যায্য অধিকারে বাধা দেন না।—মিশকাত।

২১. হজরত নবী (সঃ) মোয়াজ (রাঃ)কে ইয়েমেন প্রদেশের শাসনকর্তা করে পাঠালেন। তাঁকে এই আদেশ করলেন যে, অত্যাচারিতের অশুভকামনা (বদ-দোয়া) ও অভিশাপকে পরিহার করে চলবে। (কেননা) অত্যাচারিতের অশুভকামনা (বদ-দোয়া) সরাসরি আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছায়, কোন কিছুই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

২২. 'তোমরা কি জান কে দরিদ্র?' তারা বলল, 'আমাদের মধ্যে যার কোন ধনসম্পত্তি নেই।' হজরত (দঃ) বললেন, 'বরং সেই ব্যক্তিই দরিদ্র যে পরলোকে নামাজ, রোজা ও জাকাত সহ উপস্থিত হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার কুৎসা, পরনিন্দা, অন্যায় ভোগদখল, অত্যাচার প্রভৃতি অসৎ কাজগুলোও উপস্থিত হবে। তারপর সৎ কাজগুলো ওদের (অর্থাৎ অসৎ কাজের) বিনিময় হবে এবং এতে (অর্থাৎ এই বিনিময় করতে) যদি তার সৎকাজগুলো নিঃশেষ হয়ে যায় তবে যাদের ওপর সে অত্যাচার করেছিল, তাদের পাপ তার ওপরে নিক্ষিপ্ত হবে, তারপর তাকে দোজখে বা নরকে নিক্ষেপ করা হবে।—মুসলিম।

২৩. অন্যায়ভাবে রক্তপাত করা বেহেশ্‌ত লাভের পথে এক বিরাট বাধা। সুতরাং অন্যায়ভাবে সামান্যতম রক্তপাত করা থেকেও বিরত থাকার জন্য যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। —বুখারী। বর্ণনায়ঃ জুন্দুব (রাঃ)।

২৪. তোমরা অত্যাচারী হয়ো না। আমি বলিনা যে মানুষ উপকার করলে তোমরা তাদের উপকার করবে এবং অত্যাচার করলে তোমরাও তাদের উপর অত্যাচার করবে; বরং বলি, যদি তারা উপকার করে তবে তাদের উপকার কোরো, কিন্তু তারা অত্যাচার করলেও তাদের ওপর অত্যাচার করো না। [অর্থাৎ ক্ষমাই উত্তম]। —তিরমিজী।

২৫. হজরত নবী (সঃ) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি অত্যাচারিত হয়ে ক্ষমা-প্রদর্শন করবে আল্লাহ্‌তা'লা তাকে সম্মানিত করবেন ও সাহায্যদান করবেন।—ফত্‌হুল বারী।

২৬. অত্যাচারী রাজাকে ন্যায্য কথা শুনিয়ে দেওয়াই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জেহাদ। —আবু দাউদ। তির।

২৭. যে ব্যক্তি জেনেশুনে কোন অত্যাচারীকে (জালেমকে) সাহায্য করে, সে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়। —মিশকাত।

২৮. রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন, 'তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারীই হোক কিংবা অত্যাচারিতই হোক।' কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'হে রসূলুল্লাহ্‌, অত্যাচারিতকে আমরা সাহায্য করব তাতো বুঝলাম, কিন্তু অত্যাচারীকে আমরা কিভাবে সাহায্য করব?' তিনি বললেন, 'তুমি তার হাত শক্ত করে' ধরে রাখবে।'

[অর্থাৎ যে হাত অত্যাচারে উদ্যত সেই হাত শক্ত করে চে'পে ধরে তাকে অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করবে।] —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস ইব্‌নে মালিক (রাঃ)।

২৯. নবী (সঃ) লুণ্ঠন এবং জীবকে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে য়াযীদ আনসারী (রাঃ)।

৩০. হজরত রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ওপর অন্যায় অত্যাচার করতে পারে না, সে তাকে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ও অত্যাচারিত অবস্থায় রক্ষা করার চেষ্টা না করে পারে না। যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভায়ের প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করে, আল্লাহ্‌ তার প্রয়োজন মেটান। যে ব্যক্তি মুসলমানের মানহানির বিষয় গোপন করে' সম্মান রক্ষা করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তার সম্মান রক্ষা করবেন। —বুখারী।

অনাথ পালন

"লোকে তোমাকে পিতৃহীনদের (অনাথদের) সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে। বল, 'তাদের উপকারের চেষ্টা করাই উত্তম। আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে থাক, তবে তো তারা তোমাদের ভাই'।" ২ (২২০)

'এবং পিতৃহীনকে তাদের ধনসম্পদ সমর্পণ করবে এবং উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্ট বদল করবে না, এবং তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে মিশ্রিত করে গ্রাস করো না; এ মহাপাপ।' ৪ (২)

'অনাথের অভিভাবক যদি সচ্ছল হয়, তবে তার পক্ষে অনাথের সম্পদ থেকে ভাতাগ্রহণে বিরত থাকাই উত্তম। আর যদি সে দরিদ্র হয়, তবে সে পূর্ণ ন্যায় পরায়ণতার সাথে ভাতগ্রহণ করতে পারে।'

'পিতৃহীনদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয় ; এবং তাদের মধ্যে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে তাড়াতাড়ি তা গ্রাস করে ফেলো না।' ৪ (৬)

'পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করো, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ৎ তলব করা হবে।' ১৭ (৩৪)

'নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।' ৪ (১০)

—আল্‌-কোরআন।

৩১. যে লোক আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে কোন অনাথের মাথায় হাত বুলোয়, সে তার (অনাথের) স্পর্শ-করা-প্রতিটি-কেশের জন্য একটা করে পুরস্কার পাবে। আর যে লোক কোন অনাথ বালক বা বালিকার উপকার করবে, সে এবং আমি পরস্পর একসঙ্গে হব যেমন আমার হাতের দুটো আঙুল। —তির।

৩২. আমি এবং অনাথদের অভিভাবক পরলোকে একসঙ্গে থাকব যেমন আমার তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি প্রায় পরস্পরকে স্পর্শ করছে। —বুখারী। আবুদাউদ। তির।

৩৩. মুসলমানদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি কোন অনাথকে লালন-পালনের জন্য নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায় এবং যদি সে ক্ষমার অযোগ্য কোন পাপ না করে, তবে খোদা তাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবেন্। —তির।

৩৪. সেইটি উৎকৃষ্ট মুসলিম-গৃহ যেখানে অনাথ আছে আর তার প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয়, এবং সেইটি অধম যেখানে অনাথ আছে আর তার প্রতি অসৎ ব্যবহার করা হয়। —ইবনে মাজা।

৩৫. যে লোক বালিকাদের প্রাপ্তবয়স্কা না হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে, (হাতের দুটো আঙুল দেখিয়ে নবী সঃ বললেন) সে এবং আমি বেহেশ্‌তে এই রকম একসঙ্গে থাকব। —মুসলিম।

৩৬. আমি আর যার চেহারা কালো হয়ে গেছে সেই নারী পরলোকে এমন-ভাবে একত্র থাকব, যেমন অনামিকা আঙুলের পাশের দুটো আঙুল। —আবুদাউদ। [সম্ভ্রান্ত ঘরের যে সুন্দরী স্বামীর মৃত্যুর পর কেবল অনাথ সন্তান-দের পালন করার জন্য আপন প্রবৃত্তিকে দমন করেছে এবং অনাথেরা প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত অথবা নিজের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাদের পালনের জন্য পরিশ্রম করে' সোনার অঙ্গ কালো করেছে, এখানে সেই নারীর কথা বলা হয়েছে।]

৩৭. যে লোক তিনজন অনাথ বালিকা বা তিনজন অনাথ বোন অথবা দুটি বোন বা দুটি মেয়েকে প্রাপ্ত বয়স্কা না হওয়া পর্যন্ত পালন করে এবং তাদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, তাদের প্রতি সদয় হয় ও তাদের বিবাহ দেয়, সে বেহেশ্‌তে যাবে। —আবুদাউদ। তির।

অনাবাদী জমি

৩৮. অনাবাদী জমি যে ব্যক্তি আবাদ করে তা তারই প্রাপ্য এবং অত্যাচারীর তাতে পরিশ্রমের অধিকার নেই।—আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ সাইদ বিন জায়েদ (রাঃ)।

৩৯. রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন জমি আবাদ করে যার মালিক নেই তা তারই প্রাপ্য। হজরত (দঃ) তাঁর শাসনকালে এমনি বিধান দিয়েছিলেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৪০. যে ব্যক্তি বেড়ার দ্বারা যতটুকু অনাবাদী জমি ঘেরাও করে তা তারই প্রাপ্য।—আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ সামেরাহ্ (রাঃ)।

অনাবৃষ্টি ও অতি ঝড়বৃষ্টি

'আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, তারপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করতে দিই—ওর ভাণ্ডার তোমাদের কাছে দিই।' ১৫(২২)

'ইউসুফ বলল, তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে। তারপর তোমাদের খরচের অতিরিক্ত সংগৃহীত শস্য শীষ সমেত রেখে দেবে। এবং এরপর আসবে সাতটা অনাবৃষ্টির বছর, এ সাতবছর লোকে পূর্বে যা সঞ্চয় করে রাখবে তাই খাবে।' ১২(৪৭)

"এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও আমার দাস নূহের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং বলেছিল—'এতো এক পাগল।' ওরা তাকে ভীতিপ্রদর্শন করেছিল। তখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে' বলেছিল, 'আমি তো অসহায়, অতএব তুমি দণ্ডবিধান কর।' ফলে আমি প্রবল বারিবর্ষণে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম এবং মাটি থেকে প্রস্রবণ উৎসারিত করলাম—তারপর আকাশের পানি আর ভূমণ্ডলের পানি এক পরিকল্পনা অনুসারে মিলিত হল।" ৫৪(৯-১২)

—আল্-কোরআন।

[অনাবৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য 'ইস্তেস্কা' বা বৃষ্টি-প্রার্থনার নামাজের বিধান আছে।]

৪১. একবার রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বৃষ্টি-প্রার্থনার উদ্দেশ্যে লোকেদের নিয়ে ঈদগাহের দিকে যাত্রা করলেন এবং তাদের নিয়ে দু রাকাত নামাজ পড়লেন যাতে বড় করে কেরাত পাঠ করলেন। এরপর তিনি হাত দুটো ওপরে তুলে কা'বা শরীফের দিকে মুখে করে প্রার্থনা করলেন। যখন কা'বামুখী (কেবলামুখী) হলেন তখন আপন চাদর ঘুরিয়ে দিলেন।—মোত্তা। মিশ। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন জায়েদ (রাঃ)।

৪২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একবার ইস্তেস্কার (অর্থাৎ বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজের) উদ্দেশ্যে ঈদগাহের দিকে যাত্রা করলেন এবং যখন কা'বামুখী (কেবলামুখী) হলেন তখন নিজের চাদরখানা ঘুরিয়ে দিলেন। তিনি চাদরের ডান দিককে আপন বাম কাঁধের ওপরে এবং বাম দিককে ডান কাঁধের ওপরে রাখলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রার্থনা করলেন।—আঃ দাউদ। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন জায়েদ (রাঃ)।

৪৩. একবার লোকেরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর কাছে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করল। তিনি একটা বেদী (মিম্বার) নির্মাণ করতে বললেন। তাঁর কথামত ঈদগাহে একটা বেদী স্থাপন করা হল। তিনি এক (নির্দিষ্ট) দিনে ঈদগাহে যাবেন বলে (সেই) লোকেদের কথা দিলেন। সেই কথামত সূর্য ওঠার সময় তিনি বের হলেন এবং বেদীতে গিয়ে বসলেন। তারপর আল্লাহ্র মহত্ত্ব ঘোষণা করলেন ও তাঁর প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, 'বৃষ্টির মরশুম পার হয়ে গেল তবু তোমাদের শহরে বৃষ্টি হচ্ছে না—তোমরা এই ফরিয়াদ করেছ। আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা যেন তাঁকে ডাক এবং তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন।' তারপর বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ তালারই যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, প্রভু, দয়ালু এবং প্রতিফল দিবসের অধিপতি। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি যা ইচ্ছা, তাই করেন। হে আল্লাহ্! তুমিই আল্লাহ্, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি কারো মুখোপেক্ষী নও, আমরা তোমার মুখাপেক্ষী। আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ কর; আর যা বর্ষণ করবে তা আমাদের শক্তির উৎস ও দীর্ঘ সময়ের পাথেয় কর।' তারপর তিনি নিজের হাত দুটো ওপরে তুলে ধরলেন এবং এত উঁচুতে তুলে ধরলেন যে তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখা যেতে লাগল। তারপর জনতার দিকে পিঠ করে আপন চাদরখানা ঘুরিয়ে নিলেন, অথচ তখনো তাঁর হাত দুটো উঁচুতে তোলাই ছিল। তারপর মানুষের দিকে মুখ করে মিম্বার (বা বেদী) থেকে নেমে পড়লেন। তখন আল্লাহ্ তা'লা এক মেঘের সৃষ্টি করলেন। মেঘ গর্জন করল, বিদ্যুৎ চমকে উঠল। তারপর আল্লাহ্র আদেশে বর্ষণ শুরু হয়ে গেল এবং তিনি তাঁর মসজিদে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই ঢল নামল। এ সময় তিনি

লোকেদের আশ্রয়ের দিকে দৌড়তে দেখে হেসে উঠলেন, তাঁর সামনের দাঁতগুলো ঝিলিক মেরে উঠলো। তখন তিনি বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ তা'লা সর্ব বিষয়ে শক্তিমান এবং এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং রসূল।' —আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৪৪. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন বৃষ্টি বর্ষণ হতে দেখতেন তখন বলতেন, 'হে আল্লাহ্, প্রচুর পরিমাণে উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৪৫. একবার যখন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম তখন আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগল। হুজুর (সঃ) তখন তাঁর গায়ের কাপড় খুলে ফেললেন, ফলে বৃষ্টি তাঁর গায়ে পড়ল। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে রসূলুল্লাহ্, আপনি এরকম করলেন কেন?' তিনি (সঃ) বললেন, 'ওযে সদ্য ওর প্রতিপালকের কাছ থেকে এল', (পৃথিবীর পাপস্পর্শ এখনো ওকে দূষিত করেনি)। —মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৪৬. অনাবৃষ্টিটা দুর্ভিক্ষ নয়, বরং বৃষ্টির পর বৃষ্টি হবে কিন্তু মাটি থেকে কিছু উৎপন্ন হবেনা—সেটাই দুর্ভিক্ষ।—মুস। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৭. বাতাস আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে। ও কল্যাণ নিয়ে আসে, আবার (ঝড়ের বেশে) অকল্যাণ নিয়েও আসে। সুতরাং ওকে গালাগালি করো না, বরং আল্লাহ্‌র কাছে ওর কল্যাণটুকু কামনা কর এবং অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাও। —আ. দাউদ। ই. মাজা। বয়হাকী। শাফেয়ী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৮. যখনই বাতাস বইতে শুরু করত, নবী (সঃ) জানু পেতে বসে বলতেন, 'হে আল্লাহ্, একে তোমার করুণাতে পরিণত কর, অভিশাপে পরিণত করোনা।'—শাফেয়ী। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৪৯. নবী (সঃ) যখন মেঘের গর্জন ও বজ্রনাদ শুনতেন তখন বলতেন, 'হে আল্লাহ্, তোমার রোষের দ্বারা আমাদের ধ্বংস করো না, বরং তার পূর্বেই আমাদের শান্তি দান কর।'—আহ্‌মদ। তির। বর্ণনায়ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৫০. তিনি (সঃ) যখন মেঘের গর্জন শুনতেন (তখন) কথাবার্তা ত্যাগ করতেন এবং (কোরআনের এই বাণী) পাঠ করতেন, 'আমি সেই সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি—মেঘের গর্জন যাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে তাঁর প্রশংসার সঙ্গে এবং ফেরেশতাগণ (বর্ণনা করেন) তাঁর ভয়ে।'—মালেক। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রাঃ)।

অনিষ্টকর ও ইষ্টকর প্রাণী

৫১. যখন ঘরে সাপ দেখা যায়, (তখন) তাকে মার।—তির। আবুদাউদ। বর্ণনায়ঃ আবদুর রহমান (রাঃ)।

৫২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, সাপ মেরে ফেল এবং ঐ সব প্রাণীকে মার যার পিঠে দুটো রেখা আছে ও মুণ্ডন-করা লেজ আছে। এরা দৃষ্টিশক্তি হ্রাস করে এবং গর্ভপাত করে।—বুখারী। মুস। বর্ণনায়ঃ ইব্‌নে ওমর (রাঃ)।

৫৩. নবীদের মধ্যে কোন এক নবীকে পিপীলিকা দংশন করেছিল। তিনি পিপীলিকার স্থানটিকে দগ্ধ করিয়ে দিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'লা আকাশবাণী (অহী) মারফৎ জানালেন, 'তোমাকে একটা পিপীলিকা দংশন করেছে, সে জন্যে আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী উম্মতদের মধ্যে একটা সম্প্রদায়কে দগ্ধ করে ফেললে?' —বুখারী। মুস। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৪. যে বড় ইঁদুর এক-বারে মারে তার জন্য একশ পুণ্য লেখা হয়। দুবারে মারলে কম পুণ্য। তিন বারে মারলে আরো কম। —মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৫. যখন মোরগের ডাক শোন, আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও, সে ফেরেশ্‌তাকে দেখেছে। যখন গাধার ডাক শোন অভিশপ্ত শয়তানের থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর, সে শয়তানকে দেখেছে। —বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৬. মোরগকে তিরস্কার করোনা, সে নামাজের জন্য জাগ্রত করে। —আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ জায়েদ বিন্ খালেদ (রাঃ)।

৫৭. ভ্রমণ, শিকার ও কৃষিকার্যের কুকুর ব্যতীত যে অন্য কুকুর পোষে, তার পুরস্কার থেকে রোজ এক কিরাত (এক দিরহামের চার ভাগের এক ভাগ) কেটে নেওয়া হয়। —বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

অনুতাপ

'যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, তারা পরে অনুতাপ (অর্থাৎ তওবা) করলে ও নিজেদের সংশোধন করলে—তাদের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' ১৬ (১১৯)। ৬ (৫৪)

কিন্তু যারা তওবা (অনুশোচনা) করে, নিজেদের সংশোধন করে, আল্লাহ্‌কে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মকে নির্মল করে, তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকবে এবং বিশ্বাসীদের আল্লাহ্ মহাপুরস্কার দেবেন।' ৪ (১৪৬)

—আল্-কোরআন।

৫৮. মানুষ যখন কোন অন্যায় কাজ করে, তারপর অনুতাপ করে, আল্লাহ্ তখন তাকে ক্ষমা করেন। —শায়খান।

৫৯. যে ব্যক্তি সর্বদা মার্জনা ভিক্ষা করে আল্লাহ্ তাকে প্রত্যেক সংকট থেকে রক্ষা করেন, প্রত্যেক বিপদ থেকে মুক্ত করেন এবং যেখান থেকে সে আশা করেনি সেখান থেকে তার জীবিকা প্রেরণ করেন। —আ. দাউদ। ইব্‌নে মাজা। মিশ।

৬০. সমস্ত মানব-সন্তান পাপী এবং পাপীদের মধ্যে যারা অনুতাপ করে তারাই উৎকৃষ্ট। —তির। ইব্‌নে মাজা। মিশ।

৬১. যে ব্যক্তি শের্‌ক না করে' খোদার সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে নিশ্চয় তাঁর মার্জনা লাভ করবে, যদিও সে পর্বত প্রমাণ পাপ করে। —বয়হাকী।

৬২. আল্লাহ্ বলেন, 'যে ব্যক্তি একটা সৎকার্য সহ উপস্থিত হয় তার জন্য আমি তার (সৎকার্যের) সমান দশটা প্রুরস্কার ও আরো বেশী দিই। যে ব্যক্তি একটা অসৎকার্য সহ উপস্থিত হয়, তাকে তার তুল্য শাস্তি দিই বা ক্ষমা করি। এরপর যে ব্যক্তি পৃথিবীপূর্ণ পাপসহ আমার কাছে উপস্থিত হয় অথচ আমাকে ছাড়া (আর) কাউকে উপাসনা করে না, আমিও তার কাছে পৃথিবী পূর্ণ মার্জনা-সহ উপস্থিত হই।'—মুসলিম।

৬৩. হে মানবগণ, তোমরা আল্লাহ্র কাছে তওবা (অনুতাপ) কর ; কারণ আমি প্রত্যহ একশতবার তাঁর কাছে তওবা করি। —মুস।

৬৪. আল্লাহ্ বলেন, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা দিনরাত পাপ করছ, আর আমি তোমাদের ক্ষমা করব। অতএব আমার কাছে তোমরা ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করব। আমার কাছে প্রার্থনা কর, আমি তা পূরণ করব। সমস্ত মানুষই প্রার্থী ; সূঁচকে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করালে তা তাকে (সমুদ্রকে) যতটুকু হ্রাস করে, তাদের প্রার্থনা পূরণ করতে আমার ঐশ্বর্যেরও ততটুকু হ্রাস হয়। নিশ্চয় আমি তোমাদের কাজকর্মের হিসাব রেখেছি এবং তোমাদের তার ফল প্রদান করব। এরপর যে ব্যক্তি পুরস্কৃত হবে সে আল্লাহ্র প্রশংসা করবে, যে তার বিপরীত দেখতে পাবে সে নিজেকে তার জন্যে দোষ দেবে।' —মুস।

৬৫. তোমাদের মধ্যে যখন কেউ অত্যন্ত অনুতাপ প্রকাশ করে তখন আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন।—মুসলিম।

৬৬. অনুতপ্ত পাপী নিষ্পাপ ব্যক্তির তুল্য। —ইবনে মাজা। বয়হাকী।

৬৭. যে ব্যক্তি সর্বদা খোদার (কাছে) মার্জনা ভিক্ষা করে, সে কখনও বিপদগ্রস্ত হয় না, যদিও সে প্রত্যেক দিন ৭০ বার সীমালঙ্ঘন করে। —আবুদাউদ। তির।

৬৮. নিশ্চয় খোদা তার বিশ্বাসী বান্দাকে তওবা দ্বারা পরীক্ষা করতে ভালবাসেন। —মিশকাত।

৬৯. নিশ্চয় আমি প্রতিদিন ৭০ বারের অধিক আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং অনুতাপ করি। —বুখারী।

৭০. মহানবী (সঃ) বললেন, দুনিয়ায় (কোরআনের) এই বাণী অপেক্ষা আমার কাছে অধিকতর প্রিয় কিছু নেই—'হে আমার সীমালঙ্ঘনকারী সেবকগণ, আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়োনা। নিশ্চয় তিনি সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু (৩৯ : ৫৩)।' এক ব্যক্তি বলল, যদি সে শেরক করে ? মহানবী (সঃ) চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, তাকেও আল্লাহ্ ক্ষমা করেন যদি সে অনুতাপ করে। —মিশকাত।

৭১. অনুতাপ পাপের বিনিময়। —সগির।

৭২. আল্লাহ্তা'লা তোমাদের কারো অনুতাপ গ্রহণে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক আনন্দিত হন, যে এক বিশাল প্রান্তরে তার মৃত্যুর আশঙ্কা করে এবং তার সাথে যানবাহন, পাথেয়, খাদ্য, পানীয় এবং প্রয়োজনীয় যা কিছু ছিল, সবই হারিয়ে ফেলে ; তারপর সে তার এই (হারানো সামগ্রীর) সন্ধানে বের হয় এবং পথের মধ্যে মরণাপন্ন হয় ; তার (মরার) আগে সে বলে, যেখানে আমি সেই সামগ্রীগুলো হারিয়ে এসেছি সেখানে ফিরে গিয়ে (তবে) আমি মরব ; তারপর

সে ফিরে যায় এবং (মৃত্যু সদৃশ নিদ্রা) তাকে আকর্ষণ করে ; পরে সে জেগে ওঠে, তার যানবাহনকে তার শিয়রে দেখতে পায়, এবং তার মধ্যে তার খাদ্য পানীয় এবং হারানো যাবতীয় জিনিস দেখতে পায় (অর্থাৎ ফিরে পায়) । [হারানো ধন ফিরে পেয়ে মানুষ যেমন অপরিসীম আনন্দ লাভ করে, মানুষের অনুতাপ বা তওবা গ্রহণ করে করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লা তার চেয়েও অধিক আনন্দ লাভ করেন ।] —তির ।

৭৩. আল্লাহ্‌র ক্ষমা তোমার পাপের চেয়ে বড় । —সগির ।

৭৪. আমি হজরত নবী (সঃ)কে একটা হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি । যদি আমি তা একবার, দুবার এমনকি সাতবারও শুনতাম, তবু আমি তা বর্ণনা করতাম না , কিন্তু তার চেয়ে বেশীবার আমি তা শুনেছি । তিনি বলেছেন, ইস্‌রাইল বংশে কোফল নামক এক ব্যক্তি কোন প্রকার পাপকার্য থেকেই বিরত থাকতনা । একদিন এক স্ত্রীলোক তার কাছে উপস্থিত হল । সে (কোফল) তার প্রতি ব্যভিচার করবে এই শর্তে তাকে ৬০টা দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দান করল । তারপর তারা দুজনেই প্রস্তুত হলে স্ত্রীলোকটা কাঁপতে লাগল ও কাঁদতে লাগল । কোফল জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কাঁদছ কেন ? আমি কি তোমার ওপরে জবরদস্তি করছি ?' সে বলল, 'না, এ এমন একটা কাজ যা ইতিপূর্বে আমি কোন দিন করিনি ; বিশেষ প্রয়োজন আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে ।' সে (কোফল) বলল, 'শুধু এই কারণে তুমি একাজ করতে সম্মত হয়েছ, এর আগে আর কখনো করনি ? তুমি যাও, এই দিনারগুলো গ্রহণ কর । আল্লাহ্‌র শপথ, আমি আর কখনো আল্লাহ্‌র অবাধ্য হবনা ।' সেই রাত্রিতেই সে প্রাণত্যাগ করল । পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, তার দরজায় লেখা আছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কোফলকে ক্ষমা করেছেন ।' —তির । বর্ণনায় ঃ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) ।

৭৫. প্রত্যেকটি ব্যাধির প্রতিকার আছে এবং পাপের প্রতিকার ক্ষমা-প্রার্থনা । —সগির ।

৭৬. শয়তান বলে, 'হে প্রভো, তোমার সম্মানের শপথ, যে পর্যন্ত তোমার বান্দাদের দেহে আত্মা থাকবে, সে পর্যন্ত আমি তাদের বিপথে চালিত করা থেকে বিরত হবনা ।' আল্লাহতা'লা বলেন, 'আমার সম্মান, মহিমা ও উচ্চাসনের শপথ, যতবার তারা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, ততবার আমি তাদের ক্ষমা করব ।' —মিশকাত ।

৭৭. শ্রেষ্ঠতম ক্ষমাপ্রার্থনা এই যে, তুমি বলবে, "হে আল্লাহ্‌, তুমিই আমার প্রভু, তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই । তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার দাস । আমি তোমার সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি এবং যথাসাধ্য তা পালন করার চেষ্টা করব । আমি খারাপ কাজ যা করেছি তার ক্ষতি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ স্বীকার করছি আর আমার অপরাধ স্বীকার করছি, অতএব আমায় ক্ষমা কর । নিশ্চয় তুমি ছাড়া কেউ অপরাধ ক্ষমা করে না !' তারপর মহানবী (সঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিবাভাগে এ কথা বলে, পরে সেই দিন সন্ধ্যার পূর্বে প্রাণত্যাগ করে, সে বেহেশ্‌ত-বাসী হবে, এবং যে ব্যক্তি রাত্রিকালে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ (প্রার্থনা) পাঠ করে, তারপর প্রত্যূষের পূর্বে প্রাণত্যাগ করে, সেও বেহেশ্‌তবাসী হবে ।' —বুখারী ।

অপবাদ

'কেউ কোন দোষ বা পাপ করে কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।' ৪ (১১২)

'যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের আশিবার কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদে সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না ; এরাই তো সত্যত্যাগী।' ২৪ (৪)

'যারা সাধ্বী, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।' ২৪ (২৩)

'মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ ভালবাসেন না, তবে যার ওপর অত্যাচার করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' ৪ (১৪৮)

'আমি অপবাদ রচনাকারীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।' ৭ (১৫২)

—আল্-কোরআন।

৭৮. একদিন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট কয়েকজন সাহাবীকে বললেন ঃ তোমরা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, পরস্পরের দুর্নাম বা অপবাদ প্রচার করবে না এবং সৎকর্ম পালনে অবাধ্য হবে না। তারপর যে ব্যক্তি ও পালন করবে সে আল্লাহ্র কাছে পুরস্কার পাবে এবং যে ব্যক্তি তার জন্য পৃথিবীতে কোনরূপ বিপদ্গ্রস্ত হবে, ও তার পাপের বিনিময় হবে এবং যে ব্যক্তি ওর জন্য শাস্তি ভোগ করবে, আল্লাহ্ তার পাপকে দূরীভূত করবেন এবং ··মার্জনা করবেন।—শায়খান। বর্ণনায় ঃ ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)।

৭৯. যে ব্যক্তি কাউকে কুফুরীর অপবাদ দেয় যদি সে তার উপযুক্ত না হয় তা হলে তা (অর্থাৎ ঐ অপবাদ) তার (অপবাদকারীর) প্রতি ফিরে আসে।—মুসলিম।

৮০. কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে কাফের বললে ওর পরিণতি উভয়ের একজনের ওপর অবশ্যই বর্তাবে। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৮১. কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ফাছেক বা কাফের বললে যদি ঐ ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে ফাছেক বা কাফের না হয় তাহলে ফাছেক বা কাফের হওয়ার সমতুল্য পাপ বক্তার ওপরেই বর্তাবে। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু জর (রাঃ)।

৮২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, মহামহিম আল্লাহ্ বলেন, মানুষ যুগ ও সময়কে গালি দেয়, অথচ সময়ে ও যুগে যা ঘটে থাকে, তা আমিই ঘটাই, দিন রাত্রির গমনাগমন আমারই মহিমায় সংঘটিত হয়। (তাই সময়কে গালি দিলে সে গালি আল্লাহ্র ওপর পতিত হয়)। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৮৩. 'তোমরা সাতটা সর্বনাশা জিনিস থেকে আত্মরক্ষা করো।' জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে রসূলুল্লাহ্, সেগুলো কি?' হুজুর (সঃ) বললেন, 'কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ জ্ঞান করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে হত্যা করা, পিতৃহীন বালকবালিকাদের সম্পদ (অবৈধভাবে) ভক্ষণ করা, সুদ গ্রহণ করা, লড়াইয়ের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং নির্দোষ পবিত্র মুসলিম মহিলার নামে ব্যভিচারের অপবাদ রটনা করা।' —মুস। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)

অপব্যয়

'আত্মীয় স্বজনকে তার প্রাপ্য দেবে এবং অভাবগ্রস্ত ও পথচারীকেও—এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। যারা অপব্যয় করে তারা অবশ্যই শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।' ১৭ (২৬, ২৭)

'তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্ত হয়ো না, হলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে।' ১৭ (২৯)

'যখন ও (লতা বৃক্ষ ইত্যাদি) ফলবান হয় তখন ওর ফল আহার করবে, আর ফসল তোলার দিনে ওর দেয় (গরীব-দুঃখীদের) দান করবে এবং অপব্যয় করবে না, কারণ তিনি অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।' ৬ (১৪১)

'পানাহার করবে কিন্তু অপব্যয় করবে না; তিনি অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।' ৭ (৩১)

—আল্-কোরআন

৮৪. যা খুশী খাও, যা খুশী পর. যে পর্যন্ত অপব্যয় ও অহঙ্কার এ দুটি জিনিস তোমাকে অন্ধ না করে। --বুখারী। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৮৫. অপব্যয় এবং অহঙ্কার না করে' খাও, পর এবং দান কর। —বুখারী। নাসায়ী।

৮৬. আল্লাহ্ তিনটি জিনিস তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন—বাহুল্য বাক্য, অপব্যয় এবং অত্যধিক ভিক্ষা। —শায়খান। আবু দাউদ।

৮৭. মোমেন তার গৃহ নির্মাণের জন্য যা ব্যয় করে তাছাড়া যাবতীয় ব্যয়ই খোদার পথে ব্যয়িত হয়।—তিরমিজী।

৮৮. দালান নির্মাণে কোন মঙ্গল নেই।—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ হজরত আনাস (রাঃ)।

অভিশাপ

'পাপিষ্ঠদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।' ৭ (৪৪)

'তুমি (শয়তান) এখান (স্বর্গ) থেকে বের হয়ে যাও, কারণ তুমি অভিশপ্ত। এবং তোমার ওপর আমার অভিশাপ কর্মফল দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে।' ৩৮ (৭৭, ৭৮)

'আকাশে আমি রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং দর্শকদের জন্যে ওকে সুশোভিত করেছি। প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি ওকে রক্ষা করে থাকি।' ১৪ (১৬, ১৭)

—আল্-কোরআন।

৮৯. বিশ্বাসী বড় অভিশাপকারী নয় বা বিশ্বাসীর অভিশাপকারী হওয়া উচিত নয়। —তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৯০. যখন কোন লোক কোন কিছুকে অভিশাপ দেয়, তা আকাশে উঠে যায়। আকাশের দরজাগুলো তার জন্য বন্ধ হয়, ফলে তা পৃথিবীতে নেমে আসে।

এখানেও তার জন্য সকল পথ বন্ধ হয়। তখন তা দক্ষিণে ও বামে দৃষ্টিপাত করে ; যখন কোন আশ্রয় না পায় (তখন) যাকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে তার কাছে যায়। সে যদি তার উপযুক্ত হয় (তবে) তার ওপরে পড়ে। নয়তো (ফিরে গিয়ে) অভিশাপকারীর ওপরেই নিপতিত হয়।—আ. দাউদ। বর্ণনায় ঃ হজরত আবু দারদা (রাঃ)।

৯১. বাতাস এক ব্যক্তির চাদর উড়িয়ে নিয়েছিল, সে বাতাসকে অভিশাপ দিল। হজরত (দঃ) বললেন ঃ বাতাসকে অভিশাপ দিও না. কারণ একে আদেশ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি কোন কিছুকে অভিশাপ দেয় সে যদি তার জন্য দায়ী না হয় তাহলে তা অভিশাপকারীর কাছে ফিরে আসে।—তিরমিজী। আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৯২. একদিন হজরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর দাসকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন। (তখন) হজরত (দঃ) ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হজরত আবুবকরের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ কাবার প্রভুর শপথ, অভিশাপকারিগণ এবং সত্যবাদিগণ একত্র হতে পারে না।—বয়হাকী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৯৩. সত্যবাদী কখনো অভিশাপকারী হতে পাবে না।—মুস। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৯৪. হজরত নবী (সঃ) ঐ সব পুরুষদের প্রতি অভিশাপ দান করেছেন যারা নারীবেশী হয়, এবং ঐ সব নারীদের প্রতি অভিশাপ করেছেন যারা পুরুষ বেশিনী হয়।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৯৫. মানুষের সুনাম নষ্ট করা, কাউকে অভিশাপ দেওয়া, কাউকে গালাগালি দেওয়া এবং অকারণ বাক্যব্যয় করা কোন মুমেনের উচিত নয়।—মিশকাত।

অলঙ্কার

"অতঃপর আমি দাসদের মধ্যে তাদের গ্রন্থের অধিকারী করলাম যাদের আমি মনোনীত করেছি, তবে তাদের কেউ নিজেদের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মিতাচারী এবং কেউ আল্লাহ্‌র নির্দেশে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী, এটিই মহা অনুগ্রহ। তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, যেখানে তাদের স্বর্ণনির্মিত, মুক্তাখচিত কঙ্কণ দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। এবং তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের দুঃখ দুর্দশা দূরীভূত করেছেন, নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের স্থায়ী আবাস দিয়েছেন যেখানে আমাদের ক্লেশ ও ক্লান্তি স্পর্শ করেনা!' কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন বর্তমান।" ৩৫ (৩২-৩৬)

—আল্‌-কোরআন।

৯৬. যদি তোমরা বেহেশ্‌তের অলঙ্কার ও রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে ভালবাস, তবে ওসব দুনিয়াতে ব্যবহার করো না।—নাসায়ী। বর্ণনায় ঃ ওকবাহ্‌ বিন আমের (রাঃ)।

৯৭. ইহলোকে রেশমী বস্ত্র ঐ পুরুষই ব্যবহার করতে পারে পরলোকে সুখ লাভের যার আদৌ কোন আকাঙ্ক্ষা নেই।—বুখারী।

৯৮. যে ব্যক্তি ইহলোকে রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করবে পরলোকে সে অতি অবশ্যই ওর থেকে বঞ্চিত থাকবে। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৯৯. নবী (সঃ) আমাকে রেশম মিশ্রিত, রঙীন, একপ্রস্থ কাপড় উপহার দিয়েছিলেন। আমি তা পরেছিলাম। এতে তাঁর মুখে-চোখে ক্রোধের চিহ্ন দেখলাম। সেজন্যে তা ছিঁড়ে আমার (বাড়ীর) মেয়েদের (ওড়না করে) দিলাম। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আলী (রাঃ)।

১০০. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি হজরত রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম (রাঃ)-র পরিধানে রেশমী চাদর দেখেছেন।—বুখারী।

১০১. নবী (সঃ) তাঁর কন্যা ফাতেমার বাড়ীতে গেলেন, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করলেন না। আ'লী (ঘরে) আসলে তিনি (ফাতেমা) তাঁকে এ (কথা) জানালেন। তখন আলী নবী (সঃ)-এর কাছে কথাটা উত্থাপন করলেন। তিনি (নবী সঃ) বললেন, 'আমি তার দ্বারে নানা রঙে রঞ্জিত একটা পর্দা দেখেছিলাম।' তারপর বললেন, 'দুনিয়ার সঙ্গে আমার কি দরকার?' তখন আ'লী (রাঃ) তাঁর (ফাতেমার) কাছে এ কথা জানালেন। তাতে তিনি (ফাতেমা) বললেন, 'তিনি (নবী সঃ) যা চান তা যেন আমাকে হুকুম করেন।' তিনি (নবী সঃ) বললেন, 'ওটা (অর্থাৎ রঙিন পর্দাটা) অমুক গৃহস্থ লোকের কাছে পাঠিয়ে দেবে, তাদের অভাব আছে।' —বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

১০২. স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে, মোটা ও মিহি রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে এবং তার ওপরে বসতে নবী (সঃ) আমাদের নিষেধ করেছেন। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ হোজায়ফা (রাঃ)।

১০৩. নবী (সঃ) জোবায়ের (রাঃ) এবং আবদুর রহমান (রাঃ)-কে রেশমী বস্ত্র পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন, কারণ তাঁদের শরীরে চর্মরোগ ছিল; (সুতীবস্ত্র পরিধান করলে জ্বালা যন্ত্রণা হত)।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

১০৪. হজরত রসুলুল্লাহ্ (সঃ) সোনার আংটি পরে থাকতেন। তারপর তিনি তা বর্জন করেন এবং বলেন সর্ব সময়ের জন্য এর ব্যবহার পরিত্যাগ করলাম।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)।

১০৫. হজরত নবী (সঃ) ইচ্ছা করলেন যে বহির্বিশ্বের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে লিপি প্রেরণ করবেন। তাঁকে জানান হল যে তাঁরা সীল মোহর ব্যতীত লিপি গ্রহণ করবেন না। সুতরাং হজরত (দঃ) রৌপ্যের এক আংটি নির্মাণ করালেন যার ওপর অঙ্কিত ছিল—'মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

১০৬. কলাবের যুদ্ধে আমার পিতামহ আরফাজার নাক কেটে গেল। তিনি রৌপ্য নির্মিত নাক গ্রহণ করায় তা থেকে দুর্গন্ধ বের হতে লাগল। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে স্বর্ণনির্মিত নাক গ্রহণ করার আদেশ দিলেন। —তিরমিজী। আবুদাউদ। নাসায়ী। বর্ণনায় ঃ আবদুর রহমান (রাঃ)। [নিরুপায় পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার সিদ্ধ।]

১০৭. হজরত নবী (সঃ) জাফরান দ্বারা পুরুষের শরীর রঙীন করা নিষেধ করেছেন। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

১০৮. যে নারী স্বর্ণের অলঙ্কার পরিধান করে নিজেকে প্রকাশ করে, তাকে ওর দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে। আবুদাউদ। নাসায়ী। বর্ণনায় ঃ হোজায়ফার ভগ্নী।

১০৯. স্বর্ণ ও রেশম আমার উম্মতদের মধ্যে নারীদের জন্য বৈধ (হালাল) এবং পুরুষদের জন্য অবৈধ (হারাম)।—তিরমিজী। নাসায়ী। বর্ণনায় ঃ আবু মুসা আশয়োরী (রাঃ)।

১১০. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) ভ্রমণে বেরুবার পূর্বে সর্বশেষ যাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতেন তিনি ছিলেন হজরত ফাতেমা (রাঃ), এবং ভ্রমণ থেকে ফিরে সর্বাগ্রে যাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তিনিও ছিলেন হজরত ফাতেমা (রাঃ)। একদিন তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন। হজরত ফাতেমা (রাঃ) তাঁর দরজায় একখানা পর্দা টাঙিয়ে রেখেছিলেন এবং তাঁর দুই পুত্র হজরত হাসান (রাঃ) ও হোসেন (রাঃ)-কে রৌপ্যের হার দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) দরজার দিকে অগ্রসর হলেন কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করলেন না। হজরত ফাতেমা বুঝতে পারলেন, কি কারণে তিনি ভেতরে এলেন না। অবিলম্বে তিনি পর্দাটা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বালক দুজনের গলা থেকে হার খুলে নিলেন। তাঁরা (বালকেরা) কাঁদতে কাঁদতে রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি তাঁদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করে বললেন ঃ হে সাওবান, এদের নিয়ে অমুকের বাড়ী যাও, নিশ্চয়ই এরা আমার পরিজনভুক্ত। এরা এই পার্থিব জীবনের সুখসম্পদ উপভোগ করবে এ আমি পছন্দ করি না। ফাতেমা (রাঃ)র জন্য একটা স্নায়ুর হার এবং বালকদের জন্য দুটো পশুর দাঁতের তৈরী হার কিনে আন।—আবু দাউদ। মিশ্কাত। বর্ণনায় ঃ সাওবান (রাঃ)।

অহঙ্কার

'অহঙ্কারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; কারণ আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহঙ্কারীকে ভালোবাসেন না।' ৩১ (১৮)

'পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না—তুমি তো কখনোই পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না।' ১৭ (৩৭)

'আল্লাহ্ উদ্ধত অহঙ্কারীদের ভালবাসেন না।' ৫৭ (২৩)

'সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজায় সেখানে চিরস্থায়ী হবার জন্য প্রবেশ কর। দেখ, অহঙ্কারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট।' ১৬ (২৯)

—আল্-কোরআন।

১১১. কেয়ামতের দিন অহঙ্কারীদের শস্যবীজের মত (ক্ষুদ্র) মানুষের আকারে উত্তোলন করা হবে। অপমান তাদের চারদিক দিয়ে ঘিরে রাখবে। ইউলুস নামক নরকের এক বন্দীশালায় তাদের নিয়ে যাওয়া হবে এবং নরকের আগুনে

সেখানে তাদের আক্রমণ করবে। নরকবাসীদের মল ও মূত্র তাদের পান ও আহারের জন্য দান করা হবে।—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ আমর বিন শোয়ায়েব (রাঃ)।

১১২. 'যার অন্তরে এক সরষে পরিমাণ অহঙ্কার আছে সে বেহেশ্‌তে যাবে না।' এক ব্যক্তি বলল—'যদি কেউ ইচ্ছা করে যে তার পোশাক-পরিচ্ছদ ভাল হোক আর পায়ের জ়ুতো উত্তম হোক?' তিনি (হজরত দঃ) বললেন—'আল্লাহ্‌ নিজে সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। সত্যকে অসত্য করা এবং মানুষকে হেয় মনে করাকেই অহঙ্কার বলে।'—মুসলিম। বর্ণনায়ঃ ইবনে মস্‌উদ (রাঃ)।

১১৩. যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে সে নরকে যাবে না, আর যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার আছে সে বেহেশ্‌তে যাবে না।—মুসলিম। বর্ণনায়ঃ ইবনে মস্‌উদ (রাঃ)।

১১৪. আমি তোমাদের বেহেশ্‌তী লোকেদের পরিচয় জানাচ্ছি—তারা নম্রস্বভাবের হয় এবং মানুষের কাছে বিনীত বা নম্ররূপেই পরিচিত। আল্লাহ্‌র ওপরে নির্ভর করে' কোন কাজ হবে বলে শপথ করলে আল্লাহ্‌ তা কার্যে পরিণত করেন। হজরত (দঃ) আরও বললেন, তোমাদের দোজখী লোকেদের পরিচয় বলে দেব—তারা হয় কঠোর স্বভাবের (ও) অহঙ্কারী।—হারেছা (রাঃ)।

১১৫. অহঙ্কারী ও কর্কশভাষী কখনো বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। —আ. দাউদ।

আকিকাহ্‌

১১৬. আকিকাহ্‌ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহ্‌ অবাধ্যতা ভালবাসেন না। যার সন্তান জন্মগ্রহণ করে, (সন্তানের) বদলে কিছু জবেহ করা আমি পছন্দ করি। বালকের জন্যে দুটি ছাগ এবং বালিকার জন্যে একটি ছাগ।' [অপারক ব্যক্তি বালকের জন্য একটা ছাগ জবেহ করতে পারে।] —আবু দাউদ। নাসায়ী। বর্ণনায়ঃ আমর বিন শোয়ায়েব (রাঃ)।

১১৭. পাখীদের শান্তিতে বাসায় থাকতে দাও। বালকের জন্য দুটি ছাগ এবং বালিকার জন্য একটি—মদ্দা অথবা মাদী যাই হোক—কোন অনিষ্ট হবে না। [অর্থাৎ আকিকাহ্‌ শিশুর গৃহবাসকে শান্তিময় করে।]—আবু দাউদ। তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ উম্মে কোরেজ (রাঃ)।

১১৮. একটা দুম্বা দ্বারা রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) হাসানের আকিকাহ্‌ করলেন। তিনি বললেন, 'হে ফাতেমা! তার মস্তক মুণ্ডন কর এবং কেশের সমপরিমাণ রৌপ্য দান কর।' তিনি কেশ ওজন করলেন, তা এক বা কয়েক দিরহাম হল। —আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ আলী (রাঃ)।

১১৯. রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) হাসান ও হোসেন (রাঃ)-র আকিকাহ করেছিলেন, প্রত্যেকের জন্যে একটা করে' দুম্বা।—আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

১২০. আবু মুসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমার একটা ছেলে হলে তাকে নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। নবী (সঃ) তার নাম রাখলেন ইব্রাহীম (অর্থাৎ এক নবীর নামে নাম রাখলেন) আর খোরমা চিবিয়ে তার মুখে দিয়ে তার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। —বুখারী।

১২১. কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তা'লা ঐ ব্যক্তির নাম উপহাস করবেন যে ব্যক্তি 'রাজাধিরাজ' নাম গ্রহণ করে। [কেননা 'রাজার রাজা' এই আখ্যার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ্‌।] —বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১২২. যখন হজরত ফাতেমা (রাঃ) হাসানকে প্রসব করলেন, রসুলুল্লাহ (সঃ)কে তাঁর কানে আজান দিতে দেখেছি।—আ. দাউদ। তির। বর্ণনায়ঃ আবু রাফে' (রাঃ)।

আত্মহত্যা

১২৩. 'এক ব্যক্তির দেহে ক্ষত থাকায় সে আত্মহত্যা করল। তখন আল্লাহ্‌-তা'লা বললেন, 'আমার বান্দার প্রাণ আমি গ্রহণ করার পূর্বেই সে নিজে তার বিনাশ করেছে, তাই আমি তার জন্যে বেহেশ্‌ত হারাম (নিষিদ্ধ) করলাম।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ জুনদুব (রাঃ)।

১২৪. যে ব্যক্তি (গলায়) ফাঁসি দিয়ে শ্বাসরোধ করে' আত্মহত্যা করে, সে নরকের আগুনে নিজেকে ফাঁসি দিতে থাকবে; আর যে ব্যক্তি ফলার দ্বারা আত্মহত্যা করে সে নরকের আগুনের মধ্যে নিজেকে ফলার দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। —বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১২৫. যে ব্যক্তি কোন অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে নরকের আগুনের মধ্যে তাকে সেই অস্ত্র দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ সাবিত ইবনে জাহ্‌হাক (রাঃ)।

১২৬. যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে' আত্মহত্যা করে সে নিজেকে নরকেরআগুনে নিক্ষেপ করে। যে বিষপান দ্বারা আত্মহত্যা করে, সে বিষ হাতে নিয়ে নরকের মধ্যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে। যে বন্দুক দ্বারা আত্মহত্যা করে সে বন্দুক হাতে নিয়ে নরকের মধ্যে নিজের উদরে (গুলি) নিক্ষেপ করবে এবং সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।—তির। ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

আত্মীয়-পরিজন

জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।' ৪(১)

'সম্পত্তি বণ্টনকালে আত্মীয় স্বজন, পিতৃহীন এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদের ও থেকে কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে।' ৪(৮)

'আল্লাহ্‌ অবশ্যই ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।' ১৬(৯০)

—আল্‌-কোরআন।

১২৭. হজরত নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌তা'লা যখন সমস্ত মানুষের রূহ্‌ (আত্মা) সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন আত্মীয়তার বন্ধন আকৃতি ধারণ করে আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে দাঁড়াল এবং বলল, 'মানুষ আমাকে ছেদন করবে, তার থেকে বাঁচার জন্য আমি রক্ষাকবচ প্রার্থনা করছি।' তখন আল্লাহ্‌তা'লা বললেন, 'তুমি কি আমার এ ঘোষণায় সন্তুষ্ট হবে যে—যে ব্যক্তি তোমাকে বজায় রাখবে তার

সঙ্গে আমার সম্পর্ক বজায় থাকবে, আর যে ব্যক্তি তোমাকে ছেদন করবে তার সঙ্গে আমি আমার সম্পর্ক ছেদন করব ?' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, এমন ঘোষণা হলে নিশ্চয় আমি সন্তুষ্ট আছি।' আল্লাহ্ তা'লা বললেন, তোমার জন্য আমি এই ঘোষণা বলবৎ করে দিলাম। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১২৮. 'রাহেম' (অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা) কথাটা 'রহমান' শব্দ থেকে গৃহীত। সুতরাং আল্লাহ্ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঐ সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে আমার রহমতের সম্পর্ক তার সাথে বজায় থাকবে। আর যে ব্যক্তি ঐ সম্পর্কে ছেদন করবে, আমি তার সাথে আমার রহমতের সম্পর্ক ছেদন করব। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা ও আয়েশা (রাঃ)।

১২৯. রহম (অর্থাৎ আত্মীয়তার বন্ধন) কথাটা আরশের সঙ্গে এই বলে ঝুলছে, 'যে আমার সঙ্গে বন্ধন রক্ষা করে আল্লাহ্ তার সঙ্গে বন্ধন রাখেন, আর যে আমাকে ছেদন করে আল্লাহ্ তার সাথে বন্ধন ছেদন করেন।' —বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১৩০. যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছেদন করবে সে বেহেশ্তে যেতে পারবে না। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ জোবায়ের ইব্নে মোতয়েম (রাঃ)।

১৩১. যে ব্যক্তি উপার্জনে প্রাচুর্য (রুজিরোজগারে বরকত) এবং দীর্ঘস্থায়ী সুনাম অর্জনের আশা পোষণ করে সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। —বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা এবং আব্বাস (রাঃ)।

১৩২. আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কিভাবে আত্মীয়তায় বন্ধন রক্ষা করতে হয় তা তোমার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ কর; কেন না আত্মীয়তার বন্ধন পরিবারের মধ্যে ভালবাসা লাভের উপায়, ধর্মবৃদ্ধির উপকরণ এবং মৃত্যুকে বিলম্বিত করার পথ। —তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৩৩. (কোনব্যক্তি) প্রতিদানের দ্বারা আত্মীয়তা-রক্ষাকারীরূপে গণ্য হবে না। প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তা-রক্ষাকারী ঐ ব্যক্তি যে আত্মীয়তাছিন্নকারীর সঙ্গেও আত্মীয়তা রক্ষা করে। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ)।

১৩৪. বিদ্রোহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়া আর কোন পাপ নেই যার জন্যে পরলোকে শাস্তি নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও ইহলোকেই শাস্তিভোগ করতে হয়। —আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু বাকরাহ্ (রাঃ)।

১৩৫. দরিদ্রকে দান করলে একগুণ পুণ্য, আর আত্মীয়কে দান করলে দ্বিগুণ পুণ্য [কারণ দানের পুণ্য ও আত্মীয়তা রক্ষার পুণ্য]। —তিরমিজী। নাসায়ী। ইবনে মাজা। বর্ণনায় ঃ সোলায়মান বিন আমের (রাঃ)।

১৩৬. 'কোন্ দান সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ?' জিজ্ঞাসিত হলে রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'দরিদ্রকে দান কর। আত্মীয়কে প্রথম দান কর।'

১৩৭. এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)কে বলল, 'আমার (কাছে) একটা দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) আছে।' তিনি বললেন, 'তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর।' সে বলল, আমার আর একটা দিনার আছে।' তিনি বললেন, 'তোমার সন্তানগণের জন্য ব্যয় কর।' সে বলল, 'আমার আর একটা দিনার আছে।' তিনি বললেন, 'তা তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় কর।' সে বলল, 'আমার আর একটা দিনার আছে।' তিনি বললেন, 'তা তোমার দাস বা খাদেমের জন্য ব্যয় কর।' সে বলল, 'আমার আর একটা দিনার

আছে।' তিনি বললেন, 'তুমিই এর ব্যয় সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞাত আছ।' [সুস্থ পরিবার ও সমাজ গঠনের জন্য কি অপূর্ব ব্যয়-বিধি !] —আবু দাউদ। নাসায়ী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৩৮. যখন আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন ধন দেন, সে যেন প্রথমেই নিজের জন্য ও পরিজনবর্গের জন্য ব্যয় করে।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ জাবের বিন সামেরাহ্ (রাঃ)।

১৩৯. যে অর্থ আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, যে অর্থ দাসদাসীর মুক্তিতে ব্যয় কর, যে অর্থ দরিদ্রের জন্য ব্যয় কর, যে অর্থ পরিবারের জন্য ব্যয় কর, তার মধ্যে সব চেয়ে অধিক পুণ্য ঐ অর্থের যা তুমি পরিবারের জন্য ব্যয় কর। [কেন না Charity begins at home.]—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৪০. আল্লাহ্র কাছে সেই ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট যে তার পরিজনের প্রতি দয়ালু ও সদাশয়।—সগির।

১৪১. প্রশ্ন করা হল, 'কে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবহার পাবার যোগ্য ?' তিনি বললেন, 'তোমার মা।' তারপর কে ?—'তোমার বাবা।' তারপর তোমার নিকটতম আত্মীয় এবং তোমার নিকটতর আত্মীয়।' —তিরমিজী। আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ বাহাজ বিন হাকিম (রাঃ)।

১৪২. সর্বপ্রথমেই তিনি বললেন, হে মানবগণ ! শান্তি স্থাপন কর, খাদ্যপ্রদান কর, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর, যখন লোক নিদ্রিত থাকে তখন রাত্রিতে নামাজ পড়, তাহলে শান্তির সাথে বেহেশ্তে যাবে। —তিরমিজী ইবনে মাজা। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রাঃ)।

১৪৩. মদীনায় আনসারদের মধ্যে আবু তালহারই খেজুর বাগান সব চেয়ে বেশী ছিল এবং তাঁর এই বাগান-সম্পদের মধ্যে বাইরুহা (নামক বাগানটিই) তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। ঐ বাগান নবী (সঃ)-এর মসজিদের সামনেই অবস্থিত ছিল। নবী (সঃ) কখনো কখনো সেখানে যেতেন এবং সেখানকার সুমিষ্ট পানি পান করতেন। আনাস (রাঃ) বলেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল 'তোমরা যা ভালবাস তা থেকে দান না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত পুণ্য লাভ করবে না' —তখন আবু তালহা নবী (সঃ)এর সামনে এসে বলল, 'হে রসুলুল্লাহ, মঙ্গলময় মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, তোমরা যা ভালবাস তা থেকে দান না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত পুণ্য লাভ করবেনা ; এবং আমার সম্পদ সমূহের মধ্যে বাইরুহা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, অতএব আল্লাহর কাছে ওর (থেকে) পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় আমি ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করলাম। সুতরাং হে রসুলুল্লাহ্, আল্লাহ্ আপনাকে যেখানে রাখতে আদেশ দেন আপনি ওকে সেখানেই রাখুন।' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'বাঃ, এতো লাভজনক সম্পদ, এতো লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বললে আমি তা শুনলাম। তুমি ও (তোমার) আত্মীয়-স্বজনদের দান করে দেবে, আমি এটাই সঙ্গত মনে করি।' আবু তালহা বলল, "হে রসুলুল্লাহ্, আমি তাই করব।' তারপর আবু তালহা তা তাঁর নিকট-আত্মীয় এবং পিতৃব্য-পুত্রদের (অর্থাৎ চাচাতো ভাইদের) মধ্যে বন্টন করে দিলেন। —বুখারী/বর্ণনায় ঃ আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)।

১৪৪. (ঈদের দিনে মেয়েদের কাছে দান সম্পর্কে ভাষণ দানের পর) নবী (সঃ) যখন নিজগৃহে প্রত্যাগমন করলেন তখন ইবনে মসউদের স্ত্রী জয়নব এসে তাঁর সঙ্গে

সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করল। বলা হল, 'হে রসূলুল্লাহ্, 'এই যে জয়নব।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন্ জয়নব ?' উত্তরে বলা হল, 'ইবনে মসউদের স্ত্রী।' তিনি বললেন, 'হাঁ, তাকে অনুমতি দাও।' অনুমতি দেওয়া হলে তিনি এসে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র নবী, আপনি আজ দান করতে নির্দেশ দিয়েছেন ; আমার কাছে কিছু অলঙ্কার আছে যা আমি দান করার সঙ্কল্প করেছি ; কিন্তু ইবনে মসউদ মনে করেন যে আমি যাদের ও দান করতে চাই তাদের অপেক্ষা তিনি এবং তাঁর সন্তান (ঐ দানের) অধিকতর হকদার।' নবী (সঃ) বললেন, 'ইবনে মসউদ ঠিকই বলেছে। তুমি যাদের ও দান করতে চাও, তাদের অপেক্ষা তোমার স্বামী এবং তোমরে সন্তানই অধিক হকদার।'—বুখারী/বর্ণনাঃ--আবু সঈদ খুদরী (রাঃ)।

১৪৫. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)র স্ত্রী জয়নব বর্ণনা করছেন ঃ আমি নবী সঃ-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর দুয়ারের কাছে আমারই মত একই-উদ্দেশ্যে-আগতা এক আনসার রমণীকে দেখতে পেলাম। বেলাল আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন দেখে আমরা তাঁকে বললাম, 'আপনি নবী (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করুন যে আমি যদি আমার স্বামী এবং যে এতীমগণ আমার কোলে আছে তাদের জন্য ব্যয় করি তবে কি তা (দান হিসেবে) আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে ?' তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি (সঃ) বললেন, 'হাঁ, তার জন্য দ্বিগুণ পুণ্য হবে, আত্মীয়তার পুণ্য এবং দানের পুণ্য।' —বুখারী।

১৪৬. একদিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর স্ত্রী হেন্দা হজরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমার স্বামী আবু সুফিয়ান যে অত্যন্ত কৃপণ স্বভাবের—এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তিনি উদারতার সঙ্গে পরিবার-বর্গের জন্য খরচ করেন না। এ অবস্থায় তাঁর ধনসম্পদ থেকে ছেলেমেয়েদের জন্য খরচ করলে কি আমার পাপ হবে ?' উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'ছেলেমেয়ে-দের প্রয়োজন মত খরচ করলে তোমার কোন পাপ হবে না।' —বুখারী/বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১৪৭. যে ব্যক্তি ভিক্ষা থেকে বাঁচতে, আপন পরিজনের ভরণ-পোষণ করতে এবং প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে পৃথিবী ও তার সম্পদের প্রত্যাশা করে, সে নিশ্চয় চতুর্দশীর পূর্ণচন্দ্রের মত উজ্জ্বল মুখমণ্ডল নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। যে ব্যক্তি কেবল সঞ্চয় ও আড়ম্বর প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর ধন-সম্পদ প্রত্যাশা করে সে এমন সময়ে আল্লাহ্‌তা'লার কাছে উপস্থিত হবে যখন তিনি ক্রুদ্ধ থাকবেন। —বয়হাকী।

১৪৮. মুসলমান পুণ্যলাভের আশায় তার পরিজনের জন্য যা ব্যয় করে তা তার পক্ষে দান। —শায়খান।

১৪৯. ওপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম ; তোমার পরিজনদের থেকেই দান আরম্ভ কর [দাতার হাত প্রার্থীর হাতের ওপরে থাকে, তাই দাতার হাত উত্তম]। —বুখারী।

১৫০. যে ব্যক্তি আশুরার দিন (১০ই মহরম) নিজ পরিজনগণের জন্য মুক্ত-হস্তে দান করে, আল্লাহ্‌তা'লা তাকে সারা বৎসরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যাদি দান করেন। —বয়হাকী।

১৫১. যে ব্যক্তি তার জীবিকা বৃদ্ধি করতে বা দীর্ঘ জীবন লাভ করতে আশা করে সে যেন তার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে। —শায়খান।

১৫২. যে ব্যক্তি আপন ধনপ্রাণ ও পরিজনগণকে রক্ষা করার জন্যে প্রাণত্যাগ করে সে নিশ্চয়ই শহীদ। —আবু দাউদ। নাসায়ী।

১৫৩. তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টজীবের কাছে উৎকৃষ্ট যে ব্যক্তি তার পরিজনগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং আমি আমার পরিজনগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট। তোমাদের মধ্যে কেউ প্রাণত্যাগ করলে তার পাপের কথা উল্লেখ করোনা। —মিশকাত।

১৫৪. আল্লাহ্ যখন কাউকে ভালবাসেন তখন তাকে ধর্মপালন করার সুবুদ্ধি দান করেন, তার ঈমানকে সুদৃঢ় করেন এবং তার জীবিকাকে দৈনন্দিন আহারের উপযোগী করেন—এবং তাকে বিশুদ্ধ বসনে সজ্জিত করেন। আর যখন কারো অনিষ্ট কামনা করেন তখন তাকে ভ্রান্তিমধ্যে স্থাপন করেন, তাকে ধনের প্রতি আকৃষ্ট করেন, তার পরিজন-সংখ্যা বৃদ্ধি করেন, তাকে পার্থিব বিষয়ে মগ্ন রাখেন, তাকে প্রবৃত্তির দাস করেন এবং অপরের প্রতি নির্ভরশীল করেন। —ওসিয়াতুন্নবী।

আমানত

'যারা অমানত (অর্থাৎ গচ্ছিত ধন) ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, যারা সাক্ষ্যদানে অটল এবং নিজেদের নামাজে যত্নবান—তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে।' ৭০ (৩২-৩৫)

'আল্লাহ্ তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ আমানত আমানতকারীর কাছে ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন।'

'যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে।' ২ (২৮৩)

—আল্-কোরআন।

১৫৫. বিশ্বাস করে যে ব্যক্তি তোমার কাছে (কিছু) আমানত (গচ্ছিত) রাখে তা তাকে ফেরত দিও; এবং যে তোমার সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করে, তার সাথে বিশ্বাস-ভঙ্গ করো না। —তিরমিজী। আবুদাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৫৬. যে পর্যন্ত দুজন শরিক একে অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে সে পর্যন্ত আমি তাদের মধ্যে তৃতীয় শরীক হয়ে থাকি। যখন তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন তাদের কাছ থেকে আমি চলে যাই। —আ দাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৫৭. যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমানও নেই।

১৫৮. কেয়ামতের দিনই আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা বড় অমানত। —মুসলিম

১৫৯. যখন কোন ব্যক্তি (কোন) কথা বলে' (তা) গোপন রাখার জন্য তার মনোযোগ আকর্ষণ করে, (তখন) তা আমানত। [গোপন কথা গচ্ছিত ধন, কারণ তা অন্য কাউকে বলা যায় না।] —তিরমিজী। আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ হজরত জাবের (রাঃ)।

আলিঙ্গন ও চুম্বন

১৬০. (দৌহিত্র) হজরত হাসান(রাঃ)কে চুম্বন দান করার সময় আকরায়া উপস্থিত ছিল। সে বলল, 'আমার দশটি সন্তান আছে, (কিন্তু) কাউকেই আমি চুম্বনদিইনা।' তিনি (হজরত দঃ) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যে দয়ালু নয়, সে দয়া পায় না।' । —বুখারী । মুসলিম । বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) ।

১৬১. আবুতালেবের পুত্র জাফরের সাথে সাক্ষাৎ হলে রসুলুল্লাহ্ (দঃ) তাকে আলিঙ্গন করলেন এবং তার দুটি চোখের মধ্যবর্তী স্থানে চুম্বন দিলেন। —আবু দাউদ । বর্ণনায় ঃ সাবী (রাঃ) ।

১৬২. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আমার ঘরে ছিলেন। জায়েদ বিন হারেসা মদীনায় এসে দরজায় খট্‌খটি দিলে তিনি অনাবৃত শরীরে কাপড় টানতে টানতে তার কাছে গেলেন। সে রসুলুল্লাহ্ (সঃ)কে আলিঙ্গন ও চুম্বন করল। খোদার শপথ ! এর পূর্বে এবং পরে তাঁকে অনাবৃত অবস্থায় দেখেনি।—তিরমিজী/বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ) ।

আর্তের সেবা

১৬৩. যে ব্যক্তি আর্তের (বা রোগীর) সেবা করে সে যেন বেহেশ্‌তের ফুল তুলতে থাকে।—মুসলিম । তিরমিজী ।

১৬৪. আর্তের (রোগীর) সেবাকারী যতক্ষণ পর্যন্ত আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে বেহেশ্‌তের পথে চলতে থাকে। —মুসলিম।

১৬৫. কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তা'লা বলবেন ঃ হে আদমসন্তান, আমি রুগ্‌ণ ছিলাম, তুমি আমার সেবা কর নি।' সে বলবে, 'হে প্রভো, কিভাবে আমি আপনার সেবা করব, আপনি তো নিখিল জগতের প্রভু, (আপনি নীরোগ)।' আল্লাহ্ বলবেন ঃ 'আমার অমুক বান্দা পীড়িত ছিল, তুমি তাকে দেখনি। তুমি কি জানতে না যে যদি তুমি সেখানে যেতে তবে অবশ্যই আমাকে দেখতে পেতে ?' আল্লাহ বলবেন ঃ 'হে আদমসন্তান, আমি তোমার কাছে আহার্য চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে তা দাও নি।' সে বলবে, 'হে প্রভো, কিভাবে আমি আপনাকে আহার্য দান করব, আপনি তো নিখিল জগতের প্রতিপালক ও পানাহার থেকে মুক্ত।' আল্লাহ্ বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে আহার্য চেয়েছিল কিন্তু তুমি তা দাও নি। তুমি কি জান না, যদি তুমি তাকে আহার দিতে তবে তুমি তাকে আমার কাছে দেখতে পেতে ? হে আদম-সন্তান, আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে তা দাও নি।' সে বলবে, 'হে খোদা, কিভাবে আমি আপনাকে পানি পান করাব যখন আপনি নিখিল বিশ্বের পালনকর্তা ?' আল্লাহ্ বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা, তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে দাও নি। যদি তুমি তাকে পান করাতে, তবে তুমি তাকে আমার কাছে দেখতে পেতে অর্থাৎ তার পুরস্কার আমার কাছে দেখতে। ['জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' ।]—মুসলিম ।

আশা

'অবিশ্বাসিগণ যখন সত্যের দিকে আগমনই করেনা, তখন তাদের জন্য অনুশোচনা ত্যাগ করুন। তাদের খাওয়া-পরা, আরাম-আয়েশের দীর্ঘ আশা নিয়ে অচেতন ভাবে সময় কাটাতে দিন, অচিরেই তারা উপলব্ধি করতে পারবে।'

—আল্-কোরআন।

১৬৬. একদিন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটা চতুষ্কোণ বেষ্টনী অংকন করলেন এবং তার মধ্যে একটা সরল রেখা অঙ্কন করলেন। ঐ সরল রেখার দৈর্ঘ্য চতুষ্কোণের বেষ্টনী অতিক্রম করে' গেল। সরল রেখার যে অংশ বেষ্টনীর মধ্যে রইল তার প্রতি (উভয় দিক থেকে) ধাবমান কতকগুলো ছোট ছোট রেখাও তিনি অঙ্কন করলেন। তারপর বেষ্টনীর মধ্যস্থিত সরল রেখার প্রতি ইশারা করে বললেন, 'এ হল মানুষ, বেষ্টনকারী রেখা হল তার বয়স, বেষ্টনীর বাইরে অবস্থিত সরল রেখাংশটুকু তার দীর্ঘ আশা, আর মধ্যবর্তী রেখার প্রতি ধাবমান রেখাগুলো মানুষের জীবন-নাশক আপদ-বিপদ, রোগ-শোক—এক একটা মানুষকে যা একের পর এক আঘাত হানতে থাকে।' —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)।

১৬৭. একদিন নবী (সঃ) উদাহারণ স্বরূপ মানুষকে একটা বিন্দুরূপে কল্পনা করে তার কাছে ও দূরে কিছু রেখা অঙ্কন করলেন। তারপর কাছাকাছি একটা রেখার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'এ যেন মানুষের জীবনকালের শেষ সীমা।' আর দূরের একটা রেখার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'এ পর্যন্ত হল মানুষের আশা। সুতরাং মানুষ তার আশা পোষণ করতেই থাকে কিন্তু সেই আশা পর্যন্ত পৌঁছুবার পূর্বেই তার কাছাকাছি রেখাটা বা জীবন-কালের শেষ সীমারেখাটা এসে হাজির হয়।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

১৬৮. আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'বৃদ্ধের অন্তর দুটি জিনিসের বিষয়ে তরুণ থাকে—প্রথমটা হল দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, দ্বিতীয়টা হল দীর্ঘ আশা। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৬৯. বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে দুটি বিষয় তীব্রতর হয়— (১) ধনসম্পদের প্রতি ভালবাসা আর (২) দীর্ঘ জীবনের জন্য আশা। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

১৭০. আল্লাহ্ বলেন, আমি যখন বান্দার কোন প্রিয়বস্তু তুলে নিই তখন সে বান্দা যদি পুণ্য লাভের আশায় ধৈর্য ধারণ করে তবে সে আমার কাছ থেকে তার পুরস্কার স্বরূপ বেহেশ্ত লাভ করবে।' —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

আহার

'আমি তোমাদের জন্যে যে আহার দিয়েছি তার মধ্যে থেকে পবিত্র বস্তুকে গ্রহণ কর।' ২ (১৭২)

'যাদের কেতাব (ঐশী গ্রন্থ) দেওয়া হয়েছে তাদের আহার্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ এবং তোমাদের আহার্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ।' ৫(৫)।

—আল্-কোরআন।

১৭১. (মৃত্যুর পর) মানুষের পেটই সর্বাগ্রে বিকৃত ও দুর্গন্ধময় হয়, অতএব যথাসাধ্য বৈধ (হালাল) খাদ্য খেতে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্তব্য। —বুখারী। বর্ণনায়ঃ জুন্দুব (রাঃ)।

১৭২. কোন লোক অনিষ্টকর খাদ্য দ্বারা যেন উদর পূর্ণ না করে। মানুষের খাদ্য ততটুকুই হওয়া দরকার যাতে তার মেরুদন্ড সোজা থাকে। এ সম্ভব না হলে উদরের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য। —তিরমিজী। ইবনে মাজা। বর্ণনায়ঃ মেকদাম (রাঃ)।

১৭৩. তিনি (রসূলুল্লাহ্ সঃ) এক ব্যক্তিকে ঢেকুর তুলতে শুনে বললেন, 'তোমার ঢেকুর সংক্ষেপ কর। কেননা কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি অধিক ক্ষুধার্ত হবে যে এই দুনিয়াতে অধিক আহার করে।' —তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

১৭৪. তিনি (নবী সঃ) বলেছেনঃ আমার প্রভু মক্কার উপত্যকাকে স্বর্ণের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেবার জন্য আমার মত চেয়েছিলেন। আমি তা অস্বীকার করে বললাম, 'হে প্রভু! বরং আমি একদিন আহার করব আর অন্য দিন অনাহারে থাকব—এই আমার ইচ্ছা। কারণ যেদিন আমি অনাহারে থাকব সেদিন বিনীত থাকব এবং তোমাকে স্মরণ করব, আর যেদিন আমি আহার করতে পারব (সেদিন) আমি তোমার প্রশংসা করব এবং তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব।' —তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ আবু ওমামা (রাঃ)।

১৭৫. তোমাদের মধ্যে তারাই আমার প্রিয় যাদের আহার্য অল্প, শরীর হাল্কা এবং যারা নিজের জন্য যা ভালবাসে অপরের জন্য তাইই ভালবাসে। —বুখারী। সগির।

১৭৬. পাঁচটি জিনিস পুণ্যজনক—অল্প আহার, মসজিদে অবস্থান, কাবা শরীফ, কোরআন শরীফ এবং আলেমের অর্থাৎ জ্ঞানীর মুখদর্শন।—সগির।

১৭৭. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ দুজনের খাদ্য তিনজনের এবং তিনজনের খাদ্য চারজনের প্রয়োজন মেটাতে পারে।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৭৮. নাফে' (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) মিসকিন (দরিদ্র ব্যক্তি) সঙ্গে না নিয়ে খেতেন না। একদিন আমি তাঁর সঙ্গে আহার করার জন্যে এক ব্যক্তিকে ডেকে আনলাম; সে অনেক পরিমাণ আহার করল। পরে তিনি আমাকে বললেন, এই ব্যক্তিকে আর কোনদিন আমার সঙ্গে আহার করার জন্যে ডেকো না। আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে বলতে শুনেছি, 'প্রকৃত মুসলমান এক পেটে খায়, আর কাফের সাতপেটে খায়।'—বুখারী।

১৭৯. আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি অনেক বেশী পরিমাণ আহার করতে লাগল। এ ঘটনা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে বলা হলে তিনি বললেন, 'প্রকৃত মুসলমান এক পেটে খায় আর কাফের সাত পেটে খায়।'—বুখারী।

১৮০. রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনো কোন খাদ্যবস্তু সম্পর্কে খারাপ উক্তি করতেন

না—পছন্দ হলে খেতেন, পছন্দ না হলে খেতেন না। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৮১. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মিষ্টদ্রব্য এবং মধু ভালবাসতেন। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১৮২. আবু শোয়ায়েব (রাঃ) নামে এক মদীনাবাসী সাহাবীর একজন ক্রীতদাস ছিল। ঐ সাহাবী তার ক্রীতদাসকে বলল, 'পাঁচজন লোকের খাবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য প্রস্তুত কর। আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সমেত পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করব।' নিমন্ত্রণে যাবার সময় অতিরিক্ত একজন লোক রসূলুল্লাহ্ (সঃ)এর সঙ্গী হল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিমন্ত্রণকারীকে বললেন, 'তুমি আমাদের পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলে; অতিরিক্ত একজন লোক আমাদের সঙ্গে এসেছে—তুমি ইচ্ছা করলে তাকে আহারে-অংশ গ্রহণ করার অনুমতি দিতে পার, ইচ্ছা করলে নাও দিতে পার।' সে বলল, 'হুজুর! আমার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু মসউদ (রাঃ)।

১৮৩. নিষিদ্ধ (বা হারাম) বস্তু আহার দ্বারা যে শরীর পুষ্ট হয়েছে, তা কখনো বেহেশতে প্রবেশ করবে না।—মিশকাত।

১৮৪. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত কবুল করেন না। আল্লাহ্ নবীদের যা আদেশ দিয়েছেন মুমিনদেরও সেই আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন, 'হে নবীগণ! পবিত্র জিনিস আহার কর এবং সৎকার্য কর।' তিনি বলেছেন, 'হে মুমিনগণ। তোমাদের তিনি যে আহার্য দিয়েছেন তার থেকে পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর।' তারপর তিনি (দঃ) এমন এক ব্যক্তির কথা বললেন, যে দীর্ঘ ভ্রমণে ধূলিধূসরিত বেশে এবং আলুথালু কেশে আকাশের দিকে হাত তুলে 'হে প্রভু! হে প্রভু!' বলে (অর্থাৎ প্রার্থনা করে)। কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম—এবং হারাম (অবৈধ) খাদ্যদ্বারা সে পরিপুষ্ট। কি ভাবে তার প্রার্থনা কবুল (মঞ্জুর) হবে?—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৮৫. হজরত আবু বকর (রাঃ)-র খাজনা আদায় করার জন্য একজন কর্মচারী ছিল। একদিন সে কিছু নিয়ে এলে তিনি তা থেকে কিছু আহার করলেন। কর্মচারী বলল, 'আপনি কি জানেন এ কি?' তিনি বললেন, 'এ কি? এ কি?' সে বলল, 'ইসলামপূর্বযুগে এক ব্যক্তিকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম এবং তাকে প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছু করি নি। সেইজন্যে সে আমাকে এ দান করেছে এবং এই জিনিস আপনি ভক্ষণ করেছেন।' তখন তিনি নিজের গলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পেটে যা কিছু ছিল বমি করে ফেলে দিলেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১৮৬. মুমিন ব্যতীত কারো সঙ্গী হয়ো না এবং পবিত্র ও হালাল (বৈধ) জিনিস ছাড়া কিছু খেয়ো না।—তিরমিজী।

আহার ও পানের রীতি-নীতি

১৮৭. নিশ্চয়ই যে খাদ্যে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয় না, শয়তান তাকে বৈধ করে।—বুখারী। মুস। বর্ণনায় ঃ আবু হোজায়ফা (রাঃ)।

১৮৮. যখন কোন ব্যক্তি তার গৃহে প্রবেশ করে, প্রবেশের সময় ও খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান (তার নিজেকে সম্বোধন করে') বলে—'তোমার রাত্রিযাপনের স্থান ও রাতের আহার নেই।' যখন সে খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে না, তখন শয়তান বলে, 'তুমি (অর্থাৎ শয়তান) রাত্রিযাপনের স্থান ও রাতের আহার পেয়েছ।'—মুসলিম। বর্ণনায় জাবের (রাঃ)।

১৮৯. যখন তোমাদের কেউ আহার করে কিন্তু আহারকালে আল্লাহ্‌র নাম নিতে ভুলে যায়, সে যেন বলে, আহারের প্রথমে ও শেষে আল্লাহ্‌র নাম নিচ্ছি। —তির। আ. দাউদ। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১৯০. এক ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করছিল কিন্তু 'বিসমিল্লাহ্' বলে নি। যখন তার আর মাত্র একগাল খাওয়া বাকী ছিল, সে মুখ তুলে বলল, 'এর প্রথম ও শেষে আল্লাহ্‌র নাম।' তখন নবী (সঃ) হেসে বললেন, 'শয়তান এ পর্যন্ত ওর সঙ্গে খাচ্ছিল। যখন সে আল্লাহ্‌র নাম নিল—শয়তান যা খেয়েছিল সব বমি করে ফেলে দিল।'—আবু দাউদ।

১৯১. ওমর ইবনে আবু সালমাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)এর প্রতিপালনে ছিলাম। (এক পাত্রে কয়েকজন লোক এক সঙ্গে) আহার করার সময় আমি পাত্রের বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন দিক থেকে খাদ্য তুলে খেতাম। একদিন রসুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে বললেন, 'হে বালক, আহারের সময় বিসমিল্লাহ্ বলে' আহার আরম্ভ করবে, ডান হাতে আহার করবে এবং সম্মুখস্থল থেকে আহার করবে।'—বুখারী।

১৯২. ঠেস দিয়ে বসে আমি খাদ্য গ্রহণ করি না।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোজায়ফা (রাঃ)।

১৯৩. আবু হোজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি একদিন রসুল্লাহ্ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি আসন আকারে, বা হাতের ওপরে ভর দিয়ে কিংবা হেলান দিয়ে খেতে বসি না।' —বুখারী।

১৯৪. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে বললেন, 'তোমার ডান হাতের দ্বারা তুমি আহার কর এবং তোমার সম্মুখ দিক থেকে আহার কর।'—মুস। বর্ণনায় ঃ আমর বিন সালমা (রাঃ)।

১৯৫. যখন তোমরা কেউ আহার কর, ডান হাতের দ্বারা কর এবং যখন পান কর, ডান হাতের দ্বারা কর।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

১৯৬. তোমাদের কেউই বাম হাত দ্বারা আহার বা পান করবে না, কারণ একমাত্র শয়তানই বাম হাত দ্বারা পানাহার করে।—মুস। বর্ণনায় ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

১৯৭. যখন তোমাদের কেউ আহার করে সে যেন তার আঙ্গুলগুলো চেটে খায়—কারণ সে জানে না তাদের কোনটার সাথে বরকত আছে।—তির।

১৯৮. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) তিন অঙ্গুলি দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং হাত ধোয়ার পূর্বে তা চেটে নিতেন।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ কাব্বাব বিন মালেক (রাঃ)।

১৯৯. যখন তোমরা কেউ আহার কর, হাত চেটে না খাওয়া পর্যন্ত তা মুছে ফেল না।—শায়খান।

২০০. আহারের পর হাত ধোয়ার আগে প্রত্যেকে অবশ্যই নিজের নিজের হাত চেটে খাবে অথবা (আদর করে) অন্যকে চেটে খেতে দেবে।—বুখারী। বর্ণনায়—ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

২০১. যে ব্যক্তি কোন পাত্রে আহার করার পর পাত্রটা চেটে খায়, পাত্রটা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।—তির। ই. মাজা। দারমী। আহমদ।

২০২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে একপাত্র 'সুফ' আনা হলে তিনি বললেন, 'এর এক পাশ থেকে খাও, মাঝখান থেকে খেও না—কারণ মাঝখানেই বরকত অবতীর্ণ হয়।' অন্য বর্ণনায়, 'তোমাদের কেউ যখন খাদ্য গ্রহণ করে সে যেন সবচেয়ে ওপরের অংশ (অর্থাৎ মধ্যভাগ) থেকে খাদ্য গ্রহণ না করে, সবচেয়ে নীচের অংশ বা এক প্রান্ত থেকে খাদ্যগ্রহণ করে—কেন না ওপরের অংশে বরকত অবতীর্ণ হয়।'—আ. দাউদ। তির। ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

২০৩. নিশ্চয় খাদ্যের মধ্যভাগে আশীর্বাদ অবতীর্ণ হয়, অতএব—ওর প্রান্ত-দেশ থেকে আহার কর এবং মধ্যভাগ থেকে আহার কর না।—তিরমিজী।

২০৪. ছুরি দ্বারা মাংস কেটে খেওনা, কারণ ওটা বিদেশীদের প্রথা—কিন্তু দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাও, ও অধিকতর সহজ ও স্বাদযুক্ত।—আবু দাউদ। বয়হাকী। তির। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

২০৫. তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। যে ভুলে যায় সে যেন বমি করে।—মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

২০৬. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) পান করবার সময় তিনবার নিঃশ্বাস ফেলতেন। অন্য বর্ণনায়ঃ তিনি বলেছেনঃ এ তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং স্বাস্থ্য ও হজমশক্তি বৃদ্ধি করে।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

২০৭. উটের মত এক নিঃশ্বাসে সবটুকু (পানীয়) পান করো না, বরং অল্প অল্প করে দুবার তিনবারে পান কর এবং প্রথমে বিসমিল্লাহ্ ও শেষে আলহামদো-লিল্লাহ্ বল।—তির।

২০৮. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) পানপাত্র সম্পূর্ণ উপুড় করে পান করতে নিষেধ করেছেন।—শায়খান।

২০৯. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) পানপাত্রে নিশ্বাস ফেলতে বা ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।—আ. দাউদ। ই. মাজা।

২১০. শীতল সুমিষ্ট পানীয় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল।—তিরমিজী।

২১১. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হালুয়া ও মধু ভালবাসতেন।—বুখারী।

২১২. অতিরিক্ত ভোজন দুর্ভাগ্যসূচক।—বয়হাকী।

২১৩. তোমাদের খাদ্য পরিমাপ করে দিও, ওতে সচ্ছলতা আসবে।—বুখারী।

২১৪. সকলে একত্রে আহার করো—ওতে সচ্ছলতা আসে; একাকী আহার করো না।—তিরমিজী।

২১৫. একত্রে আহার কর, পৃথক হয়ো না। নিশ্চয়ই জামাতের সাথে বরকত।—ই. মাজা।

২১৬. খাদ্যের বরকত পূর্বে ও পরে অজু করা।—সগির।

২১৭. তোমাদের মধ্যে যখন কেউ আহার করে এবং ওর থেকে কিছু (দস্তর-খানে) পড়ে যায়, তখন সে ওর ময়লাটুকু ফেলে দিয়ে খাবে এবং শয়তানের জন্য রেখে দেবে না।—তির।

২১৮. কৃতজ্ঞ ভোজনকারী ধৈর্যশীল রোজাদারের তুল্য।—তির। ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২১৯. তোমরা স্বর্ণ বা রৌপ্যপাত্রে কিছু পান বা আহার করোনা। অবিশ্বাসীরা ওসবের দ্বারা ইহকালে ভোগবিলাস করে, তোমরা ওসব পরকালে লাভ করবে।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ হোজায়ফা (রাঃ)।

২২০. জাবালা-ইবনে-সোহায়েম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন: আমরা কয়েকজন লোক একসঙ্গে বসে খেজুর খাচ্ছিলাম। সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে ওমর (রাঃ) আমাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় আমাকে বললেন, 'কেউ যেন একসঙ্গে দুটো করে খেজুর নিও না, তবে যদি অপর সঙ্গীর অনুমতি নেওয়া হয় তাহলে তাতে দোষ নেই।' —বুখারী।

২২১. তোমার ভৃত্য তোমার জন্য আহার্যদ্রব্য নিয়ে এলে তাকে সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াবার মত মনোবল যদি তোমার না থাকে তবে অন্ততঃ দু একগাল তাকে অবশ্যই দেবে—কারণ এই খাদ্য তৈরী করার সময় আগুনের উত্তাপ ও ধোঁয়ার সমস্ত কষ্ট সে-ই সহ্য করেছে।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২২২. নিশ্চয়ই অল্লোহ্ ঐ বান্দাদের ওপর সন্তুষ্ট যারা আহার ও পান করার পর আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসা করে।—মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

২২৩. যখন তোমাদের কেউ আহার করে সে বলবে: হে আল্লাহ্ আমাদের জন্যে এতে বরকত দাও এবং এর চেয়ে উত্তম জিনিস আহার করতে দাও। আর যখন কেউ দুধ পান করে সে বলবে: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য এতে বরকত দাও এবং এর চেয়ে বেশী দাও; কারণ দুধ ছাড়া আর কিছুই আহার ও পানীয়ের ক্ষতিপূরণ করতে পারে না।—তির। আ. দাউদ।

২২৪. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন পানাহার করতেন, তখন বলতেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আহার ও পানীয় দিয়েছেন, একে সহজে গলাধঃকরণের উপযোগী করেছেন এবং এর জন্য একটা পথ সৃষ্টি করেছেন।—আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ —আবু আয়ুব (রাঃ)।

২২৫. আবু উমামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন: আহারান্তে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কখনো এই দোয়া পড়তেন, 'পবিত্র ও অফুরন্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তা'লার জন্য। হে আমার পালনকর্তা, কখনো এর মুখাপেক্ষী না হয়ে পারবনা, একে চিরবিদায় দিতে পারবনা, এর থেকে নির্লিপ্ত থাকতে পারবনা।' কখনো বলতেন, 'সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র জন্য যিনি অনুগ্রহ করে আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। আমরা তাঁর কাছে চিরপ্রত্যাশী ও চিরকৃতজ্ঞ।' কখনো বলতেন, 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌তা'লার জন্য যিনি আমাদের খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন, উপরন্তু আমাদের মুসলমানদের দলভুক্ত করেছেন।'—বুখারী।

ইহলোক ও পরলোক

'ইহলোকের ভোগ সামান্য, এবং যে সংযমী তার জন্য পরলোকই উত্তম।' ৪ (৭৭)

'অতএব যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাদের আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করা উচিত।' ৪ (৭৪)

'আর পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া ও কৌতুক বই আর কিছুই নয়, এবং যারা সাবধানতা অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়ঃ, তোমরা কি (তা) অনুধাবন করনা?' ৬ (৩২)

'যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় এবং তাতে দোষত্রুটি অনুসন্ধান করে, তারাই পরকালকে অবিশ্বাস করে।' ৭ (৪৫)

'নিশ্চয়ই যারা পরলোকে বিশ্বাস করেনা তারা তো সরল পথ হতে বিচ্যুত; আমি ওদের দয়া করলেও এবং দুঃখ-দৈন্য দূর করলেও ওরা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের মত ঘুরতে থাকবে।' ২৩ (৭৪, ৭৫)

'হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, যদি তোমরা দুনিয়ার সৌন্দর্য এবং সন্তুষ্টি কামনা কর, তবে এস তোমাদের কিছু ভুক্ত সামগ্রী দিয়ে বিদায় করে দিই।'

'পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ৩ (১৮৪)

—আল্-কোরআন।

২২৬. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন: আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের কারো আঙুল সমুদ্রে ডুবোলে তা যা (অর্থাৎ যতটুকু প্যানি) নিয়ে ফিরে আসে, পরকালের তুলনায় ইহকালের উপমা ততটুকু।—মুসলিম/বর্ণনায়ঃ মোসতাওরিদ বিন সাদ্দাদ (রাঃ)।

২২৭. একদিন আমি হজরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটা খেজুরের মাদুরের ওপরে নিদ্রিত ছিলেন; তাতে তাঁর শরীরের ওপর দাগ পড়ে। 'আমি বললাম, 'হে রসূলুল্লাহ্, যদি অনুমতি করেন তবে আপনার জন্য আমি একটা উত্তম শয্যা রচনা করি।' তিনি বললেন, 'পৃথিবীতে আমার কি প্রয়োজন? একজন অশ্বারোহী যেমন ক্ষণিকের জন্য গাছ-তলায় দাঁড়ায় এবং পরক্ষণেই তা পরিত্যাগ করে, পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্কতো সেইরকম।—তিরমিজী/বর্ণনায়ঃ ইবনে মসউদ (রাঃ)।

২২৮. পৃথিবী আত্মনির্ভরতার স্থান এবং পরকাল সুখের স্থান; পৃথিবী বিশ্বাসীদের পক্ষে কারাগার এবং অবিশ্বাসীদের পক্ষে স্বর্গস্বরূপ।—মুসলিম।

২২৯. পৃথিবী মুসলমানদের জন্য কারাগার ও দুর্ভিক্ষ। যখন তারা পৃথিবী পরিত্যাগ করে তখন তারা যেন কারাগার ও দুর্ভিক্ষ ত্যাগ করে।—মিশকাত।

২৩০. (পৃথিবীর) এ জীবন পরকালের ক্ষেত্রস্বরূপ, অতএব পৃথিবীতে সৎকার্য বপন (বা পালন) কর যাতে পরলোকে পুণ্যের ফসল কাটতে পার। কারণ চেষ্টা করা খোদার আদেশ, আর তিনি যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তা চেষ্টা দ্বারাই লাভ করা যায়।—সগির।

২৩১. তিনি [হজরত (দঃ)] বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের ভয় করিনা; আমি ভয় করি—যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য পৃথিবী প্রশস্ত হয়েছিল তোমাদের জন্যও (তেমনি) প্রশস্ত হবে তারা যেমন এর (পৃথিবীর) প্রীতি আসক্ত হয়েছিল তোমরাও তেমনি (আসক্ত) হবে এ পৃথিবী তাদের যেভাবে

ধ্বংস করেছে তোমাদেরও সেইভাবে (ধ্বংস) করবে।'—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আমর বিন আউফা (রাঃ)।

২৩২. যে পৃথিবীকে ভালবাসে সে পরলোকে কষ্ট ভোগ করে, আর যে পরলোক ভালবাসে সে পৃথিবীতে কষ্টভোগ করে। অতএব নশ্বর অপেক্ষা যা অবিনশ্বর তাই গ্রহণ কর।—বয়হাকী।

২৩৩. নশ্বর জিনিস অর্জন করোনা, তাহলে পৃথিবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে।—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ ইবনে মসউদ (রাঃ)।

২৩৪. তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট যে পৃথিবীর জন্য পরকাল এবং পরকালের জন্য পৃথিবীকে পরিত্যাগ করেনা, আর মানুষের গলগ্রহ হয়না।—সগির।

২৩৫. ইহলোকের দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি ভালবাসা সকল অনিষ্টের মূল এবং কোন দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি ভালবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির করে তোলে।—আবু দাউদ।

২৩৬. তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট যে পৃথিবীতে আপন প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করে এবং পরকালের জন্য অধিকতর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।—সগির।

২৩৭. এক ব্যক্তি বললেন, হে রসুলুল্লাহ্ (সঃ)! আমাকে এমন একটা কাজ শিখিয়ে দিন যা করলে আল্লাহ্ এবং মানুষ আমাকে ভালবাসবে। তিনি বললেন, 'এই পৃথিবীকে চেওনা, (তাহলে) খোদা তোমাকে ভালবাসবেন, আর মানুষ যা চায় (অর্থাৎ যশঃ, অর্থ ইত্যাদি) তা তুমি চেওনা, তাহলে লোকেও তোমাকে ভালবাসবে।'—তির। ইবনে মাজা। বর্ণনায়ঃ সহল বিন সায়াদ (রাঃ)।

২৩৮. একদিন এক মৃত ছাগশিশুকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হজরত (দঃ) তাঁর সহচরদের (তা) দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি একে এক দিরহামে কিনতে চাও?' তাঁরা বললেন, 'না, আমরা এ পছন্দ করিনা এতে আমাদের কোন লাভ নেই।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ—এই মৃত ছাগশিশু তোমাদের কাছে যেমন হেয়, আল্লাহ্‌তা'লার কাছে এই পৃথিবী তার চেয়েও বেশী হেয়।'—মুসলিম।

২৩৯. তিনি (হজরত দঃ) বলেছেন, 'পৃথিবী যদি আল্লাহ্‌র কাছে মাছির ডানার মতও মূল্যবান হত, (তাহলে) তিনি কোন অবিশ্বাসীকে এক কোষ পানিও পান করতে দিতেন না।'—তিরমিজী/বর্ণনায়ঃ সহল বিন সায়াদ (রাঃ)।

২৪০. আমার উম্মতগণ এক আশীর্বাদপ্রাপ্ত জাতি, পরলোকে তাদের জন্য কোন শাস্তি নেই। আপদ-বিপদ, বিপ্লব-হত্যা তাদের জন্য ইহলোকের শাস্তি।—আবু দাউদ।

২৪১. আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্‌র রসুল হওয়া সত্বেও আমি জানিনা আমাকে এবং তোমাদেরকে (পরকালে) কি করা হবে!—বুখারী। বর্ণনায়ঃ উম্মুল আলা (রাঃ)।

২৪২. (ইহলোকে) আদম-সন্তানের তিনটে জিনিস ছাড়া অন্য কোন জিনিসে কোন স্বত্ব নেই—বসবাস করার জন্য একটা ঘর, গুপ্ত অঙ্গ ঢাকার জন্য একটু কাপড় এবং একটু রুটি ও পানি।—তিরমিজী/বর্ণনায়ঃ হজরত ওসমান (রাঃ)।

২৪৩. নিশ্চয় আল্লাহ্ ধর্মভীরু, স্বাধীনচেতা এবং আড়ম্বরবিহীন বান্দাকে ভালবাসেন।—মুসলিম/বর্ণনায় ঃ মায়াজ (রাঃ)।

২৪৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের পুণ্য নষ্ট করেন না। ইহলোকে তাকে পুণ্য দেওয়া হয় এবং পরলোকে তাকে পুণ্য দেওয়া হবে। অবিশ্বাসী দুনিয়ায় যে পুণ্য করে তার বিনিময়ে তাকে খাদ্য দেওয়া হয়; যখন তাকে পরলোকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তার পুরস্কার দেবার জন্যে কোন পুণ্য বাকী থাকে না।—মুসলিম/বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

২৪৫. 'কেউ কি পা না ভিজিয়ে পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে পারে?' তারা বলল, 'না'। মহানবী (সঃ) বললেন, 'পৃথিবীর অধিবাসীদের অবস্থা সেই রকম। তারা পাপ থেকে মুক্ত নয়।'—বয়হাকী।

২৪৬. পার্থিব বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকা এবং রসনাকে সতত আল্লাহ্‌র আরাধনায় নিযুক্ত রাখা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাজ।—সগির।

২৪৭. পৃথিবী মনের মধ্যে মিষ্ট বলে' মনে হয় এবং চোখেও সবুজ সুন্দর প্রতীয়মান হয়। অতএব নিজের কাজের ওপর লক্ষ্য রাখ এবং পৃথিবী ও রমণীকে ভয় কর; কারণ বনি ইসরাইলদের মধ্যে প্রথম যে বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল তা রমণীঘটিত। —মুসলিম।

২৪৮. যে ব্যক্তি পরকালের আশা করে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে উন্নত করেন এবং তার চিন্তা তার প্রাণে শান্তি দান করে। ইহলোক তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। যে ব্যক্তি পৃথিবীর জন্য দুঃখবোধ করে, আল্লাহ্ তার দুই চোখের সামনে অভাব স্থাপন করেন এবং তার কাজকে তার কাছে অশান্তির কারণ করে তোলেন। তার অধিকারভুক্ত জিনিষ ছাড়া পৃথিবীর কোন জিনিসই তার ভাগ্যে লাভ হয় না। সন্ধ্যায় সে অভাবগ্রস্ত, সকালেও সে অভাবগ্রস্ত। এমন কখনো হয় না যে যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরক্ত হয় অথচ বিশ্বাসীরা তার প্রতি অনুরক্ত হয় না—এবং আল্লাহ্ তার দিকে প্রত্যেক পুরস্কার সত্বর প্রেরণ করেন।—তিরমিজী।

উইল ও উত্তরাধিকার

'পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদের (প্রাপ্য) অংশ তাদের দেবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।' ৪ (৩৩)

'আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সন্তানদের মিরাস (ভাগ বণ্টন) সম্পর্কে তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সম পরিমাণ হবে। আর, যদি সন্তান শুধু কন্যাই থাকে (সংখ্যায় দুই বা) দুই-এর অধিক হলেও তারা সকলে পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি কন্যা-সন্তান কেবলমাত্র একজন থাকে তবে সে অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান থাকে তবে তার মাতা-পিতা প্রত্যেকে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে (একাধিক ভাই বোনও না থাকে)

কেবল মাতা-পিতাই তার উত্তরাধিকারী হয়, তবে মাতা এক-তৃতীয়াংশ পাবে, (অবশিষ্ট পিতা পাবে)। পক্ষান্তরে যদি মৃত ব্যক্তির (মাতা-পিতার সঙ্গে তার) একাধিক ভাই-বোনও থাকে, তবে (ভাই-বোনেরা মিরাস পাবেনা বটে, কিন্তু তাদের দরুন মাতার অংশ কম হয়ে যাবে)—মাতা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে এবং অবশিষ্ট পিতা পাবে। এই বণ্টন মৃত ব্যক্তির স্বকৃত অছিয়ত (উইল) বা তার ঋণ পরিশোধ করার পর সম্পাদিত হবে।' ৪ (১১)

'আর তোমাদের স্ত্রীগণের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তোমরা অর্ধেক পাবে, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি কোন সন্তান থাকে, তোমরা চতুর্থাংশ পাবে, তাদের কৃত অছিয়ত বা ঋণ পরিশোধের পর। আর স্ত্রীগণ তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে চতুর্থাংশ পাবে, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি সন্তান থাকে তবে স্ত্রী অষ্টমাংশ পাবে—তোমাদের কৃত অছিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি মৃতব্যক্তি এমন কোন পুরুষ বা নারী হয় যার পিতা, দাদা, সন্তান বা পুত্রের সন্তান নেই—আছে ভ্রাতা বা ভগ্নী, তবে সেই ভ্রাতা বা ভগ্নী এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। আর ঐ শ্রেণীর ভ্রাতা-ভগ্নী একাধিক হলে এক-তৃতীয়াংশ তাদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হবে (নারী পুরুষ ভেদাভেদ হবে না), ক্ষতিকারক নিয়ম বিরোধী নয় এরূপ অছিয়ত বা ঋণ পরিশোধ করার পর। আল্লাহ্ তা'লা সবকিছু জ্ঞাত থাকেন, তিনি ধৈর্যশীল।' ৪ (১২)

'আর যদি ঐরকম মৃত ব্যক্তি পুরুষ হয় এবং তাদের সহোদরা বা বৈমাত্রেয় ভগ্নী একজন থাকে, তবে সেই ভগ্নী অর্ধেক পাবে। যদি ঐশ্রেণীর ভগ্নী দুই বা তার অধিক থাকে, তবে তারা সকলে দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। ঐরূপ মৃত ব্যক্তি যদি নারী হয় এবং তার (ভগ্নী না থাকে, বরং) সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাই থাকে, তবে সেই ভাই মৃত ভগ্নীর সমুদয় সম্পত্তির মালিক হবে। যদি ঐরকম মৃত নারী বা পুরুষের ঐ শ্রেণীর ভ্রাতা-ভগ্নী মিশ্রিত থাকে, তবে তারা সমগ্র সম্পত্তি বণ্টন করে' নেবে—ভ্রাতা ভগ্নীর দ্বিগুণ পাবে।' (৬ পারা, ৪ রুকু)

—আল্-কোরআন।

২৪৯ জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রোগ-শয্যায় শায়িত হলে হজরত রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে আমাকে দেখার জন্য পায়ে হেঁটে আসলেন। তাঁরা যখন আমার কাছে পৌঁছুলেন তখন আমি অচৈতন্য ছিলাম। তাই হজরত (দঃ) অজু করে' অজুর পানি আমার ওপর বইয়ে দিলেন। তাতে আমার চেতনা ফিরে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে রসুলুল্লাহ্, আমার ধনসম্পত্তি সম্পর্কে আমি কি ফয়সালা করব?' হজরত (দঃ) কোন উত্তর দিলেন না এবং মিরাসের (অর্থাৎ ভাগবণ্টনের) আয়াত অবতীর্ণ হল।—বুখারী।

২৫০. যে মুসলমানের উইল (বা অছিয়ত) করার মত কিছু থাকে, উইল না লিখে তার দুটো রাত-ও কাটান উচিত নয়।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

২৫১. মক্কা-বিজয়ের বছর (অত্যন্ত) পীড়িত হয়ে আমি মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিলাম। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে দেখতে এলে আমি বললাম 'আমার অগাধ সম্পত্তি আছে, কিন্তু উত্তরাধিকার-সূত্রে পাবার মত দুই কন্যা ছাড়া আর কেউ নেই। আমি কি অছিয়ত (উইল) করে সমস্ত সম্পত্তি দান করে দেব?' তিনি

বললেন, 'না।' 'আমি বললাম, 'দুই-তৃতীয়াংশ ?' তিনি বললেন, 'না।' আমি বললাম, 'অর্ধেক ?' তিনি বললেন, 'না।' আমি বললাম, 'এক-তৃতীয়াংশ ?' তিনি বললেন, 'এক-তৃতীয়াংশ, তাও খুব বেশী। তোমার উত্তরাধিকারীদের দরিদ্ররূপে পরের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার (অবস্থায় রেখে যাওয়ার) চেয়ে তাদের অভাবমুক্ত করে' রেখে যাওয়াই ভাল। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তুমি যা-কিছু ব্যয় কর, তাঁর কাছ (থেকে তার) পুরস্কার পাবে—তোমার স্ত্রীর মুখে যে এক মুঠো অন্ন তুমি তুলে দাও তার জন্যেও।'—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস্ (রাঃ)।

২৫২. আমার অসুস্থতার সময় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে দেখতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি অছিয়ত করেছ ?' আমি বললাম, 'হাঁ।' তিনি বললেন 'কত অংশ ?' আমি বললাম, 'আল্লাহ্‌র পথে আমার সমস্ত সম্পত্তি।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সন্তান সন্ততির জন্য কি রেখেছ ?' আমি বললাম, 'তাদের বিস্তর ধন আছে।' তিনি বললেন, 'এক-তৃতীয়াংশ অছিয়ত কর।' আমি একে খুব সামান্য মনে করলাম। তিনি আবার বললেন, 'এক-তৃতীয়াংশ উইল কর, এক-তৃতীয়াংশই খুব বেশী।'—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস্ (রাঃ)।

২৫৩. যদি কোন ব্যক্তি এবং তার স্ত্রী দুজনেই ষাট্ বছর এবাদত (উপাসনা) করার পর মারা যায়, কিন্তু অন্যায় ভাবে উইল করে যায়, তাদের জন্য দোজখের আগুন ওয়াজেব (নিশ্চিত) হয়ে যায়।—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২৫৪. যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তাকে বেহেশ্‌তের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন।—ইবনে মাজা। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

২৫৫. হায়াদ বিন রাবি (রাঃ) দুটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)এর কাছে এসে বলল, 'এদের পিতা আপনার সঙ্গে থেকে ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, আর এদের পিতৃব্য সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করে নিয়েছে, এদের জন্যে কিছুই রাখেনি। সম্পত্তি না থাকলে এদের বিয়ে দেওয়া যাবেনা।' তিনি (হজরত দঃ) বললেন, 'আল্লাহ এ সম্বন্ধে আদেশ দেবেন।' তখনই মিরাসের (ভাগবণ্টনের) আয়াত অবতীর্ণ হল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদের পিতৃব্যকে ডাকিয়ে বললেনঃ 'সায়াদের দুই কন্যাকে দুই-তৃতীয়াংশ দাও, তাদের মাতাকে এক-অষ্টমাংশ দাও এবং যা বাকী থাকে তা তোমার।'- আ. দা.। ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ জাবের (রাঃ)।

২৫৬. দুজন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয় না। —আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)।

২৫৭. হত্যাকারী উত্তরাধিকারী হয় না।—বুখারী। মুসলিম। তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২৫৮. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে (কোন ব্যক্তি) জিজ্ঞাসা করল, 'আমার নাতি (ছেলের ছেলে) মারা গিয়েছে, তার সম্পত্তিতে আমার অংশ আছে কি ?' তিনি বললেন এ 'তোমার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ।' এভাবে তিনবার বললেন।—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ এমরান বিন হোসেন (রাঃ)।

২৫৯. আবু মুসাকে কন্যা, ছেলের কন্যা এবং ভগ্নী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, 'কন্যার জন্যে অর্ধেক এবং ভগ্নীর জন্যে অর্ধেক।

মসউদের ছেলেকে নিয়ে এস, সে আমার সাথে একমত হবে।' তখন মসউদ-পুত্রকে জিজ্ঞাসা করা হল এবং আবু মুসার কথা তাঁকে জানান হল। তিনি বললেন, 'তাহলে আমি ভুল করেছি। আমি পর্যাপ্ত ব্যক্তিদের অন্যতম নই। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমি তেমনি দিয়েছি। কন্যার জন্য অর্ধেক, ছেলের কন্যার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ আর এতেই দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয় এবং যা বাকী থাকে তা ভগ্নীর জন্যে। আমরা আবু মসার কাছে মসউদ-পুত্রের কথা জানালাম। তিনি বললেন, 'যে পর্যন্ত ওই বিদ্বান ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে আছেন সে পর্যন্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করো না।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ হোজায়েল (রাঃ)।

উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ব্যক্তি

২৬০. মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট যে মানুষের কল্যাণ সাধন করে। —মিশকাত।

২৬১. আল্লাহ্‌র কাছে সেই ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট যে তার বন্ধুদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট—আর প্রতিবেশীদের মধ্যে যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সে আল্লাহ্‌র কাছেও উৎকৃষ্ট।—মিশকাত।

২৬২. 'কে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি?' তিনি (হজরত দঃ) বললেন, 'সেই ব্যক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট যে দীর্ঘজীবী হয় এবং সৎকার্য করে।' তার পর জিজ্ঞাসা করা হল, 'কে নিকৃষ্ট?' তিনি বললেন, 'যে দীর্ঘজীবী হয় এবং অসৎকার্য করে।'—তিরমিজী।

২৬৩. সেই ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট যার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৎকার্য বৃদ্ধি পায়। —তিরমিজী।

২৬৪. 'আমি কি তোমাদের বলব, কে তোমাদের মধ্যে উত্তম এবং (কে) অধম?' তিনবার তিনি এ (কথা) জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বললেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে পুণ্য লাভের আশা করে এবং পাপ থেকে সতর্ক থাকে, আর সেই ব্যক্তিই অধম যে পুণ্য লাভেরও আশা করে না এবং পাপ থেকেও সতর্ক থাকেনা।'—তিরমিজী।

২৬৫. আমি কি তোমাদের উত্তম ও অধম লোকদের সম্বন্ধে বলব? মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে অশ্ব বা উটের পিঠে চড়ে অথবা পায়ে হেঁটে খোদার পথে যাত্রা করে এবং প্রাণত্যাগ করে। সেই ব্যক্তি অধম যে কোরআন শরীফ পাঠ করে অথচ তার উপদেশ অনুসারে কাজ করে না। —নাসায়ী।

উদ্দেশ্য (নিয়ত)

২৬৬. কাজ কেবল উদ্দেশ বা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল এবং মানুষ যে যা উদ্দেশ্য করে তার জন্য তাই। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ

করে তার গৃহত্যাগ আল্লাহ্ ও রসূলের জন্যই হবে ; যে ব্যক্তি জাগতিক বিষয়ের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে সে তাই (অর্থাৎ জাগতিক বিষয়) পাবে, আর যদি কেউ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে তবে তার গৃহত্যাগ সে জন্যেই হবে।—বুখারী। মুস। খামসা। বর্ণনায় ঃ ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)।

২৬৬. (ক) পুণ্যের পরিমাণ অনুসারে পুরস্কার এবং সংকল্প (বা নিয়ত) অনুসারে কাজ।—সগির।

২৬৭. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের আকৃতি বা সম্পত্তি দেখবেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কার্য পরীক্ষা করবেন।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা। (রাঃ)।

২৬৮. আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি জ্ঞানীর প্রতিটি বাক্য গ্রহণ করি না, কিন্তু উদ্দেশ্য ও ভালবাসাকে গ্রহণ করি। যদি তার উদ্দেশ্য ও ভালবাসা আমার আরাধনা সম্বন্ধে হয় তবে তার নীরবতাকে আমি আমার প্রশংসা ও সম্মান রূপে গণ্য করি—যদিও সে মুখে কিছু উচ্চারণ করে না।—মিশকাত।

২৬৯. তিনটি বিষয়ে আমি শপথ করছি এবং তোমাদের কাছে একটা হাদীস বর্ণনা করছি—তোমরা তা স্মরণ রাখবে। যে বিষয়ে আমি শপথ করছি তা হল ঃ (১) ভিক্ষাদানে কারো ধন কমেনা, (২) কারো ওপর অত্যাচার করা হলে যদি সে তা সহ্য করে তবে তার দ্বারা আল্লাহ্ তার সম্মান বৃদ্ধি করেন; এবং (৩) কোন বান্দা যখন ভিক্ষার দ্বার খোলে (অর্থাৎ ভিক্ষা করে) তখন আল্লাহ্ তার জন্য দারিদ্র্যের দ্বার খুলে দেন। আমি আরো একটা কথা বলছি তা স্মরণ রেখো ঃ পৃথিবী চার শ্রেণীর লোকের জন্য—(১ম) আল্লাহ্ যাকে ধন ও জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তার প্রভুকে সে বিষয়ে ভয় করে ও আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যথাযথ ভাবে তার হক আদায় করে—সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর। (২য়) যাকে আল্লাহ্ জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু ধন দান করেননি, অথচ তার উদ্দেশ্য ভাল—সে বলে, যদি আমার অমুকের মত অর্থ থাকত তবে আমিও তার মত ঐ অর্থ দিয়ে সৎকাজ করতাম—অতএব এদের দুজনের সমান পুরস্কার। (৩য়) যাকে আল্লাহ্ ধন দিয়েছেন কিন্তু জ্ঞান দেননি, আর সে মুর্খের মত তার ধনদৌলতের মধ্যে মশগুল থাকে—সে সম্বন্ধে (সে) তার প্রভুকে ভয় করে না, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক রাখে না এবং সে বিষয়ে তার কর্তব্য পালন করে না—এই শ্রেণীর ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধম। (৪র্থ) যাকে আল্লাহ্ ধনও দেননি, জ্ঞানও দেননি, কিন্তু সে বলে, 'যদি আমার অর্থ থাকত তবে আমি অমুকের মত কাজ করতাম'—ঐ তার উদ্দেশ্য—সুতরাং ঐ দুই ব্যক্তির পুরস্কার সমান।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু কাবশা (রাঃ)।

২৭০. শেষ বিচারের দিন সর্ব প্রথম শহীদকে আনা হবে এবং তার প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্র দান ও করুণার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে। সে তা চিনতে পারবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তুমি ওটা দিয়ে কি করেছ?' সে বলবে, 'শহীদ না হওয়া পর্যন্ত তোমার জন্যে যুদ্ধ করেছি।' আল্লাহ্ বলবেন, 'তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি বীর নামে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করেছ এবং তোমার সে পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' তখন আল্লাহ্র নির্দেশে নিম্নমুখী করে তাকে নরকে নিক্ষেপ করা হবে। এর পর যে ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষা করেছে এবং শিক্ষা দিয়েছে ও কোরআন পাঠ করেছে তাকে আনান হবে এবং তার প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্র যাবতীয় নেয়ামত

(বা দানের) কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তুমি ও দিয়ে কি করেছ ?' সে বলবে, 'আমি বিদ্যা শিক্ষা করেছি ও শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার উদ্দেশ্যে কোর-আন পাঠ করেছি।' আল্লাহ্ বলবেন, 'তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি বিদ্যাশিক্ষা করেছ আলেম (অর্থাৎ বিদ্বান বা জ্ঞানী) বলে পরিচিত হবার জন্য এবং কোরআন পাঠ করেছ ক্বারী (বিশুদ্ধ কোরআন-পাঠকারী) রূপে পরিচিত হবার জন্য। তোমার সে পরিচয় (প্রতিষ্ঠিত) হয়েছে।' তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাকে নরকে নিক্ষেপ করা হবে। তার পর ঐ ব্যক্তিকে ডাকা হবে যাকে সচ্ছলতা ও বিভিন্ন প্রকারের ধন-সম্পত্তি দান করা হয়েছিল। তাকে প্রদত্ত যাবতীয় নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি ও দিয়ে কি করেছ ?' সে বলবে, 'তুমি যে পথে খরচ করা ভালবাস, তোমার উদ্দেশ্যে তার কোন পথে খরচ করতে আমি বাকি রাখিনি।' আল্লাহ্ বলবেন, 'তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি দান করেছ নিজেকে দানবীর হিসেবে পরিচিত করানর উদ্দেশ্যে এবং তোমার সে পরিচয় হয়েছে।' তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাকে নরকে (দোজখে) নিক্ষেপ করা হবে।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২৭০. (ক) (শেষ বিচারের দিন) মানুষেরা তাদের উদ্দেশ্য অনুসারে উত্থিত হবে।—ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২৭০. (খ) কেউ সৎকাজ করার সংকল্প করে' শেষ পর্যন্ত তা সম্পন্ন করতে না পারলেও তার জন্যে একটা পুণ্য লিখিত হবে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২৭১. যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চায়, মানুষের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে আল্লাহ্‌তালাই যথেষ্ট। যে আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, আল্লাহ্ তাকে মানুষের হাতে অর্পণ করেন।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ) ও মাবিয়া (রাঃ)।

২৭২. 'তোমরা কি জান, কোন্ কাজ আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ?' এক জন বলল, 'নামাজ ও জাকাত।' আর একজন বলল, 'জেহাদ!' হজরত (দঃ) বললেন, 'সেই কাজ আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে (বা জন্যে যাতে) কাউকে ভালবাসা হয় এবং কাউকে হিংসা করা হয়।' —মিশ।

২৭৩. আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ কর, তিনিও তোমার জন্য উৎসর্গিত হবেন এবং তাঁর সেবা কর, তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।—ওঃ নবী।

উপহার

২৭৪. হজরত (দঃ) বলেছেন, 'পরস্পর পরস্পরকে উপহার দেবে, কেন না উপহার হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে।'—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

২৭৫. পরস্পর পরস্পরকে উপহার দেবে, উপহার হৃদয়ের বিদ্বেষ দূর করে। কোনো প্রতিবেশিনী কোন প্রতিবেশিনীকে যেন রান্না করা ছাগলের মাংস হলেও তা উপহার দিতে (নিজেকে) ক্ষুদ্র মনে না করে।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২৭৬. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) উপহার গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদান দিতেন। —বুখারী। তির। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

২৭৭. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যাকে সুগন্ধ ফুল উপহার দেওয়া হয় সে যেন তা (গ্রহণ করতে) অস্বীকার না করে। কারণ এ বহনে ভারহীন এবং গন্ধে আনন্দদায়ক।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২৭৮. যখন তোমাদের কাউকে ফুল উপহার দেওয়া হয় সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়, কেন না এ (ফুল) বেহেশ্ত থেকে এসেছে।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু ওসমান (রাঃ)।

২৭৯. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কখনো সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্বাস (রাঃ)।

২৮০. যাকে কিছু উপহার দেওয়া হয় এবং তা তার দখলে আসে, সে যেন প্রতিদান দেয়। আর যা দখলে আসে না, সে যেন তার প্রশংসা করে, কেননা প্রশংসাকারী কৃতজ্ঞ আর যে গোপন রাখে সে অকৃতজ্ঞ।—তিরমিজী। আ. দাউদ। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

২৮১. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে উপহার দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি বললাম, 'আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশী, এ তাকে দিন।' তিনি বললেন, 'এটা গ্রহণ কর (এবং) তোমার মালের সাথে মিশ্রিত করে এ দান কর। লোভী বা প্রার্থী না হয়ে এই মালের যা তোমাকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হয় তা গ্রহণ কর। এছাড়া তুমি নিজে এর অনুগামী হয়ো না।'—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ ওমর (রাঃ)।

২৮২. নবী করীম (সঃ) বলেছেন, 'যদি রান্না করা ছাগলের খুর খাওয়ার জন্য আমার দাওয়াত অর্থাৎ নিমন্ত্রণ হত, আমি তা নিশ্চয়ই গ্রহণ করতাম। যদি পেছনের খুরের রান্না-করা মাংস আমাকে উপহার দেওয়া হত, আমি তা গ্রহণ করতাম।' —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২৮৩. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ হজরত নবী (সঃ) জয়নব (রাঃ)-র সঙ্গে নব-বিবাহিত হলেন। সেই উপলক্ষ্যে আমার মা উম্মে সোলায়েমা আমাকে বললেন, 'এই সময় রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জন্যে কিছু উপহার পাঠালে ভাল হয়।' আমি বললাম, 'তাই করুন।' সেই মতে তিনি খোরমা, ঘি ও পনীর একটা পাত্রে একত্রিত করে পায়েস তৈরী করলেন এবং আমাকে দিয়ে তা হজরত (দঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ও নিয়ে আমি হজরত (দঃ)-এর কাছে গেলাম। হজরত (দঃ) বললেন, 'এ রেখে দাও।' তারপর তিনি (দঃ) কয়েকজন লোকের নাম করে বললেন, 'এদের এবং এ ছাড়া যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তাদের সবাইকে ডেকে আন।' আমি তাই করলাম এবং ফিরে এসে দেখলাম যে হজরতের ঘর আগন্তুকে ভরে' গেছে। তারপর দেখলাম হজরত (দঃ) সেই পায়েসের মধ্যে নিজের হাত রেখে কিছু খেলেন এবং দশ-দশজন করে অন্দর মহলে ডাকতে লাগলেন। হজরত (দঃ) সকলকে নিজ নিজ সম্মুখস্থল থেকে বিসমিল্লাহ্ বলে' খাবার জন্যে উপদেশ দিলেন। এইভাবে উপস্থিত সবাই পরিতৃপ্তি সহকারে খেল।—বুখারী।

উপবেশন ও শয়ন

২৮৪. যখন তোমাদের কেউ ছায়ায় বসে এবং পরে ছায়া চলে গেলে শরীরের

কতকাংশ রৌদ্রে ও কতকাংশ ছায়ায় থাকে—সে যেন উঠে যায়। [কেননা এতে স্বাস্থ্যের হানি হয়]—আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ আবুহোরায়রা (রাঃ)।

২৮৫. আমার পিতা বাম হাত পেছনের দিকে রেখে হাতে ভর দিয়ে বসেছিলেন। ঐ সময় রসুলুল্লাহ্ (সঃ) পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'যারা অভিশপ্ত তুমি কি তাদের মত বসবে?'—আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ আমর বিন শারীদ (রাঃ)।

২৮৬. যখন তোমাদের কেউ শয্যায় শয়ন করে তখন ইজার সহ অবশ্যই ডান পাশে শয়ন করবে; তারপর বলবে—'হে প্রভো, তোমারই নামে আমি শয্যায় শয়ন করেছি, তোমারই নামে আমি শয্যা ত্যাগ করব, যদি তুমি আমার জীবন রক্ষা কর, তবে ওর প্রতি করুণা কর, আর যদি তুমি ওকে প্রত্যর্পণ কর তবে পুণ্যবান বান্দাদের সঙ্গে ওকে সংরক্ষণ কর।—শায়। আ. দাউদ।

উপার্জন

'তারপর যখন নামাজ শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা দেশের মধ্যে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়বে এবং আমার অনুগ্রহ উপার্জনের কাজে লিপ্ত হবে। কিন্তু এই অর্থ-উপার্জনের সময় কর্মক্ষেত্রেও সর্বদা আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে এবং উন্নতি ও সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবে।' ৬২ (১০)

'তোমরা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ (নেয়ামত) উপার্জনে তৎপর হবে, তাতে কোন পাপ হবে না।'

'ভাল এবং মন্দ যে যা উপার্জন করবে সে তারই (প্রতিদান পাবে)।' ২ (২৮৬)

—আল্-কোরআন

২৮৭. সৎভাবে জীবিকা উপার্জন করা অন্যতম ফরজ।—বয়হাকী

২৮৮. নিজে হাতে মানুষ যা উপার্জন করে তার চেয়ে অধিক উত্তম আহার্য আর কিছুই নেই। হজরত দাউদ (আঃ) আপন পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ মেকদাম (রাঃ)।

২৮৯. মানুষ অসদুপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে—যা দান করে তা কখনো কবুল হয় না, যা সৎপথে ব্যয় করে তা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয় না, আর যা সে পশ্চাতে রেখে যায় পরে তা শুধু দোজখের পাথেয় হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনো অসৎ কার্য দ্বারা অসৎ কার্যাবলীকে দূরীভূত করেন না—সুকার্য কখনো কুকার্যকে ধ্বংস করে না।—মিশকাত।

২৯০. 'কোন্ প্রকারের জীবিকা সর্বাপেক্ষা উত্তম?' তিনি (দঃ) বললেন, 'মানুষ নিজে হাতে যা উপার্জন করে এবং সকল রকমের বৈধ ব্যবসায়।'—মিশকাত।

২৯১. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন এবং ভবিষ্যদ্বক্তার উপার্জন নিতে নিষেধ করেছেন।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আবু মসউদ আনসারী (রাঃ)।

২৯২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ 'কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন এবং শিঙ্গাদাতার উপার্জন অপবিত্র।'—মুসলিম।

২৯৩. মানুষের ওপর এমন এক যুগ অবতীর্ণ হবে যখন সে উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈধ বা অবৈধ (হালাল-হারাম) সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করবে না।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ নো'মান-বিন বশীর (রাঃ)।

২৯৪. যখন আল্লাহ্ তোমাদের কারো জীবিকা উপার্জনের উপায় করে দেন তখন যে পর্যন্ত তিনি তা পরিবর্তিত ও অপছন্দ না করেন, সে পর্যন্ত তা ত্যাগ করবে না।—ইবনে মাজা।

২৯৫. যে ব্যক্তি অল্পজীবিকায় সন্তুষ্ট হয়, আল্লাহ্ তার অল্প কাজে সন্তুষ্ট হন।—মিশকাত। সগির।

২৯৬. সেই সুখী যে অল্পজীবিকায় সন্তুষ্ট থাকে এবং তাতেই ধৈর্য ধারণ করে।—সগির।

২৯৭. মুমেনদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয় যার পরিজন-সংখ্যা অল্প, যে তার প্রভুর আরাধনায় নিমগ্নচিত্ত, যে গোপনে তাঁকে ভক্তি করে; যে মানুষের কাছে বিনীত—যাকে মানুষ অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা দেখায় না, যে তার জীবিকাকে যথেষ্ট মনে করে এবং যে নিজহস্তে পরিশ্রম করে' জীবিকা উপার্জন করে। এ ধরনের লোকের মৃত্যু সহজ, ঋণও কম, সম্পত্তিও কম, এবং উত্তরাধিকারীও অল্প।—তিরমিজী। ইবনে মাজা।

২৯৮. নিশ্চয়ই এই সম্পত্তি তাজা, সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি সৎভাবে একে উপার্জন করে এবং সৎভাবে একে ব্যয় করে তার পরিশ্রম কতইনা উত্তম। যে ব্যক্তি অসৎ (অবৈধ) ভাবে একে উপার্জন করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না এবং এ তার বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু সইদ খুদ্‌রী (রাঃ)।

২৯৯. হে খোদা, আমাকে অক্ষমতা ও অলসতা, কাপুরুষতা ও কৃপণতা, বার্ধক্য ও কলুষতা, উদাসীনতা ও দারিদ্র্য, এবং লজ্জা ও নীচতা থেকে রক্ষা কর। [উপার্জন সংক্রান্ত প্রার্থনার হাদীস]।

ঋণ

'হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা যখন একে অন্যের সাথে ঋণ সংক্রান্ত কারবার করবে, তখন তা লিখে রাখবে, এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন তা ন্যায্য ভাবে লিখে দেয়, লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। যেহেতু আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা (বা জ্ঞান) দান করেছেন, সেই হেতু সে যেন লেখে। এবং ঋণ-গ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে আর কিছু যেন কম না লেখায়। কিন্তু ঋণ-গ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়-বস্তু বলে দেয়। এবং তোমাদের পছন্দ মত দুজন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে, আর যদি দুজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীকে (সাক্ষী করে

নেবে)।...আর ঋণ কম হোক কিংবা বেশী হোক মিয়াদ (আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সময়) লিখতে তোমরা বিরক্ত হয়ো না।' ২ (২৮২)।

—আল-কোরআন।

৩০০. ঋণ থেকে সাবধান থাক, কারণ রাত্রিকালে তা দুশ্চিন্তার কারণ এবং দিনের বেলায় তা অপমানের কারণ।—সগির।

৩০১. ঋণ ধার্মিকের কলঙ্ক।—সগির।

৩০২. ঋণ ধর্ম ও মর্যাদা নষ্ট করে।—সগির।

৩০৩. ঋণ ব্যতীত যাবতীয় পাপ থেকে শহীদ মুক্তি লাভ করবে।—মুসলিম। বর্ণনায় : আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)।

৩০৪. মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয় তখন কথা বলতে গিয়ে সে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতিজ্ঞা করলে তা ভঙ্গ করে।—বুখারী। বর্ণনায় : আয়েশা (রাঃ)।

৩০৫. যে শোধ করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে আল্লাহ্‌তা'লা তাকে সঙ্গতি দান করেন, আর যে শোধ না করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে আল্লাহ্‌ তাকে ধ্বংস করেন।—বুখারী। বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩০৬. যে ঋণগ্রস্ত লোককে সময় দেয় বা ক্ষমা করে—আল্লাহ্‌ তাকে নিজের ছায়ায় স্থান দেবেন। [অন্য বর্ণনায়] আল্লাহ্‌ তাকে কেয়ামতের দিন বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।—মুসলিম। বর্ণনায় : আবুল ইয়াসার ও আবুল কাতাদাহ (রাঃ)।

৩০৭. পরলোকের বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার ইচ্ছা যদি কারো থাকে তবে সে যেন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রাপ্য পরিশোধের জন্য সময় দেয়—বা তাদের ঋণের কিয়দংশ মাফ করে।—মুসলিম।

৩০৮. যে পর্যন্ত কোন মুমিন তার ঋণ পরিশোধ না করে, সে পর্যন্ত তার রূহ (আত্মা) ঋণের সাথে ঝুলান থাকে।—তিরমিজী। বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩০৯. রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মৃতদেহ জানাজার জন্য আনা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'তার ঋণ পরিশোধের কোন সম্পত্তি আছে কি ?' যদি বলা হত পরিশোধের মত পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে, তখন তিনি জানাজা পড়তেন। নয়ত সকলকে বলতেন, 'তোমাদের বন্ধুর জানাজা পড়।' যখন আল্লাহ্‌ তাঁকে বিজয় দান করতে লাগলেন, তিনি উঠে বললেন, 'আমি মুসলমানদের কাছে তাদের প্রাণের অধিক প্রিয়—মুমিনদের মধ্যে যে কেউ ঋণ রেখে মরে, তার পরিশোধের ভার আমার ওপর, আর যে সম্পত্তি রেখে যায় তার ভার উত্তরাধিকারীদের ওপর।'—নাসায়ী। মুসলিম। বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩১০. এক ব্যক্তির জানাজা নামাজ পাঠের জন্য হজরত (দঃ)-এর কাছে হাজির করা হলে তিনি বললেন, 'তোমরা তোমাদের সহচরের জানাজা পড়, কারণ সে ঋণগ্রস্ত ছিল।' তখন আমি বললাম 'আমি তবে তার ঋণের ভার নিলাম।' তিনি বললেন, 'তবে ন্যায্য ভাবে তা পরিশোধ করবে।' আমি বললাম : 'হ্যাঁ, আমি তা পরিশোধ করব।' তারপর তিনি তার জানাজা পড়লেন। —তিরমিজী। নাসায়ী। বর্ণনায় : আবু কাতাদা (রাঃ)।

৩১১. আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক নির্দিষ্ট মহাপাপগুলো ছাড়া মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বড় পাপ হল—ঋণগ্রস্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করা এবং তা পরিশোধ করার উপযুক্ত সম্পত্তি না রেখে যাওয়া। —আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু মুসা (রাঃ)।

৩১২. একদিন এক বেদুইন মহানবী (সঃ)-এর কাছে তার প্রাপ্য আদায় করার জন্য এসে হাজির হল। সে স্বভাবতঃ কর্কশ ও কটুভাষী ছিল, তাই সে তাঁর সাথে কর্কশভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল। বেদুইনের উদ্ধত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর (নবীর) সহচরগণ তাঁকে বললেন, 'তুমি কি জাননা কার সাথে তুমি কথা বলছ ?' বেদুইন শান্তভাবে বলল, 'হাঁ। আমি তো শুধু আমার প্রাপ্যই প্রার্থনা করছি।' মহানবী (সঃ) তাঁর সহচরদের বললেন, 'তোমাদের উচিত ছিল তার পক্ষ সমর্থন করা, কারণ সে ন্যায্য অধিকারী।'—শায়খান। ইবনে মাজা।

৩১৩. একবার রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটা উট ধার করেছিলেন। তাকে তা ফেরত দেওয়ার সময় তার চেয়ে ভাল একটা উট দান করলেন এবং বললেন, 'তারাই উৎকৃষ্ট যারা সদ্ভাবে তাদের ঋণ পরিশোধ করে।'—মুসলিম। তিরমিজী।

৩১৪. হজরত (দঃ) আমার কাছ থেকে ৪০,০০০ দিরহাম ঋণ নিয়েছিলেন। তাঁর মালামাল আসলে, তিনি তা পরিশোধ করে দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ্ আপনার পরিজনবর্গ ও ধনসম্পত্তিতে বরকত (প্রাচুর্য) দিন।'—নাসায়ী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন আবু রাবিয়াহ (রাঃ)।

৩১৫. যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের কাউকে ঋণ দেয়, ঋণী ব্যক্তি যেন তাকে উপহার না দেয়।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৩১৬. যদি তোমাদের কেউ ঋণ দেয় এবং ঋণী ব্যক্তি যদি ঋণদাতাকে কোন উপহার দেয় অথবা কোন প্রাণীর ওপর আরোহণ করায়, তা গ্রহণ করো না এবং তার ওপর আরোহণ করো না। যদি এর পূর্বে এমন হয়ে থাকে তাতে দোষ নেই। —ইবনে মাজা। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

এসতেঞ্জা বা মলমূত্রত্যাগের শিষ্টাচার

৩১৭. যখন তোমরা পায়খানায় যাবে কেবলাকে (মক্কা ও কাবা শরীফকে) সামনে বা পেছনে রেখে বসবেনা ; পূর্বদিক অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। [মক্কা মদীনার উত্তরে, তাই মদীনাবাসীদের উত্তর দক্ষিণে মুখ করে পায়খানা প্রস্রাব করতে নিষেধ করা হয়েছিল ; কিন্তু মক্কা ভারতবাসীর পশ্চিমে তাই আমাদের পক্ষে পূর্ব পশ্চিমে মুখ ফিরে পায়খানা-প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ।]—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু আয়ুব আনসারী (রাঃ)।

৩১৮. তোমরা শুষ্ক গোবর এবং হাড় দ্বারা এসতেঞ্জা করো না [অর্থাৎ মলমূত্র ত্যাগের পর শৌচকার্য করো না]। এ তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য। [তিন টুকরো পবিত্র মাটির ঢেলা ও পানি দ্বারা শৌচকর্ম করার বিধান আছে।] —তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন মসউদ (রাঃ)।

৩১৯. তিনটি কাজ অভিশাপের যোগ্য, (১) পানির ঘাটে (২) চলাচলের পথে

ও (৩) ছায়ায় (যেখানে লোক বিশ্রাম নেয়) মলমূত্র ত্যাগ করা। এসব থেকে আত্মরক্ষা করবে।—আ. দাউদ। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ মোয়াজ বিন জাবাল (রাঃ)।

৩২০. তোমাদের কেউ যেন গর্তে মূত্র ত্যাগ না করে। আ. দাউদ। নাসায়ী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন সারজেস (রাঃ)।

৩২১. তোমাদের কেউ যেন আপন স্নানাগারে মূত্রত্যাগ করে' সেখানে স্নান বা অজু না করে, কারণ এতে সেখানে অধিকাংশ মন্দের উদয় হয়। —আ. দাউদ। তির। নাসায়ী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন মোগাফ্ফাল (রাঃ)।

৩২২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন মলমূত্র ত্যাগ করতে মাঠে যেতেন তখন এতদূর যেতেন যেন কেউ তাঁকে দেখতে না পায়।—আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

৩২৩. একবার রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে দেখলেন, আমি দাঁড়িয়ে মূত্র-ত্যাগ করছি। তিনি বললেন, 'ওমর, দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগ করোনা।' তারপর আমি দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগ বন্ধ করি।—তিরমিজী। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ ওমর (রাঃ)।

৩২৪. দুজন লোক তাদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে কথা বলতে বলতে যেন পায়খানা না করে ; কেননা আল্লাহ্ তা ঘৃণা করেন।—আহ্মদ। আবু দাউদ। ইবনে মাজা। বর্ণনায় ঃ আবু সঈদ খুদ্‌রী (রাঃ)।

৩২৫. অংশীবাদীদের (মোশরেকদের) একজন (আমাকে) বিদ্রূপ করে বলল, 'দেখছি, তোমাদের বন্ধু (নবী সঃ) তোমাদের পায়খানায় বসার নিয়ম-পর্যন্ত শিখিয়ে দিচ্ছেন।' আমি বললাম, 'হাঁ, তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন (পায়খানার সময়) কেবলার দিকে ফিরে না বসি, ডানহাতে শৌচকার্য না করি এবং শৌচকালে তিনটি ঢেলার কম ব্যবহার না করি এবং ওতে (ঐ ঢেলায়) (যেন) গোবর বা হাড় না থাকে।'—মুসলিম। আহ্মদ। বর্ণনায় ঃ সালমান ফারসী (রাঃ)।

ওজন ও মাপ

'ন্যায্য ওজনের মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।' ৫৫ (৯)।

'মাপ দেবার সময় পূর্ণ মাপ দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে—এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।' ১৭ (৩৫)।

'সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে, লোকেদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না, এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না,—তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের পক্ষে এইটিই কল্যাণকর।' ৭ (৮৫)।

'যারা ওজনে কম দেয় তাদের জন্য বড় আক্ষেপ! যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেবার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয় এবং যখন তাদের জন্য মাপে, তখন কম করে দেয়—ওরা কি ভাবে না যে ওরা পুনরুত্থিত হবে মহাদিনে, যেদিন সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে? এ প্রকার আচরণ অনুচিত।' ৮৩ (১-৭)।

'মাপ পূর্ণমাত্রায় দেবে, যারা মাপে কম দেয় তাদের মত হয়ো না এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। লোকেদের তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দেবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না।' ২৬ (১৮১-১৮৩)।

—আল্-কোরআন।

৩২৬. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) দাঁড়ি-পাল্লার মহাজনদের বলেছেন, 'তোমাদের ওপর এমন দুটি বিষয়ের ভার ন্যস্ত করা হয়েছে যার জন্য তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।' [সঠিক ওজন না করায় ধ্বংস হয়েছে]—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৩২৭. আমি এবং ক্রীতদাস মাখরাফাহ্ হীজার থেকে কাপড় কিনে মক্কায় আনছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এসে একটা জুব্বা কেনার জন্য দাম করলেন। আমরা তাঁর কাছে বিক্রয় করলাম। সেখানে একজন লোক পাল্লার ওজন উঁচু করতে লাগল। তিনি তাকে বললেন, 'পাল্লার ওজন নীচু কর।'—আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ সোয়াইদ বিন কায়েস (রাঃ)।

ওলিমা বা বিবাহে বরপক্ষের ভোজ

৩২৮. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বাড়ীতে যখন জাহাসের কন্যা জয়নবকে (নববধূ হিসেবে) আনা হল, তখন তিনি ভোজ দিলেন। লোকজন তাদের ইচ্ছামত রুটি এবং মাংস খেয়েছিল।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৩২৯. যে বিবাহের ভোজে ধনীদের নিমন্ত্রণ করা হয় আর দরিদ্রদের করা হয় না, তা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যে নিমন্ত্রণ ত্যাগ করে, সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে ত্যাগ করে।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৩০. যখন দুই ব্যক্তি একই সময়ে নিমন্ত্রণ করে (তখন) যার দুয়ার নিকটতর তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর। কিন্তু দুজনের একজন যদি পূর্বে আসে, তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।—আবু দাউদ।

৩৩১. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ঐ দুই ব্যক্তির খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন—যে লোক-দেখানোর জন্য খাওয়ায় এবং (খাওয়ানর ব্যাপারে) প্রতিযোগিতা করে।—আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ আব্বাস (রাঃ)-র পুত্র।

৩৩২. আব্দুর রহমান বিন আউফের পায়ে হলুদ রঙ দেখে (হজরত দঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কি ?' তিনি বললেন, 'আমি ৫ দিরহাম ওজনের স্বর্ণের বিনিময়ে এক নারীকে বিবাহ করেছি।' হজরত (দঃ) বললেনঃ 'আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। একটা ছাগ হলেও একটু ভোজ দাও।'

ওয়াক্‌ফ

৩৩৩. আমার পিতা বিজিত খয়বর এলাকায় কিছু জমি লাভ করলেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বললেনঃ 'আমি খয়বর এলাকায় অতি উত্তম জমি লাভ

করেছি, এই-ই আমার সর্বোত্তম সম্পত্তি, (আমি একে আল্লাহ্‌র জন্য ওয়াক্‌ফ করতে ইচ্ছা করছি), এ সম্পর্কে আপনার আদেশ ও পরামর্শ প্রার্থনা করি।' তিনি বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে মূল জমিটি ওয়াক্‌ফ করে উৎপন্ন ফসল দানখয়রাতে ব্যয় করতে পার।' ওমর (রাঃ) তাই করলেন এবং এইভাবে ওয়াক্‌ফনামা লিখলেন : 'আমার অমুক জমি, (কেয়ামত পর্যন্ত সর্বক্ষণের জন্য) ওয়াক্‌ফ। মূল জমি বিক্রয় করা যাবে না, হেবা করা যাবে না (এবং) ওর ওপর উত্তরাধিকারের স্বত্ব স্থাপন করা যাবে না। (ওর উৎপন্ন ফসল) গরীব-মিসকিন, আত্মীয়-স্বজনকে দান করা হবে, এবং ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য ব্যয় করা হবে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদের জন্য ব্যয় করা হবে এবং পথিক ও মুসাফিরের জন্য ব্যয় করা হবে। যে ব্যক্তি ওর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিয়োজিত হবে সে-ও ঐ উৎপন্ন থেকে প্রয়োজন মত ভোগ করতে পারবে এবং প্রয়োজনবোধে আপন কোন বন্ধুকেও ভোগ করাতে পারবে। কিন্তু সে ওকে আপন সম্পত্তিরূপে ব্যবহার করতে পারবে না।'—বুখারী। বর্ণনায় : ওমরের পুত্র আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ)।

কপটতা

[কপট বা ভণ্ড ব্যক্তিকে ইসলামী পরিভাষায় মুনাফিক বা মেনাফেক বলা হয়।]

'কপট ব্যক্তি নরকের নিম্নস্তরে অবস্থান করবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনো কোন সাহায্যকারী পাবে না।' ৪(১৪৫)

'তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে কখনো জানাজা পড় না, তাদের পাশে দাঁড়িও না।'

'কপট ও অবিশ্বাসী লোকসকলকে আল্লাহ্‌ নরকে একত্র করবেন।' ৪(১৪০)

'তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কর বা না কর, যদি ৭০ বারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, আল্লাহ্‌ কখনো ক্ষমা করবেন না।'

মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাসী'—কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়।...যখন তারা বিশ্বাসিগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে 'আমরা বিশ্বাস করেছি'—আর যখন তারা নিভৃতে তাদের দলপতিগণের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি, আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা তামসা করে থাকি।' ২(৮,১৪)

—আল্‌-কোরআন।

৩৩৪. মানুষের মন ও মুখ সমান না হওয়া পর্যন্ত সে মুমেন হয় না। —সগির।

৩৩৫. কপট বা মুনাফিকের তিনটি চিহ্ন : যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন প্রতিজ্ঞা করে তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে আমানত বা গচ্ছিত রাখা হয়, সে বিশ্বাসঘাতকতা করে—যদিও সে নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে। —মুসলিম।

৩৩৬. যে প্রকৃত মুনাফিক (কপট), তার চারটি দোষ আছে—যখন তাকে

বিশ্বাস করা হয়, বিশ্বাস ভঙ্গ করে ; যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে ; যখন সে চুক্তি করে তা রক্ষা করে না এবং যখন সে শত্রুতা করে পাপ কার্য করে।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় : আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ)।

৩৩৭. কপট ব্যক্তিকে প্রভু বলে ডেকো না ; কেননা সে যদি প্রভু হয় তাহলে তুমি আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি উৎপাদন করবে। —বুখারী। আবু দাউদ। বর্ণনায় : হোজায়ফা (রাঃ)।

৩৩৮. দুটি গুণ কপট ব্যক্তির মধ্যে একত্রে পাওয়া যায় না—সদ্ব্যবহার এবং ধর্মজ্ঞান।

৩৩৯. অবাধ্য এবং তালাক-প্রার্থী স্ত্রীলোক মুনাফিক।

৩৪০. যে ব্যক্তি লোক দেখানর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে ও দান খয়রাত করে—সে নিশ্চয় শেরেক করে।—মিশকাত।

৩৪১. কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টরূপে গণ্য হবে যে একবার এ পক্ষে অন্যবার অন্য পক্ষে যোগদান করে। অন্য বর্ণনায়—যে এ দলের সামনে এক ধরনের কথা বলে আবার ও দলের সামনে গিয়ে অন্য ধরনের কথা বলে। —বুখারী। মুস। তির। নাসায়ী। বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৪২. মুনাফিক (বা কপট ব্যক্তি) সেই বানডাকা ছাগীর মত যে দুপাল ছাগলের মধ্যে একবার এপালের দিকে, আর একবার ওপালের দিকে দৌড়াদৌড়ি করে।—মুসলিম।

করমর্দন

[করমর্দনকে ইস্‌লামী পরিভাষায় 'মোসাফাহ্' বলে। সালামের সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের করমর্দন করা সুন্নত।]

৩৪৩. রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, পরস্পর করমর্দন করবে, তা হলে ঘৃণা দূর হবে। পরস্পর পরস্পরকে উপহার দেবে, তাহলে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা জন্মাবে এবং হিংসা বিদ্বেষ দূর হবে।—মালেক। বর্ণনায় : আতা খোরাসানী (রাঃ)।

৩৪৪. আমি আনাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে করমর্দন প্রথা ছিল কি ?' তিনি বললেন, 'হাঁ'। —বুখারী। বর্ণনায় : কাতাদাহ্ (রাঃ)।

৩৪৫. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন : দুজন মুসলমান পরস্পরের করমর্দন করলে পৃথক হবার পূর্বেই তাদের পাপ মাফ করা হয়। অন্য বর্ণনায় : দুজন মুসলমানের সাক্ষাৎ হলে যদি তারা করমর্দন করে, আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাদ করে এবং পরস্পরের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে, (তাহলে) তাদের ক্ষমা করা হয়।—আহমদ। তির। আ. দা.। ই. মাজা : বর্ণনায় : বারায়া বিন আজেব (রাঃ)।

৩৪৬. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে সে কি তার মাথা অবনত করবে ?' তিনি বললেন, 'না।' আবার প্রশ্ন করল, 'সে কি তাকে আলিঙ্গন করবে এবং চুম্বন দেবে ?' তিনি বললেন, 'না।' আবার জিজ্ঞাসা করল, 'সে কি তার করমর্দন করবে ?' তিনি বললেন, 'হাঁ।'—তিরমিজী। বর্ণনায় : আনাস (রাঃ)।

৩৪৭. তোমাদের পরস্পরের প্রীতি-সম্ভাষণের অর্থ এই যে তোমরা পরস্পর করমর্দন করবে।—তির। মিশ।

৩৪৮. যখন মুসলমানেরা পরস্পরের করমর্দন করে তখন ক্ষমা লাভ না করা পর্যন্ত তাদের হাত বিচ্ছিন্ন হয় না। [অর্থাৎ তারা হাত ছাড়িয়ে নেবার পূর্বেই তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়।]—বুখারী। আহ্।

কর্ম ও তার ফল

'পৃথিবীর ওপরে যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে ওর শোভা করেছি মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্যে যে ওদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ।' ১৮(৭)।

"কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলো না 'আমি ওটা আগামীকাল করব'—'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে' একথা না বলে।" ১৮(২৩)।

'এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয়ই তাদের দোষত্রুটিগুলো দূর করে দেব এবং তাদের কর্মের উত্তম ফলদান করব।' ২৯(৭)

"প্রত্যেকের স্থান তার কর্মানুযায়ী, কারণ আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। যেদিন সত্য-প্রত্যাখ্যান-কারীদের জাহান্নামের সন্নিকট উপস্থিত করা হবে, সেদিন ওদের বলা হবে, 'তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ, সুতরাং আজ তোমাদের দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি ; কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।" ৪৬(১৯,২০)।

'যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য এ পৃথিবীতে কল্যাণ আছে এবং পরলোকে আরো উৎকৃষ্ট। এবং সাবধানীদের আবাসস্থল কত উত্তম—তা হল স্থায়ী স্বর্গ যেখানে তারা প্রবেশ করবে, ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা যা কিছু কামনা করবে ওতে তাদের জন্য তাই থাকবে।' ১৬(৩০, ৩১)।

'আল্লাহ্ জন্ম ও মৃত্যু এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যে তিনি পরীক্ষা করে দেখবেন তোমাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।'

'প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী, একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না।'

'যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখবে এবং যে ব্যক্তি অণু-পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখবে (অর্থাৎ তার ফল পাবে)।'

—আল্-কোরআন।

কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস

৩৪৯. একবার আমি একটা টাকার তোড়া কুড়িয়ে পেয়েছিলাম যার মধ্যে একশ স্বর্ণমুদ্রা (দিনার) ছিল। তখন আমি নবী (সঃ)-এর কাছে হাজির হলাম।

তিনি বললেন, 'এক বছর ঘোষণা কর।' আমি সেইভাবে ঘোষণা করলাম, কিন্তু এমন কোন লোক পেলাম না যে ওটাকে (তার বলে) সনাক্ত করতে পারে। তখন আমি আবার তাঁর (নবীর) কাছে এলাম। তিনি বললেন, 'আর একবছর ঘোষণা কর।' আমি সেই ভাবে ঘোষণা করলাম ; কিন্তু এমন কোন লোক পেলাম না, যে ওটাকে সনাক্ত করতে পারে। তখন তৃতীয়বার তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন, 'ওর থলি, ওর সংখ্যা, ওর বাঁধন মনে করে রাখ, যদি ওর মালিক আসে (তবে তাকে দিও), নয়তো তুমি ভোগ কর।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)।

৩৫০. যখন আমি আমার পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করি, তখন (কখনো কখনো) আমার বিছানার ওপরে খোরমা পড়ে থাকতে দেখি ; এবং আমি খাবার জন্য ও তুলে নিই। পরে আমার ভয় হয় যে ও হয়তো দানের জিনিস—তখন আমি ও ফেলে দিই।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৫১. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) হাজীদের কুড়িয়ে-পাওয়া জিনিস গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আব্দুর রহমান বিন ওসমান (রাঃ)।

৩৫২. মুসলমানদের কোন হারানো জিনিস অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়। —দারেমী। বর্ণনায় ঃ জারুদ (রাঃ)।

৩৫৩. এক বছর তাদের (অর্থাৎ পথভোলা বা হারানো পশুদের) কথা ঘোষণা কর. এবং তাদের বন্ধন-রশি ও আবরণ রেখে দাও এবং তাদের জন্য ব্যয় কর। যদি তাদের মালিক পাও, তাকে দিয়ে দাও।—বুখারী। মুস। মিশ। বর্ণনায় ঃ জায়েদ বিন খালেদ (রাঃ)।

ক্রীতদাস

৩৫৪. আবু মাসঊদ আল বাদাবী (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমি একজন ক্রীতদাসকে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছি, এমন সময় পেছন দিক থেকে শুনতে পেলাম, 'হে মাসঊদ, শোন।' কিন্তু অত্যধিক ক্রোধের বশে সে কণ্ঠস্বর কার তা বুঝতে পারলুম না। তারপর সে ব্যক্তি আমার সামনে উপস্থিত হলে দেখলাম যে তিনি স্বয়ং হজরত মুহম্মদ (দঃ)। তাঁকে দেখে আমি আমার হাতের চাবুক ফেলে দিলাম। তিনি বললেন, 'হে আবু মাসঊদ! ক্রীতদাসদের ওপর তোমার ক্ষমতা যতটুকু, তোমার ওপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশী।' আমি বললাম, 'আর কখনো ক্রীতদাসদের প্রহার করব না।' তিনি বললেন, 'যদি তুমি তা কর তবে দোজখ তোমার জন্যে উন্মুক্ত হবে এবং অগ্নি তোমাকে স্পর্শ করবে।' —আ. দাউদ। তিরমিজী। মুসলিম।

৩৫৫. এক ব্যক্তি বলল, 'হে রসুলুল্লাহ! ক্রীতদাসকে কতবার ক্ষমা করব?' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) চুপ করে রইলেন। তারপর সে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'প্রত্যহ ৭০ বার।'—আবু দাউদ। তিরমিজী।

৩৫৬. যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসের সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করে সে, বেহেশ্‌তে যাবে না। —ইবনে মাজা।

৩৫৭. একদিন আবুজরের গায়ে ইয়েমেনের একখানা মূল্যবান চাদর ও তার ক্রীতদাসের গায়ে অনুরূপ একখানা চাদর দেখতে পেলাম। তারপর আমি আবুজরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি হজরত রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ক্রীতদাস তোমাদের ভাই ; আল্লাহ্ তাদের তোমাদের অধীনে রেখেছেন। অতএব যে ব্যক্তি তাদের ভায়েদের আপন অধীনে রেখেছে সে নিজে যা আহার করে তাই তাদের আহার করতে দেবে, নিজে যা পরিধান করে তাই তাদের পরিধান করতে দেবে এবং তাদের শক্তির অতিরিক্ত কোন কাজ তাদের করতে দেবে না, নতুবা তাতে তাদের সাহায্য করবে।'—নাসায়ী ও আরো ৪ জন। বর্ণনায়ঃ মসরুর-বিন-সাঈদ (রাঃ)।

৩৫৮. যদি কারো কোন বালিকা ক্রীতদাসী থাকে এবং সে যদি তাকে শাস্তি না দিয়ে শিষ্টাচার ও সুশিক্ষা দান করে, তাকে মুক্তিদান করে এবং বিবাহ দেয়—সে নিশ্চয় দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।—শায়খান।

৩৫৯. যে ব্যক্তি মাতা ও সন্তানের বিরহের কারণ হয় আল্লাহ্ পরলোকে তাকে তার বন্ধুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন।—তিরমিজী। মিশকাত।

৩৬০. 'কোন্ ক্রীতদাসকে মুক্তিদান সর্বাপেক্ষা উত্তম?' হজরত (দঃ) বললেন, 'যার মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক এবং যে তার প্রভুর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়।' —শায়খান। মালেক।

কৃতজ্ঞতা

'অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না।' ২(১৫২)

'হে বিশ্বাসিগণ, আমরা তোমাদের যা দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা করে থাক।' ২(১৭২)

'তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করবে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।' ২(১৮৫)

'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই অধিক দেব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।' ১৪(৭)

'তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও বিশ্বাস কর তবে আল্লাহ্ তোমাদের শাস্তি দিতে চান না, বস্তুতঃ আল্লাহ্ পুরস্কার দাতা, সর্বজ্ঞ।' ৪(১৪৭)

—আল্-কোরআন।

৩৬১. উপকৃত ব্যক্তি যদি উপকারী ব্যক্তিকে বলে, 'আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন'—তাহলে সে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ ওসমান বিন জায়েদ (রাঃ)।

৩৬২. যে ব্যক্তি মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহ্‌র কাছেও কৃতজ্ঞ নয়। —বুখারী। আহমদ। তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৬৩. যখন কোন সুসংবাদ রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছতো (তখন)

তিনি আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য সিজদায় রত হতেন।—আবু দাউদ। তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু বাকরাহ্ (রাঃ)।

৩৬৪. হজরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললাম, 'রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক দেখেছেন তা আমাকে বলুন।' তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, 'এর চেয়ে কোন বিষয় অধিক আশ্চর্যজনক! তিনি একরাত্রে আমার শয্যায় এসে শয়ন করলেন, আমার দেহ তাঁর দেহকে স্পর্শ করল। তখন তিনি বললেন ঃ 'হে আয়েশা! আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি কি আমার প্রভুর উপাসনা করবে?' আমি বললাম ঃ আমি আপনার সঙ্গ ভালবাসি, কিন্তু আপনার ইচ্ছাই আমার অধিক পছন্দনীয়। আমার অনুমতি পেয়ে তিনি পানির কুঁজোর কাছে গিয়ে অজু করলেন, কিন্তু অধিক পানি ব্যয় না করেই তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অশ্রু বক্ষঃস্থল পর্যন্ত প্রবাহিত হতে লাগল। তারপর তিনি রুকু দিলেন এবং পরে সিজদায় গিয়ে কাঁদতে লাগলেন। এইভাবে ক্রন্দন করার সময় বেলাল তাঁকে নামাজের জন্য ডাকলেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসুল, আপনার পূর্বাপর সকল দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা সত্ত্বেও আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমি কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?'—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আতোয়া (রাঃ)।

৩৬৫. আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট যে আহার ও পানের পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।—মুস।

কৃপণতা ও কাপুরুষতা

'যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতা করার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে, আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন না।' ৪(৩৭)

'যারা কার্পণ্য করে, তারা তো নিজেদেরই প্রতি কার্পণ্য করে।' ৪৭(৩৮)

'মানুষতো স্বভাবতই অতিশয় অস্থিরচিত্ত, সে বিপদগ্রস্ত হলে হা-হুতাশ করতে থাকে এবং ঐশ্বর্যশালী হলে কৃপণ হয়ে পড়ে; তবে তারা নয় যারা নামাজ পড়ে।' ৭০(১৯-২২)।

'এবং কেউ ব্যয়কুণ্ঠ হলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে ও যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য কঠোর পরিণামের পথ সহজ করে দেব, এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না—যখন তার অধঃপতন ঘটবে।' ৯২(৮-১১)।

—আল্-কোরআন।

৩৬৬. সত্যকার মুসলমানের পক্ষে কৃপণ ও কাপুরুষ হওয়া উচিত নয়। —সগির।

৩৬৭. দানশীল লোক আল্লাহ্, বেহেশত ও মানুষের নিকটবর্তী এবং দোজখ থেকে দূরবর্তী। কৃপণ লোক আল্লাহ্, বেহেশত ও মানুষ থেকে দূরবর্তী এবং নরকের নিকটবর্তী। মূর্খ দাতা কৃপণ আবেদ (উপাসক) অপেক্ষা আল্লাহ্‌র কাছে নিশ্চয়ই অধিকতর প্রিয়।—বুখারী। মুসলিম। তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৬৮. কুচক্রী কৃপণ এবং নিষ্ঠুর ব্যক্তি বেহেশতে যাবে না।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবুবকর (রাঃ)।

৩৬৯. কৃপণতা ও অসৎ ব্যবহার কখনো সত্যকার মুসলমানের মধ্যে একত্র হয় না।—তিরমিজী।

৩৭০. যারা অর্থের দাস তারা অভিশপ্ত।—তিরমিজী।

৩৭১. যারা শুধু অর্থ সঞ্চয় করে এবং সৎপথে তা ব্যয় করে না, তারা নিশ্চয় ধ্বংসপ্রাপ্ত। —আবু দাউদ এবং আরো ৫ জন।

৩৭২. সেই ব্যক্তিই কৃপণ যার কাছে আমার বিষয় উল্লেখ করা হয় অথচ সে আমার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে না।—তিরমিজী। নাসায়ী। সগির।

৩৭৩. এমন কোন বান্দা নেই যে সকালে উঠলে দুজন ফেরেশতা তার কাছে আসে না। একজন বলে, 'হে আল্লাহ! দানশীলকে সফলতাদান কর।' অন্যজন বলে, 'হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস কর।'—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৭৪. দাতার খাদ্য প্রতিষেধক, কৃপণের খাদ্য ব্যাধিমূলক।—সগির।

৩৭৫. মুমেন আত্মভোলা মহৎব্যক্তি, পাপী সতর্ক কৃপণ।—আ. দাউদ।

৩৭৬. মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট দোষ অতিরিক্ত কৃপণতা ও অতিরিক্ত ভীরুতা। —আ. দাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৭৭. কৃপণতাকে ভয় কর, কেন না কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে ধ্বংস করেছে। এ তাদের এমন পথে পরিচালিত করেছে যে তারা রক্তপাত করেছে এবং অবৈধ বিষয়কে বৈধ জ্ঞান করেছে। —মুসলিম। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

৩৭৮. হে মানবসন্তান! যা তুমি ব্যয় কর তা তোমার পক্ষে কল্যাণকর এবং যা তুমি সঞ্চয় কর তা তোমার পক্ষে অকল্যাণকর। তুমি যেন কৃপণতার জন্য নিন্দিত না হও। তোমার পরিজনের মধ্যে যারা দরিদ্র প্রথমে তাদের দান কর। —মুসলিম।

কেশ, নখ, চোখ

৩৭৯. রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ যার কেশ আছে সে যেন তার সম্মান (যত্ন) করে।—আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৮০. রসুলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে অবস্থান করছিলেন। একজন লোক এলোমেলো কেশ ও দাড়ি নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। হজরত (দঃ) হাত-ইসারা করে তার মস্তক ও দাড়ির কেশ বিন্যাস করতে বললেন। সে তাই করে এলে তিনি বললেন, 'শয়তানের মত তোমাদের কেউ আলুলায়িত কেশে আসার চেয়ে এটাই কি উত্তম নয়?'—মালেক। বর্ণনায় ঃ আতা বিন আবু ইসার (রাঃ)।

৩৮১. রসুলুল্লাহ (সঃ)-কে একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার দীর্ঘকেশ আছে, আমি কি এ বিন্যাস করব?' তিনি বললেন, 'হাঁ, একে সম্মান কর।' রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর এই কথার জন্য তিনি দিনে দুবার কেশে তেল ব্যবহার করতেন।—মালেক। বর্ণনায় ঃ আবু কাতাদাহ (রাঃ)।

৩৮২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যে সব বিষয়ে অহী বা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পান নি তাতে তিনি কেতাবী লোক (অর্থাৎ পূর্ববর্তী ঐশী ধর্মগ্রন্থের অনুসারী)-দের সাথে একমত হতেন। কেতাবী ব্যক্তিরা তাদের মাথার কেশ লম্বা করে রাখত এবং তাদের মাথার-কেশের মধ্যভাগে সিঁথি কাটত। হজরত (দঃ)-ও তাঁর কেশকে লম্বা করতেন এবং মাঝখানে সিঁথি কাটতেন।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৩৮৩. আমি যখনই রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কেশ বিন্যাস করতাম, তাঁর মাথার মধ্যভাগে সিঁথি কাটতাম এবং মাথার অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ তাঁর নয়নদ্বয়ের উপরিভাগে বিন্যাস করে দিতাম।—বুখারী। মুসলিম। আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ হজরত আয়েশা (রাঃ)।

৩৮৪. এক বালকের মাথার কিছু অংশের কেশ মুণ্ডিত এবং কিছু অংশের কেশ রক্ষিত আছে দেখে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এরকম করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ হয় সমস্ত কেশ মুণ্ডিত কর, নয় সমস্ত কেশ রক্ষা কর।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ ওমরের পুত্র (রাঃ)।

৩৮৫. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) স্ত্রীলোকদের কেশ মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৩৮৬. আমরা আনাস বিন মালেকের কাছে গেলে ভগ্নী মুগীরাহ্ বলল, 'আজ তুমি একজন গোলাম। তোমার দুটি কেশগুচ্ছ আছে, তজ্জন্য আনাস তোমার মস্তক স্পর্শ করে (তোমার) মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেছে এবং বলেছে—এই দুটি (কেশগুচ্ছ) মুণ্ডন কর অথবা ছোট কর, কেন না এ ইহুদীদের গুচ্ছ।'—আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ হাজ্জাজ (রাঃ)।

৩৮৭. মেহদি এবং কাতামের সাহায্যে পক্ক কেশের রঙ পরিবর্তন করা সর্বাপেক্ষা উত্তম।—তিরমিজী। আ. দাউদ। নাসায়ী। বর্ণনায় ঃ আবুজর (রাঃ)।

৩৮৮. ওতবার কন্যা হেন্দা বলল 'আমার কাছ থেকে আনুগত্য গ্রহণ করুন।' রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'যে পর্যন্ত তুমি হিংস্র জন্তুর থাবার মত তোমার হাতদুটোর (নখ)-কে পরিবর্তন না কর, সে পর্যন্ত তোমার আনুগত্য গ্রহণ করব না।'—আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৩৮৯. পর্দার অন্তরালে থেকে একজন স্ত্রীলোক ইঙ্গিত করেছিল। তার হাতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে লেখা একখানা পত্র ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তার হাত সম্পর্কে বললেন, 'এ পুরুষের না নারীর হাত তা বুঝতে পারছি না।' বলা হল, 'নারীর হাত।' তিনি বললেন, 'তুমি যদি নারী হতে মেহদি দ্বারা নখের রঙ করতে।'—আবু দাউদ। নাসায়ী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৩৯০. প্রাকৃতিক অভ্যাস পাঁচটি ঃ খাত্না করা, গুপ্তাঙ্গের চুলকাটা, মুছ (গোঁফ) ফেলা, নখ কাটা এবং বগলের চুল কাটা।—শায়খান।

[নবীজি প্রতি সপ্তাহে নখ কাটতেন।]

৩৯১. পৌত্তলিকদের বিপরীত কর—দাড়ি রাখ ও মুছ ফেল।

৩৯২. মুছ ফেল ও দাড়িকে লম্বা কর।—শায়খান।

৩৯৩. ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর দাড়ি হলুদে রঙে এমন ভাবে রঞ্জিত করতেন যে

তার জামাকাপড়ও হলুদ হয়ে যেত। 'কেন তিনি এমন করেন?' জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, 'আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে ওর দ্বারা রঞ্জিত করতে দেখেছি, ওকেই তিনি সর্বাধিক পছন্দ করতেন এবং পাগড়ি পর্যন্ত ওর দ্বারা রঞ্জিত করতেন।' —আ. দাউদ। নাসায়ী।

৩৯৪. পাকা চুল বা দাড়ি তুলে ফেলো না, কারণ তা মুসলমানের নূর। যে ব্যক্তি ইসলামে (দৃঢ় থেকে) চুল পাকায়, আল্লাহ্ তার দ্বারা তার জন্য একটা পুরস্কার লিখে রাখেন এবং তাকে একটা পাপ থেকে মুক্ত করেন এবং তার দ্বারা তার পদোন্নতি করেন।—আ. দাউদ। বর্ণনায় ঃ আমর (রাঃ)।

৩৯৫. পাকা চুলের রঙ পরিবর্তন কর এবং ইহুদীদের অনুকরণ করো না। —বুখারী। মুস। তির। নাসায়ী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৯৬. চোখকে সুরমা দ্বারা সুশোভিত কর, কারণ তা দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল করে এবং চুল উৎপাদন করে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর একটা সুরমাকাঠি ছিল এর দ্বারা তিনি প্রতি রাতে বাম চোখে দুবার এবং ডান চোখে তিন বার সুরমা দিতেন।—তিরমিজী।

ক্রোধ

৩৯৭. ক্রোধ থেকে বিরত থাক।—সগির।

৩৯৮. ক্রোধ করো না, কারণ তা বিবাদের সৃষ্টি করে।—সগির।

৩৯৯. তিক্ত ঔষধ যেমন মধুকে নষ্ট করে, ক্রোধ তেমন ঈমানকে নষ্ট করে। —মিশকাত।

৪০০. ক্রোধ প্রকাশ করা শয়তানের কাজ, আর শয়তান আগুন দ্বারা সৃষ্ট। আগুন পানির সাহায্যে নেভান যায়। অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ ক্রুদ্ধ হলে সে যেন অজু করে।—আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ অরওয়ার পুত্র আতিয়্যাহ্।

৪০১. যখন তোমাদের কারো ক্রোধ হয়, দাঁড়ান অবস্থায় থাকলে সে যেন বসে পড়ে। তাতে যদি ক্রোধের অবসান হয় ভাল, নয়তো সে যেন সেই স্থান ত্যাগ করে (অন্য বর্ণনায়—সে যেন শুয়ে পড়ে)।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবুজর (রাঃ)।

৪০২. যারা ক্রুদ্ধ হলে ধৈর্য ধারণ করে এবং অন্যায়ের পর ক্ষমা করে আল্লাহ্ তাদের দোষ মার্জনা করেন, তাদের শত্রুদের দমন করেন, এবং তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হন। - মিশকাত।

৪০৩. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ক্রোধ গলধঃকরণ করেছে, তার মত উত্তম পানীয় আর কেউ পান করেনি।—মিশকাত।

৪০৪. মল্লযুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করার মধ্যে প্রকৃত বীরত্ব নেই, ক্রোধের সময় আত্মসংযমের মধ্যেই প্রকৃত বীরত্ব নিহিত।—শায়খান। বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪০৫. আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যে ক্রোধ দমন করা হয় তার চেয়ে কোন বীরত্বই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ নয়।—মিশকাত।

৪০৬. এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'ক্রোধ করো না।' সে বার বার উপদেশ দানের জন্য প্রার্থনা করল। তিনি বার বার বললেন, 'ক্রোধ করো না।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪০৭. অত্যধিক ক্রোধী ব্যক্তিই আল্লাহ্‌তা'লার কাছে সর্বাধিক অপ্রিয়। —শায়খান। তির। নাসায়ী। সগির।

৪০৮. প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করে, পরলোকে আল্লাহ্ তাকে সকলের সামনে দাঁড় করিয়ে বলবেন, 'হুরদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তুমি গ্রহণ করতে পার।'—আবু দাউদ। তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ সহল (রাঃ)।

৪০৯. ক্রুদ্ধ অবস্থায় কেউ কখনো দুই ব্যক্তির সম্বন্ধে বিচার করবে না। —খামসা।

কৌতুক-হাস্য

'তারা যেন অল্প হাসে এবং কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অধিক কাঁদে।'

—আল-কোরআন

৪১০. এক সময় সাহাবীরা বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসাও করেন?' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) উত্তর দিলেন, 'আমি ঠাট্টা তামাসাতেও সত্য ছাড়া মিথ্যা বলি না।'—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪১১. এক ব্যক্তি হজরত (দঃ)-কে একটা যানবাহনের জন্য অনুরোধ করল। তিনি বললেন, 'তোমাকে আমি একটা উটনীর বাচ্চার পিঠে চড়াব।' সে বলল, 'উটনীর বাচ্চা নিয়ে আমি কি করব?' তিনি বললেন, 'উট কি উটনীর পেট থেকে (বাচ্চারূপে) জন্মায় না?'—তিরমিজী। আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৪১২. আমি তাবুকের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন চর্মনির্মিত তাঁবুর মধ্যে ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি জবাব দিয়ে বললেন, 'প্রবেশ কর।' আমি বললাম, 'আমার সম্পূর্ণ (অঙ্গ সহ)?' তিনি বললেন, 'তোমার সম্পূর্ণ (অঙ্গ সহ)।' তারপর আমি প্রবেশ করলাম।—আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ মালিকের পুত্র অউফ (রাঃ)।

৪১৩. আনাস (রাঃ) বলেছেন যে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে একবার 'হে দুই কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি' বলে সম্বোধন করেছেন।—আবু দাউদ। তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৪১৪. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের সাথে মেলামেশা ও হাসি-তামাসা করতেন। আমার এক ভাই অল্প বয়স্ক বালক ছিল। তাকে তিনি তামাসা করে বলেছিলেন ঃ

ওগো আবু উমাইর,
কি হল তোমার বুলবুলির?

'ইয়া আবা উমাইর—মা ফাআলান্‌নুগাইর ?' [ওমাইর-এর সর্বক্ষণের খেলার সাথী বুলবুলিটা মারা গিয়েছিল।]—তির। বুখারী। মুস।

৪১৫. হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সঙ্গে মদীনা থেকে যাত্রা করলাম এবং আমাদের মনে হয়েছিল যে এ (যাত্রা) হজ্জেরই জন্য। যখন আমরা মক্কায় পৌছলাম, কা'বা গৃহ তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করলাম, তখন নবী (সঃ) আদেশ দিলেন, 'যে ব্যক্তি কোরবানীর জন্তু সঙ্গে আনে নি সে যেন এহ্‌রাম ছেড়ে দেয়।' সুতরাং যে কোরবানীর জন্তু আনেনি সে এহরাম ছাড়ল। তাঁর পত্নীগণ (কোরবানীর জন্তু) আনেন নি, তাঁরাও এহরাম ছাড়লেন। [হজ্জের অনুষ্ঠানগুলো যখন সম্পন্ন হয় তখন সোফিয়া (রাঃ)-র ঋতু বা মাসিক হয়েছিল তাই বিদায়ী তওয়াফ করতে না পারায়] সোফিয়া (রাঃ) বললেন, 'বোধ হয় আমিই সকলের (যাত্রার) প্রতিবন্ধক হব।' তিনি (দঃ) বললেন, 'তুমি কি কোরবানীর দিন (ফরজ) তওয়াফ করনি ?' তিনি বললেন, 'হাঁ, নিশ্চয়।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'কোন দোষ নেই, চল।' —বুখারী।

৪১৬. অধিক হাস্য করবে না, কারণ অধিক হাস্য হৃদয়কে মৃত করে। —বুখারী। মুস। তির। আহ্। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪১৭. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সব সময় হাসিমুখে থাকতেন। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ হাসান (রাঃ)।

৪১৮. জাহের নামে এক পল্লীবাসী বেদুইন ছিল। সে গ্রাম থেকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জন্য উপহার (শাকসব্জী) নিয়ে আসত, আর মদীনা থেকে ফেরার সময় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে শহরের কোন জিনিস উপহার দিতেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলতেন, 'জাহের আমাদের গ্রাম, আমরা তার শহর।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে খুবই স্নেহ করতেন। সে কুৎসিত চেহারার মানুষ ছিল। একদিন মদীনার বাজারে সে যখন তার মালপত্র বিক্রি করছিল তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে পেছন থেকে তার চোখ দুটো এমন ভাবে চেপে ধরলেন যে সে তাঁকে দেখার সুযোগ পেল না। সে চমকে উঠে বললে, 'কে গো, ছাড় আমাকে !' তারপর মনোযোগ দিয়ে ভাবল, ; তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে চিনতে পারল। তাঁকে চিনতে পেরে সুবোধ বালকের মত সে তার পৃষ্ঠদেশ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পবিত্র বক্ষোদেশে সংলগ্ন থাকা অবস্থায় চুপ করে রইল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলতে লাগলেন, 'কে এই গোলামটা খরিদ করবে ?' জাহের বলে উঠল, 'হে রসূলুল্লাহ্, আমাকে বিক্রি করলে বাজারে আপনি আমাকে অচল পাবেন অথবা অতি অল্প মূল্যেরই পাবেন।' তখন নবী (সঃ) বললেন, 'কিন্তু তুমিতো আল্লাহ্‌র কাছে অচল অথবা অল্প মূল্যের নও, বরং অতি মূল্যবান মানুষ তুমি।' [জাহের গোলাম ছিলেন না, আজাদ মানুষ ছিলেন—কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার গোলাম ছিলেন।]—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)।

৪১৯. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন—রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন ঃ আমি ঐ ব্যক্তিকে চিনি যে সকলের শেষে দোজখের আগুন থেকে (মুক্তি পেয়ে) বেরিয়ে আসবে। তাকে আদেশ করা হবে, 'যাও, বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর।' সে সেখানে গিয়ে দেখবে যে লোকেরা বেহেশ্‌তের সব অট্টালিকা দখল করে আছে। সে ফিরে এসে আল্লাহ্‌র কাছে বলবে, 'হে প্রভু, বেহেশ্‌তের সমস্ত জায়গা লোকেরা দখল করে রেখেছে। আমি সেখানে স্থান লাভ করার মত খালি জায়গা পাইনি।'

তখন আল্লাহ্ বলবেন, 'তুমি এক সময় যে দুনিয়ায় অবস্থান করতে সেখানকার কথা তোমার মনে আছে ?' সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার ভাল মনে আছে।' তারপর তাকে বলা হবে, 'তোমার যা কিছু চাওয়ার আছে আমার কাছে চাও।' সে তার বাসনা ব্যক্ত করবে। আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম, তাছাড়া দুনিয়া যত বড় ছিল তার চেয়ে দশগুণ বড় বেহেশ্‌তের বাগান তোমাকে দান করা হল। তখন সে বান্দা বলবে, 'হে আল্লাহ্ আপনি সর্বশক্তিমান সম্রাট হয়ে আমার সাথে তামাসা করছেন ?' ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি দেখলাম, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তার শেষ কথাটা নকল করে হাসলেন এবং হাসার সময় তাঁর পবিত্র দন্তরাজি বিকশিত হল।—তিরমিজী।

৪২০. একদিন এক বৃদ্ধা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে রসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্‌পাকের কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে বেহেশ্‌তের মধ্যে স্থান দান করেন।' তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'ওগো অমুকের মা, কোন বৃদ্ধাই বেহেশ্‌তের মধ্যে প্রবেশ করবে না।' তখন সেই বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যেতে লাগল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) উপস্থিত সহচরদের বললেন, 'তোমরা ওকে বুঝিয়ে দাও যে ও বৃদ্ধার বেশে বেহেশ্‌তে যাবে না, বরং আল্লাহ্-তা'লা সমস্ত বেহেশ্‌তী নারীকে ষোড়শী কুমারীতে রূপান্তরিত করবেন। আল্লাহ্-তা'লার পবিত্রবাণী—'আমি তাদের বিশেষ করে পবিত্র ও দোষত্রুটিহীন চিরকুমারী রূপে গঠন করেছি।'—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ হাসান বসরী (রাঃ)।

৪২১. অধিক হেসো না, কেন না এর দ্বারা হৃদয়ের মৃত্যু ঘটে এবং মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়।

৪২২. আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)কে অট্টহাস্য করতে দেখিনি। তিনি অত্যধিক আনন্দিত হলেও মৃদু হাসতেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৪২৩. মৃদু হাসি ব্যতীত রসূলুল্লাহ (সঃ)এর হাসি ছিল না।—তির। বর্ণনায় ঃ ইবনে হারেস (রাঃ)।

৪২৪. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ছাড়া আর কাউকে আমি এত মৃদু হাসতে দেখিনি। —তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ হারেসের পুত্র আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)।

৪২৫. আমি মুসলমান হবার পর কোন সময়ই রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতে বাধা দেননি এবং যখন তিনি আমাকে দেখতেন একটু হাসতেন। - তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ জরীর রাঃ)।

৪২৬. রসূলুল্লাহ (সঃ) যেখানে ফজরের নামাজ পড়তেন সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সেখানে বসে থাকতেন। সূর্যোদয় হলে তিনি উঠতেন। তারা (অনুচরেরা) কথাবার্তা বলত এবং অজ্ঞতার যুগের কাহিনী নিয়ে হাসাহাসি করত। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তা শুনে মৃদু হাসতেন।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

৪২৭. রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে মসজিদ থেকে একটা মাদুর নিয়ে আসতে বললেন। আমি বললাম, 'আমার হায়েজ (ঋতু) আছে।' তিনি বললেন, 'তোমার হায়েজ তোমার হাতে নেই।'—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৪২৮. তোমার ভায়ের সাথে বিবাদ করো না, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করো না এবং তার সাথে এমন প্রতিজ্ঞা করো না যা তুমি ভঙ্গ করবে।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

খেলাধূলো

[শরীরে পক্ষে কল্যাণকর নির্দোষ খেলাধূলা ইসলাম সমর্থন করে, কিন্তু ক্ষতিকারক খেলাধূলা যেমন তাস, পাশা, জুয়া, লটারি ইত্যাদি ইসলামে অবৈধ ।]

'শয়তান নেশা, পান ও হার-জিতের খেলা দ্বারা তোমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করে । তারা যদি তোমাকে নেশা, পান ও হার-জিতের খেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল : 'উভয়ের মধ্যে ক্ষতি এবং লাভ আছে, কিন্তু লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী ।'

—আল্-কোরআন ।

৪২৯. যে ব্যক্তি নারদ (তাস-পাশা) খেলে, সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে অমান্য করে ।—আবু দাউদ । বর্ণনায় : আবু মুসা আশ্য়ারী (রাঃ)।

৪৩০. যে ব্যক্তি পাশা খেলে, সে যেন তার হাত শূকরের মাংস এবং রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করে ।—মুসলিম । বর্ণনায় : বোরাইদাহ্ (রাঃ) ।

৪৩১. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মদ, জুয়া খেলা, তবলা বাজান এবং গোরাইরাহ্ (এক-প্রকার মদ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন ।—আবু দাউদ । বর্ণনায় : ইবনে ওমর (রাঃ) ।

৪৩২. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমার কয়েকজন বান্ধবী ছিল, তাদের সঙ্গে আমি খেলা করতাম । রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ঘরে আসলে আমার বান্ধবীরা দৌড়ে পালাত । তিনি (দঃ) তাদের খোঁজ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন ; আমরা পুনরায় খেলা আরম্ভ করতাম ।'—বুখারী ।

৪৩৩. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে আমি একবার ভ্রমণ করছিলাম ; তখন তাঁর সাথে আমার দৌড়ের প্রতিযোগিতা হল । আমি দৌড়ে তাঁকে পরাজিত করলাম । যখন আমি স্থূলকায় হলাম, তাঁর সাথে আবার দৌড়ের প্রতিযোগিতা হল, তখন তিনি আমাকে দৌড়ে পরাজিত করলেন এবং বললেন, 'আয়েশা ! এ হল তোমার পূর্ববিজয়ের প্রতিশোধ ।' [স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এ ধরনের নির্দোষ খেলাধূলা বৈধ —কেন না এ দাম্পত্য-জীবনকে পবিত্র আনন্দে পরিপূর্ণ ও মধুময় করে ।] —আবু দাউদ । বর্ণনায় : আয়েশা (রাঃ) ।

৪৩৪. এক ঈদের দিনে কিছু হাবশী লোক মসজিদে ঢাল-তলওয়ার চালনার খেলা করছিল । আমি নিজে হজরত (দঃ)কে বললাম কিংবা হজরত (দঃ) নিজেই আমাকে বললেন : 'তলোয়ার (খঞ্জর) চালনার খেলা দেখতে চাও কি ?' আমি বললাম—'হাঁ ।' হজরত (দঃ) আমাকে আড়াল করে রাখছিলেন । আমি আমার গণ্ডদেশ হজরতের গণ্ডদেশে লাগিয়ে হাবশীদের অস্ত্রচালনার দেখছিলাম । ওমর (রাঃ) তাদের ধমকালেন । রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে বললেন, 'তাদের ছাড় ।' আর হাবশীদের বললেন, 'ভয় নেই, তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও ।' আমি যখন নিজেই অবসাদ অনুভব করলাম তখন নবী (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'মন ভরেছে কি ?' আমি বললাম. 'হাঁ' । তিনি বললেন, 'তবে চলে যাও ।' [প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ খেলার মধ্যে জেহাদের প্রশিক্ষণ ছিল, তাই সিদ্ধ ।]—বুখারী ।

৪৩৫. যে সকল ঘোড়াকে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদের (মদীনার উপকণ্ঠস্থিত) 'হাফইয়া' নামক স্থান থেকে শুরু এবং (মদীনার ৬/৭ মাইল দূরে অবস্থিত) 'সানিইয়াতুল অদা' নামক স্থানে দৌড়

শেষ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর যে সব ঘোড়ার বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করা (অর্থাৎ ইজমার করা) হয় নি তাদের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল সানিইয়া থেকে মসজিদে-বনু-জুরাইক পর্যন্ত। প্রতিযোগীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমরও ছিলেন। —বুখারী। বর্ণনায়ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৪৩৬. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলিষ্ঠদেহী ঘোড়াদের দৌড় ছ সাত মাইল দূরবর্তী দুটো জায়গার মধ্যে অনুষ্ঠিত করেছিলেন এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের অধিকারী ঘোড়াদের দৌড় এক মাইল দূরবর্তী দুটি জায়গার মধ্যে অনুষ্ঠিত করেছেন। আমি সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছিলাম। —বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)।

গান-বাজনা

৪৩৭. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) খন্দকের যুদ্ধে মাটি কাটছিলেন, এমন কি তাঁর উদর (বক্ষোদেশ) কর্দমাক্ত হয়ে গিয়েছিল আর তিনি গাইছিলেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ ব্যতীত আমরা হেদায়েত-প্রাপ্ত হতাম না, আমরা দান করতাম না এবং আমরা নামাজ পড়তাম না। সুতরাং আমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ কর, যুদ্ধের সম্মুখে আমাদের পদযুগল দৃঢ় কর। নিশ্চয়ই আমাদের বন্ধুগণ বিদ্রোহ করেছে। তারা যখন যুদ্ধ চায়, আমরা তখন তা চাই না।' এর সঙ্গে তিনি বলছিলেন, 'আমরা চাই না, আমরা চাই না।' —বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ হজরত বারায়া (রাঃ)।

৪৩৮. তিনি (নবী সঃ) মসজিদ নির্মাণ করতে আদেশ দিলেন।...তারা ছড়া গাইতে গাইতে পাথর বইছিল। নবী (সঃ)-ও তাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি গাইছিলেন—'হে আল্লাহ্! কল্যাণ তো কল্যাণ আখেরাতের!

ক্ষমা কর তবে আনসার ও মুহাজিরদের।'

—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্বাস (রাঃ)।

৪৩৯. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ কোরবানী বা রোজার এক ঈদের দিন আবুবকর (রাঃ) আমার কাছে আমার ঘরে এলেন। সে সময় দুজন মদীনা-বাসী বালিকা ইসলাম-পূর্ব ঐতিহাসিক বোয়াছ যুদ্ধ-কালে উভয় পক্ষের রচিত তারানা বা যুদ্ধ সঙ্গীত গাইছিল। বালিকা দুজন কোন গায়িকা ছিলনা। তারা দফ বা ডুগি (মাটি, কাঠ বা ধাতুর খোলের একদিকে চামড়া দেওয়া অপর দিক খোলা 'বাঁয়া') বাজাচ্ছিল এবং লাফালাফিও করছিল। নবী (সঃ) তখন বিছানার ওপর অন্য দিকে মুখ ফিরে চাদর মুড়ি দিয়ে সেখানে শুয়ে-ছিলেন। আবুবকর (রাঃ) আমাকে এবং বালিকা দুটিকে ধমকালেন এবং বললেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ঘরে শয়তানের বাঁশি?' তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) চাদর থেকে মুখ বের করে আবুবকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাদের ছাড়, তাদের ছাড়, প্রত্যেক জাতির খুশীর দিন আছে, আজকের দিনটা আমাদের খুশীর দিন।' তারপর হজরত (দঃ) এদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন, তখন আমি বালিকাদুজনকে টিপুনি দিয়ে চলে যেতে বললাম, তারা চলে গেল। [ডুগি, যুদ্ধ-সঙ্গীত এবং দীনী সঙ্গীত ছাড়া সকল গানবাজনা নিষিদ্ধ।] —বুখারী। মুস।

৪৪০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ এমন কোন নবী পাঠান নি যাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ছিল না। —তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ কাতাদাহ্ (রাঃ)।

ঘরের কাজ

৪৪১. আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হজরত নবী (সঃ) যখন ঘরে থাকতেন তখন কি কাজ করতেন?' আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'তখন তিনি (দঃ) আপন পরিবারবর্গের কাজকর্ম করে দিতেন এবং আজান শুনলে নামাজের জন্য চলে যেতেন।' [ঘরের কাজ করা সুন্নত।]—বুখারী।

৪৪২. আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আটা পেশাই করার চাকী চালিয়ে ফাতেমার হাতের যা অবস্থা হয়েছিল তা জানাবার জন্যে ফাতেমা (রাঃ) একদিন (তাঁর পিতা) নবী (সঃ)-এর কাছে এলেন। কারণ তিনি খবর পেয়েছিলেন যে নবী (সঃ)-এর কাছে তখন (মুসলমানদের মধ্যে বিতরণের জন্য) কয়েকজন গোলাম আমদানি করা হয়েছে। ফাতেমা (রাঃ) এসে নবী (সঃ)কে ঘরে পেলেন না, তাই তিনি তাঁর বক্তব্য আয়েশা (রাঃ)-র কাছে বলে গেলেন। হজরত (দঃ) ঘরে ফিরলে আয়েশা (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ)র বক্তব্য তাঁকে জানালেন। আলী (রাঃ) বলেন, হজরত (দঃ) রাত্রে আমাদের ঘরে এলেন। তখন আমরা বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। তাঁর আগমনে আমরা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি (দঃ) আমাদের নিজ নিজ অবস্থায় থাকতে বললেন এবং (স্নেহভরে) এসে আমাদের দুজনের মাঝখানে বসলেন, এমন কি তাঁর পায়ের শীতলতা আমার পেটকে স্পর্শ করল। এরকম সময় হজরত (দঃ) আমাদের দুজনকে লক্ষ্য করে' বললেন, "তোমরা যে জিনিস (গোলাম বা চাকর) চেয়েছ তার চেয়ে অধিক উত্তম জিনিসের সন্ধান আমি তোমাদের দেব কি? তাহল—বিছানায় শোবার সময় ৩৩ বার 'ছোবহানাল্লাহ্' ৩৩ বার 'আলহাম-দুলিল্লাহ্' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবর' পাঠ করা; এটা তোমাদের পক্ষে গোলাম বা চাকর অপেক্ষা অধিক উপকারী হবে।"—বুখারী।

ঘুষ

'এবং তোমরা একে-অন্যের ধন অন্যায় ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধনসম্পদের কিছু অংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে ঘুষ দিও না।' ২(১৮৮)

—আল্-কোরআন।

৪৪৩. যারা ঘুষ নেয় অথবা ঘুষ দেয়, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদের (সকলকে) অভিশাপ দিয়েছেন।—আবু দাউদ। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন আমের (রাঃ)। [ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া দুইই কবীরা গুনাহ্ বা মহাপাপ।]

৪৪৪. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, যে (যা) ঘুষ খায় কেয়ামতের দিন সে তা বহন করে' উপস্থিত হবে। যদি (ঘুষ

হিসেবে) গাধা গ্রহণ করে' থাকে তা চীৎকার করতে থাকবে, যদি গাভী গ্রহণ করে' থাকে তা চীৎকার করতে থাকবে। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হাত তুলে বললেন, 'হে আল্লাহ্, আমি কি এ সংবাদ ঘোষণা করে' দিয়েছি ?' (এই ভাবে দুবার বললেন) ।—আ. দাউদ ।

৪৪৫. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'আমরা যাকে যে পদে নিয়োগ করি তাকে সে জন্যে বেতন দেওয়া হবে। এ ছাড়া সে যা গ্রহণ করবে তা বিশ্বাসঘাতকতা।'—ই. মাজা ।

চাষ ও ভাগচাষ

৪৪৬. একজন লোক একটা গরুর ওপরে চড়েছিল। এমন সময় গরুটা তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয় নি, আমাকে ক্ষেতের (চাষের) কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' (এ ঘটনা বর্ণনা করে') তিনি (নবী সঃ) বললেন, 'আমি, আবুবকর এবং ওমর একথা (অর্থাৎ ক্ষেতের কাজের জন্য সৃষ্টি হওয়ার কথা) বিশ্বাস করি।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৪৭. নবী (সঃ) খয়বরবাসীদের সঙ্গে ফসল কিংবা ফলের অর্ধেক ভাগের শর্তে জমি বন্দোবস্ত করে' দিয়েছিলেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৪৪৮. ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ), আবুবকর, ওমর এবং ওসমানের আমলে—এবং মোয়াবিয়ার শাসনের প্রথম ভাগে তিনি (ইবনে ওমর) নিজের ক্ষেত ভাগে বিলি করতেন। এরপর রাফে' ইবনে খাদীজের এই হাদীস তাঁর কাছে বর্ণনা করা হয় যে নবী (সঃ) ভাগে ক্ষেত বিলি করা নিষেধ করেছেন। তখন ইবনে ওমর বললেন, 'তুমি তো জানই যে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কালে আমরা নালার ধারের ফসলের শর্তে এবং কিছু (অনির্দিষ্ট) ভূষির শর্তে জমি বিলি করতাম ; (নবী সঃ) এই শর্তে নিষেধ করেছেন,—একেবারে নিষেধ করেননি।' —বুখারী।

৪৪৯. রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলেছেন, 'সমস্ত মদীনাবাসীদের মধ্যে বেশী ক্ষেত আমাদের ছিল। আমরা ক্ষেত ভাগে দিতাম এবং সেই ক্ষেতের এক নির্দিষ্ট অংশ জমির মালিকের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতাম। তিনি বলেছেন, কখনো সেই অংশের ওপরে আপদ-বিপদ আসত এবং অবশিষ্ট অংশ নিরাপদ থাকত। আর কখনো অবশিষ্ট অংশের ওপরে আপদ-বিপদ আসত এবং সেই অংশ নিরাপদ থাকত। এই জন্য আমাদের (এ) নিষেধ করা হয়েছিল।'—বুখারী।

৪৫০. ওমর (রাঃ) ইহুদী ও খৃষ্টানদের হেজাজ থেকে বের করে' দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন খয়বর জয় করেন তখন ইহুদীদের সেখান থেকে বের করে দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। (কেন না) যখন তিনি সেই স্থান জয় করেন সেই স্থানের জমি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের হয়েছিল। তিনি ইহুদীদের সেখান থেকে বের করে দেবার সঙ্কল্প করলে, ইহুদীরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করল যেন তিনি তাদের সেখানে এই শর্তে থাকতে দেন যে, তারা সেখানে মেহনত করবে আর ফসলের অর্ধেক ভাগ পাবে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদের বললেন, আমরা এই শর্তে যতদিন চাইব তোমাদের থাকতে দেব। ফলে তারা সেখানে থেকে গেল। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৪৫১. আনসারগণ নবী (সঃ)-কে বললেন, 'আমাদের এবং আমাদের ভাই মোহাজেরদের মধ্যে খেজুরের বাগান ভাগ করে দিন।' তিনি বললেন, 'না।' তখন তাঁরা (মোহাজেরদের) বললেন, 'আপনারা আমাদের খরচ দিন; আপনাদের ফলের ভাগ দেব।' 'আমরা শুনলাম এবং মঞ্জুর করলাম।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৫২. হানজালা (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বললেন, আমার দুই চাচা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কালে জমির নির্দিষ্ট অংশের শস্য বা ঐ জমির নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ে জমি ভাগে দিতেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ ব্যবস্থাকে নিষেধ করে দিলেন। হানজালা (রাঃ) বলেন, তখন আমি রাফে' (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'টাকা-পয়সার বিনিময়ে জমি চাষে বিলি করা কিরকম?' তিনি বললেন, 'টাকা-পয়সার বিনিময়ে জমি চাষ করতে দেওয়া দূষণীয় নয়।'—বুখারী।

চিন্তা ও কল্পনা

'তোমার প্রভুর সৃষ্টি সম্বন্ধে তুমি কি চিন্তা করনি, তিনি কিরূপে ছায়া বিস্তৃত করেন।'

'তিনিই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদনদী সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রত্যেক প্রকার ফলের জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দিয়ে ঢেকে দেন। নিশ্চয়ই এ সকলের মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।'

'পরম করুণাময় আল্লাহ্। তিনিই কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাকে ভাবপ্রকাশ করতে শিখিয়েছেন।' ৫৫ (১-৪)।

—আল্-কোরআন।

৪৫৩. বেলাল ফজরের নামাজের জন্য ডাকতে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার পূর্ব ও পরের সমস্ত পাপ তো মাফ হয়ে গিয়েছে, (তবু) আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি (দঃ) বললেন, "হে বেলাল, তোমার জন্য আক্ষেপ! কাঁদতে আমাকে কে বাধা দেবে? মহান আল্লাহ্ রাত্রে এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন—আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।' যে একথা পাঠ করে চিন্তা করে না তার জন্য পরিতাপ।"—ইবনে হাব্বান। বর্ণনায়ঃ আতা (রাঃ)।

৪৫৪. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, এক ঘণ্টা (পবিত্র) চিন্তা করা এক বৎসরের উপাসনার চেয়ে উত্তম।—ইবনে হাব্বান। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৫৫. এক ব্যক্তি নবী (সঃ)কে বলল, 'কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'চিন্তা করে কাজ কর এবং যদি অকল্যাণকর মনে কর তবে তা পরিত্যাগ কর।'—মিশকাত।

৪৫৬. উত্তম কল্পনা উত্তম উপাসনার অংশ বিশেষ। —সগির। মিশ।

৪৫৬. (ক) সৎ চিন্তার তুল্য উপাসনা নেই।—সগির।

চুরি করা

'নর বা নারী চুরি করলে তাদের হাত কেটে ফেল। যা তারা করেছে (এ) তারই শাস্তি, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আদর্শ শাস্তি এবং আল্লাহ্‌ শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। কিন্তু তার অপরাধের পর সে যদি অনুশোচনা করে এবং শুদ্ধ হয়, আল্লাহ্‌ তার প্রতি ক্ষমাশীল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' ৫(৩৮)

—আল্‌-কোরআন।

৪৫৭. একজন চোরকে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে আনা হলে তিনি তার হাত কাটলেন। তারা বলল, 'আমরা ভাবিনি, তাকে এই শাস্তি দেবেন।' তিনি বললেন, 'ফাতেমাও (নবীকন্যা) যদি চুরি করত, নিশ্চয় আমি তার হাত কাটতাম।' —বুখারী। মুসলিম। নাসায়ী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৪৫৮. সিকি দিনার বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মাল চুরি করলে তার হাত কাটা হবে।' —বুখারী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৪৫৯. নবী (সঃ) একটা ঢাল চুরি করার অপরাধে চোরের হাত কেটেছিলেন। ঢালটার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৪৬০. এক সিঁধেল চোরকে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে আনা হলে সে চুরি স্বীকার করল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি চুরি করেছ?' সে বলল, 'হাঁ।' এভাবে দুই কি তিনবার করা হলে সে প্রত্যেকবারেই (অপরাধ) স্বীকার করল। তারপর (তাকে) আবার আনা হলে তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও এবং অনুশোচনা (তওবা) কর।' তারপর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তিনবার বললেন, 'হে আল্লাহ্‌ তার তওবা কবুল কর।' —আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ আবু উমাইয়াহ্‌ (রাঃ)।

ছবি

৪৬১. আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ তিনি একটা বালিশ কিনেছিলেন, তাতে ছবি ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তা দেখতে পেয়ে দরজায় দাঁড়ালেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর মুখে ঘৃণার চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললাম, 'হে রসূলুল্লাহ্‌! যে পাপ করেছি, তার জন্য আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের কাছে আমি অনুতপ্ত।' তিনি বললেন, 'এ বালিশের খবর কি?' বললাম, 'আমি এ আপনার জন্য কিনেছি, যাতে আপনি এর ওপর হেলান দিতে বা একে তাকিয়া হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই এই ছবির শিল্পিগণ পরলোকে শাস্তি পাবে এবং তাদের বলা হবে—যা তোমরা সৃষ্টি করেছ তাতে প্রাণ সঞ্চার কর।' তিনি আরো বলেন, 'যে-গৃহে (প্রাণীর) চিত্র থাকে সে গৃহে (রহমতের) ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করেন না।' —শায়খান। বুখারী।

৪৬২. যে গৃহে কুকুর অথবা ছবি থাকে সে গৃহে ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করেন না।—শায়খান।

৪৬৩. সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আমি আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-র কাছে ছিলাম। একজন লোক তাঁর কাছে এল

এবং বলল—'হে আব্বুল আব্বাস! আমি একজন দরিদ্র ব্যক্তি, আমার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় আমার হস্তশিল্প—আমি ছবি তৈরি করি।' ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন—'আমি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মুখে নিজকানে যে হাদীসটা বলতে শুনেছি (এ প্রসঙ্গে) তোমাকে সেটাই বলব। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন ছবি তৈরি করবে আল্লাহ্‌তা'লা কেয়ামতের দিন তাকে ঐ ছবির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি দান করতে থাকবেন, কিন্তু সে কখনই ওতে প্রাণসঞ্চার করতে সক্ষম হবে না।' একথা শুনে লোকটা ভয়ে কাঁপতে লাগল এবং তার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাকে বললেন, 'যদি অগত্যা তুমি ঐ কাজ করতেই চাও তবে কোন প্রকার প্রাণীর ছবি তৈরি না করে নিষ্প্রাণ গাছপালার ছবি তৈরি করো।' —বুখারী।

জীবে প্রেম

'তুমি সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদাশয়, এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেওনা। অবশ্যই আল্লাহ্ বিপর্যয়সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।'

—আল্-কোরআন।

৪৬৪. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ এক পতিতার পাপ ক্ষমা করা হয়েছিল। সে একটা কূপের কাছ দিয়ে যেতে যেতে দেখল যে একটা কুকুর জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে আর পিপাসায় মৃতপ্রায় হয়েছে। পতিতা নারীটি তার খোঁপার রশি খুলে কুকুরটার জন্য কূপ থেকে পানি তুলল। এর জন্য তার পাপ ক্ষমা করা হল।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৬৫. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ এক স্ত্রীলোককে একটা বিড়াল আটক করে রাখার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। ক্ষুধার কারণে বিড়ালটার মৃত্যু হয়েছিল। ঐ স্ত্রীলোক তাকে খাদ্যও দেয়নি এবং বিড়ালটা যাতে কীটপতঙ্গ (বা) অন্য কিছু খেয়ে বাঁচতে পারে তার জন্যে তাকে মুক্ত করেও দেয়নি। —বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) ও ইবনে ওমর (রাঃ)।

৪৬৬. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ নরককে আমার কাছে উপস্থিত করা হলে বনি-ইসরাইল বংশের এক স্ত্রীলোককে তার এক বিড়ালের জন্যে শাস্তি পেতে দেখলাম। সে তাকে খাদ্য না দিয়ে বেঁধে রেখেছিল, ফলে বিড়ালটা মারা যায়। —মিশকাত। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

৪৬৭. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ একটা পিপীলিকা একজন নবীকে দংশন করেছিল। তিনি পিপীলিকার স্থানটি পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তা পুড়িয়ে ফেলা হলে আল্লাহ্ বললেন, 'একটা পিপীলিকা দংশন করেছে, সেজন্য তুমি আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী একটা সম্প্রদায়কে পুড়িয়ে ফেললে?'—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৬৮. রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ যখন কোন মুসলমান গাছ লাগায় কিংবা ক্ষেতে বীজ ছড়ায়, তখন…পশুপক্ষী (যদি) খায়—এ তার দানের কাজ বলে' গণ্য হবে।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)।

৪৬৯. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হল। তখন সে একটা কূপের মধ্যে নেমে সেখান থেকে পানি পান করল। তারপর সে কূপ থেকে বেরিয়ে এসে দেখল যে একটা কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে হাঁপাচ্ছে আর (কূপের ধারের) ভিজে মাটি চাটছে। (এ ঘটনা দেখে) সে মনে মনে ভাবল যে, সে হয়তো তারই মত তৃষ্ণার্ত হয়েছে। (তখন) পুনরায় সে (সেই) কূপের মধ্যে নেমে তার চামড়ার মোজায় করে কিছু পানি ভরে দাঁত দিয়ে শক্ত করে' ধরে ওপরে উঠল এবং তাকে পান করাল॥ তখন আল্লাহ্‌তা'লা তার কাজের কদর করলেন এবং তাকে ক্ষমা করলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'হে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)! পশুদের প্রতি করুণা প্রকাশে কোন পুরস্কার আছে কি?' তিনি বললেন, 'হাঁ, প্রত্যেক জীবের জন্য (করুণা প্রকাশে) পুণ্য আছে।' বুখারী। আবুদাউদ ও ২জন। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৭০. এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে একটা চাদর নিয়ে হাজির হয়ে বলল, 'হে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)! আমি এক বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় কতগুলো ছোট ছোট পাখীর শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর তাদের ধরে এনে আমার চাদরের মধ্যে রাখলাম। তাদের মা আমার মাথার ওপর ব্যাকুল ভাবে উড়তে লাগল। আমি তখন চাদরের কোণা খুলে দিলাম। তাদের মা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই ছানাগুলো এই।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন 'এদের ছেড়ে দাও।' সে তাই করল। তাদের মা তাদের আগলে রাখল। হজরত (দঃ) বললেন 'তোমরা কি এই ছানাগুলোর প্রতি তাদের মায়ের স্নেহ দেখে আশ্চর্য বোধ কর? যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! এই ছানাগুলোর প্রতি তাদের মায়ের স্নেহ যেরকম সৃষ্ট জীবের প্রতি আল্লাহ্‌র স্নেহ তার চেয়েও বেশী। অতএব যেখান থেকে তাদের এনেছ, সেখানেই তাদের রেখে এস এবং তাদের মাকে তাদের সঙ্গে থাকতে দাও।' —মিশকাত।

৪৭১. আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, তাঁর পিতা ও কয়েকজন ব্যক্তি একদিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। পথের মধ্যে তাঁরা একটা লাল পাখী ও তার সঙ্গে দুটো বাচ্চা দেখে তাদের ধরে আনলেন। তাদের মা তাদের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পাখা ঝাপটাতে লাগল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন 'যে ব্যক্তি এদের ধরে' এনে কষ্ট দিচ্ছে সে এদের ছেড়ে দিক।' তারপর তাদের একটা পিপীলিকাকে আগুনে পোড়াতে দেখে তিনি বললেন ঃ 'কে এদের পুড়িয়ে মারল?' তারপর বললেন, 'এ আগুনের মালিক (আল্লাহ্) ছাড়া কেউ কাউকে আগুনের শাস্তি দেবে এটা উচিত নয়।'—আবু দাউদ।

জুতা প্রসঙ্গ

৪৭২. এক সময় আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ জুতা অধিক সময় ব্যবহার কর। যে পর্যন্ত জুতা পায়ে থাকে সে পর্যন্ত সে আরোহীর ন্যায় থাকে। —মুস। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

৪৭৩. ওবাইদু ইবনে জরীজ (রাঃ) হজরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বললেন, আপনি (সবসময়) লোমবিহীন চর্মের জুতা পরিধান করেন দেখছি। তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে লোমহীন চর্মের জুতা পরিধান করতে এবং ওতে

অজ্জু করতে দেখেছি, অতএব আমিও সেই রকম জুতা ব্যবহার করতে ভালবাসি।' [সেকালের আরবে সচরাচর লোমযুক্ত চর্মপাদুকা পরিধানের প্রচলন ছিল।] —তিরমিজী। বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৪৭৪. রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জুতায় দুটি করে ফিতা ছিল। বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৪৭৫. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) প্রত্যেক জুতায় দুখানা করে ফিতা ছিল। হজরত আবুবকর (রাঃ) এবং হজরত ওমর ফারুক (রাঃ)-রও সেই রকম ছিল। হজরত ওসমান (রাঃ)-ই সর্বপ্রথম জুতায় একখানা ফিতা ব্যবহার করেছিলেন। —তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৭৬. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে মেরামত না করা পর্যন্ত কেউ যেন এক পায়ে জুতা ব্যবহার না করে, এক মোজা পরে না হাঁটে, বাম হাত দিয়ে খাদ্য গ্রহণ না করে, একখণ্ড বস্ত্রে দেহ আবৃত না করে এবং কষ্টকর পথে না চলে। —মুসলিম। তির। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

৪৭৭. তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা দিয়ে না হাঁটে। উভয় পা নগ্ন থাকবে অথবা জুতা পরিহিত থাকবে। —বুখারী। মুসলিম। তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৭৮. তোমাদের কেউ যখন জুতা পরে তখন সে যেন ডান পা থেকে আরম্ভ করে, আর যখন তা খোলে তখন যেন বাম পা থেকে আরম্ভ করে। —তির। বু.। মু.। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৭৯. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) চিরুণী দ্বারা (মাথা বা দাড়ি) আঁচড়ানো, জুতা পরা এবং ওজু করার সময় যথাসম্ভব ডান দিক দিয়ে আরম্ভ করতে ভালবাসতেন। তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৪৮০. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন এবং যখন কোন লোক আসন গ্রহণ করে সে যেন জুতা খুলে পাশে রাখে। এই হল নবীর নীতি। —আবু দাউদ। তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ জাবের ও আব্বাস (রাঃ)।

জ্ঞান-শিক্ষা

'পাঠকর তোমার সেই প্রভুর নামে যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন—যিনি এক বিন্দু রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। পাঠকর তোমার সেই মহিমময় প্রভুর নামে যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞানদান করেছেন—যিনি অনুগ্রহ করে মানুষকে দান করেছেন অজ্ঞাতপূর্ব জ্ঞান।' ৯৬ (১-৫)

'পরম করুণাময় আল্লাহ্। তিনিই কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাকে ভাবপ্রকাশ করতে শিখিয়েছেন।' ৫ (১-৪)

'যারা ঈমান এনেছে এবং বিশেষ করে যারা জ্ঞান বা শিক্ষা অর্জন করেছে—আল্লাহ্‌তা'লা তাদের অনেক উচ্চ আসনের অধিকারী করবেন।' ৫৮ (১১)

'তোমরা যা পছন্দ করনা সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা

যা পছন্দ কর সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।' ২(২১৬)। [কেননা আল্লাহ্ অজ্ঞাত জ্ঞানের খনি।]

'অতীতে তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ছিল, সুতরাং তোমরা পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম।' ৩(১৩৭) (Travelling is a part of education)।

—আল্-কোরআন।

৪৮১. প্রথম জ্ঞান আল্লাহ্‌তা'লাকে জানা এবং শেষ জ্ঞান তাঁর প্রতি সর্ববিষয়ে আত্মসমর্পণ করা। —সগির।

৪৮২. আল্লাহ্‌তা'লার কাছে জ্ঞান-সাধকের কলমের কালি শহীদের রক্ত অপেক্ষা অধিক প্রিয়। কারণ জ্ঞানী আল্লাহ্‌তা'লার কাছ থেকে পথপ্রাপ্ত হয়েছে আর তার দ্বারা আল্লাহ্‌র অনেক বান্দা পরিচালিত হয়েছে; কিন্তু শহীদ শুধু আপন আত্মার মুক্তি অর্জন করেছে। —ওসিয়াতুন্নবী।

৪৮৩. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন : যে উপদেশ ও জ্ঞান দিয়ে আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছেন তার উপমা হল— মাটির ওপরে বর্ষণ-মুখর প্রবল বৃষ্টি। কিছু মাটি ভাল, (সে মাটি) পানি শুষে নেয় এবং প্রচুর ঘাস-পাতা উৎপন্ন করে, কিছু মাটি শক্ত, (তারা) পানি ধরে রাখে এবং আল্লাহ্ তাদের দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধন করেন; তারা পান করে, পান করায় এবং কৃষি করে; এবং ঐ বৃষ্টির কিছু (পানি) এমন এক অঞ্চলে (অর্থাৎ মাটিতে) বর্ষিত হয় যে যদিও তা (সে মাটি) সমতল তবুও তা না ধরে রাখে পানি, না উৎপন্ন করে ঘাস॥ এই হল ঐ (প্রথম দু শ্রেণীর) লোকের উপমা যারা খোদার ধর্মে জ্ঞানবান হয় এবং খোদা আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দ্বারা লাভবান হয়, শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। আর ঐ (শেষোক্ত অকেজো মাটির বা) লোকের উপমা হল যে ব্যক্তি ওর (খোদার ধর্মের) দিকে মাথা তুলে তাকায় না এবং আমাকে যে উপদেশ দিয়ে পাঠান হয়েছে তা গ্রহণ করে না। —বুখারী। বর্ণনায় : আবু মূসা (রাঃ)।

৪৮৪. ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি : আমি যখন নিদ্রিত ছিলাম তখন আমাকে এক পেয়ালা দুধ দেওয়া হল। আমি পান করলাম এবং দেখলাম যে আমার নখে নখে তৃপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে। তারপর বাকিটা ওমর ইবনে খাত্তাবকে দিলাম। তারা (সাহাবীরা) বলল, 'আপনি ওর কি অর্থ করলেন?' তিনি (সঃ) বললেন, 'জ্ঞান।' [অর্থাৎ জ্ঞান বা সৎশিক্ষা দুধের মত এমন এক পবিত্র ও পরম পুষ্টিকর জিনিস যা গ্রহণ করতে পারলে মানুষের দেহমনের কানায় কানায় সার্থক আনন্দের শিহরণ জাগে।]—বুখারী।

৪৮৫. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একদিন যখন তাঁর মসজিদের মধ্যে দুই দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন বললেন : তাদের উভয় দলই সৎকার্যে লিপ্ত—তবে একদল অপর দল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, এরা (উপাসকেরা) আল্লাহ্‌কে ডাকে, তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়, তারপর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন এদের (প্রার্থনা) পূরণ করেন এবং যদি ইচ্ছা না করেন তবে তা প্রত্যাখ্যান করেন; আর এরা (জ্ঞানীরা) ধর্মশাস্ত্র বা জ্ঞানশিক্ষা করেন এবং অশিক্ষিতদের শিক্ষা দেন, অতএব এঁরা শ্রেষ্ঠতর। আমি শুধু শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। তারপর তিনি তাদের (জ্ঞানীদের) মধ্যে বসলেন। —মিশকাত। বর্ণনায় : আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ)।

৪৮৬. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে দুজন লোক (সম্পর্কে) আলোচনা করা হল—তাদের একজন সাধক আর একজন শিক্ষক (আলেম)। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন ঃ একজন সাধারণ মানুষ অপেক্ষা আমার মত একজন নবীর মর্যাদা যেমন অধিক, একজন সাধক অপেক্ষা একজন শিক্ষকের মর্যাদাও তেমনি অধিক। যে ব্যক্তি মানুষকে ভাল কথা (অর্থাৎ জ্ঞান) শিক্ষাদান করে—তার জন্যে আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তারা, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, এমন কি গুহাবাসী পিপীলিকা এবং মৎস্যেরাও শুভকামনা (দোয়া) করে।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু উমামা বাহেলী (রাঃ)।

৪৮৭. শয়তানের কাছে সহস্র সাধক অপেক্ষা একজন শিক্ষক (আলেম বা জ্ঞানী) অধিক আশংকার কারণ।—তিরমিজী। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ)।

৪৮৮. জ্ঞানীর নিদ্রা অশিক্ষিত ব্যক্তির উপাসনা অপেক্ষা উত্তম ; কারণ জ্ঞান ব্যতীত উপাসনা বিক্ষিপ্ত ধূলিরাশির মত এবং সংযম ব্যতীত জ্ঞান ঝড়ের দিনে ঝঞ্ঝা-তাড়িত ভস্মের মত।—ওসিয়াতুন্নবী।

৪৮৯. শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ব্যতীত কেউ আমার আপন নয়।—সগির।

৪৯০. যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণের পথে যাত্রা করে আল্লাহ্ তাকে বেহেশ্‌তের পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশ্‌তারা জ্ঞানান্বেষণকারীদের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে (তাদের চলার পথে) নিজ নিজ ডানা বিস্তার করে' দেন। এ ছাড়া স্বর্গমর্তের সকল কিছু এমন কি পানির মধ্যে মাছেরাও জ্ঞানীদের জন্য প্রার্থনা করে। তারকারাজি মধ্যে পূর্ণচন্দ্র যেমন শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানহীন সাধকবৃন্দের মধ্যে জ্ঞানিগণও তেমনি উৎকৃষ্ট। নবীগণ স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্তে জ্ঞানের উত্তরাধিকার রেখে যান। যারা জ্ঞান লাভ করে তারা পূর্ণমাত্রায় সেই উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়।—আহ্‌মদ। আ. দাউদ। ই. মাজা। মিশ।

৪৯১. আল্লাহ্‌তা'লা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কোন কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেইভাবেই তা অপরকে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা অনেক সময় যাকে পৌঁছে দেওয়া হয় সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষাকারী হয়।—তির। মিশ। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ)।

৪৯২. কোন ব্যক্তিকে তার জানা বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে যদি সে তা গোপন করে তবে কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে।—তির। মিশ। আহমদ। আ. দাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৯৩. জ্ঞান শিক্ষা কর এবং মানুষকে শিক্ষা দাও, ফরজ কাজগুলো শিক্ষা কর এবং মানুষকে শিক্ষা দাও, আর কোরআন শিক্ষা কর এবং মানুষকে শিক্ষা দাও। কারণ আমি মানুষ, মরণশীল—এবং শীঘ্রই জ্ঞানও লোপ পাবে এবং বিপদ এমন চরম সীমায় উপস্থিত হবে যে ফরজ বা অবশ্য পালনীয় বিষয় সম্বন্ধে দুই ব্যক্তি পরস্পরের মধ্যে বিরোধ করবে এবং তাদের মীমাংসা করার মত কাউকেও পাবে না।—মিশকাত। বর্ণনায় ঃ ইবনে মসউদ (রাঃ)।

৪৯৪. পরবর্তী বংশধরদের জন্য জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করে স্থায়ী কর।—ওসিয়াতুন্নবী।

৪৯৫. কুলেখক কুকর্মীর তুল্য।—সগির।

৪৯৬. মূর্খদের মধ্যে শিক্ষার্থী মৃতদের মধ্যে জীবিতের তুল্য।—সগির।

৪৯৭. শিক্ষার্থী ইসলামের স্তম্ভ।—সগির।

৪৯৮. যে শিক্ষার্থী জ্ঞানান্বেষণের জন্য বিদেশে গমন করে আল্লাহ্ তার জন্য বেহশ্তে উন্নত স্থান নির্দেশ করবেন এবং তার প্রতিটি পদক্ষেপ আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয় ও তার শিক্ষাকরা প্রতিটি শব্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়।—ওসিয়াতুন্নবী।

৪৯৯. প্রত্যেক বস্তু লাভ করার পথ আছে—বেহশ্ত লাভের পথ জ্ঞানান্বেষণ।—সগির।

৫০০. জ্ঞান অন্বেষণ কর যদিও তা চীন দেশে থাকে।—মিসবাহোশ্শারিয়ত।

৫০১. যে জ্ঞানান্বেষণ করে সে পুরস্কৃত হয়, কারণ এ তার দোষগুলোকে গোপন রাখে।

৫০২. যে জ্ঞানান্বেষণ করে, সে আল্লাহ্কে অন্বেষণ করে।—সগির।

৫০৩. জ্ঞানান্বেষণ আল্লাহ্র কাছে নামাজ, রোজা, হজ্ ও জেহাদ অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যজনক।—সগির।

৫০৪. যে ব্যক্তি ইসলামকে জীবন্ত করার জন্য জ্ঞানান্বেষণে মৃত্যুবরণ করে সে নিশ্চয়ই বেহশ্তে পয়গম্বরদের একধাপ নীচে থাকবে।—মিশকাত।

৫০৫. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্তা'লা আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছেন যে, যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে পথ চলে আমি তার জন্য বেহশ্তের পথ সহজ করে দিই এবং যাকে আমি (অত্যধিক জ্ঞানানুশীলনের জন্য) অন্ধ করি, আমি তার দুই চক্ষুর পরিবর্তে বেহশ্ত দান করি এবং অত্যধিক উপাসনা অপেক্ষা অত্যধিক জ্ঞানান্বেষণ উৎকৃষ্টতর এবং আল্লাহ্তা'লাকে ভয় করাই ধর্মের মূল।—বয়হাকী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৫০৬. যে ব্যক্তি জ্ঞান-অন্বেষণের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করে, আল্লাহ্তা'লা তার জন্য বেহেশ্তের পথ সহজ করে দেন এবং মানুষ যখন আল্লাহ্র কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহ্র গ্রন্থ পাঠ করে এবং তার ব্যাখ্যা বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে তখন তাদের ওপর করুণা ও শান্তি বর্ষিত হয় এবং ফেরেশতারা চারদিক দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানায় এবং আল্লাহ্ তাঁর কাছে অবস্থানকারী ফেরেশ্তাদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন। যে ব্যক্তি (জ্ঞানান্বেষণের) কাজে অমনোযোগী, বংশমর্যাদা তার কোন কাজে আসে না।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫০৭. যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণে বহির্গত হয়, (স্বগৃহে) প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সে আল্লাহ্র পথে থাকে।—তির। মিশ্। দারেমী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৫০৮. জ্ঞান-অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ (অবশ্য কর্তব্য)। এবং যে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে জ্ঞান দান করে সে শূকরের গলায় পদ্মরাগমণি, স্বর্ণ বা মুক্তামাল্য স্থাপন করে।—মিশ। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৫০৯. সমস্ত মানুষ সোনা-রূপার বিভিন্ন খনির মত—যারা জ্ঞানী অন্ধকার যুগেও তারা উত্তম ঐসলামিক যুগেও তারা উত্তম।—মিশ। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫১০. যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয় তার অতীত পাপ মার্জনা করা হয়।—তির। মিশ্।

৫১১. শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।—চেহেল হাদীস।

৫১২. শৈশবে জ্ঞানার্জন করা প্রস্তরে খোদাই করা লিপির তুল্য, আর বার্ধক্যে জ্ঞানার্জন করা পানির ওপর অংকনের তুল্য।—সগির।

৫১৩. বিদ্যা ও অর্থ সমস্ত দোষ অপহারক এবং অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য সমস্ত দোষ প্রকাশক।—সগির।

৫১৪. জ্ঞান হল সত্যকার মুসলমানদের বন্ধু, বুদ্ধি তার সহচর, কর্ম তার পথ প্রদর্শক, অধ্যবসায় তার মন্ত্রী, সহিষ্ণুতা তার সেনাপতি, বিনয় তার সন্তান এবং ভদ্রতা তার সহোদর।—সগির।

৫১৫. পরিমিত ব্যয় অর্ধেক পাথেয়, মানুষকে ভালবাসা অর্ধেক বুদ্ধির পরিচয়—এবং উত্তম প্রশ্ন অর্ধেক জ্ঞান।

৫১৬. জ্ঞান হল রত্নাগার এবং প্রশ্ন তার চাবি।—সগির।

৫১৭. হজরত আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন—জিলহজ্জ্ মাসের দশ তারিখ কোরবানীর দিন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মিনার ময়দানে আপন উটের পিঠে বসে ভাষণ দিচ্ছিলেন; আমি তাঁর উটের লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন: আজকের দিনটা কোন দিন? নবী (সঃ)-এর এ প্রশ্ন শুনে আমরা সবাই নীরব নিস্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগলাম, বোধহয় এই দিনের প্রচলিত প্রসিদ্ধ নাম 'ইয়াওমুন্নহর' (কোরবানীর দিন) বদলে দিয়ে তিনি অন্য কোন নাম রাখবেন। তাই আমরা মূলপ্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললাম: আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূল সবচেয়ে ভাল জানেন। তখন নবী (সঃ) বললেন: এদিনটা পবিত্র ইয়াওমুননহর নয় কি? আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম: হাঁ,—এ পবিত্র ইয়াওমুন্নহর। তারপর নবী (সঃ) আবার জিজ্ঞাসা করলেন: এ মাসটা কোন মাস? আমরা সবাই পূর্ব-বৎ নীরব নিস্তব্ধ রইলাম এবং মনে মনে ভাবতে লাগলাম—বোধ হয় নবী (সঃ) এ মাসের প্রচলিত নাম পরিবর্তন করে দেবেন। তাই আমরা এবারেও বললাম: আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন। তখন নবী (সঃ) বললেন: এটা পবিত্র জিলহজ্জ্ মাস নয় কি? আমরা সমস্বরে বললাম: হাঁ, এ সেই পবিত্র মহান জিলহজ্জ্ মাস। তৃতীয় বার নবী (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন: এ কোন্ এলাকা? এবারেও আমরা পূর্বের মত ভাবলাম এবং কিছুক্ষণ নীরব থেকে পূর্ববৎ নিবেদন করলাম। তখন নবী (সঃ) নিজেই বললেন: এ পবিত্র হেরেম শরীফ নয় কি? আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম: হাঁ হাঁ এ সেই পবিত্র হেরেম শরীফ এলাকা। এইভাবে শ্রোতৃবর্গের মনকে (নানা প্রশ্নের মাধ্যমে) পূর্ণরূপে আকর্ষণ করে এবং তাদের হৃদয়ে একাগ্রতা ও পূর্ণ শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে নবী (সঃ) উচ্চৈঃস্বরে বললেন: তোমরা সবাই একাগ্রচিত্তে শুনে মানসপটে অঙ্কিত করে জেনে রেখো—তোমাদের রক্ত, তোমাদের জান, তোমাদের মান, তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের গাত্রচর্ম যেভাবে আজকের এই মহান ইয়াওমুন্নহর-এর দিনে, এ পবিত্র জিলহজ্জ্ মাসে, এই পবিত্র হেরেম শরীফে হারাম—সুরক্ষিত ও অস্পর্শিত, ঠিক এমনিভাবে সর্বদিনে সর্বমাসে ও সর্বস্থানে হারাম এবং সুরক্ষিত গণ্য হবে। অচিরেই তোমারা আল্লাহ্র দরবারে হাজির হবে; আল্লাহ্ তোমাদের সমুদয় কাজকর্মের হিসাব নেবেন।

ভাষণ-শেষে নবী (সঃ) শ্রোতৃবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই মহান মূল নীতিটি তোমাদের পেঁছে দিলাম তো ? একবাক্যে সকলেই স্বীকার করল— হাঁ, হাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ হে খোদা ! এই স্বীকারোক্তির ওপর সাক্ষী থেকো। তারপর নবী (সঃ) আরো বললেন ঃ এই মহান মূলনীতি যারা আমার কাছে উপস্থিত থেকে শুনেছে তারা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের একে অন্যকে, তারপর পরস্পর, কেয়ামত পর্যন্ত শুনিয়ে জানিয়ে শিক্ষা দিতে বাধ্য-থাকবে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে এমন হবে যে আমার বাণী মূল শ্রোতা অপেক্ষা তার (অর্থাৎ শ্রোতার) শিষ্যরা অধিক সংরক্ষণ ও কার্যকরী করতে এবং অধিক স্মরণ রাখতে সমর্থ হবে। [প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে আগ্রহ সৃষ্টি করে শিক্ষা বা জ্ঞান দান করা, শিক্ষাকে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে গণশিক্ষায় রূপান্তরিত করা এবং শিক্ষাদানকর্মকে প্রত্যেক শিক্ষিত বা জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক করা এই হাদীসের লক্ষ্য।]—বুখারী।

৫১৮. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের (মনের অবস্থার) দিকে লক্ষ্য রেখে কতকগুলো নির্দিষ্ট দিনে উপদেশ দিতেন ; পাছে আমাদের বিরক্তি ধরে এই আশঙ্কায়। [সুদূর অতীতের এই শিক্ষাদান-কর্মে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের মূল নীতির প্রকাশ কি সবিস্ময়ে লক্ষ্যণীয় নয় ?]—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইবনে মসউদ (রাঃ)।

৫১৯. (শিক্ষা বা জ্ঞান দানের জন্য) সহজ পথ ধর, কড়াকড়ি করো না ; সুসংবাদ দাও (খোদার রহমতের)—(ভয় দেখিয়ে) তাড়িয়ে দিও না।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৫২০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ কেয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে কয়েকটা এই—জ্ঞান হ্রাস পাবে, অজ্ঞতা জমাট হবে, মদ পান করা হবে, ব্যভিচার ব্যাপক হবে এবং স্ত্রীলোক বৃদ্ধি পাবে পুরুষ কমবে, এমনকি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের কর্তা হবে একজন পুরুষ।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৫২১. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ বান্দার মন থেকে জ্ঞান বের করে নিয়ে খোদা জ্ঞান তুলে নেবেন না, বরং আলেম অর্থাৎ জ্ঞানীদের মৃত্যুর মাধ্যমে তা তুলে নেবেন। অবশেষে যখন কোন জ্ঞানী আর থাকবে না, তখন লোকে মূর্খদের নেতা বলে বরণ করে নেবে। তাদের কাছে ধর্মের বিধান জিজ্ঞাসা করবে, আর তারা না জেনেই (সে) বিধান দেবে। তারা নিজেরা পথ হারাবে এবং অন্যদের পথহারা করবে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)।

৫২২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ মূসা নবী বনি ইসরাইলদের মধ্যে ভাষণ দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে জ্ঞানী ?' তিনি বললেন, 'আমিই সবচেয়ে জ্ঞানী !' তাঁর জ্ঞানকে খোদার ওপর ন্যস্ত না (করে অহঙ্কার) করার দরুন খোদা তাঁকে তিরস্কার করলেন। তারপর খোদা তাঁকে আকাশবাণী (অহী) মারফৎ জানালেন, 'দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে আমার এক বান্দা আছে, সে তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী।' মূসা বললেন, 'প্রভু আমার, আমি কিভাবে তাঁর সাথে মিলিত হব ?' তাঁকে বলা হল, 'তোমার থলিতে একটা মাছ রাখ। যেখানে তুমি ঐ মাছ হারাবে সেখানেই সে (আছে)।' তখন তিনি থলিতে একটা মাছ এবং অনুচর য়ুশফ ইবনে নূনকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলেন। অবশেষে তাঁরা এক খণ্ড বড় পাথরের চাতানের কাছে এসে হাজির হলেন এবং সটান শুয়ে ঘুমুলেন। মাছটা থলি থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে সুড়ঙ্গ করে সোজা

পথ ধরল। মূসা ও তাঁর অনুচরের কাছে এ ছিল এক আশ্চর্য ব্যাপার। তারপর তাঁরা দিনের বাকি অংশ এবং সারা রাত (আবার) চললেন। পরদিন ভোরে মূসা তাঁর অনুচরকে বললেন, 'ভ্রমণে আমরা বড় ক্লান্ত হয়েছি ; নাশ্‌তো (খাবার) আন তো!' (অবশ্য) যে স্থানের কথা মূসাকে বলা হয়েছিল সেই স্থান অতিক্রম করার পূর্বে মূসা কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করেন নি। তাঁর অনুচর বলল : 'দেখুন যখন আমরা পাথরের চাতানে আশ্রয় নিয়েছিলাম, আমি মাছের (হারিয়ে যাবার) কথা বলতে ভুলে গিয়েছি।' মূসা বললেন, 'ঐ স্থানই তো আমরা চাইছিলাম।' তারপর উভয়ে (তাঁদের) নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে এলেন। যখন তাঁরা ঐ পাথরের চাতানে পৌঁছুলেন, দেখলেন একজন লোক (খিজির) কাপড় মুড়ি দিয়ে আছেন। মূসা সালাম করলেন। খিজির বললেন, 'এ দেশে সালাম কোথা?' (অর্থাৎ এখানে সালামের রীতি নেই ; তুমি কে?) মূসা বললেন, 'আমি মূসা।' খিজির বললেন, 'বনি ইসরাইলের মূসা?' মূসা বললেন, 'হাঁ।' তিনি (মূসা) আরো বললেন, 'আল্লাহ্ আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তার কিছু আপনি আমাকে শেখাবেন—এই উদ্দেশ্যে কি আমি আপনার অনুসরণ করব?' তিনি (খিজির) বললেন, 'তুমি কখনই আমার সাথে ধৈর্য রাখতে পারবে না। হে মূসা, খোদা আমাকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জান না ; আর খোদা তোমাকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা আমি জানি না।' মূসা বললেন, 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে পাবেন এবং কোন ব্যাপারে আমি আপনার অবাধ্যতা করব না।' তখন তাঁরা দুজনে সমুদ্রের ধার দিয়ে চললেন। তাঁদের কোন নৌকা ছিল না। এই সময় তাঁদের কাছ দিয়ে একখানা নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা নৌকার লোকদের তাঁদের তুলে নিতে বললেন। খিজির পরিচিত থাকায় তারা বিনা ভাড়ায় তাদের তুলে নিলেন। তারপর এক চড়ুই এসে নৌকার কিনারায় বসল এবং একবার কি দুবার সমুদ্রে ঠোঁট ডুবাল। তখন খিজির বললেন, 'হে মূসা, তোমার ও আমার জ্ঞান খোদার জ্ঞানের কাছে সমুদ্রের সামনে ঐ চড়ুই-এর ঠোঁটের পানির চেয়েও সামান্য।' (এরপর) খিজির নৌকার একখানা তক্তার দিকে গেলেন এবং তা খুলে ফেললেন। মূসা বললেন, 'এরা বিনা ভাড়ায় আমাদের তুলে নিল আর আপনি গিয়ে এদের নৌকায় ছিদ্র করে দিলেন ; ফলে এদের লোকজনেদের ডুবিয়ে দেবেন।' তিনি বললেন, 'আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবে না?' মূসা বললেন, 'আমার ভুলের জন্য দোষ ধরবেন না এবং আমার প্রতি এই ব্যাপারে (প্রতিবাদে) বেশী কঠোর হবেন না।' এই প্রথম ব্যাপারটা মূসার ভুল বলে গণ্য হল। তাঁরা আবার চললেন। দেখলেন, এক বালক আর-এক-বালকের সাথে খেলা করছে। খিজির হাত দিয়ে তার মাথার ওপরের দিক ধরলেন এবং তা (তার দেহ থেকে) বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। মূসা বললেন, 'হত্যার বিনিময় ব্যতীতই আপনি একটা নির্দোষ জীবকে হত্যা করলেন!' তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাকে বলিনি যে তুমি আমার সাথে ধৈর্য রাখতে পারবে না?' তাঁরা আবার চলতে লাগলেন এবং অবশেষে এক গ্রামে এসে পৌঁছলেন। গ্রামবাসীদের কাছে তাঁরা খাদ্য চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের আতিথ্য করতে অস্বীকার করল। সেখানে তাঁরা একটা দেওয়াল পড়ে যেতে দেখলেন। খিজির হাত দিয়ে ইশারা করে সোজা খাড়া করে দিলেন। মূসা বললেন, 'আপনি ইচ্ছা করলে তো এর জন্যে মজুরী নিতে পারতেন।' তিনি (খিজির) বললেন, 'এই আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন : খোদা মূসার মঙ্গল করুন ; যদি তিনি ধৈর্য

ধরতেন তাহলে কি ভালই না হত ; আর খোদা আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন এই দুজনের আরো ঘটনা। [যথার্থ জ্ঞানার্জনের জন্য ধৈর্য, অহংকারশূন্যতা এবং শিক্ষক বা ওস্তাদকে শ্রদ্ধাসহকারে যথাযথভাবে অনুসরণ অবশ্য প্রয়োজন।]—বুখারী।

৫২৩. মূর্খতা অপেক্ষা বড় দারিদ্র্য আর নেই। —সগির।

৫২৪. আক্ষেপ তার জন্য যে জানে না এবং তার জন্য যে জানে অথচ করে না।—সগির।

৫২৫. যে জ্ঞানী মানুষকে সদুপদেশ দেয় অথচ নিজে তা পালন করে না সে সেই প্রদীপের তুল্য যা মানুষকে আলো দান করে কিন্তু আপন আত্মাকে দগ্ধীভূত করে।—সগির।

৫২৬. 'উত্তম জ্ঞানী কারা ?' তিনি (রসূলুল্লাহ্ সঃ) বললেন, 'যারা পালন করে যা তারা জানে।'—মিশকাত।

৫২৭. রোজ কিয়ামতে সেই ব্যক্তি জ্ঞানীর শ্রেণীতে সর্বাপেক্ষা অধম যে তার জ্ঞান দ্বারা কোন উপকার লাভ করে নি।—মিশকাত।

৫২৮. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে এক ব্যক্তি অসৎ লোকদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন ঃ আমাকে অসৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর না বরং সৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। তিনবার একথা বলার পর তিনি বললেন ঃ জেনো, শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা অসৎ, মানুষের মধ্যে তারাই সর্বাপেক্ষা অধম এবং শিক্ষিতদের মধ্যে যারা সৎ তারাই সর্বাপেক্ষা উত্তম।—মিশকাত।

৫২৯. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পরিবর্তে পার্থিব ভোগ বিলাস লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করে, পরকালে কখনো সে বেহেশ্তের সৌরভ লাভ করবে না।—আঃ দাউদ। ই. মাজা। মিশ্। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৩০. সন্তানকে আদবকায়দা শিক্ষা দেওয়া ভিক্ষুককে একবস্তা আটা দান করা অপেক্ষা অধিক পুণ্যজনক।—তিরমিজী।

৫৩১. যে জ্ঞান দ্বারা কোন উপকার হয়নি তা সেই রত্নাগারের তুল্য যা থেকে খোদার পথে কিছুই ব্যয়িত হয়নি।—মিশকাত।

৫৩২. রাত্রিকালে এক ঘণ্টা জ্ঞানানুশীলন করা সমস্ত রাত্রি জেগে উপাসনা করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।—মিশকাত।

৫৩৩. খোদার সৃষ্টি সম্বন্ধে নিবিষ্ট মনে এক ঘণ্টা চিন্তা করা সত্তর বৎসরের উপাসনা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

৫৩৪. জিব্রাইলের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মানুষের নেতা কে ? তিনি বললেন—বুদ্ধি।—সগির।

৫৩৫. মানুষের পরিচয় তার বুদ্ধির পরিমাপ হিসেবে ; যার বুদ্ধি নেই, তার ধর্ম নেই।—বয়হাকী।

৫৩৬. জ্ঞান অর্জন কর, কারণ যে ব্যক্তি খোদার পথে জ্ঞান অর্জন করে সে পুণ্য কাজ করে ; যে সে বিষয়ে আলোচনা করে সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে এবং যে তা অন্বেষণ করে সে আল্লাহ্র উপাসনা করে এবং যে তা শিক্ষা দেয় সে দান করে, এবং যে তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করে সে আল্লাহ্র উপাসনা করে, জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ কল্যাণ ও মহত্ত্বের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে এবং ইহলোকে নৃপতিদের

সাহচর্য ও পরলোকে পরিপূর্ণ সুখ লাভ করে ; জ্ঞান অর্জন কর, এ তার অধিকারীকে অন্যায় থেকে ন্যায়কে পৃথক করতে সমর্থ করে ; এ বেহেশ্‌তের পথ আলোকিত করে। মরুভূমিতে এ বন্ধু সদৃশ, নির্জনে এ আমাদের সঙ্গী, বন্ধুহীন অবস্থায় এ আমাদের সহচর ; এ আমাদের সুখের দিকে পরিচালিত করে এবং দুঃখে আমাদের জীবিত রাখে, বন্ধুদের মধ্যে এ আমাদের অলংকার স্বরূপ এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে বর্ম।—জামেয়ে আখবার।

৫৩৭. বৃদ্ধ ব্যক্তি রুটি খেতে যেমন লজ্জাবোধ করে না, জ্ঞান অর্জন করতেও তেমনি লজ্জা বোধ করবে না।—সগির।

৫৩৮. যে ব্যক্তি ৪০ দিনের মধ্যে কোন শিক্ষিত সমাজে বসে না নিশ্চয়ই তার হৃদয় কঠিন হয়েছে এবং সে মৃত হয়েছে। কারণ জ্ঞান হৃদয়ের জীবন ও জ্যোতিঃ। মাটির তলায় লোহা থাকলে তাতে যেমন মরিচা ধরে, জ্ঞানহীন ব্যক্তির হৃদয়েও তেমন মরিচা ধরে। জিজ্ঞাসা করা হল ঃ কি করলে হৃদয়ের মরিচা দূর হয় ? তিনি (রসূলুল্লাহ্ সঃ) বললেন ঃ জ্ঞানীদের সমাজে উপবেশন।—ওসিয়াতুন্নবী।

৫৩৯. যে ব্যক্তি বিদ্যাকে জীবন দান করে তার কখনো মৃত্যু হয়না।—বর্ণনায় ঃ হজরত আলী (রাঃ)।

৫৪০. জ্ঞানকে সুদৃঢ় কর, তার অনুসরণ কর এবং তার অবাধ্য হয়ো না নতুবা পরিণামে অনুতপ্ত হবে।—সগির।

৫৪১. অনেক উপাসক মূর্খ এবং অনেক জ্ঞানী কুকর্মশীল হয়, অতএব মূর্খ উপাসক এবং অসৎ জ্ঞানীকে পরিত্যাগ কর।—সগির।

৫৪২. মনে রেখো, আমার অনুবর্তীদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরাই উৎকৃষ্ট এবং জ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা দয়ালু তাঁরাই সর্বোৎকৃষ্ট। আল্লাহ্‌তা'লা মূর্খের একটা পাপ মাফ করার পূর্বে জ্ঞানীর ৪০টা পাপ মাফ করেন।—সগির।

৫৪৩. জ্ঞানীদের অনুসরণ কর, কারণ তাঁরা ইহকালের প্রদীপ এবং পরকালের বাতি।—সগির।

৫৪৪. আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে জ্ঞান আহরণ করা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা অধিক পুণ্যজনক।—সগির।

৫৪৫. জ্ঞানের একটা বাক্য জ্ঞানীর হারানো পশুর সমান ; যেখানেই পাওয়া যায় সেখানেই তা তার গ্রহণ করার অধিকার আছে।—তির। ই. মাজা।

৫৪৬. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন প্রথম যে ব্যক্তির বিচার হবে সে একজন শহীদ। তাকে হাজির করা হবে এবং আল্লাহ্ তাকে আপন নেআ'মত (দান) স্মরণ করিয়ে দেবেন, আর সেও তা স্মরণ করবে। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তুমি এ দানের বিনিময়ে (দুনিয়ায়) কি কাজ করেছ ? সে উত্তর করবে ঃ আপনার (সন্তুষ্টির) জন্য আমি যুদ্ধ করেছি, এমন কি আমি শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছ ; তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করনি, বরং যুদ্ধ করেছ যাতে তোমাকে 'বীর পুরুষ' বলা হয় সে জন্যে—আর তা বলা হয়েছে। তারপর তার সম্বন্ধে আদেশ দেওয়া হবে। সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে নরকে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে জ্ঞান বা বিদ্যাশিক্ষা করেছে ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কোরআন পড়েছে (ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছে)—তাকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির

করা হবে। আল্লাহ্ প্রথমে তাকে আপন দানের (কথা) স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সে তা স্মরণ করবে। তখন আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন: তুমি এ সকল দানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কি করেছ? সে উত্তর দেবে: আমি জ্ঞান শিক্ষা করেছি ও তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনাকে খুশী করার জন্য কোরআন পড়েছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ: তুমি জ্ঞান শিক্ষা করেছ যাতে তোমাকে জ্ঞানী (আলেম) বলা হয় (সেজন্যে), আর কোরআন পড়েছ যাতে তোমাকে কারী (বিশুদ্ধ পাঠকারী) বলা হয় সেজন্যে; আর তা তোমায় বলাও হয়েছে। তারপর (ফেরেশতাদের) আদেশ দেওয়া হবে, সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে নরকে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি আল্লাহ্ যার রেজেক প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং সমস্ত রকমের ধন তাকে দান করেছিলেন। তাকে আল্লার দরবারে হাজির করা হবে; আল্লাহ্ তাকে আপন দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন, সেও তা স্মরণ করবে। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন: তুমি এ সবের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কি করেছ? উত্তরে সে বলবে: এমন কোন পথ বাকি ছিল না যে পথে দান করলে আপনি খুশী হবেন আর আপনার খুশীর জন্যে আমি (সেপথে) দান করিনি। তখন আল্লাহ্ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ; তুমি দান করেছিলে যাতে তোমাকে দাতা বলা হয় সেই উদ্দেশ্যে, আর (তোমাকে) তা বলাও হয়েছে। তারপর (ফেরেশতাদের) আদেশ করা হবে; সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে নরকে নিক্ষেপ করা হবে। [উদ্দেশ্য খারাপ হলে ভাল কাজেরও খারাপ ফল হয়] —মুসলিম। বর্ণনায়: আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৪৭. যে ব্যক্তি জ্ঞানীদের সাথে তর্ক, মূর্খদের সাথে বাক্‌বিতণ্ডা এবং মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান শিক্ষা করেছে—আল্লাহ্ তাকে নরকে নিক্ষেপ করবেন। —তিরমিজী। মিশকাত। বর্ণনায়: কা'ব বিন মালেক (রাঃ)।

৫৪৮. (আমার মৃত্যুর পর) মানুষ তোমাদের অনুসরণকারী হবে। পৃথিবীর চার প্রান্ত থেকে মানুষ তোমাদের কাছে ধর্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আগমন করবে। যখন তারা তোমাদের কাছে আসবে—সদুপদেশ (অর্থাৎ সৎ শিক্ষা) দিও। —তির। মিশ। বর্ণনায়: আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

৫৪৯. হজরত কাসির বিন কায়েস (তাবেঈ) বলেন: (একদিন) আমি দামেস্কের মসজিদে হজরত আবুদ্দরদা সাহাবীর সাথে বসে আছি, এমন সময় তাঁর কাছে একজন লোক এসে পেঁছুলো এবং বলল: হে আবুদ্দরদা! আমি সুদূর মদীনাতুন্নবী থেকে আপনার কাছে শুধু একটা হাদীসের জন্য ছুটে এসেছি, এছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে নয়। তখন হজরত আবুদ্দরদা (রাঃ) বললেন: আমি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)কে বলতে শুনেছি—"যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে কোন পথে চলতে শুরু করে সেই পথের সাহায্যে আল্লাহ্ তাকে বেহেশতের বহু সংখ্যক পথের মধ্যে একটা পথে পেঁাছে দেন আর ফেরেশতারা জ্ঞানান্বেষণকারীদের সন্তুষ্টির জন্য (সেইপথে) নিজেদের ডানা পেতে দেন।" ··[এরপর ৪৯০ সংখ্যক হাদীস দেখুন।] —আহ্‌মদ। তির। আ. দাউদ। ই. মাজা। দারেমী।

৫৫০. যে ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সে আশীর্বাদপ্রাপ্ত, কারণ লোকে যদি তার কাছে যাওয়া আবশ্যক মনে করে তবে সে ওর প্রশ্নের সমাধান করে এবং যদি তার কাছে প্রয়োজন না থাকে তবে সে নিজের আত্মার উন্নতি সাধন করে। —মিশকাত।

৫৫১. যে ব্যক্তি বিদ্যা ও বিদ্বানদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে সে আল্লাহ্ কর্তৃক অনুগৃহীত হয়।

৫৫২. যদি মানুষ হজরত নূহের মত চার হাজার বছরও উপাসনা করে তবু তা তার কোন কাজে আসবে না, যদি তার মধ্যে তিনটে গুণ না থাকে—জ্ঞানান্বেষণ, মিতব্যয়িতা এবং পাপ থেকে সংযম।—ওসিয়াতুন্নবী।

৫৫৩. রোগীর সেবার জন্য এক মাইল যাও, দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ-মীমাংসার জন্য দু মাইল যাও, তোমার মুসলমান ভায়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তিন মাইল যাও এবং জ্ঞানের একটা কথা শিক্ষার জন্য ছ মাইল যাও। (এখানে মাইল বিষয়ের গুরুত্ব জ্ঞাপক)।—ওসিয়াতুন্নবী।

দন্তমার্জন (মেস্ওয়াক)

[রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত দন্তমার্জনকে পছন্দ করেছেন। অজুর পূর্বে দন্ত মার্জন করা বা দাঁত মাজা সুন্নত।]

৫৫৪. দন্তমার্জন মৃত্যু ব্যতীত সমস্ত রোগের প্রতিষেধক।—সগির।

৫৫৫. দন্তমার্জন হল মুখকে পরিষ্কার করা এবং আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করার পথ।—বুখারী। নাসায়ী। মিশ। +৩জন। বর্ণনায়ঃ হজরত আয়েশা (রাঃ)।

৫৫৬. দশটি স্বভাবসিদ্ধ কর্তব্য আছে—গোঁফ ছোট করা, দাড়ি দীর্ঘ করা, দন্ত মার্জন করা, নাসিকা পরিষ্কার করা, নখ কাটা, নখের অভ্যন্তরভাগ ধৌত করা, নাভির নিম্নের কেশ মুণ্ডন করা এবং মল ত্যাগের পর ও মূত্র ত্যাগের পর পানি দ্বারা পরিষ্কার করা। বর্ণনাকারিণী বলেনঃ দশমটি আমি ভুলে গেছি—সেটা কুল্লি করা হতে পারে।—মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৫৫৭. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) রাত্রে বা দিনে শয্যায় নিদ্রা যেতেন, নিদ্রা থেকে জেগে অজু করার পূর্বে দন্তমার্জন করতেন।—আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৫৫৮. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) রাত্রিতে যখন তাহাজ্জদ নামাজ পড়তে উঠতেন, দাঁতন দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করতেন।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ হোজায়ফা (রাঃ)।

৫৫৯. আমি হজরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ঘরে ফিরে প্রথম কি কাজ করতেন?' তিনি বললেন, 'দাঁতন দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করতেন।' —মুসলিম। বর্ণনায়ঃ শোরাইহ্ (রাঃ)।

৫৬০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ আমার উম্মতদের যদি কষ্ট না হত তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাদের এশার নামাজ বিলম্ব করে পড়তে এবং প্রত্যেক নামাজের পূর্বে দন্ত মার্জন করতে নির্দেশ দিতাম।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৬১. যদি আমার উম্মতদের পক্ষে অসুবিধাজনক হওয়ার আশংকা না

করতাম তবে প্রতিবারে নামাজ পালনের পূর্বে তাদের আমি দন্তমার্জন করতে আদেশ দিতাম। —বুখারী। শায়খান। তির। ই. মাজা। মালেক। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৬২. দন্তমার্জন সম্বন্ধে আমি তোমাদের অনেক উপদেশ দিয়েছি। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৫৬৩. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) দন্তমার্জন করার পর দাঁতন ধৌত করার জন্য আমাকে দিতেন। তা নিয়ে আমি আমার দন্তমার্জন করতাম। তারপর তা ধৌত করে তাঁকে দিতাম।—আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৫৬৪. আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। (তখন) দাঁতনের একাংশ তাঁর মুখের মধ্যে ছিল।—মুস।

দয়া

'আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া তাতো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা (দয়া) তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা সাবধান হয়, জাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস করে।' ৭ (১৫৬)

'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক দয়াদ্র', পরম দয়ালু।' ১৬ (৭৬)

—আল্-কোরআন।

৫৬৫. আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টিকার্য সম্পূর্ণ করে আরশের ওপর তাঁর নিকটবর্তী পুস্তকে লিখলেন, 'নিশ্চয় আমার দয়া আমার ক্রোধকে পরাজিত করে।' —শায়খান।

৫৬৬. যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহ্ও তাকে দয়া করেন না। —বুখারী। শায়খান। তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ জারির বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)।

৫৬৭. যে দয়াগুণে বঞ্চিত, সে সর্ব প্রকার মঙ্গল থেকে বঞ্চিত।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ জারির (রাঃ)।

৫৬৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দয়ালু, তিনি দয়া ভালবাসেন। তিনি দয়ালুকে যা দান করেন, নির্দয়কে তা দান করেন না বা তাকে ছাড়া অন্য কাউকেও তা দান করেন না। অন্য বর্ণনায় ঃ তিনি হজরত আয়েশাকে বললেন ঃ দয়া গুণ গ্রহণ কর, কঠোরতা এবং অশ্লীলতা পরিত্যাগ কর। যার মধ্যে দয়া নেই তাকে এ অপমান করে, যার মধ্যে দয়া আছে তাকে এ সম্মানিত করে।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৫৬৯. পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি সদয় হও—আকাশের অধিবাসিগণও তোমাদের প্রতি সদয় হবেন। আ. দাউদ। তিরমিজী।

৫৭০. সমস্ত সৃষ্ট জীব আল্লাহ্ তা'লার পরিজন এবং সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্-তা'লার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় যে তাঁর (আল্লাহ্র) সৃষ্ট জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে।—বয়হাকী।

৫৭১. সে আমাদের কেউ নয়, যে কনিষ্ঠদের প্রতি সদয় হয় না, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করেনা, সৎকার্যের আদেশ দেয় না এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে না। —তিরমিজী।

৫৭২. আল্লাহ্ প্রতিটি সৃষ্টির সঙ্গে তার পরাজয়কারীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাঁর দয়াকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ক্রোধকে পরাজিত করার জন্যে। —সগির।

৫৭৩. দয়াময় আল্লাহ্ দয়ালু লোকদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি দয়ালু হও। তাহলে আকাশে যারা আছে তারাও তোমাদের প্রতি দয়ালু হবে। —তির। আ. দাউদ। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ)।

দরিদ্র এবং দারিদ্র্য

'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা ভাল এবং যদি গোপনে তা কর এবং দরিদ্রকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো ভালো। এবং এতে তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করবেন, বস্তুতঃ তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা অবহিত।' ২ (২৭১)

—আল্-কোরআন।

৫৭৪. আবুজর (রাঃ) বলেন, আমার বন্ধু (অর্থাৎ রসুলুল্লাহ সঃ) আমাদের ৭টা কাজ করার আদেশ দিয়েছেন ঃ ১) দরিদ্রদের ভালবাসতে ও তাদের সাথী হতে, ২) যে ব্যক্তি আমার চেয়ে নিম্নশ্রেণীর তার দিকে দৃষ্টিপাত করতে এবং যে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ (বা উচ্চ) তার দিকে দৃষ্টিপাত না করতে ; ৩) আত্মীয়ের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতে, যদিও সে আমার প্রতি অমনোযোগী ; ৪) কারো কাছ থেকে কোন জিনিস না চাইতে ; ৫) তিক্ত বা অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলতে, ৬) আল্লাহ্ সম্বন্ধে নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করতে এবং ৭) আল্লাহ্ ছাড়া (পুণ্য কাজ করবার আর কোন) শক্তি (এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবার) শক্তি নেই—এই কথা অধিকবার বলতে, কেননা নিঃসন্দেহে তা আরশের নীচে রত্নাগার। —মিশকাত।

৫৭৫. পৃথিবীতে দারিদ্র্যই মুসলমানদের জন্য উপহার।—মিশকাত। দায়লমী।

৫৭৬. আমি বেহেশ্তে নীত হলাম ; সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী রূপে দরিদ্রদেরই দেখতে পেলাম এবং দোজখে নীত হলাম সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী-রূপে নারীদেরই দেখতে পেলাম। —শায়খান।

৫৭৭. দারিদ্র্য মানুষের কাছে হেয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে প্রশংসনীয়। —সগির।

৫৭৮. দরিদ্রদের মধ্যে আমাকে সন্ধান কর, কারণ তাদের জন্য তোমাদের সাহায্য দান করা হয়। [দরিদ্ররাই আহার্য উৎপাদন করে।]—আ. দাউদ। তির। নাসায়ী।

৫৭৮. (ক) দরিদ্ররা ধনীদের রুমাল, তারা ওর দ্বারা তাদের পাপ মুছে ফেলবে।—সগির। [অর্থাৎ দরিদ্রের সাহায্য করলে ধনীদের পাপ মুছে যাবে।]

৫৭৯. হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ হজরতের জীবদ্দশায় তাঁর পরিজনগণের মধ্যে কেউই পর পর দুদিন পেট ভরে আটার রুটি আহার করেননি।—শায়খান।

৫৮০. আবু তালহা বলেন ঃ আমরা রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে আমাদের ক্ষুধার জন্য অনুযোগ করলাম এবং আমাদের পেটে যে পাথর বেঁধে রেখেছিলাম তা বের করে দেখলাম। তখন রসুলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর পেটে যে পাথর দুটি বেঁধে রেখেছিলেন তা বের করলেন।

৫৮১. নবী (সঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য মক্কার পাথরগুলোকে সোনায় পরিণত করে দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমি বললাম—না প্রভো, বরং আমি একদিন তৃপ্তিভরে আহার করব অন্যদিনে ক্ষুধার্ত থাকব; যখন ক্ষুধার্ত থাকব তখন তোমার কাছে প্রার্থনা করব এবং তোমার উপাসনা করব—আর যখন আহার করব তখন তোমার প্রশংসা ও শোকর করব।—তির।

৫৮২. একজন লোক রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমি আপনাকে ভালবাসি।' তিনি বললেন, 'তুমি যা বলছ সে বিষয়ে ভেবে দেখ।' সে বলল, 'আল্লাহ্র শপথ, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ভালবাসি।' তিনবার সে ঐ কথা বলল। তিনি বললেন, 'যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে নিজেকে দরিদ্ররূপে গণ্য কর;—কারণ আমাকে যে ভালবাসে, নদী যেমন দ্রুতবেগে সাগরের দিকে অগ্রসর হয় দারিদ্র্য তার কাছে তার চেয়েও দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়।'—তিরমিজী।

৫৮৩. 'হে আল্লাহ্! দরিদ্ররূপে আমাকে বাঁচতে দাও, দরিদ্ররূপে আমাকে মরতে দাও এবং দরিদ্রদের সঙ্গে আমাকে পুনরুত্থিত কর।' তারপর হজরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'হে রসুলুল্লাহ্! কেন?' তিনি বললেন, 'কারণ তারা ধনীদের চল্লিশ বৎসর পূর্বে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা! দরিদ্রদের শূন্যহাতে বিদায় করোনা—যদিও তা আধখানা খোরমা হয়। হে আয়েশা! দরিদ্রদের ভালবাস এবং তাদের সহচরী হও—আল্লাহ্ তোমার সঙ্গী হবেন।'—তির। ই. মাজা। বয়হাকী।

৫৮৪. ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর গায়ে একখানা মাত্র চাদর এবং ঘরে একখানা মাত্র শয্যাহীন খাট ও তার ওপর খেজুর-ছালে-ভরা একখানা মাত্র বালিশ দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলাম। ঘরের এক কোণে এক পাত্রে সামান্য কিছু আটা, অপর কোণে বিস্তৃত একখানা পশুচর্ম এবং তাঁর মাথার ঠিক ওপরে কয়েক খানা ভিস্তি টাঙান রয়েছে দেখতে পেলাম। এতে আমার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম ঃ হে রসুলুল্লাহ্! আমার কান্নার যথেষ্ট কারণ আছে। যে দড়ি দিয়ে খাটখানা তৈরী হয়েছে তা আপনার নগ্ন গায়ে গভীর দাগ কেটেছে এবং আপনার ঘরখানাও সম্পূর্ণরূপে বসবাসের অনুপযোগী। যখন পারস্য-সম্রাট এবং রোমের রাজারা পার্থিব সুখে ভাসতে থাকে যদিও তারা আল্লাহ্র উপাসনা করেনা—তখন আল্লাহ্র রসুল হয়েও আপনি এমন সাধারণ জীবন যাপন করবেন একি অসহনীয় নয়? তিনি বললেন, 'হে খাত্তাবপুত্র! তুমি কি পছন্দ করনা যে তারা ইহকালের জীবন ভোগ করবে এবং আমি পরকালের?'—শায়খান।

৫৮৫. ক্ষুধা কমাও, কারণ এ জগতে যারা ভরা পেটে থাকবে পরজগতে তাদের অধিকাংশ অনাহারে থাকবে।—তিব।

৫৮৬. যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত বা ক্ষুধা নিবারণে অসমর্থ অথচ লোকের কাছে তা গোপন রাখে, মহিমময় আল্লাহ্ তাকে এক বছরের পবিত্র আহার্য দান করেন। —তিরমিজী।

দান

'যারা আপন ধন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা হল—একটা শস্যবীজ যা থেকে সাতটা শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে এক শত করে শস্যদানা।' ২(২৬১)

'হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি জমি হতে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করে দিই—তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা দান কর। মন্দ জিনিস দান করার সংকল্প করোনা—যেহেতু তোমরা তা গ্রহণ করোনা, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক।' ২(২৬৭)

'তোমরা যা ভালবাস তা থেকে দান না করা পর্যন্ত কিছুতেই প্রকৃত পুণ্য লাভ করবেনা।'

'আর তোমরা যা কিছু দান কর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তা কর, আর যা কিছু তোমরা দান কর তার পুরস্কার পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে, তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবেনা।' ২(২৭২)

'যারা আল্লাহ্‌র পথে আপন ধন ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং (ঐ দানের বদলে কাউকে) কষ্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে।' ২(২৬২)

'যে দানের পর কষ্ট দেওয়া হয় তার চেয়ে মিষ্টি কথা বলা এবং ক্ষমা করা উত্তম।' ২(২৬৩)

'হে বিশ্বাসিগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করোনা—ঐ লোকের মত যে নিজের ধন লোক-দেখানর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করেনা। তার উপমা একটা শক্ত পাথরের মত যার ওপর কিছু মাটি থাকে, তারপর তার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাতে তাকে মসৃণ করে রেখে দেয়।' ২(২৬৪)

'যারা তাদের প্রতিপালকের অংশীদার স্থাপন করেনা এবং যারা তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা ভীত কম্পিত হৃদয়ে দান করে, তারাই দ্রুত কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করে এবং তারা গুতে অগ্রগামী হয়। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না।' ২৩(৫৯-৬২)

—আল্-কোরআন।

৫৮৭, আল্লাহ্‌তা'লা বলেন: হে মানব সন্তান! দান কর তোমাকে দান করা হবে।—শারখান।

৫৮৮. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ সন্তুষ্টচিত্তে যা দান করা হয় তাই উত্তম দান এবং তোমার আত্মীয়কেই প্রথম দান কর।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৮৯. ওপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তোমার পোষ্যকে দিয়েই (দান) শুরু কর। অভাবমুক্ত থেকে দান করাই শ্রেষ্ঠ দান। (ওপরের হাত অর্থাৎ দাতার হাত এবং নীচের হাত অর্থাৎ দান গ্রহণকারীর হাত।) —বুখারী। বর্ণনায় ঃ হাকিম ইবনে হিজাম (রাঃ)।

৫৯০. মানুষের জীবদ্দশায় একটা দিরহাম দান করা মৃত্যুর পর একশত দিরহাম দান করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।—আবু দাউদ।

৫৯১. দান আল্লাহ্‌র ক্রোধকে উপশম করে এবং মৃত্যু-যন্ত্রণাকে দূরীভূত করে।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৫৯২. পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, (মানুষকে) খাদ্য দান কর এবং শান্তি বিস্তার কর—তাহলেই শান্তিতে বেহেশ্‌তে যেতে পারবে।—তির। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ)।

৫৯৩. যদি কোন স্ত্রীলোক অশান্তি সৃষ্টি না করে' তার ঘরের খাদ্য সামগ্রী থেকে কিছু দান করে, তাহলে সে পুণ্য লাভ করবে কেননা সে দান করেছে। আর তার স্বামীও পুণ্যলাভ করবে কেননা সে উপার্জন করেছে। আর খাজাঞ্চিও অনুরূপ পুণ্য লাভ করবে। তাদের কেউ কারো পুণ্য আদৌ হ্রাস করবে না।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৫৯৪. ভোরে যখন মানুষ শয্যা ত্যাগ করে তখন দুজন ফেরেশ্‌তা নেমে আসে। তাদের একজন বলতে থাকে, 'হে আল্লাহ্, দাতাকে পুরস্কার দান কর' এবং অপরজন বলতে থাকে, 'হে আল্লাহ্, কৃপণকে ধ্বংস কর।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৯৫. কৃপণ ও দাতার উপমা হল এমন দুটি লোক যাদের দুজনের দেহে বুক থেকে গলার হাড় পর্যন্ত লোহার জামা আছে। দাতা যখনই দান করতে উদ্যত হয় তখনই ঐ জামা তার শরীরে ঢিলা হয়ে (হাতের) নখ পর্যন্ত বিস্তারিত হয় এবং তার পদাঙ্কও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি যখনই কিছু দান করতে ইচ্ছা করে তখনই ঐ লোহার জামার আংটাগুলো দৃঢ়ভাবে এঁটে যায়—সে ও ঢিলা করতে চায়, কিন্তু ঢিলা হয় না। [অর্থাৎ দাতার পক্ষে দান করা সহজ, কিন্তু কৃপণের পক্ষে সহজ নয়।] —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৯৬. নবী (সঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানেরই দান করা কর্তব্য।' সাহাবীরা বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র নবী, যার কিছু নেই?' তিনি বললেন, 'সে নিজের হাতে কাজ করবে, ফলে সে নিজেও লাভবান হবে এবং দানও করবে।' তারা বলল, 'যদি সে অক্ষম হয়?' তিনি বললেন, 'তবে সে অভাবী ও দুর্দশা-গ্রস্তদের কাজে সাহায্য করবে।' তারা বলল, 'যদি সে তাতেও সক্ষম না হয়?' তিনি বললেন, 'তবে সে যেন ন্যায় কাজ করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে, কেননা এটাই তার জন্যে দান।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু মুসা (রাঃ)।

৫৯৭. আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটা ঘোড়া দান করেছিলাম। কিন্তু যাকে ওটা দিয়েছিলাম সে ওকে অকেজো করে' দিয়েছিল। আমি তখন ওটা কিনে নেবার

ইচ্ছা করলাম। আমি ভাবলাম যে, সে ওটা সস্তায় বিক্রি করবে। আমি নবী (সঃ)-কে (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'ওটা কিনো না, যা দান করেছ তা পুনরায় গ্রহণ করোনা যদিও সে (মাত্র) এক দেরেমের বিনিময়ে তোমাকে ওটা দেয়, কেননা দান করে তা পুনরায় গ্রহণ করা আর বমি করে সেই বমি ভক্ষণ করা সমান।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ওমর (রাঃ)।

৫৯৮. তোমরা দান কর, কেননা তোমাদের এমন এক সময় আসবে যখন কোন লোক নিজের জাকাত (অবশ্যদেয় দান) নিয়ে ঘুরতে থাকবে অথচ তা গ্রহণ করার মত কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। লোকে বলবে, যদি গতকালও আসতে তবে অবশ্যই আমি ও গ্রহণ করতাম ; কিন্তু আজ আমার আর ওর প্রয়োজন নেই। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ হারিসা ইবনে ওহাব (রাঃ)।

৫৯৯. আবু মসউদ আনসারী (রাঃ) বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ (সঃ) যখন আমাদের দান করার আদেশ করতেন তখন আমাদের কেউ কেউ বাজারে চলে যেত এবং মোট বহন করে এক মুদ্দ (প্রায় এক সের বা এক কে. জি) পরিমাণ মজুরী পেত (এবং ওর থেকে দান করত), আর আজ তাদের কেউ কেউ লক্ষপতি। [কারণ দানে বৃদ্ধি।]—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু মসউদ আনসারী (রাঃ)।

৬০০. নবী (সঃ)-এর কোন এক সহধর্মিনী নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে কে সর্বাগ্রে (মৃত্যুর পর) আপনার সঙ্গে মিলিত হবে ?' তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘহস্ত।' তখন তারা একটা কাঠি নিয়ে হাত মেপে দেখল, বিবি সওদা তাদের মধ্যে দীর্ঘ হস্ত। পরে (সর্বপ্রথম জয়নবের মৃত্যু হলে) আমরা বুঝতে পারলাম যে, হস্তের দীর্ঘতা হল দানশীলতা। তিনি (জয়নব) আমাদের মধ্যে সর্বাগ্রে তাঁর (নবী সঃ-এর) সঙ্গে মিলিত হন এবং তিনি দান করতে ভালবাসতেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৬০১. একদিন এক স্ত্রীলোক তার দুই কন্যাকে নিয়ে ভিক্ষা করতে এল, কিন্তু আমার কাছে সে একটা খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেলনা। আমি তাকে ওটা দান করলাম। সে ওটা তার দুই কন্যাকে ভাগ করে দিল, কিন্তু নিজে একটুও খেলনা। তারপর সে উঠে চলে গেল। নবী (সঃ) আমাদের কাছে আসলে আমি তাঁকে ঘটনাটা বললাম। তখন নবী (সঃ) বললেন, 'যে কেউ এই কন্যাদের কারণে কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করবে—ওরা তাকে দোজখের আগুন থেকে আড়াল করে রাখবে।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৬০২. যে দান করে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মত যে বমি করে আবার তা ভক্ষণ করে। এর চেয়ে মন্দ উপমা আমার নেই। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৬০৩. কেউ তার দান ফিরিয়ে নিতে পারে না, কেবল পিতা তার সন্তানের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে।—নাসায়ী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ)।

৬০৪. হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ তারা একটা ছাগ জবেহ্ করেছিল। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর কিছু অবশিষ্ট আছে কি ?' আমি বললাম, 'ওর গ্রীবা ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই (অর্থাৎ গ্রীবা ছাড়া সব দান করা হয়েছে)।' তিনি বললেন 'গ্রীবা (কাঁধের ও গলার মাংস) ছাড়া সবটাই

অবশিষ্ট আছে।' [অর্থাৎ যা দান করা হয় তা মানুষের পরকালের সঞ্চয়]—তিরমিজ।

৬০৫. যে কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে নগ্নতা নিবারণের জন্য এক খণ্ড বস্ত্র দান করে, আল্লাহ্ তাকে বেহেশ্তে সবুজ বস্ত্রদ্বারা সজ্জিত করবেন এবং যে কোন মুসলমান কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার্য দান করে আল্লাহ্ তাকে বেহেশ্তের মেওয়া থেকে আহার্য দান করবেন। যে কোন মুসলমান কোন তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানীয় দান করবে আল্লাহ্ তাকে মোহরাবৃত সুপবিত্র পানীয় দান করবেন।—আ. দাউদ। তিরমিজী।

৬০৬. কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে এক খণ্ড বস্ত্র দান করলে যতক্ষণ পর্যন্ত তা তার ব্যবহারে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ্তা'লার তত্ত্বাবধানে থাকে।—তির। মিশকাত।

৬০৭. এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ দান সর্বোৎকৃষ্ট?' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'যখন তুমি সুস্থ থাক ও আকাঙ্ক্ষা কর, দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর ও ধনের আশা কর—তোমার সেই সময়কার দান। তারপর প্রাণবায়ু যখন তোমার কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছুবে এবং তুমি বলতে থাকবে। 'এতো এতো অমুকের জন্য' এবং তা তাদের অধিকারে এসে যাবে—সেই সময়ের জন্য তুমি দানকার্য স্থগিত রেখো না। [মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে দান করার চেয়ে সুস্থ সমর্থ অবস্থায় যখন ভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রবল, তখন দান করাই শ্রেয়ঃ]—শায়খান। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬০৮. উম্মে বুজাইদ (রাঃ) বল্লেন, 'হে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)! এক দরিদ্র আমার দুয়ারে অপেক্ষা করছে। আমার অত্যন্ত লজ্জা করছে, কেন না তার হাতে দেবার মত আমার ঘরে কিছুই নেই।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন 'যদিও তা সিদ্ধকরা পায়ের ক্ষুর হয়, তবুও তা তার হাতে দাও।'—আ. দাউদ। তিরমিজী। মিশকাত।

৬০৯. যে দুগ্ধ বা রৌপ্য দান করে অথবা কারো পথ দেখিয়ে দেয়—সে একটা দাসকে মুক্ত করারও সমান পুণ্য লাভ করবে।—তিরমিজী। বারায়াহ্ (রাঃ)।

৬১০. প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য দান করা। জিজ্ঞাসা করা হল, 'যদি কোন ব্যক্তির সঙ্গতি না থাকে?' তিনি (হজরত) বললেন, 'সে যেন নিজের হাত দিয়ে কাজ করে তার আত্মার উপকার করে, তাই তার দানের কাজ হবে।'—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ)।

৬১১. মিষ্টভাষী হওয়া দান-খয়রাত করার সমান পুণ্য কাজ।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬১২. প্রত্যেকটি ভাল কথা ও ভাল ব্যবহারে দান-খয়রাত করার সমান পুণ্য লাভ হয়।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

৬১৩. একখণ্ড শুকনো খেজুর দান করার সামর্থ্য থাকলেও তাই দান করে নরক থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা কর। যদি ততটুকু সামর্থ্য না থাকে তবে অন্ততঃ মিষ্টভাষী হয়ে সে চেষ্টা অব্যাহত রাখ। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আদি ইবনে হাতেম (রাঃ)।

৬১৪. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক সৎকর্মই দান।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবুজর (রাঃ)।

৬১৫. প্রতিদিন মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থিরই একটা (করে) দানের কর্তব্য আছে। দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচার করে দেওয়া একটা দানের কাজ, যানবাহনের আরোহণকারীকে সাহায্য করা অথবা তার মালপত্র তুলে দেওয়া একটা দানের কাজ, সৎকথা বলা, নামাজের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ করা এবং পথ থেকে অনিষ্টকর দ্রব্য দূরীভূত করা—সব-কিছুই দানের কাজ।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬১৬. আল্লাহ্ যখন পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তখন তা দুলতে লাগল। তারপর পাহাড় সৃষ্টি করে তিনি তাকে পৃথিবীর ওপর স্থির থাকতে বললেন। পৃথিবী স্থির হলে ফেরেশ্তাগণ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হে প্রভু! তোমার সৃষ্টির মধ্যে এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কিছু আছে কি ?' তিনি বললেন, 'হাঁ, লোহা।' তারা জিজ্ঞাসা করল, 'লোহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী আর কিছু আছে কি ?' তিনি বললেন, 'হাঁ, আগুন।' তারা জিজ্ঞাসা করল, 'আগুন অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী আর কি আছে ?' তিনি বললেন, 'পানি।' তারা প্রশ্ন করল, 'পানির চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কি আছে ?' তিনি বললেন, 'বাতাস'।' তারা বলল, 'বাতাস অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী আর কি আর কি আছে ?' তিনি বললেন, 'আদম সন্তানের ঐ দান যা সে ডান হাতে সম্পাদন করে কিন্তু বাম হাত জানে না।' —তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৬১৭. ওকবা ইবনোল হারেস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পেছনে আমি মদীনা শরীফে আছরের নামাজ পড়ছিলাম। তিনি নামাজ শেষে সালাম ফেরালেন, তারপর সহসা উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকেদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাঁর এক স্ত্রীর ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর এই ব্রস্তভাব দেখে সবাই বিচলিত হল। তিনি ফিরে এসে দেখলেন যে তাঁর (ঐভাবে) দ্রুত গমনের জন্য তারা আশ্চর্য হয়েছে। তিনি বললেন, 'আমার মনে পড়ল যে আমি ঘরে এক টুকরো সোনা রেখে এসেছি। আমার ঘৃণা হয় যে সে আমাকে আকর্ষণ করবে। সুতরাং তা দান করবার জন্য আমি আদেশ দিলাম।'—বুখারী।

৬১৮. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অন্যতম সহধর্মিণী উম্মে সালমাকে কিছু মাংস উপহার দেওয়া হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মাংস পছন্দ করতেন। সুতরাং তিনি পরিচারিকাকে বললেন, 'ওটা রেখে দাও, নবী (সঃ) খেতে পারেন।' তারপর এক ভিক্ষুক এসে দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলল, 'খয়রাত দাও, আল্লাহ্ তোমাদের বরকত (প্রাচুর্য) দেবেন।' তাঁরা বললেন, 'আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দেবেন।' তারপর ভিক্ষুক চলে গেল। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বাড়ী ফিরলেন এবং বললেন, 'হে উম্মে সালমা, তোমাদের কাছে কিছু খাবার আছে কি ?' তিনি বললেন, 'হাঁ।' তারপর পরিচারিকাকে বললেন, 'যাও, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জন্যে সেই মাংসটুকু এনে দাও।' সে চলে গেল, কিন্তু সেই পাত্রে মাংস দেখতে পেল না, বরং তার পরিবর্তে একখন্ড সাদা পাথর দেখতে পেল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই যে মাংস তুমি ভিক্ষুককে দাওনি সেই মাংস এখন পাথরে পরিণত হয়েছে।'—বয়হাকী।

৬১৯. একদিন একজন লোক মাঠে কাজ করতে করতে মেঘের মধ্যে শুনতে

গেল, 'অমুকের বাগানে পানি দাও।' তারপর সেই মেঘ একদিকে ভেসে এসে একটা প্রস্তরময় সমতল ভূমিতে পানি বর্ষণ করল। ঐ ভূমির একটা নালা দিয়ে সে পানি বের হয়ে যেতে লাগল। লোকটা তা অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়ে দেখল, এক ব্যক্তি কোদাল দিয়ে স্রোতের গতি পরিবর্তন করে দিচ্ছে। সে (প্রথম ব্যক্তি) তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তোমার নাম কি?' সে বলল, 'আমার নাম 'অমুক।' (তখন) সেই নাম সে মেঘের মধ্যে উচ্চারিত হতে শুনল। সে প্রথম ব্যক্তিকে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে কেন?' সে বলল, 'নিশ্চয়ই আমি মেঘের মধ্যে একটা শব্দ (নাম) উচ্চারিত হতে শুনেছি—এ পানি তার। তোমার নাম ধরে বলেছে, তার বাগানে পানি দাও। তুমি ওর দ্বারা কি করবে?' সে বলল, 'যখনকার কথা তুমি বলছ তখন আমি ঐ (ক্ষেত) থেকে যা উৎপন্ন হয় তার দিকে লক্ষ্য করছিলাম- যাতে আমি ওর (উৎপন্ন ফসলের) এক-তৃতীয়াংশ দান করতে পারি, আমি ও আমার পরিজনগণ ওর এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করতে পারি এবং ওর এক-তৃতীয়াংশ ওকেই (ক্ষেতকেই) দিতে পারি (অর্থাৎ বীজ হিসেবে রাখতে পারি)। [যে কৃষক চাষের সময় তার উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ দান করার উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ তার ক্ষেতে রহমত (দয়া বা অনুগ্রহ) বর্ষণ করেন]—মুসলিম।

৬২০. মুসলমানের দান কেয়ামতের দিন তার জন্য ছায়া হবে।—মিশকাত।

৬২১. গুপ্ত দান আল্লাহ্‌র ক্রোধ নিবারণ করে।—সগির।

৬২২. পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপনই উৎকৃষ্ট দান।—সগির।

৬২৩. দ্রুত দান কর, কারণ ওতে বিপদ আসে না।—মিশকাত।

৬২৪. লোকে জিজ্ঞাসা করল, 'হে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)! ধনী লোকেরাই তো সব পুণ্য লুট করে নিল। তারা আমাদেরই মত নামাজ পড়ে, রোজা রাখে—এ ছাড়া তাদের অতিরিক্ত ধনের জন্য জাকাতও দেয়।' তিনি বললেন, 'তোমাদের কি আল্লাহ্ এমন কিছু দেন নি যার থেকে তোমরাও কিছু দান করতে পার? নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিবার 'সোবহানাল্লাহ্', প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবর', প্রত্যেকবার 'আলহামদু-লিল্লাহ্' বলা এবং প্রত্যেকবার কলেমা শরীফ পাঠ করা দান কার্য। সৎ-কার্য পালনে উপদেশ দান এবং অসৎকার্য পালনে নিষেধ করাও দান। আপন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করাও দান।' তারা বলল, 'হে রসূলুল্লাহ্! কেউ যদি আপন কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয় তাহলে কেমন করে সে তার দ্বারা পুণ্যলাভ করবে?' তিনি বললেন, 'তোমরা কি দেখ না, যদি সে কোন পাপ কাজ করে তবে সে জন্য শাস্তি ভোগ এবং যদি সে পুণ্য কাজ করে তবে সেজন্যে পুরস্কার?'—মুসলিম।

৬২৫. একদিন হজরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কোন একজন লোকের কাছে একটা ঘটনা বর্ণনা করলেন: এক ব্যক্তি কিছু দান-খয়রাত করবে বলে একদিন রাতে পণ করল। এই পণ করে' সে দানের জিনিস নিয়ে ঘর থেকে বের হল এবং একজনকে দান করল। ঘটনাক্রমে ঐ দান-গ্রহণকারী আসলে এক চোর ছিল। (তাই) ভোর হবার পর সকলে বলাবলি করতে লাগল যে, 'রাত্রিকালে এক চোরকে দান করা হয়েছে।' ঐ দানকারী এ কথা জানতে পেরে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শোকর আদায় করল (এর চেয়ে আরো খারাপ পাত্রে তার দান প্রদত্ত হয় নি বলে')। পরদিন রাতে পুনরায় সে অনুরূপ পণ করল এবং দানের জিনিস নিয়ে বের হল। আজ তার দান এক পতিতা নারীর হাতে পড়ল। ভোর হবার পর সবাই বলাবলি

করতে লাগল যে, 'আজ রাতে এক অসতী পতিতাকে দান করা হয়েছে।' ঐ (দানকারী) ব্যক্তি একথা জানতে পেরে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শোকর আদায় করল (কারণ, এর চেয়ে অধিক জঘন্য পাত্রে তার দান প্রদত্ত হয় নি)। পরদিন রাতে আবার সে ঐ একই পণ করে দানের জিনিস নিয়ে বের হল। আজ তার দান এক ধনী ব্যক্তির হাতে পড়ল, (যে দান-খয়রাত গ্রহণের যোগ্য পাত্র নয়)। ভোর হলে সবাই বলাবলি করতে লাগল যে, 'আজ রাতে এক ধনী ব্যক্তিকে দান করা হয়েছে।' এবার ঐ দানকারী ব্যক্তি একথা জানতে পেরে বলল, 'হে আল্লাহ্‌, আমার দান চোরের হাতে, অসতী নারীর হাতে এবং দানের অযোগ্য ধনী ব্যক্তির হাতে পড়েছে—সকল অবস্থাতেই তোমার প্রশংসা ও শোকর যে, তুমি আমাকে (দান করার) শক্তি দিয়েছ।' (কিন্তু সমস্ত দান অযোগ্য পাত্রে পড়ায় মনটা তার সামান্য একটু ক্ষুণ্ণ হল)। (তখন) স্বপ্নের মধ্যে কেউ এসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে গেল, 'মনে রেখো, তোমার যে দান চোরের হাতে পড়েছে (তা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়েছে, কারণ) ওর দ্বারা এই সুফল ফলতে পারে যে, ঐ চোর এই ধন পেয়ে চুরি ত্যাগ করে সাধু হয়ে যেতে পারে। তেমনি যে দান পতিতার হাতে পড়েছে (তাও) কবুল হয়েছে, কারণ) তার ফলে এই সুফল ফলতে পারে যে, ঐ পতিতা ঐ ধনের উপলক্ষে স্বীয় পতিতাবৃত্তি ত্যাগ করে সৎপথ অবলম্বন করতে পারে। তারপর যে দান ধনী ব্যক্তির হাতে পড়েছে (তাও কবুল হয়েছে, কারণ) ওর দ্বারা এই সুফল ফলতে পারে যে ঐ ধনী ব্যক্তি দান করার প্রেরণা ও শিক্ষা লাভ করে নিজের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে অভ্যস্ত হতে পারে।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬২৬. ইয়াজিদ (রাঃ) নামক এক সাহাবীর পুত্র মাআ'ন বর্ণনা করেছেন যে, আমি এবং আমার পিতা, পিতামহ সকলে হজরত রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে ইসলাম কবুল করে তাঁর হাতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলাম। হজরত রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং আমার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন এবং বিবাহ পড়িয়েছিলেন। একদিন আমি তাঁর কাছে একটা নালিশ পেশ করলাম যে—'আমার পিতা কিছু স্বর্ণমুদ্রা দান করার নিয়ত (সংকল্প) করে আলাদা করে রাখলেন এবং (উপযুক্ত পাত্রে দান করার জন্যে তা) মসজিদের মধ্যে এক ব্যক্তির কাছে রেখে আসলেন। ঐ ব্যক্তি আমার পরিচয় জানতেন না এবং আমিও ঐ মুদ্রাগুলো আমার পিতা কর্তৃক প্রদত্ত বলে জানতুম না। আমি নিঃস্ব গরীব ছিলাম। তাই (মসজিদের) ঐ ব্যক্তি ঐ স্বর্ণমুদ্রাগুলো আমাকে দান করলেন, (আর) আমিও তা গ্রহণ করলাম। আমার পিতা এই ঘটনা জানতে পেরে আমাকে বললেন, 'এই মুদ্রা তোমাকে দান করার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, (তাই নিয়েত-বিরুদ্ধ হওয়ায় মুদ্রাগুলি তুমি আমাকে ফেরৎ দাও)।' আমি তা ফেরৎ দিতে অস্বীকার করে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর দরবারে এ বিষয়ে নালিশ পেশ করলাম। তিনি আমার পিতাকে ডাকিয়ে বললেন, 'তুমি যে দান করার নিয়ত করেছ তার পুণ্য পুরোপুরিই লাভ করবে (যদিও অজ্ঞাতসারে তা তোমার আপন পুত্রের হাতে পড়েছে)।' আর আমাকে বললেন, 'তুমি যা নিয়েছ তুমি তার মালিক সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছ।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ মাআ'ন (রাঃ)।

৬২৭. নবী (সঃ)-এর কাছে বাহরায়েন থেকে (রাজস্ব বাবদ) অর্থ আসল। তিনি বললেন, 'তোমরা এসব মসজিদে ঢেলে রাখ।' রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে এবার সবচেয়ে বেশী অর্থ এসেছিল। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) নামাজের জন্য বের হলেন কিন্তু সেদিকে দৃকপাত করলেন না। নামাজ শেষ করে (সেই) অর্থের

কাছে এসে বসলেন এবং যাকে দেখলেন তাকেই (তার থেকে কিছু) দিলেন। এমন সময় আব্বাস তাঁর কাছে এসে বলল, 'হে রসূলুল্লাহ্! আমাকে (কিছু) দিন। আমি (বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে) আমার নিজের এবং আকীলের মুক্তিপণ দিয়েছিলাম, (তার ফলে অভাবগ্রস্ত হয়েছি)।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে বললেন, 'নাও।' সে অঞ্জলা ভরে ভরে নিয়ে নিয়ে কাপড়ে রাখতে লাগল, তারপর ওঠাতে চাইল কিন্তু পারল না। সে বলল, 'হে রসূলুল্লাহ্! কাউকে বলুন, সে যেন এটা আমাকে তুলে দেয়।' তিনি বললেন, 'না।' সে বললে, 'তবে আপনিই তুলে দিন।' তিনি বললেন 'না।' তখন সে তা থেকে কিছু রেখে দিয়ে আবার তুলতে গিয়ে বলল, 'হে রসূলুল্লাহ! কাউকে এটা তুলে দিতে আদেশ করুন।' তিনি উত্তর দিলেন, 'না।' সে বলল, 'তবে আপনিই তুলে দিন।' তিনি বললেন, 'না।' তখন সে তার থেকে আরো কিছু রেখে দিল। তারপর তা তুলে নিয়ে নিজের কাঁধে রাখল। তারপর চলে গেল। তার লোভে বিস্মিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তার দিকে তাকিয়ে রইলেন—যতক্ষণ না পর্যন্ত সে আমাদের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হল। একটা দিরহাম-ও বাকী থাকা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সে স্থান থেকে উঠলেন না।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৬২৮. নবী (সঃ) মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল ছিলেন। আর রমজান মাসে তাঁর এই দানশীলতা সর্বাধিক বৃদ্ধি পেত। রমজানের প্রতি রাতে হজরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তিনি (নবী সঃ) তাঁকে কোরআন শরীফ পাঠ করে শোনাতেন। যখন জিব্রাইল (আঃ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তাঁর দান বর্ষণকারী বাতাস অপেক্ষাও প্রবলতর হত। [এই সাক্ষাৎ ও কোরআন পাঠ এ'তেকাফ রত অবস্থাতেই হত]—শায়। মিশ। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৬২৯. রসূলুল্লাহ (সঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল ছিলেন। তাঁর মত অতবড় দানশীল মানবজগতে আর কেউ হয় নি, হবেও না। তাঁর দানশীলতা প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা বসন্ত বাতাস অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

দুঃখ-বিপদ

'যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই বিনীত ভাবে আহ্বান কর।' ১৬(৫৩)

—আল্-কোরআন।

৬৩০. মানুষ যখন অত্যন্ত পাপাসক্ত হয় এবং তার এমন কোন পুণ্য থাকে না যার দ্বারা তা দূর হতে পারে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে মুক্তিদান করার উদ্দেশ্যে তাকে দুঃখ-বিপদে জড়িত করেন।—মিশকাত।

৬৩১. প্রত্যেক মানুষ তার পুণ্যশীলতার পরিমাণ অনুসারে বিপদগ্রস্ত হয়। দুঃখ সর্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং এমন সময়ে তাকে পরিত্যাগ করে যখন তার আর কোন পাপ থাকে না।—তিরমিজী।

৬৩২. নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যের পরিমাণ অনুসারে পুরস্কারের পরিমাণ নির্ধারিত হয় এবং আল্লাহ্ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাকে বিপদগ্রস্ত করেন এবং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, যে তাতে অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।—তিরমিজী।

৬৩৩. আমার প্রভু বলেন ঃ আমার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ ! যাকে আমি ক্ষমা করতে ইচ্ছা করি তাকে কখনো এ পৃথিবী থেকে অপসারিত করিনা যে পর্যন্ত আমি দৈহিক পীড়া এবং জীবিকার কৃচ্ছ্রতা দ্বারা তার গ্রীবাকে পাপমুক্ত না করি।—মিশকাত।

৬৩৪. আল্লাহ্ যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে বিপদে জড়িত করেন। —বুখারী।

৬৩৪. (ক) বিপদ ব্যতীত কেউ সহিষ্ণু এবং বহুদর্শিতা ব্যতীত কেউ জ্ঞানী হতে পারে না।—তিরমিজী।

৬৩৫. মুসলমান ও তার পত্নীর সঙ্গে মৃত্যু এবং রোগযন্ত্রণারূপ দুর্ভাগ্য সর্বদাই বিজড়িত থাকে—হয় তা তাদের শরীরের ওপর, নয় তা তাদের সন্তান-সন্ততির ওপর। কিন্তু যখন তারা পরলোকগমন করে তখন তাদের আর কোন পাপ থাকে না।—তির। মালেক।

৬৩৬. প্রকৃত মুসলমান এমন কোন দুঃখ, যন্ত্রণা, রোগ এবং শোক ভোগ করে না বা সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা করে না যার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা তার পাপ মার্জনা না করেন।—শায়খান। তির।

৬৩৭. একদিন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) উম্মে সায়েব নামক এক রমণীর গৃহে উপস্থিত হন এবং জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার কি হয়েছে যে কাঁপছ?' তিনি বললেন, 'আমার জ্বর হয়েছে, খোদা ওর বিনাশ করুক।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'জ্বরকে খারাপ বলো না ; কারণ হাপর যেমন লোহার দাগকে দূর করে ও (জ্বর)-ও তেমনি মানুষের পাপকে দূর করে।'—মুসলিম।

৬৩৮. মহিমময় আল্লাহ্ যখন প্রকৃত মুসলমানকে ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার পর মুক্তি দেন তখন তা তার অতীত পাপের বিনিময় ও ভবিষ্যতের জন্য উপদেশস্বরূপ হয় ; এবং মুনাফেক (কপট) ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে আরোগ্যলাভ করলে তার তুলনা সেই উষ্ট্রের তুল্য হয় যাকে তার প্রভু বেঁধে রাখার পর মুক্তি দেয় কিন্তু সে জানতে পারে না কেনই বা তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং কেনই বা তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। [অর্থাৎ বিপদ-ব্যাধি আল্লাহ্‌তালার হুঁশিয়ারী হিসেবে মোমেন ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে পাপমুক্ত বা পাপ সম্পর্কে সাবধান করে না।]—আবু দাউদ।

৬৩৯. যদি কোন ব্যক্তি কোন সৎকাজ করার সময় অসুস্থতাহেতু বা পথশ্রমের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে অবাধে তা পালন করলে সে যে পুরস্কার পেত আল্লাহ্ তাকে সেই পুরস্কারই দান করবেন।—বুখারী। আবু দাউদ।

৬৪০. আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন বিপদ্‌গ্রস্ত হয় তখন সে যেন তা আমার কাছে বলে।—সগির।

৬৪১. তোমাদের মধ্যে কেউ বিপদ্‌গ্রস্ত হলে সে বলবে, 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁরই কাছে আমাদের ফিরতে হবে। হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমার দুঃখের যোগ্য পুরস্কার আছে ; অতএব আমাকে ওর থেকে মুক্ত কর এবং ওর চেয়ে উত্তম কিছু দান কর।'—তিরমিজী। ই. মাজা।

ধন-সম্পত্তির লালসা

'তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা—এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে মহাপুরস্কার।' ৮ (২৮)

'তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে যেন তোমাদের ভুলিয়ে না রাখে। যাদের ভুলিয়ে রাখে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।'

'নিশ্চয় যারা অবিশ্বাসী, আল্লাহ্‌র পথ হতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য তারা তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে, তারা ধনসম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, তারপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে।' ৮ (৩৬)

'এবং তার ধনসম্পদ তার কোন কাজে আসবে না যখন তার অধঃপতন ঘটবে।' ৯২ (১১)

'অতিরিক্ত ধন তোমাদের ধ্বংসের পথেই নিয়ে গিয়েছে।'

'ধনসম্পদ যেন শুধু ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বা কুক্ষিগত না থাকে।'

—আল্-কোরআন।

৬৪২. অগাধ ধনসম্পদের মধ্যে সুখ নেই, সুখ মানুষের মনে।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬৪৩. আদমসন্তান বৃদ্ধ হলেও তার দুটি জিনিস বৃদ্ধ হয় না—ধনসম্পত্তি উপার্জনের লালসা এবং জীবনের আশা।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৬৪৪. যদি আদমসন্তানের দুই পর্বত সমান ধনসম্পত্তি থাকত, নিশ্চয়ই সে তৃতীয় পর্বত চাইত। মৃত্তিকা ব্যতীত অন্য কিছুই আদম-সন্তানের (মানুষের) উদর পূর্ণ করতে পারে না। যে তওবা (অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা) করে, আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৬৪৫. কোন মানুষের এক মাঠ-ভরা স্বর্ণলাভ হলে সে আরো দুটি মাঠ-ভরা স্বর্ণের জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে। একমাত্র মাটির দ্বারাই তার মুখ বন্ধ হতে পারে। অবশ্য যে আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবিত হয় আল্লাহ্ তাকে গ্রহণ করেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)।

৬৪৬. ধিক্ তাদের প্রতি যারা ধনসম্পদের দাস হয়, পোশাক-পরিচ্ছদের দাস হয়; ওসব পেলে সন্তুষ্ট হয়, না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬৪৭. একদিন নবী (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে নিজের ধনসম্পদ অপেক্ষা আত্মীয়-স্বজনের ধনসম্পদকে অধিক ভালবাস?' সাহাবীরা বললেন, 'হে রসুলুল্লাহ্, আমরা প্রত্যেকে আপনাপন ধনসম্পদকে সর্বাধিক ভালবেসে থাকি।' রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'মনে রেখো, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ঐ ধনসম্পদ নিজস্ব যা পরকালের জন্য ব্যয় করেছ, আর যা জমিয়ে রেখেছ তা উত্তরাধিকারী ও আত্মীয়স্বজনের।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)।

৬৪৮. পৃথিবীতে পথিক বা আগন্তুকরূপে বসবাস কর এবং নিজেকে কারাবাসী রূপে গণ্য করো না। [ধনসম্পদের লালসার কারাগারে নিজেকে বন্দী না করে পথিক ও আগন্তুকের মত ধন সম্পর্কে নির্লোভ হওয়াই সকল মানুষের কর্তব্য।] —বুখারী। বর্ণনায়ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৬৪৯. আল্লাহ্ বলছেন, হে আদম-সন্তান! আমার উপাসনার জন্য অবসর অন্বেষণ কর, তাহলেই আমি তোমার অন্তরকে সন্তোষ দ্বারা পূর্ণ করব। যদি তা না কর, তোমার হাত অজস্র কাজে ভারাক্রান্ত রাখব এবং দারিদ্র্য দূর করব না। —ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬৫০. ধনসম্পদের আধিক্য থাকলে ধনী হওয়া যায় না, যার অন্তরে ধন আছে সেই যথার্থ ধনী।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

ধৈর্য

'হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের (প্রার্থনার) মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' ২ (১৫৩)।

'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ ও ফসলের লোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; এবং তুমি ধৈর্যশীলদের শুভ সংবাদ দাও।' ২ (১৫৫)

'তারাই ধৈর্যশীল যারা তাদের ওপর কোন বিপদ এলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহ্রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁরই কাছে ফিরে যাব।' ২ (১৫৬)।

'ধৈর্যধারণকারীদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে।'

'তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই রয়েছেন।' ৮ (৪৬)

'হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং ধৈর্যধারণে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা কর।' ৩(২০০)

'আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন।' ৩ (১৪৬)।

—আল্-কোরআন।

৬৫১. ধৈর্যশীল ব্যক্তিই ইহকাল ও পরকালের নেতা।—বুখারী।

৬৫২. বিপদে ধৈর্যধারণ করা উপাসনা বিশেষ।—নাসায়ী।

৬৫৩. আল্লাহ্ বলেন, যারা বিপদে ধৈর্যধারণ করে এবং অপরের অপরাধ ক্ষমা করে তারা পুণ্যবান।—সাগির।

৬৫৪. এমন কোন ধৈর্যশীল ব্যক্তি নেই যার কোন ক্ষমতা নেই এবং এমন কোন জ্ঞানী লোক নেই যার অভিজ্ঞতা নেই।—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ আবু সাঈদ (রাঃ)।

৬৫৫. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আবদুল কায়েসের নেতাদের বললেন, তোমাদের

দুটি গুণ আল্লাহ্ ভালবাসেন—ধৈর্য এবং বিলম্ব [অর্থাৎ বিবেক-বিবেচনাসহ ধীরে কাজ করা]।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৬৫৬. আমি একজন নবীকে দেখেছি, তাঁর সম্প্রদায় (তাঁকে) প্রহার এবং রক্তপাত করেছিল। তিনি তাঁর মুখমন্ডল থেকে রক্তধারা মুছতে মুছতে বলতেন, 'হে আল্লাহ্! আমার কওমকে ক্ষমা কর, কেননা ওরা অজ্ঞ।' [নির্যাতিত নবী (সঃ)-এর কি অসাধারণ ধৈর্য!]—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ ইবনে মসউদ (রাঃ)।

৬৫৭. ব্যথাদায়ক দুর্ব্যবহারের ওপর ধৈর্যধারণ আল্লাহ্‌তা'লার মত কেউ করতে পারে না। এক শ্রেণীর লোক আল্লাহ্‌তালা'র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, তাদেরও আল্লাহ্‌তা'লা পানাহার দান করেন, সুখে-সুস্থতায় রাখেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু মুসা (রাঃ)।

৬৫৮. যদি মানুষের ধৈর্য থাকে তবে সে অবশ্যই ভাগ্যবান হয়।—সগির।

৬৫৯. আল্লাহ্‌তা'লা হজরত মুসা (আঃ)-র কাছে প্রত্যাদেশ করেছিলেনঃ হে মুসা, যে ব্যক্তি আমার আদেশ সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে না এবং আমার অনুগ্রহ সমূহের জন্য শোকর করে না এবং আমার প্রেরিত বিপদে ধৈর্যধারণ করে না—সে যেন আমার আকাশের নীচে থেকে বেরিয়ে যায় এবং আমাকে ছাড়া অন্য কোন প্রভুকে সন্ধান করে।'—সগির।

৬৬০. সহিষ্ণুতাই সন্তুষ্টির চাবি।—সগির।

৬৬১. আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কারো শারীরিক, আর্থিক বা মানসিক বিপদ উপস্থিত হলে যদি সে উৎকৃষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে তা বরণ করে তাহলে বিচারের দিন আমি তার জন্য তুলাদন্ড স্থাপন করতে এবং তার কর্মলিপি খুলে ধরতে লজ্জা বোধ করব।—সগির।

৬৬২. আল্লাহ্ বলেন, সেই বিশ্বাসী বান্দার জন্য আমার কাছে বেহেশ্‌ত ছাড়া অন্য কোন পুরস্কার নেই যে তার প্রিয়জনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করে। —বুখারী। নাসায়ী।

৬৬৩. দেহের সঙ্গে মস্তকের যেমন সম্বন্ধ, ঈমানের সঙ্গে ধৈর্যেরও ঠিক তেমনি সম্বন্ধ।—সগির।

৬৬৪. ধৈর্যেই বিপদের প্রাথমিক পরীক্ষা।—৪ জন।

নম্রতা

'মানুষের প্রতি বিমুখ হয়োনা বরং নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করবে—আর দম্ভের সাথে যারা পা চালায় তারা নরকে প্রবেশ করবে।'

'আল্লাহ্‌র আবেদ (দাস বা উপাসক) ঐ ব্যক্তিগণ যারা বিনীত হয়ে চলে।'

'তুমি বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হবে।' ১৫ (৮৮)

'যারা বিনয়ী তারা ব্যতীত অন্যের পক্ষে এ (ধৈর্য) বড়ই কষ্টকর।'

'তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের কাছে এ নিশ্চিত ভাবে কঠিন।' ২ (৪৫)

'যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই বিনীতভাবে আহ্বান কর।' ১৬ (৫৩)

'আর তোমরা চলনে বিনম্র হও, আর তোমাদের কণ্ঠস্বর নত কর, নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ঘৃণিত কন্ঠস্বর হচ্ছে গাধার কণ্ঠস্বর।'

—আল্-কোরআন।

৬৬৫. আল্লাহ্ আমার কাছে (এই) আকাশবাণী (অহী) প্রেরণ করেছেন ঃ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিনম্র হও, এমন কি একজন অন্যজনের সাথে অহঙ্কার করোনা; একজন অন্যজনের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করোনা।'—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ ইয়াজবিন হেমার (রাঃ)।

৬৬৬. দানে ধন কমেনা, ক্ষমার বিনিময়ে আল্লাহ্ কারো সম্মান ব্যতীত অন্য কিছু বৃদ্ধি করেন না; আল্লাহ্র জন্য যে নত (বা বিনম্র) হয় তিনি তাকে উন্নত করেন।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬৬৭. হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন ঃ একদিন একজন ইহুদী রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মজ্লিসে উপস্থিত হল এবং (সালামের সুরে) বলল—আস্সামু আলাইকুম (অর্থাৎ তোমার মৃত্যু আসুক)। আমি তাদের কথা যথাযথ ভাবে বুঝতে পারলাম, তাই তাদের উদ্দেশ্যে ক্রোধের সাথে বললাম—অ-আলাইকুমুস্সাম অ লা'নাতু অর্থাৎ তোমাদের ওপর মৃত্যু আসুক এবং অভিশাপ বর্ষিত হোক। একথা শুনে রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন ঃ 'হে আয়েশা! ক্ষান্ত ও শান্ত হও; সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহ্তা'লা কোমলতাকে (নম্রতাকে) পছন্দ করেন।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'হে রসুলুল্লাহ্! আপনি কি শুনেছেন—তারা কি বলেছে?' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন—আমিও তাদের সমুচিত উত্তরই দিয়েছি, আমি বলেছি, 'অ-আলাইকুম'—(অর্থাৎ) যে জিনিস আমার ওপর আসার জন্য বলেছ তা তোমাদের ওপরে আসুক। [রসুলুল্লাহ্ (সঃ) সাধারণভাবে অভিশাপদান পছন্দ করতেন না, নম্রভাবে উচিত উত্তর দিতেন।] —বুখারী।

৬৬৮. খ্রীস্টানেরা মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে যেমন খোদার পুত্র বলে অত্যধিক প্রশংসা করে তোমরা আমাকে তেমন প্রশংসা করোনা। কারণ, আমি তাঁর দাস। আমাকে আল্লাহ্র দাস (বান্দা) ও রসুল বলো।—শায়খান।

৬৬৯. আমাকে অন্য নবীদের অপেক্ষা উত্তম বলোনা।—আ. দাউদ।

৬৭০. আল্লাহ্ ভদ্রতা ও নম্রতাকে ভালবাসেন এবং বিনয়ীকে যা দেন গর্বিতকে তা দেন না।—মিশকাত।

৬৭১. যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনীত হয় আল্লাহ তাকে উন্নত করেন এবং যদিও সে নিজেকে ছোট মনে করে, তবু সে লোকের দৃষ্টিতে বড়। যে দুর্বিনীত আল্লাহ্ তাকে অবনত করেন, সে নিজের মনে নিজে বড় হয় যদিও সে লোকের চোখে ছোট। তারপর সহজেই সে কুকুর ও শুকরের স্বভাব প্রাপ্ত হয়।—মিশকাত।

৬৭২. ভদ্রতা ও বিনয় ঈমানের দুটি শাখা—বৃথা বাক্য ও অহঙ্কার কপটতার শাখা।—সাগির।

৬৭৩. যাকে নম্রতা দান করা হয়েছে তাকে ইহ-পরকালের কল্যাণ দান করা হয়েছে এবং যাকে তা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে ইহ-পরকালের উত্তম দ্রব্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।—মিশকাত।

৬৭৪. বিনয় ব্যতীত যাবতীয় গুণের জন্য তার অধিকারীকে হিংসুকের আক্রমণ সহ্য করতে হয়।—সাগির।

৬৭৫. হে আয়েশা, বিনীতা হও এবং কর্কশতা ও গর্হিত কাজ ত্যাগ কর। নিশ্চয়ই বিনয়ের চেয়ে সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই—এবং অভাব মানুষকে যতদূর ক্ষতিগ্রস্ত করে অন্য কিছু তা করেনা।—মুসলিম।

৬৭৬. তোমাদের মধ্যে যারা অমায়িক তারাই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়।—বুখারী।

নির্ভরতা

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের (জ্ঞান) আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই কাছে সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে। সুতরাং তাঁর উপাসনা কর এবং তাঁর ওপর নির্ভর কর।" ১১(১২৩)

"কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলো না 'আমি ওটি আগামীকাল করব', 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে' একথা না বলে।" ১৮(২৩, ২৪)

—আল্-কোরআন।

৬৭৭. যদি তোমরা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর কর—যা করা তোমাদের উচিত—তবে নিশ্চয় তিনি তোমাদের আহারের ব্যবস্থা করবেন, যেমনভাবে তিনি পাখীদের আহার দান করেন। তারা প্রভাতে ক্ষুধার্ত হয়ে বের হয়, সন্ধ্যায় উদর পূর্ণ করে ফেরে। —তিরমিজী।

৬৭৮. আমার উম্মতদের মধ্যে ৭০ হাজার ব্যক্তি বিনাবিচারে বেহেশ্‌তে যাবে —তারা শাঁখ ব্যবহার করে না, গণকদের কথায় বিশ্বাস করে না এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে। —শায়খান।

৬৭৯. এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি আমার উটের পা বেঁধে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে ছেড়ে দেব, না পা না-বেঁধে ছেড়ে দেব এবং আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করব?' তিনি বললেন, উটের পা বেঁধে আল্লাহ্‌র ওপরে নির্ভর কর। [অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা কর।] —তিরমিজী।

৬৮০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন আমি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পেছনে পেছনে যাচ্ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন—হে বালক! আল্লাহ্‌র অধিকার রক্ষা কর, (তাহলে) তোমার অধিকার রক্ষিত হবে, এবং তাঁর (প্রতি) কর্তব্য পালন কর, তাঁকে তোমার সাহায্যকারীরূপে দেখতে পাবে। যখন প্রার্থনা করবে তখন তাঁরই কাছে প্রার্থনা করবে এবং যখন সাহায্য চাইবে তখন তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে। জেনে রেখো, যদিও পৃথিবীর সমস্ত লোক তোমার উপকার করায় ইচ্ছা করে তবু আল্লাহ্ যেটুকু তোমার জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তার বেশী

উপকার তোমাকে কেউ করতে পারবে না এবং যদি তারা তোমার অপকার করতে ঐক্যবদ্ধ হয় তবু আল্লাহ্ তাঁর কলম দিয়ে কেতাবে যা লিখেছেন তার বেশী ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।—তিরমিজী।

৬৮১. জীবিকা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন আত্মাই মৃত্যু বরণ করে না। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা কর এবং তা পেতে বিলম্ব হলে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ো না। কারণ তাঁর কাছে যা আছে বাধ্যতা (অর্থাৎ নির্ভরতা) ছাড়া তা পাওয়া যায় না। —বয়হাকী।

নিয়ম-নিষ্ঠা

'সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত কক্ষ পথে আবর্তন করে, তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাঁরই বিধান মেনে চলে, তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন —যাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না কর।' ৫৫(৫-৮)

—আল্‌-কোরআন।

৬৮২. আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জন্য আমার বাড়ীতে এক ছাগীর দুধ দোহন করা হল এবং আমার বাড়ীর কূপের পানি সেই দুধের সঙ্গে মিশ্রিত করা হল। পরে (সেই দুধের) বাটি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে দেওয়া হল। তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন। যখন তিনি বাটিটা মুখ থেকে নামালেন তখন তাঁর বাম দিকে হজরত আবুবকর (রাঃ) এবং ডান দিকে এক বেদুইন ছিল। হজরত ওমর (রাঃ) আশঙ্কা করলেন যে নবী (সঃ) হয়তো বাটিটা বেদুইনকে দেবেন। তাই তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল, আপনার কাছে আবুবকর আছেন, তাঁকে দিন।' কিন্তু তিনি (নবী সঃ) তাঁর ডান দিকে যে বেদুইন ছিল তাকেই তা দিয়ে বললেন, 'ডাইনের লোক, তারপর ডাইনের লোক (বেশি হকদার)।'—বুখারী।

৬৮৩. নবী (সঃ)এর কাছে এক জামবাটি পানীয় আনা হল ; তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন। তাঁর ডান দিকের দলের মধ্যে সকলের চেয়ে ছোট এক বালক এবং বামদিকে কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি ছিল। তখন তিনি (নবী সঃ) বললেন, 'হে বালক, তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যে আমি বয়োজ্যেষ্ঠদের এটা (বাটিটা) দিই ?' সে বলল, 'হে রসূলুল্লাহ্, আমার ভাগের আপনার এঁটো পানি আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেব—এমন ছেলে আমি নই।' তখন তিনি তাকেই (বালককেই) বাটিটা দিলেন। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাঃ)।

নীরবতা ও বাক্‌সংযম

৬৮৪. নীরবতাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। —সগির।

৬৮৪.(ক) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন।—মিশকাত। বর্ণনায় ঃ জাবের বিন সামার (রাঃ)।

৬৮৫. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে শুধু সৎকথা বলবে নয়তো নীরব থাকবে।—শায়খান। আবু দাউদ।

৬৮৬. নীরবতা জ্ঞানীর অলংকার ও মূর্খের আবরণ।—সগির।

৬৮৭. যে নীরবতা অবলম্বন করে সে মুক্তি পায়।—আহ্‌মদ। তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ)।

৬৮৮. বাহুল্য বাক্য বর্জন করাতেই মুসলমানের সৌন্দর্য।—তিরমিজী। মালেক।

৬৮৯. বিপদ বাক্যের ওপর নির্ভরশীল।—সগির।

৬৯০. 'যা সৎকার্যকে সুদৃঢ় করে আমি কি তোমাদের সে সম্পর্কে বলব?' তারা বলল, 'হাঁ'। তিনি (রসূলুল্লাহ সঃ) জিহ্বাকে স্পর্শ করে বললেন, 'একে সংযত কর।' তারপর মুয়াজ নামক এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে রসূলুল্লাহ্! আমাদের সাধারণ কথাবার্তার জন্যও কি আমরা দায়ী হব?' তিনি বললেন, 'হে মুয়াজ, তোমার মা তোমাকে রক্ষা করুক। মুখের কথা এবং রসনার কটুবাক্যই মানুষকে নরকে নিক্ষেপ করবে।'—তিরমিজী।

৬৯১. যে ব্যক্তি নীরব থাকে সে নিরাপদে থাকে এবং যে নিরাপদে থাকে সে মুক্তি লাভ করেছে।—আবু দাউদ।

৬৯২. এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করল, 'কিসে মুক্তি লাভ হয়?' তিনি বললেন, 'তোমার জিহ্বা বন্ধ কর, আপন গৃহে অবস্থান কর এবং পাপের জন্য কাঁদ।'—তিরমিজী।

৬৯৩. মানুষ যখন সকালবেলা শয্যাত্যাগ করে তখন তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বার কাছে অনুযোগ করে, আমাদের কথা মনে রেখে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, কারণ আমরা তোমার সঙ্গী। যদি তুমি স্থির থাক তবে আমরাও স্থির থাকব এবং যদি তুমি বিপথে যাও তবে আমরাও বিপথে যাব। [বাক্‌সংযম সকল সংযমের মূল।] —তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু সঈদ (রাঃ)।

৬৯৪. তোমরা সবসময় সদ্ব্যবহার করবে এবং অত্যন্ত নীরব থাকবে; কারণ যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, নিশ্চয় মানুষের জন্য ওর চেয়ে উত্তম কোন কিছু নেই।—৪জন।

৬৯৫. সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ্ বলেন, 'হে রসূলুল্লাহ্! আমার পক্ষে কোন্‌টা সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক?' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর রসনা স্পর্শ করে বললেন, 'এইটা।'—তির।

৬৯৬. রসনাকে সংযত রাখাই আল্লাহ্‌র কাছে সর্বপেক্ষা প্রিয় কাজ। —সগির।

৬৯৭. আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মুক্তি কি?' তিনি বললেন, 'তোমার রসনাকে সংযত কর, তোমার গৃহে তোমাকে আবদ্ধ রাখ এবং তোমর পাপের জন্য ক্রন্দন কর।'—তিরমিজী। আহ্‌মদ। বর্ণনায় ঃ ওকবা বিন আমের (রাঃ)।

৬৯৮. দুই সারি দন্তরাজির মধ্যে এবং পদদ্বয়ের মধ্যে যা আছে তার জন্য যে আমাকে জামিন দিতে পারবে আমিও তার জন্য বেহেশ্‌তের জামিন হব।—বুখারী।

বর্ণনায় ঃ সহল বিন সায়াদ (রাঃ)। [এখানে জিহ্বা ও গুপ্তাঙ্গকে সংযত রাখার কথা বলা হয়েছে।]

৬৯৯. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি আমার জন্যে কোন বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক ভয় করেন?' তিনি তাঁর নিজের রসনা (জিহ্বা) স্পর্শ করে বললেন, 'এর (বিষয়ে)।'—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)।

নৈতিক চরিত্র

'আমার প্রভু কুকর্মকে অবশ্যই অবৈধ (হারাম) করেছেন, তা প্রকাশ্য অথবা গোপন যাই হোক।'

'বিশ্বাসিগণকে বলে দাও যেন তারা নিম্ন দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং আপনাপন লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে।'

—আল্-কোরআন।

৭০০. তোমার স্ত্রী ও তোমার ডান হাত যাদের অধিকার করেছে তাদের ছাড়া অন্যের কাছে তোমার গুপ্ত অঙ্গ রক্ষা করবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'যদি কোন লোক একাকী থাকে, তার সম্বন্ধে কি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্কে অধিক লজ্জা করা উচিত।'—তিরমিজী। আ, দাউদ। বর্ণনায় ঃ বাহাজ বিন হাকেম (রাঃ)।

৭০১. যদি কোন লোক কোন স্ত্রীলোকের সাথে নির্জনে থাকে, তবে তাদের মধ্যে তৃতীয়জন থাকে শয়তান।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ হজরত ওমর (রাঃ)।

পদে নিয়োগ

'আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করিনা।' ৭ (৪২)

—আল্-কোরআন।

৭০২. আমার দুজন চাচাতো ভাই রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বলল, 'আল্লাহ্ আপনাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তার দ্বারা আপনি আমাদের কোন দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করুন।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'আল্লাহর শপথ! যারা প্রার্থী অথবা পদের জন্য লালায়িত তাদের আমি এই কাজে নিযুক্ত করিনা।' অন্য বর্ণনায় ঃ যারা এই পদের আশা করে আমি তাদের এই কাজে নিযুক্ত করিনা।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু মুসা (রাঃ)।

৭০৩. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ তোমরা সর্বোত্তম লোককে এই কাজে নিযুক্ত হতে ঘৃণা করতে দেখবে, যে পর্যন্ত না সে এতে নিযুক্ত হয়।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

পরনিন্দা

'তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করোনা ও একে অন্যের পশ্চাতে নিন্দা করোনা। কোন ব্যক্তি কি তার মৃত ভায়ের মাংস ভক্ষণ করতে ভালবাসে? নিশ্চয়ই তোমরা তা ঘৃণা কর।' ৪৯ (১২)।

—আল্-কোরআন।

৭০৪. নিন্দুক কথনো বেহেশ্তে যাবে না।—নাসায়ী ও অন্য ৫ জন।

৭০৫. 'তোমরা কি জান পরনিন্দা কাকে বলে?' সাহাবীগণ বললেন, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'যদি তোমরা তোমাদের ভায়েদের বিষয়ে এমন কিছু বল যা তাদের অপ্রিয় তবে তাইই পরনিন্দা।' এক ব্যক্তি বলল, 'যদি তার মধ্যে যে দোষ আছে সেই দোষের বিষয় উল্লেখ করি?' তিনি বললেন? 'যদি তার সেই দোষ থাকে তবু তার অসাক্ষাতে সেই দোষের আলোচনা করায় তুমি পরনিন্দুক এবং যদি তার সে দোষ না থাকে তবে তুমি মিথ্যা দুর্নাম প্রচারক।'—আবু দাউদ। তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৭০৬. যে দুর্নাম (বা নিন্দা) করে এবং অশ্লীল ও কুবাক্য বলে সে প্রকৃত মুসলমান নয়।—তিরমিজী।

৭০৭. কোন মুসলমানের সম্বন্ধে রসনা দীর্ঘ করা সুদের সুদ এবং এক মুসলমানের জান, মাল ও সম্মান অন্য মুসলমানের জন্য হারাম।—মুস। আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা ও দাউদ বিন জায়েদ (রাঃ)।

৭০৮. কোন মানুষই কোন মানুষকে কুকাজ এবং অবিশ্বাসের অপবাদ দেবেনা কিন্তু যদি তা তার মধ্যে না থেকে তবে অবশ্যই নিন্দাকারীর মধ্যে উক্ত দোষসমূহ প্রকাশিত হবে।—বুখারী।

৭০৯. এমন কথনো হবেনা যে মানুষ অপরের দোষ গোপন করবে কিন্তু আল্লাহ্ তার দোষ গোপন করবেন না।

৭১০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বেদীর ওপরে উঠলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বললেনঃ হে মানব সকল! তোমরা যারা মুখে মুসলমান হয়েছ অথচ অন্তরে বিশ্বাস করনি, তারা মুসলমানদের কষ্ট দিওনা, তাদের নিন্দা করোনা, তাদের দোষ খুঁজো না, কারণ যে মুসলমান তার ভায়ের দোষ খুঁজবে আল্লাহ্ তার দোষ খুঁজবেন, আর আল্লাহ্ যার দোষ খুঁজবেন, তিনি তাকে অপমানিত করবেন—যদিও সে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে।—তিরমিজী।

৭১১. পরনিন্দা অজু ও নামাজকে নষ্ট করে।—জাঃ ছাগির।

৭১২. মুসলমানের নিন্দা করা বড় পাপ এবং তাকে হত্যা করা কুফুরী।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন মসউদ (রাঃ)।

৭১৩. পরনিন্দা ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক জঘন্য। প্রশ্ন হলঃ 'পরনিন্দা ব্যভিচার অপেক্ষা কিভাবে অধিক জঘন্য?' তিনি (দঃ) বললেন; 'কোন বান্দা ব্যভিচার করে' অনুতাপ (তওবা) করলে আল্লাহ্ সে অনুতাপ কবুল করতে পারেন। অন্য বর্ণনায়ঃ তিনি তওবা কবুল করে' তাকে ক্ষমা করতে পারেন কিন্তু

পরনিন্দাকারীকে নিন্দিত ব্যক্তি ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না।' —বয়হাকী। বর্ণনায় ঃ আবু সঈদ (রাঃ)।

৭১৪. ব্যভিচারীর তওবা আছে, কিন্তু পরনিন্দুকের তওবা নেই।—বয়হাকী। বর্ণনায় ঃ। আনাস (রাঃ)।

৭১৫. নিন্দিত ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন না করা পর্যন্ত নিন্দাকারীর ওপরেই সে পাপ বর্তাবে।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ)।

পরোপকার

'আল্লাহ্ পরোপকারীদের পছন্দ করেন।' ৩ (১৪৮)

'তুমি ধৈর্য ধারণ কর—নিশ্চয় আল্লাহ্ পরোপকারীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।' ১১ (১১৫)

—আল্-কোরআন।

৭১৬. ক্ষুধার্তকে অন্নদান কর, রোগীর সেবা কর, এবং বন্দীকে মুক্তি দাও যদি সে অন্যায়ভাবে বন্দী হয়ে থাকে।—বুখারী। আ. দাউদ।

৭১৭. তিনি (নবী সঃ) সর্বাপেক্ষা পরোপকারী, মহানুভব এবং ধৈর্যশীল ছিলেন।—শায়। তির। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৭১৮. আমার অনুবর্তীদের মধ্যে কারও অভাব পূরণ করে' যে ব্যক্তি সন্তুষ্টি লাভ করে সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে, যে আমাকে সন্তুষ্ট করে সেও নিশ্চয় আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে এবং যে তাঁকে সন্তুষ্ট করে, তিনি (আল্লাহ্) তাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করান।—মিশকাত।

৭১৯. বিধবা ও দরিদ্রদের সাহায্য করা—খোদার পথে জেহাদ করা বা সমস্ত দিন রোজা রাখা বা সমস্ত রাত্রি নামাজে দাঁড়িয়ে থাকার সমান।—মুস। আ. দাউদ। মালেক।

৭২০. যে ব্যক্তি তার ভায়ের দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করে, সে তাতে সফলকাম হোক বা না হোক আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন। —আবু দাউদ।

৭২০(ক). যে ব্যক্তি এ জগতে কোন মো'মেনের দুঃখ দূর করে, পরজগতে আল্লাহ্ তার দুঃখ দূর করবেন এবং যে ব্যক্তি দরিদ্রের উপকার করে আল্লাহ্ তাকে ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল করবেন। —আ. দাউদ।

৭২১. যে ব্যক্তি তার ভায়ের সম্মান রক্ষা করে, আল্লাহ পরলোকে তাকে নরকের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। —তিরমিজী।

৭২২. যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখে সাহায্য করে, আল্লাহ্ তাকে ইহলোকে ও পরলোকে সাহায্য করবেন এবং যদি সে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও তাকে সাহায্য না করে, তবে আল্লাহ্ তাকে ইহকালে ও পরকালে অপদস্থ করবেন।—মিশকাত।

৭২৩. যে-কোন মুসলমান তার ভায়ের সম্মান রক্ষা করতে ইচ্ছা করে, তার প্রতি খোদার কর্তব্য রয়েছে যে, পরলোকে তিনি তার সম্মান রক্ষা করবেন।

পর্দা

'হে নবী, তোমার স্ত্রীগণ, তোমার কন্যাগণ, এবং মোমেনদের স্ত্রীগণকে বলে' দাও যে তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের মুখমণ্ডলের ওপরে ঘোমটা আকারে টেনে দেয়।' ৩৩ (৫৯)

'তোমরা তাঁর (নবীর) পত্নীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে তা চাইবে।' ৩৩ (৫৩)

'বিশ্বাসী নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে ; তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ করে' থাকে তা ছাড়া তাদের (অন্য) আভরণ প্রকাশ না করে ; তাদের গ্রীবা ও বক্ষ যেন মাথার কাপড় (অর্থাৎ ওড়না) দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতার পুত্র, ভগিনীপুত্র, সেবিকা যারা তাদের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌন-কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো কাছে তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।' ২৪ (৩১)

— আল্-কোরআন।

৭২৪. 'খবরদার ! পরনারীর সঙ্গে মেলামেশা দেখাসাক্ষাৎ করোনা।' একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে রসুলুল্লাহ্, স্বামীর ভায়েরা ভায়ের স্ত্রীর সাথে ওসব করতে পারে কি ?' উত্তরে রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'স্বামীর ভায়েদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা মৃত্যুর সমান।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)।

৭২৫. 'কোন নারীর সঙ্গে বিবাহ-নিষিদ্ধ-পুরুষের (মাহ্রাম) উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোন পর-পুরুষ (পর্দা অবস্থায়ও) যেন না যায়।' একজন লোক বলল, 'হে রসুলুল্লাহ্, আমার স্ত্রী এবছর হজ্জ্ করতে ইচ্ছা করে অথচ অমুক যুদ্ধে আমার নাম লেখান হয়েছে।' তিনি (দঃ) বললেন, 'ঐ জেহাদের সফর স্থগিত রেখে তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জে যাও' (অন্যের সঙ্গে পাঠিও না)। বুখারী। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৭২৬. আমি এবং ময়মুনা রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে থাকাকালে উম্মে মকতুমের ছেলে এসে তাঁর কাছে গেল। তিনি (নবী সঃ) বললেন, 'এর সামনে পর্দা কর।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কি অন্ধ নয় ?' তিনি বললেন, তোমরা কি অন্ধ ? তোমরা কি দেখতে পাও না ?'—তির। বর্ণনায়ঃ উম্মে সালমাহ্ (রাঃ)।

৭২৭. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) হজরত ফাতেমা (রাঃ)-কে যে দাস দান করেছিলেন

তাঁকে নিয়ে তিনি তাঁর (ফাতেমার) কাছে গেলেন। ফাতেমার দেহে একখণ্ড বস্ত্র ছিল এবং তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা অনাবৃত থাকত এবং পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত থাকত। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই টানাটানি দেখে বললেন, 'এতে তোমার কোন দোষ নেই। আমি তোমার পিতা এবং সে তোমর দাস।'—আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৭২৮. স্বামী অনুপস্থিত থাকলে ঘরে প্রবেশ করোনা, কারণ শয়তান রক্ত চলাচলের ন্যায় তোমাদের মধ্যে চলাফেরা করে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার মধ্যেও?' তিনি বললেন, 'আমার মধ্যেও চলাফেরা করে। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে তার ওপর জয়ী করেছেন এবং সে আমার বাধ্য হয়েছে।'—মুসলিম। তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ জাবের ও আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)।

৭২৯. আগন্তুক স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার নির্দেশ দিলেন।—মুস। —তির। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

৭৩০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হজরত আলীকে বললেন, 'হে আলী! (কোন স্ত্রীলোকের প্রতি) একবার দৃষ্টিপাত করার পর আর একবার দৃষ্টিপাত করোনা, কেননা প্রথমবার তোমার জন্য এবং পরের বার তোমার জন্য নয়।' [প্রথমবার আকস্মিক তাই তা নিষ্পাপ; দ্বিতীয় বারে কামনা জাগ্রত হয় তাই তা শয়তানের।] তির। আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

পরিশ্রমের মর্যাদা ও ভিক্ষা

'নিশ্চয়ই মানুষের জন্য তাই রয়েছে যার জন্য সে চেষ্টা করে। তার পরিশ্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করা হবে।'

—আল্-কোরআন।

৭৩১. একজন আনসার রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে এসে ভিক্ষা চাইলে তিনি বললেন, 'তোমার ঘরে কি কিছু আছে?' সে বলল' 'হাঁ, একখানা চাদর আছে, ওর কিছু অংশ আমরা পরি এবং কিছু অংশ বিছিয়ে শুই—আর একটা পান-পাত্র (বা পেয়ালা) আছে।' তিনি বললেন, 'ও দুটো আমার কাছে নিয়ে এস।' তা নিয়ে আসা হলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হাতে করে ধরে বললেন, 'কে এই জিনিস দুটো ক্রয় করবে?' একজন বলল, 'আমি এক দিরহামে ক্রয় করতে পারি।' তিনি বললেন, 'কে একদিরহামের অধিক দেবে?' তিনি এই ভাবে দুতিনবার জিজ্ঞাসা করলেন। এক ব্যক্তি বলল, 'আমি দুই দিরহামে ওটা খরিদ করব।' তিনি তাকেই সে দ্রব্য দুটি দিলেন এবং দিরহাম দুটি নিয়ে সেই আনসারকে দিলেন। বললেন, 'এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য কিনে তোমার স্ত্রীর কাছে দিয়ে এস এবং অন্য দিরহাম দিয়ে একটা কুড়ুল কিনে আমার কাছে নিয়ে এস।' আদেশমত নিয়ে আসা হলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজে হাতে সেই কুড়ুলে একটা কাঠের হাতল লাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'যাও, কাঠ কেটে বিক্রি কর এবং ১৫ দিনের মধ্যে আর আমার কাছে এসো না।' তারপর লোকটা চলে গেল এবং কাঠ কেটে বিক্রি করতে লাগল। যখন তার কাছে ১৫ দিরহাম সংগৃহীত হল তখন সে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে

আসল। কতক দিরহাম দিয়ে সে এক খণ্ড বস্ত্র ক্রয় করল এবং কতক দিরহাম দিয়ে খাদ্য শস্য ক্রয় করল। তিনি বললেন, 'বিচারের দিন মুখমণ্ডলে ভিক্ষুকের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে আসার চেয়ে এইই তোমার জন্য উত্তম নয় কি? তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্যের জন্য ভিক্ষা হারাম (নিষিদ্ধ)— অভাবগ্রস্ত (সর্বস্বহারা) ব্যক্তি, আপাদমস্তক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এবং হত্যার ক্ষতিপূরণ দানে অসমর্থ ব্যক্তি।'—আবু দাউদ। ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৭৩২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ অন্যের কাছে হাতপাতার চেয়ে দড়ি নিয়ে জঙ্গলে যাওয়া এবং সেখান থেকে কাঁধে করে জ্বালানী কাঠ বহন করে তার দ্বারা জীবিকা উপার্জন করা তোমাদের পক্ষে উত্তম। কারণ অন্যের কাছে হাত পাতলে সে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৭৩৩. একদিন কয়েকজন মদীনবাসী সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদের দান করলেন। তারপর পুনরায় সাহায্য প্রার্থনা করলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এবারেও দান করলেন। এমন কি তাঁর কাছে যাকিছু ছিল বারবার দান করে তা সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে ফেললেন। এবার তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেনঃ আমার কাছে টাকা পয়সা কিছু থাকলে তা তোমাদের না দিয়ে কখনো আমি নিজের কাছে জমিয়ে রাখি না। মনে রেখো, যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে আল্লাহ্ তাকে বিরত থাকার সুযোগ ও শক্তি দান করবেন। যে ব্যক্তি কারো মুখাপেক্ষী হবে না আল্লাহ্ তাকে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। যে ব্যক্তি কষ্ট-ক্লেশে আপদে-বিপদে দুঃখ-বেদনায় ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করবে, আল্লাহ্ তাকে ধৈর্য ধারণে সাহায্য করবেন। ধৈর্যের মত নেয়ামত দুনিয়াতে আর কিছুই নেই। বুখারী ও ৫ জন। বর্ণনায়ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

৭৩৪. যে ব্যক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করে সে নিশ্চয় ভস্ম সঞ্চয় করে— তা বেশী হোক বা কম হোক।—মুসলিম।

৭৩৫. ভিক্ষা করা আর নিজের মুখে নিজে আঘাত করা সমান। অতএব যার খুশী সে তার মুখ (অক্ষত) রাখুক আর যার খুশী সে তা ক্ষতবিক্ষত করুক।—আ. দাউদ। তির। নাসায়ী।

৭৩৬. যে ব্যক্তি বরাবর মানুষের কাছে ভিক্ষা করে সে কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার মুখমণ্ডলে সামান্য মাংসও থাকবে না—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৭৩৭. শেষ হজ্জে যাবার সময় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন ভিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন দুই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হল এবং ভিক্ষা প্রার্থনা করল। তিনি তাদের সুস্থ ও সবল দেখে বললেন 'দেখ, যদি তোমরা ইচ্ছা কর তবে আমি তোমাদের এর থেকে কিছু দিতে পারি; কিন্তু এও আমি বলছি যে যারা পরিশ্রম করতে পারে এবং সৎভাবে জীবিকা উপার্জন করতে পারে, এতে তাদের কোন অংশ নেই।'—আবু দাউদ।

৭৩৮. ধনী বা সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ভিক্ষা করা বৈধ নয়, ভিক্ষা কেবল দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্য।—আ. দা। তির।

৭৩৯. যার ঘরে একদিন বা এক দিন-রাতের খাদ্য আছে ভিক্ষা করা তার পক্ষে বৈধ নয়।—আবু দাউদ।

৭৪০. মুখারেক বিন কাবিসা (রাঃ) বলেন ঃ এক সময় আমি ঋণগ্রস্ত হই, তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করি। তারপর তিনি বললেন, 'অপেক্ষা কর, দেখা যাক কোন দান সামগ্রী আসে কিনা; আমি তোমাকে সে সম্পর্কে কিছু বলব।' পরে বললেন; 'হে কাবিসা! ভিক্ষা করা কেবল তিন ব্যক্তির পক্ষে বৈধ—প্রথম, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যতক্ষণ ঋণভারাক্রান্ত থাকে; দ্বিতীয়, দৈব-দুর্ঘটনায় সর্বস্বহারা ব্যক্তি যতক্ষণ দুর্দশাগ্রস্ত থাকে; তৃতীয়, গ্রামের তিনজন জ্ঞানী ও সাধু ব্যক্তি যার অনাহারে থাকা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় সে যতক্ষণ পর্যন্ত অনাহারে থাকে। হে কাবিসা! এছাড়া আর কারো পক্ষে ভিক্ষা করা বৈধ নয়। এছাড়া যে ভিক্ষা করে সে নিষিদ্ধ বস্তু (হারাম) ভক্ষণ করে।'—মুসলিম।

৭৪১. যে ব্যক্তি ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে আল্লাহ্ তার জন্য অভাবের দ্বার উন্মুক্ত করেন।—তিরমিজী।

৭৪২. একদিন একজন লোক রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে কিছু চাইলে তিনি তাকে কিছু দিলেন। কিন্তু ফিরে যাবার সময় যখন সে দরজায় পা রাখল তখন তিনি সমবেত সকলকে সম্বোধন করে বললেন, 'ভিক্ষা করা কত মন্দ তা যদি তোমরা জানতে তাহলে কখনো কারো কাছে কিছু চাইতে না।'—নাসায়ী।

৭৪৩. যে কখনো কারো কাছে কিছু চাইবে না বলে আমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়, আমিও তাকে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দিই।—আবু দাউদ। নাসায়ী।

৭৪৪. কারো কোন অভাব উপস্থিত হলে সে যদি তা মানুষের ওপর নিক্ষেপ করে (অর্থাৎ মানুষের কাছে ভিক্ষা চায়), তাহলে কখনো তার অভাব দূর হয় না; আর যে তার অভাব পূরণের জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাকে দ্রুত মৃত্যু অথবা পরিমিত ধন দ্বারা অবিলম্বে তার অভাব পূর্ণ করেন।—আবু দাউদ। তিরমিজী।

৭৪৫. যে ব্যক্তি লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ফেরে এবং দু-এক গাল খাদ্য কিংবা দু-একটা খেজুর পেয়ে ফিরে যায় সে প্রকৃত মিসকিন নয়, বরং প্রকৃত মিসকিন সে যার নিজেকে অভাবমুক্ত রাখার সামর্থ্য নেই অথচ লোকে তার অভাবের খবর জানতে পারে না যে তাকে দান করবে এবং সেও কারো কাছে ভিক্ষার জন্য দাঁড়ায় না।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যপ্রীতি

'হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ তা বুঝতে পার, এবং অপবিত্র (অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন) অবস্থাতেও নয়, যদি তোমরা পথচারী না হও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা স্নান কর।' ৪(৪৩)

'হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথায় হাত

বুলাবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে, যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষ ভাবে পবিত্র হবে।' ৫(৬) [অজু ও স্নান পরিচ্ছন্নতার প্রতীক।]

'হে আদমসন্তানগণ! প্রত্যেক নামাজের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে।' ৭(৩১)

'তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্যে আমি তোমাদের পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং সাবধানতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট।' ৭(২৬)

—আল্-কোরআন।

৭৪৬. যে ব্যক্তি জুম্'আর দিনে (শুক্রবার) স্নান করবে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তমরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ করবে, তারপর নিজের সঞ্চিত তেল থেকে নিজের শরীরে কিছু মাখবে অথবা ঘরে সুগন্ধি থাকলে কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করবে, তারপর মসজিদে গমন করবে এবং (মসজিদে গিয়ে) দুই ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করবেনা, তারপর যা তার পক্ষে সম্ভব নফল সুন্নত নামাজ পড়বে, তারপর ইমাম যখন খোতবা পাঠ করতে থাকবেন নীরবে শুনবে—নিশ্চয়ই তার এ জুম্'আ এবং পূর্ববর্তী জুম্'আর মধ্যবর্তী সমস্ত সাধারণ পাপ মাফ করে দেওয়া হবে। [অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধিপ্রীতি অন্যান্য উপাসনার মতই পাপ মোচনের উপায়।]—মিশকাত। বর্ণনায়ঃ সালমান (রাঃ)।

৭৪৭. পরিচ্ছন্নতা ইমানের অর্ধেক।—মুসলিম।

৭৪৮. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে আমি সর্বোত্তম আতরের দ্বারা সুবাসিত করতাম, এমনকি তাঁর মাথা ও দাড়ি থেকে আমি সুঘ্রাণ লাভ করতাম।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৭৪৯. ইব্নে ওমর যখন সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, আতর ব্যতীত তিনি চন্দনের সুগন্ধিও ব্যবহার করতেন। তিনি চন্দনের সাথে কর্পূর মিশ্রিত করে নিতেন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এই ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। —মুসলিম। বর্ণনায়ঃ না'ফে (রাঃ)।

৭৫০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, পুরুষের সুগন্ধির ঘ্রাণ প্রকাশ্য কিন্তু রঙ গুপ্ত ; নারীর সুগন্ধির রঙ প্রকাশ্য কিন্তু ঘ্রাণ গুপ্ত হওয়া উচিত।—তির। নাসায়ী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৭৫১. তোমাদের কেউ স্নানাগারে প্রস্রাব করবেনা, তারপর সেখানে স্নান বা অজু করবে না ; কারণ ওতেই অধিকাংশ অসৎ প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়।—আ. দাউদ। তির। নাসায়ী।

৭৫১.(ক) যখন নবী (সঃ) প্রস্রাব করতেন তখন গুপ্তাঙ্গ ধৌত করতেন ও অজু করতেন।—আবু দাউদ। নাসায়ী।

৭৫২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের কাছে এলে তিনি এক ব্যক্তিকে আলুলায়িত কেশে দেখে বললেন, 'কোন্ জিনিসের দ্বারা মাথার কেশ বিন্যাস করতে হয়, তা এই ব্যক্তি দেখতে পাচ্ছে না ?' এক ব্যক্তির অপরিষ্কার বস্ত্র দেখে বললেন, 'কোন্ জিনিসের দ্বারা কাপড় পরিষ্কার করতে হয় তা এই ব্যক্তি দেখতে পাচ্ছেনা ?' নাসায়ী। বর্ণনায়ঃ জাবের (রাঃ)।

৭৫৩. শুভ্র বস্ত্র পরিধান কর—এ সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও পবিত্র এবং

তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরও এর দ্বারা কাফন কর।—আবু দাউদ। নাসায়ী। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ সামোরাহ্ (রাঃ)।

৭৫৪. হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'তোমরা চোখে এছমদ সুরমা ব্যবহার করবে। ও চোখকে উজ্জ্বল করে এবং চোখে নতুন পালক সৃষ্টি করে ও তা ঘন-সন্নিবিষ্ট করে।' ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরো বর্ণনা করেন যে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে একটা সুরমাদান ছিল; তার থেকে রোজ রাতে তিনি কাঠির সাহায্যে প্রত্যেক চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন।—তিরমিজী।

৭৫৫. (রাত্রে) শয়নকালে এছমদ সুরমা ব্যবহার করা তোমাদের কর্তব্য। কারণ ও চোখকে উজ্জ্বল করে এবং চোখের পালক সৃষ্টি করে।—তির। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

৭৫৬. বশীর ইবনে খাছাছিয়ার স্ত্রী জাহ্জমাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে পবিত্র মস্তকের কেশরাজির পানি ঝাড়তে ঝাড়তে বের হতে দেখেছি। অবশ্য তিনি স্নান করেছিলেন, তাঁর পবিত্র মস্তকে মেহদীর সামান্য সামান্য রঙ ছিল।'—তির।

পাত্রী দেখা

৭৫৭. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন নারীকে বিবাহ করার প্রস্তাব করে, সে যাকে বিবাহ করতে চায়, তাকে যদি দেখার সুযোগ পায়, সে যেন তা করে।—আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

৭৫৮. আমি একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করতে চাইলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে বললেন, 'তুমি কি তাকে দেখেছ?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'তাকে একবার দেখ, কেননা তোমাদের মধ্যে ভালবাসা স্থায়ী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।' অন্য বর্ণনায় ঃ 'যাও তাকে দেখে এস, হয়তো তোমাদের উভয়ের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হবে।'—আহ্মদ। নাসায়ী। তির। ই. মাজা। মিশকাত।

পাপ ও পুণ্য

'হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান হতে দূরে থাক, কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে কল্পনা বা অনুমান পাপ।' ৪৯(১২)

'কেউ কোন পুণ্য কাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে, আর কেউ কোন পাপের কাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল (শাস্তি) দেওয়া হবে।' ৬ (১৬০)

'নিশ্চয়ই তোমাদের ওপর প্রহরিগণ আছে—কেরামন ও কাতেবিন (পাপ ও পুণ্য লেখক ফেরেশতা)। তোমরা যা কর তা তারা জ্ঞাত আছে এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সবকিছুই লিখিত হয়।'

'এবং তোমরা পুণ্য সাধনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্য সাধকদের ভালবাসেন।' ২(১৯৫)

—আল্-কোরআন।

৭৫৯. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'হে ওয়াবেসা! তুমি আমাকে পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?' আমি বললাম, 'হাঁ।' তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো একত্র করে তাঁর বুকে তিনবার লাগিয়ে বললেন, 'তোমার বিবেকের কাছে উত্তর চাও। বিবেক যে কাজে সন্তুষ্ট তাই পুণ্য—মনে যা সন্দেহ এবং হৃদয়ে যা দ্বিধা উৎপাদন করে তাইই পাপ।'—আহ্মদ। বর্ণনায়ঃ ওয়াবেসা (রাঃ)।

৭৬০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'সৎ স্বভাব বা উত্তম ব্যবহারই পুণ্য এবং যা তোমাকে অনুতপ্ত করে ও লোকে যার সন্ধান নিলে তোমার ঘৃণা হয় তাই হল পাপ।'—মুসলিম। বর্ণনায়ঃ নাওয়াস বিন সাময়ান (রাঃ)।

৭৬১. পুণ্য কাজ মহৎ লোকের সঙ্গী।—সগির।

৭৬২. আমার উম্মতদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা কোন পাপ কাজ করলে ক্ষমা ভিক্ষা করে, আর পুণ্য কাজ করলে আনন্দ প্রকাশ করে।—সগির।

৭৬৩. পুণ্য কাজ অনেক, কিন্তু পালনকারী অতি অল্প।—সগির।

৭৬৪. পুণ্য কাজ অল্প হলেও তার পুরস্কার অপরিসীম।—সগির।

৭৬৫. হে মানবসকল! তোমাদের পক্ষে যা সহজ সেই পুণ্য কাজ পালন কর; কারণ আল্লাহ্ ওর পুরস্কার দিতে ক্লান্তি বোধ করেন না—যে পর্যন্ত না তোমরা ক্লান্তি বোধ কর। পুণ্য কাজের মধ্যে সেই কাজই আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় যা অল্প হলেও অনবরত করা হয়।—৬ জন।

৭৬৬. পুণ্য ও পাপ কর্ম পরলোকে মানুষের সামনে দুটি মূর্তিতে উপস্থিত হবে। পুণ্যকর্ম পুণ্যবানদের সুসংবাদ দান করবে আর তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করবে। পাপকর্ম, পাপীদের বলবে, আমি তোমাদের কাছে এসেছি—কিন্তু সে তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করা ব্যতীত অন্য কোন সাহায্য করবে না।—বয়হাকী।

৭৬৭. পৃথিবী নশ্বর—সাধু-অসাধু সকলেই এ থেকে আহার্য গ্রহণ করছে। পরলোক সত্য নির্দিষ্ট বস্তু, সেখানে শক্তিশালী প্রভু (আল্লাহ্)-ই একমাত্র বিচারক। জেনে রেখো—পুণ্যের চার দিকে স্বর্গ এবং পাপের চারদিকে নরক। অতএব সকলেই আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। এবং জেনে রেখো তোমাদের কার্যাবলী তোমাদের সম্মুখে রাখা হবে, তারপর যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্র সৎকার্য করেছে সে তা দেখবে এবং যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্র অসৎ কার্য করেছে সেও তা দেখবে। [অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমনি ফল পাবে।]—মিশকাত।

৭৬৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ-পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন। যে ব্যক্তি একটা পুণ্য কাজ করতে ইচ্ছা করে আল্লাহ্ তার জন্য একটা পুরস্কার লিখে রাখেন। তারপর যখন সে তা (সম্পন্ন করার) ইচ্ছা করে এবং তা সম্পন্ন করে তখন তার জন্য সাত থেকে সাতশ গুণ বা তার চেয়ে বেশী পুরস্কার লিপিবদ্ধ করেন। যে ব্যক্তি একটা পাপ কাজ করার ইচ্ছা করে কিন্তু তা করে না—আল্লাহ্ তার জন্য একটা পুণ্য কাজের পুরস্কার লিপিবদ্ধ করেন; তারপর যখন সে তা সম্পন্ন করে তখন তিনি তার জন্য শুধু একটা পাপের শাস্তি লিপিবদ্ধ করেন।—শায়খান।

৭৬৯. সত্যকার মুসলমান তার পাপকে এমন মনে করে যেন সে একটা পাহাড়ের নীচে বসে আছে এবং তা তার মাথার ওপরে পড়বে বলে ভয় করছে। অবিশ্বাসী তার পাপকে মনে করে যেন মাছি তার নাকের ওপর বসে আছে এবং সে ইচ্ছা করলেই তাকে তাড়িয়ে দিতে পারে।—শায়খান। তিরমিজী।

৭৭০. তোমাদের মধ্যে কেউ কোন পাপকার্য অনুষ্ঠিত হতে দেখলে সে যেন হাত দিয়ে তাতে বাধা দেয়, নয়তো মুখ দিয়ে তা নিষেধ করে; আর যদি তাও না পারে তবে যেন অন্তর দিয়ে সেই পাপকার্যকে ঘৃণা করে।—বুখারী ও আরো ৫ জন।

৭৭১. যার পুণ্য নেই, তার কোন পুরস্কার নেই।—সগির।

৭৭২. নামাজ পুণ্যের চাবি এবং মদ সমস্ত পাপের চাবি।—সগির।

৭৭৩. মানুষ যখন কোন পাপ কাজ করে তখন তার মনের ওপর একটা কালো দাগ পড়ে, তারপর যখন সে তা ত্যাগ করে এবং তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা ও অনুতাপ করে তখন তার অন্তর পরিষ্কৃত হয় এবং যদি সে ক্রমাগত তা (পাপ) করতে থাকে তবে তা তার সমস্ত অন্তরকে আবৃত করে এবং ও সেই মরিচা যে সম্পর্কে খোদাতা'লা বর্ণনা করেছেন (৮৩ : ১৪)।—তিরমিজী।

৭৭৪. উত্তম ও সুন্দর পোশাক (দ্বারা সজ্জিত হওয়া) পুণ্য কাজ নয়, বরং আত্মার শান্তি ও সংযমই পুণ্য।—সগির।

৭৭৫. যে ব্যক্তি অপরকে পুণ্য কাজ করতে আদেশ করে—সে অবশ্যই নিজে তা পালন করবে।—বয়হাকী।

৭৭৬. তারাই আল্লাহ্‌র প্রিয়তম বান্দা যারা পুণ্যকাজকে প্রিয় মনে করে এবং তা পালনে প্রীতি লাভ করে।—সগির।

পেঁয়াজ-রসুন

৭৭৭. আবু সাঈ'দ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেন, আমাদের উপস্থিতিতেই খয়বর বিজয় সম্পন্ন হল। তারপর রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর শিষ্যগণ রসুন-ক্ষেত্রে অবতরণ করলেন। যেহেতু তাঁরা ক্ষুধার্ত ছিলেন, সেখানে খুব করে' খেয়ে নিলেন। তারপর আমরা মসজিদের দিকে চললাম। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) গন্ধ পেলেন। তারপর বললেন, 'যে ব্যক্তি এই (রসুনের) গাছড়া থেকে খাবে সে যেন (সেই অবস্থায়) আমাদের মসজিদের ধারে না আসে।' লোকেরা তখন বলতে লাগলেন, 'রসুন হারাম (নিষিদ্ধ) হয়ে গেছে।' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'আল্লাহ্ যা আমার জন্য হালাল করেছেন আমি তা হারাম করতে পারি না। কিন্তু ও এমন একটা গাছড়া যার গন্ধ আমি পছন্দ করি না।'—মুসলিম।

৭৭৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এবং তাঁর কিছু শিষ্য একটা পেঁয়াজ-ক্ষেত্র অতিক্রম করছিলেন। তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ ক্ষেতে নেমে পেঁয়াজ খেলেন আর কেউ কেউ খেলেন না। তারপর আমরা রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দিকে চললাম। যাঁরা পেঁয়াজ খান নি রসুলুল্লাহ্ তাঁদের কাছে

ডাকলেন, আর যাঁরা খেয়েছেন তাঁদের মুখের গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত কাছে ডাকলেন না।—মুসলিম।

৭৭৯. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই গাছড়া (অর্থাৎ পেঁয়াজ-রসুন) থেকে খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে এবং আমাদের ওর দুর্গন্ধ দ্বারা কষ্ট না দেয়।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৭৮০. যে ব্যক্তি এই সব সবজি (পেঁয়াজ-রসুন) খাবে—যতক্ষণ ওর গন্ধ মুখ থেকে দূর না হয় ততক্ষণ সে যেন মসজিদের কাছে না আসে।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ) থেকে আব্দুল আজীজ ইবনে সুহাইব (রাঃ)।

৭৮১. যে ব্যক্তি পেঁয়াজ, রসুন (এবং) এ ধরনের অন্য কোন দুর্গন্ধযুক্ত তরকারি খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। কেন না মানুষেরা যে যে জিনিসের জন্যে কষ্ট পায় ফেরেশ্তারাও সেই সব জিনিসের জন্য কষ্ট পায়।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)।

৭৮২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন. নবী (সঃ) বলেছেন, 'যে কেউ (কাঁচা) রসুন বা পেঁয়াজ খায় সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে (অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে) এবং ঘরে বসে থাকে।' (একবার) নবী (সঃ)-এর কাছে একটা পাতিল আনা হয়। ওতে কিছু সবুজ তরি-তরকারি ছিল। তিনি তার থেকে এক প্রকার গন্ধ পেলেন এবং যখন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তখন তাতে যে সব তরি-তরকারি ছিল তা তাঁকে বলা হল। তিনি তাঁর সঙ্গী এক সাহাবীকে তা দিয়ে দিতে বললেন। যখন তিনি দেখলেন যে তিনি না খাওয়ায় সে (সাহাবী) তা খেতে চাইছে না, তখন তিনি বললেন, 'তুমি খাও. কেন না আমি যার সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলি তুমি তাঁর সঙ্গে চুপি চুপি কথা বল না।' অন্য বর্ণনায় আছে. তাঁর কাছে সবুজ তরি-তরকারির একটা গোল থালা আনা হয়েছিল।—বুখারী।

পোশাক-পরিচ্ছদ

'হে আদম-সন্তানগণ! তোমাদের লজ্জা নিবারণের এবং সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য আমি পোশাক-পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করেছি, কিন্তু পবিত্রতার পরিচ্ছদই উত্তম।'

'আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করুন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সৌন্দর্যবৃদ্ধিকারী যে পোশাক-পরিচ্ছদ দান করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে?'

—আল্-কোরআন।

৭৮৩. আহার কর, পান কর, দান কর এবং পরিধান কর—যে পর্যন্ত অমিতব্যয়িতা এবং অহঙ্কার ওতে মিশ্রিত না হয়।—নাসায়ী। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ আমর (রাঃ)।

৭৮৪. যা খুশী খাও, যা খুশী পর—যে পর্যন্ত অপব্যয় আর অহঙ্কার—এ দুটো জিনিস তোমাদের স্পর্শ না করে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৭৮৫. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি (মূল্যবান) সুন্দর বসন পরিধান ত্যাগ

করে, আল্লাহ্ তাকে সম্মানের বসন পরিধান করাবেন।—আ. দাউদ। তির। বর্ণনায় ঃ সোয়ায়েদ বিন ওহাব (রাঃ)।

৭৮৬. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর কাছে আমি যখন ছিন্ন বসন পরিধান করে এলাম তিনি বললেন, 'তোমার অর্থ নেই?' আমি বললাম, 'হাঁ।' তিনি বললেন, 'কি সম্পত্তি?' আমি বললাম, 'আল্লাহ্ আমাকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়েছেন—উট গোরু, ঘোড়া এবং দাসদাসী।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ যখন তোমাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন তখন সে দানের চিহ্ন তোমার দেহের ওপরে প্রকাশ করা উচিত।—মিশকাত। বর্ণনায় ঃ আবুল আহ্ওয়াস (রাঃ)।

৭৮৭. তোমরা শুভ্রবসন ব্যবহার কর—তোমাদের জীবিত ব্যক্তিরা তা পরিধান করবে এবং মৃতদের তার দ্বারা কাফন দেবে। কেন না শুভ্রবসন (সাদা পোশাক) তোমাদের সকল পোশাকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।—তির। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৭৮৮. শুভ্র বসন পরিধান কর, ও হল সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও পবিত্র; এবং তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের ওর দ্বারা কাফন কর।—আ. দাউদ। নাসায়ী। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ সামোরাহ্ (রাঃ)।

৭৮৯. তোমাদের কবরে এবং মসজিদে আল্লাহ্তা'লার সঙ্গে সাক্ষাতের সর্বাপেক্ষা উত্তম বস্ত্র হল শ্বেতবর্ণের বস্ত্র।—ইবনে মাজা। বর্ণনায় ঃ আবু দ্দারদা (রাঃ)।

৭৯০. 'যে ব্যক্তি অহঙ্কার প্রকাশের জন্য তার পাজামা লম্বা করে, পরলোকে আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন না।' এ কথা শুনে হজরত উম্মে সালমা (রাঃ) বললেন, 'তাহলে স্ত্রীলোকেরা তাদের আঁচল কত বড় রাখবে?' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'আধ হাত পরিমাণ লম্বা রাখবে।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি ওতে তাদের পাদুটো ঢাকা না পড়ে?' তিনি বললেন, 'তবে এক হাত পর্যন্ত বাড়াবে এবং অতিরিক্ত বাড়াবে না।'—তির। আ. দাউদ। নাসায়ী। ই. মাজা। মালেক।

৭৯১. পাজামার কোন অংশ পায়ের গোড়ালির নীচে গেলে দোজখের শাস্তি ভোগ করতে হবে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৭৯২. যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও ধনগর্ব প্রকাশের জন্যে আপন পরিধানের লুঙ্গি মাটির ওপর দিয়ে লুটোতে লুটোতে নিয়ে যায়, আল্লাহ্তা'লা কেয়ামতের দিন তার প্রতি করুণাপূর্ণ নয়নে তাকাবেন না।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৭৯৩. 'যে ব্যক্তি বড়মানুষী ও অহঙ্কার বশে আপন পরিধের বস্ত্র হিঁচড়ে নিয়ে চলে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার প্রতি করুণাপূর্ণ নয়নে তাকাবেন না।' এ কথা শুনে আবু বকর (রাঃ) বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্! আমার (সেলাইবিহীন) লুঙ্গির প্রান্ত (সময় সময়) ঝুলে পড়ে যদি না আমি বিশেষ রূপে যত্নবান হই এবং লক্ষ্য রাখি।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'আপনি তো তাদের মত নন যারা বড়মানুষী ও অহঙ্কারবশে অমন করে।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৭৯৪. পায়ের গোড়ালির নীচে পরিধের বস্ত্র ঝুলিয়ে দেওয়া থেকে খুব

সাবধানতার সাথে বিরত থেকো, কারণ এই অভ্যাসটা অহংকার ও ধনগর্বের অঙ্গরূপে গণ্য হয় যার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত নারাজ ও অসন্তুষ্ট।—মিশকাত।

৭৯৫. যে ব্যক্তি অহঙ্কার বশে আপন পাজামা লম্বা করে রাখে, তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে এবং শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সে সেখানে অস্থির থাকবে।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৭৯৬. স্বর্ণ এবং রেশম আমার উম্মতদের মধ্যে নারীদের জন্য বৈধ এবং পুরুষদের জন্য অবৈধ (হারাম)।—তির। নাসায়ী। বর্ণনায়ঃ আবু মুসা আশ্‌য়ারী (রাঃ)।

৭৯৭. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে সোনার আংটি, রেশমের পোশাক, রুকু ও সিজদাতে কোরআন পাঠ এবং লাল রঙের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ আলী (রাঃ)।

৭৯৮. স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে না, মোটা বা মিহি রেশমী কাপড় পরবে না এবং ওর ওপর বসবে না।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ হোজায়ফা (রাঃ)।

৭৯৯. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) লালরঙের রেশমী কাপড়ের গদি বা আসন এবং রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ ইবনে আজেব (রাঃ)।

৮০০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একদিন আমাকে এক জোড়া রেশমী কাপড় দিলেন। আমি তা পরে' বাইরে এলে রসূলুল্লাহ্‌র মুখে অসন্তোষের চিহ্ন ফুটে উঠল। তখনই আমি ঐ কাপড়জোড়াকে ছিঁড়ে মেয়েদের ওড়না তৈরী করে দিলাম।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আলী (রাঃ)।

৮০১. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন—তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের পরিধানে রেশমী চাদর দেখেছেন।—বুখারী।

৮০২. একদিন আবুবকরের কন্যা আসমা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরনে একখানা সূক্ষ্ম বস্ত্র ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) অন্য দিকে মুখ ফেরালেন এবং বললেন, 'হে আসমা! যখন কোন নারী যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তার এই (মুখ এবং হাত) ছাড়া দেহের অন্য কোন অংশ খোলা বা দৃষ্টিগোচর রাখা উচিত নয়।'—আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৮০৩. যে ব্যক্তি খ্যাতিলাভের জন্য দুনিয়াতে কোন বসন পরিধান করবে, হাশরের দিনে তাকে অসম্মানের বসন পরিয়ে দেওয়া হবে।—তির। আ. দাউদ। ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৮০৪. যে-ব্যক্তি যে-সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে, সে তাদেরই দলভুক্ত।—আহ্‌মদ। আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৮০৫. মোশরেক ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে আমরা টুপির ওপরে পাগড়ি ব্যবহার করি।—তির।

৮০৬. আবু কাবশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সহচরগণ যে টুপি ব্যবহার করতেন তা মাথার সাথে মিশে থাকত।—তির।

৮০৭. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন পাগড়ি পরতেন, তিনি তা দুই কাঁধের মাঝখান দিয়ে ঝুলিয়ে দিতেন।—তির। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৮০৮. তোমরা পাগড়ি পরবে, কারণ এ ফেরেশ্তাদের চিহ্ন এবং এ তোমাদের পিঠের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দেবে।

৮০৯. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) অধিকাংশ সময় পবিত্র মস্তকের ওপরে এক খণ্ড বস্ত্র রাখতেন। তাঁর বস্ত্রখণ্ড তেলীর বস্ত্রখণ্ডের মত তৈলাক্ত হত [কিন্তু ময়লা হত না]—তির। বর্ণনায়ঃ আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)।

৮১০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রিয় পোশাক ছিল সবুজ রঙের জোব্বা। —শায়খান। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৮১১. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইয়েমেন প্রদেশের তৈরী ডোরাকাটা সবুজ রঙের এক ধরনের কাপড় বেশী পছন্দ করতেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৮১২. আয়েশা (রাঃ) মোটাকাপড়ের একখানা চাদর ও একখানা লুঙ্গি বের করে দেখালেন এবং বললেন, মৃত্যুকালে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পরিধানে এই দুখানা কাপড় ছিল।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৮১৩. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যে শয্যায় শয়ন করতেন তা চর্মনির্মিত ছিল এবং তার মধ্যে খেজুরের বাকল (ছাল) ছিল।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৮১৪. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) খেজুরের বাকল বিশিষ্ট তাকিয়া (বালিশে) হেলান দিয়ে বসতেন।—মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৮১৫. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় পোশাক ছিল কামিজ (বা লম্বা জামা)।—তির। আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ উম্মে সালমা (রাঃ)।

৮১৬. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন জুব্বা পরতেন তখন ডান দিক থেকে আরম্ভ করতেন।—তির। বর্ণনায়—আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৮১৭. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর কাছে একখানা চাদর ছিল, তাতে নানারকমের নকশা করা ছিল। ঐ সব নকশা নামাজের একাগ্রতায় বাধা সৃষ্টি করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ঐ চাদর খানা (দানকারী) আবু জাহামকে (ফেরত) দিয়ে দিলেন এবং তার পরিবর্তে (জাহামের সন্তুষ্টির জন্য) তার সাদা চাদর খানা চেয়ে নিলেন।—মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)

৮১৮. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) পরিধানের জন্যে সকল প্রকার পোশাকের মধ্যে লম্বা জামা-ই অধিক পছন্দ করতেন।—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ উম্মে সালমা (রাঃ)।

৮১৯. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত ছিল।—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ এজিদকন্যা আসমা (রাঃ)।

৮২০. রসূলুল্লাহ (সঃ) পারস্য-সম্রাট খসরু, রোমসম্রাট কাইজার (বা সীজার) এবং আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী প্রভৃতি (অনারব) প্রধানদের কাছে (পাঠাবার জন্য) যখন পত্র লেখালেন তখন তাঁকে বলা হল যে তাঁরা শীল মোহরবিহীন পত্র গ্রহণ করেন না। কাজেই রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটা আংটি গড়ালেন। তার

বেষ্টনী রৌপ্য-নির্মিত ছিল এবং তার ওপরে অংকিত ছিল—মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্। —তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ কাতাদাহ্ (রাঃ)।

৮২১. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মোহরটি রৌপ্য-নির্মিত ছিল, ওর বেষ্টনীও রৌপ্য-নির্মিত ছিল।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৮২২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কোন নতুন পোশাক পরিধান করার সময় পাগড়ি, জামা ও চাদর নির্বিশেষে পোশাকের নাম নিতেন তারপর প্রার্থনা করতেন, 'হে করুণাময় আল্লাহ্, সমস্ত প্রশংসা তোমারই—তুমি আমাকে এই পোশাক পরিধান করিয়েছ। এর মঙ্গলের জন্য আর এর সৃষ্ট মঙ্গলের জন্য আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি এবং এর অমঙ্গল আর এর সৃষ্ট অমঙ্গল থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।'—তির। আ. দাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু সঈদ খুদরী (রাঃ)।

প্রতারণা

৮২৩. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'যে লোক বিশ্বাসী ব্যক্তির অনিষ্ট করে অথবা তার সাথে প্রতারণা করে সে অভিশপ্ত।'—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবুবকর (রাঃ)।

৮২৪. যে ব্যক্তি অহংকার, প্রতারণা এবং ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।—তিরমিজী। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ সাওবান (রাঃ)।

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য

'আত্মীয়-প্রতিবেশী এবং অন্যান্য প্রতিবেশীর প্রতি সৎ হও।'

—আল্-কোরআন।

৮২৫. যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন এবং যে তাকে কষ্ট দেবে আল্লাহ্ তাকে কষ্ট দেবেন।—আবু দাউদ।

৮২৬. যার অত্যাচার থেকে প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয় সে কখনো বেহেশ্‌তে যাবে না।—শায়খান। মুস। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৮২৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে।—বুখারী। শায়। আ. দাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৮২৮. প্রতিবেশীর প্রতি তোমার কর্তব্য কি তা কি তুমি জান ? সে তোমার সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করবে, সে তোমার কাছে ঋণ চাইলে তাকে ঋণ দেবে ; সে অভাবগ্রস্ত হলে তাকে সাহায্য করবে ; সে অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করবে ; তার মৃত্যু হলে জানাজাতে যোগ দেবে ; তার সুসংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করবে ; তার অনুমতি ব্যতীত তোমার গৃহকে এত উঁচু করবে না যাতে তার বাড়ীতে বাতাস

প্রবেশ করতে বাধা পায়। তাকে যন্ত্রণা দেবে না। যদি কোন ফল ক্রয় কর তবে তাকে কিছু দেবে, যদি না দাও তবে গোপনে তা ঘরে নিয়ে যাবে এবং তোমার সন্তানদের তা বাইরে নিয়ে যেতে দেবে না, যাতে তার সন্তানদের রাগ না জন্মায়। —মিশকাত। বর্ণনায় ঃ আমর (রাঃ)।

৮২৯. হে মুসলমান মহিলাগণ। কোন প্রতিবেশিনী তার প্রতিবেশিনীকে ছাগলের খুরের মধ্যবর্তী মাংস রান্না হলেও তা উপহার দিতে যেন কষ্টবোধ না করে।—বুখারী। মুস। আহমদ। তির। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৮৩০. যখন তোমরা তরকারি রান্না কর, তার ঝোল বৃদ্ধি ক'রো এবং তোমার প্রতিবেশিগণকে তা থেকে কিছু দিও।—মুসলিম। বর্ণনা ঃ আবুজর (রাঃ)।

৮৩১. আমি কি তোমাদের বলব তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম কারা? যারা একা একা আহার করে, চাকরদের প্রহার করে এবং কাউকে কিছু দিতে কুণ্ঠিত হয়।—মিশকাত।

৮৩২. 'আমার দুজন প্রতিবেশী আছে, কাকে উপহার দেব?' তিনি (রসুলুল্লাহ্ সঃ) বললেন, 'যার দুয়ার তোমার দুয়ারের অধিকতর নিকটবর্তী।' —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৮৩৩. এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি ভাল করেছি কি মন্দ করেছি—তা আমি কি করে জানব?' তিনি বললেন, 'যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শোন 'তুমি ভাল করেছ' তখন তুমি প্রকৃতই ভাল করেছ, আর যখন তুমি শোন যে 'তুমি মন্দ করেছ' তখন তুমি প্রকৃতই মন্দ করেছ।'—ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ ইবনে মসউদ (রাঃ)।

৮৩৪. এক ব্যক্তি বলল, 'হে রসুলুল্লাহ্। কোনো স্ত্রীলোক খুব নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং জাকাত দেয়, এছাড়া অন্যান্য সৎকাজ করে, কিন্তু সে তার প্রতিবেশীদের তার জিহ্বা দ্বারা পীড়ন করে (অর্থাৎ গালমন্দ করে)।' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'সে নরকে যাবে।' সে বলল, 'হে রসুলুল্লাহ্। কোনো স্ত্রীলোক রোজাও বিশেষ রাখে না, দান-খয়রাতও তেমন করে না, নামাজও বিশেষ পড়ে না—অথচ প্রায়ই সত্য কথা বলে এবং প্রতিবেশীদের কুকথা বলে কষ্ট দেয় না।' তিনি বললেন, 'সে বেহেশ্‌তে যাবে।'—বয়হাকী।

৮৩৫. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে ভালবাসতে এবং তাঁদের ভালবাসা পেতে ইচ্ছা করে—সে যেন সদা সত্য কথা বলে, গচ্ছিত ধন ফেরত দেয় এবং প্রতিবেশীর উপকার করে।—মিশকাত।

৮৩৬. যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরে খায় আর তার নিকটতম প্রতিবেশীকে অভুক্ত রাখে, সে কখনো মুসলমান নয়।—মিশকাত।

৮৩৭. যে ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত তার ভায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, সে যেন তাকে হত্যা করেছে।—আ. দাউদ।

৮৩৮. কোন মুসলমানের পক্ষেই উচিত নয় যে, সে তার ভায়ের সাথে তিন রাত্রির অধিক কথাবার্তা বন্ধ রাখে বা যখন দুই বিবাদীর সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন পরস্পর বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। তবে তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে প্রথমে সালাম করে কথা বলে।—নাসায়ী ও আরো ৫ জন।

৮৩৯. যে ব্যক্তি তার বন্ধুদের প্রতি ব্যবহারে উত্তম আল্লাহ্‌র কাছে সে বন্ধুদের মধ্যে উত্তম এবং যে প্রতিবেশীর প্রতি (ব্যবহারে) উত্তম আল্লাহ্‌র কাছে সে প্রতিবেশীদের মধ্যে উত্তম।—তিরমিজী। বর্ণনায় : আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ)।

৮৪০. এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীর দেওয়ালের ওপর আবশ্যকবোধে আড়কাঠ, কড়িকাঠ ইত্যাদি রাখলে তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।—বুখারী। বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৮৪১. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে তার কর্তব্য হবে প্রতিবেশীকে সম্মান করা।—বুখারী। বর্ণনায় : আবু শোরায়হ্ (রাঃ)।

৮৪২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর সহচরদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে আমার কাছ থেকে এই বাক্যগুলো গ্রহণ করবে এবং সেই মত কাজ করবে অথবা আমি যা শিক্ষা দেব সেই অনুসারে কাজ করবে ?' আমি বললাম, 'আমি।' তিনি আমার হাত ধরে পাঁচটা বিষয় গুণে গুণে বললেন, '(১) হারামকে ত্যাগ করবে, তবে তুমি মানুষের মধ্যে বড় উপাসক (আবেদ) হবে ; (২) আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকবে, তাহলে তুমি মানুষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অভাবশূন্য বা স্বাবলম্বী হবে ; (৩) তোমার প্রতিবেশীদের উপকার করবে, তাহলে তুমি প্রকৃত বিশ্বাসী বা ঈমানদার হবে ; (৪) তোমার জন্যে যা ভালবাস অন্য মানুষদের জন্যও তাই ভালবাসবে তাহলে প্রকৃত মুসলমান হবে ; আর (৫) অধিক হাস্য করবে না কারণ অধিক হাস্য হৃদয়কে মৃত করে।'—বুখারী। মুস। তির। আহ্মদ। বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৮৪৩, আল্লাহ্‌র কাছে সেই ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট যে তার বন্ধুদের কাছে সর্বোৎকৃষ্ট এবং আল্লাহ্‌র কাছে সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট যে তার প্রতিবেশীদের মধ্যে উৎকৃষ্ট।—মিশ।

৮৪৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ যেমন তোমাদের রেজেক বণ্টন করেছেন তেমন তোমাদের মেজাজ বণ্টন করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ভালবাসেন আর যাকে ভালবাসেন না উভয়কেই দুনিয়া দান করেন, কিন্তু যাকে ভালবাসেন তাকে ছাড়া আর কাউকে ধর্ম দান করেন না। যার হাতে আমার জীবন—তার শপথ, মানুষ কখনো (প্রকৃত) মুসলমান হয় না, যে পর্যন্ত তার হৃদয় ও জিহ্বা মুসলমান না হয় এবং সত্যকার বিশ্বাসী (ঈমানদার) হয় না যে পর্যন্ত তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ না হয়।—মিশকাত।

৮৪৫. একদিন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলে উঠলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম (শপথ) সে মোমেন নয়, আল্লাহ্‌র কসম সে মোমেন (প্রকৃত মুসলমান) নয়, আল্লাহর কসম সে মোমেন নয়।' রসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে রসূলুল্লাহ্! কে মোমেন নয় ?' তিনি বললেন, 'যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে নিরাপদ নয়।'—বুখারী। বর্ণনায় : আবু শোরায়হ্ (রাঃ)। [অন্য বর্ণনায় : 'যার প্রতিবেশী তার রসনা (বাক্য) থেকে নিরাপদ নয়।']

৮৪৬. জিব্রাইল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্যে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) এত বেশী উপদেশ দিতে লাগলেন যে আমি ভাবলাম শীঘ্রই তাকে অর্থাৎ প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী (ওয়ারিস) সাব্যস্ত করা হবে।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় : হজরত আয়েশা ও ইবনে ওমর (রাঃ)।

প্রতিশোধ

'আর তাদের জন্য ওতে (তওরাত বা তোরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে ওতে তারই পাপমোচন হবে।' ৫ (৪৫)

'আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে।' ১৭ (৩৩)

'পবিত্র মাসের বদলে পবিত্র মাস এবং সকল পবিত্র জিনিসের জন্য এরকমই বিনিময়। সুতরাং যে তোমাদের আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ্ সাবধানীদের সঙ্গে থাকেন।' ২ (১৯৪)

—আল্-কোরআন।

৮৪৭. দুটি সৎকাজের মধ্যে যেটি অধিকতর সহজ ও নির্দোষ সেটিই রসুলুল্লাহ্ (সঃ) গ্রহণ করতেন এবং অসৎ কাজ হলে মানুষকে তার থেকে দূরে রাখতেন। তিনি নিজের জন্য কখনো কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেন না—কেউ আল্লাহ্‌র সীমা লঙ্ঘন করলে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই তার প্রতিশোধ নিতেন। —শারখান। বর্ণনায় : আয়েশা (রাঃ)।

৮৪৮. আমি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-কে কখনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখিনি। অবশ্য আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা সমূহের মধ্যে থেকে যদি কোন একটা লঙ্ঘন করা হয়, তখন সেই বিষয়ে তাঁর চেয়ে অধিক ক্রুদ্ধ কেউ হত না। যখন হুজুর (সঃ)কে দুটি পথের মধ্যে কোন একটা পছন্দ করার ও গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হত—তিনি সর্বদা সহজ পথটাই অবলম্বন করতেন, যদি না তার মধ্যে কোন দোষ ত্রুটি থাকত।—তিরমিজী। বর্ণনায় : আয়েশা (রাঃ)।

৮৪৯. প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করে, পরলোকে আল্লাহ্ তাকে সকলের সম্মুখে দাঁড় করাবেন এবং বলবেন, 'হুরদের (অর্থাৎ স্বর্গসুন্দরীদের) মধ্যে যাকে ইচ্ছা তুমি গ্রহণ করতে পার।' —আ. দাউদ তির।

প্রতিশ্রুতি

'প্রতিশ্রুতি পালন কর, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ৎ তলব করা হবে।' ১৭ (৩৪)

'তোমরা আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে তোমাদের জামিন করে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করোনা। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা অবশ্যই জানেন।' ১৬ (৯১)

—আল্-কোরআন।

৮৫০. তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ্‌তা'লার কর্তব্য—১) যে তার জন্য জেহাদ করে, ২) যে প্রতিজ্ঞা পালন করতে ইচ্ছা করে এবং ৩) যে ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিবাহ করে।—তির। নাসায়ী।

প্রেম-প্রীতি

৮৫১. আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করার পর মানুষকে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের পরিচায়ক।—সগির।

৮৫২. প্রেম ও প্রীতিতে মুসলমানেরা পরস্পর এক দেহ সদৃশ। তার কোন অঙ্গে বেদনা হলে সর্বাঙ্গ সেই বেদনা অনুভব করে।—শায়খান।

৮৫৩. বন্ধুর সাথে পরিমিতরূপে বন্ধুত্ব স্থাপন কর, কারণ হয়তো সে একদিন তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে ; এবং শত্রুর সাথেও পরিমিত শত্রুতা কর—সম্ভবত সেও একদিন তোমার বন্ধু হতে পারে।—সগির।

৮৫৪. দুজন প্রেমিকের পক্ষে পরস্পরকে বিবাহ করার মত আর কিছুই নেই।—ইবনে মাজা। বর্ণনায় : ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৮৫৫. বিবাহ-বন্ধন দ্বারা অন্য সবকিছু অপেক্ষা বন্ধুত্ব অধিকতর দৃঢ় হয়।—মিশকাত।

বন্ধক

৮৫৬. যদি আরোহণের উপযুক্ত কোন জন্তু কারো কাছে বন্ধক থাকে তবে তার খরচের জন্য সে তার ওপর আরোহণ করতে পারে। আর যদি কোন দুগ্ধবতী জন্তু বন্ধক থাকে তবে খরচের কারণে তার দুধ পান করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি চড়বে বা দুধ পান করবে, তার ওপর খরচের দায়িত্ব। [অধিকাংশ ইমামের মতে এই বিধি পরে বাতিল হয়েছে।]—বুখারী। বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৮৫৭. একদিন আমি কিছু যবের রুটি ও ছাগমাংস নিয়ে রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম যে, তিনি মদীনার এক ইহুদীর কাছ থেকে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখে কিছু আটা ধার নিয়েছেন। যদিও তাঁর পরিজন নয়জন মহিলা ছিলেন, তবু আমি নিশ্চিতরূপে শুনেছি যে কোনরাতেই তাঁর ঘরে এক ছা (অর্থাৎ ২৩৪ তোলা বা প্রায় তিন কেজি) পরিমাণ গম বা আটাও থাকত না।—বুখারী। বর্ণনায় : আনাস (রাঃ)।

৮৫৮. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এক ইহুদীর কাছ থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য ধারে ক্রয় করেছিলেন এবং মূল্যের পরিবর্তে তিনি তার কাছে আপন লোহ-বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।—বুখারী। বর্ণনায় : আয়েশা (রাঃ)।

বিচার ও সাক্ষ্যদান

'আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়-পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।' ৪ (৫৮)

'হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক—আল্লাহ্‌ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে কামনার অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে চল, তবে (জেনে রাখো) যে, তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ তার খবর রাখেন।' ৪ (১৩৫)

'তোমরা মানুষকে ভয় করোনা, আমাকে ভয় কর এবং কোন স্বার্থের খাতিরে আমার বিধানকে বিসর্জন দিওনা। যারা আল্লাহ্‌-প্রদত্ত বিধানমতে বিচার মীমাংসা না করবে নিশ্চয় তারা কাফেররূপে পরিগণিত হবে।

'হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার করা থেকে বিরত থাকতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর—তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ তার খবর রাখেন।' ৫ (৮)

—আল্-কোরআন।

৮৫৯. যে পর্যন্ত বিচারক অবিচার না করে আল্লাহ্‌ তার সঙ্গে থাকেন। যখন সে অবিচার করে, তিনি তার কাছ থেকে চলে যান এবং শয়তান তার সঙ্গী হয়। —তির। ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্‌ বিন আউফ (রাঃ)।

৪৬০. যে বিচারক পরিশ্রম করে বিচার করে এবং ন্যায় বিচার করে তার জন দুটি পুণ্য এবং যখন সে পরিশ্রম করে বিচার করে কিন্তু ভুল করে, তার জন্য একট পুণ্য।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্‌ বিন আমর (রাঃ)।

৮৬১. যদি কখনো তুমি বিচারকের পদ গ্রহণ করতে বাধ্য হও তাহলে পূর্ববর্তী মনীষী ও সাহাবীদের বিচার-মীমাংসা সংক্রান্ত দৃষ্টান্তগুলো অনুসরণ করো।—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মুবারক (রাঃ)।

৮৬২. বিচারক তিনশ্রেণীর—এক শ্রেণী বেহেশ্‌তে যাবে, আর দুই শ্রেণী দোজখে যাবে। যে বেহেশ্‌তে যাবে সে সত্য বুঝতে পারে এবং সেই অনুসারে রায় দেয়। যদি কোন বিচারক বুঝেও রায়দানে অবিচার করে, সে দোজখে যাবে। আর যে জ্ঞান ব্যতিরেকে লোকের বিচার করে, সেও দোজখে যাবে।—আ. দাউদ। ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ বোরায়দা (রাঃ)।

৮৬৩. বিচারকের জন্য ক্রোধকালে বাদী-বিবাদীর মধ্যে রায়দান করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু বকরাহ্‌ (রাঃ)।

৮৬৪. যে ব্যক্তি বিচারকের পদ লাভের জন্য প্রার্থী হয় এবং (তার জন্য) অনুরোধ করে, তাকে তার নিজের ওপর ন্যস্ত করা হয়; এবং প্রার্থী না হওয়া সত্ত্বেও যাকে বিচারক নিযুক্ত করা হয়, আল্লাহ্‌ তাকে শক্তিদানের জন্য একজন ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করেন। [নিষ্কাম বিচারককে আল্লাহ্‌ নিজে সাহায্য করেন। তদ্বিপরীত স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে যে ঐ পদ লাভ করে, আল্লাহ্‌ তাকে সাহায্য করেন না।] —তিরমিজী। আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৮৬৫. যে মুসলমান বিচারক হবার জন্য প্রার্থী হয়ে তা পায়, যদি তার

বিচার অবিচারের ওপর প্রাধান্য লাভ করে, তার জন্য বেহেশ্‌ত, আর যার অবিচার বিচারের ওপর প্রাধান্য লাভ করে, তার জন্য দোজখ।—আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৮৬৬. আমি কি তোমাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম সাক্ষীর সংবাদ দেবনা? সে ঐ ব্যক্তি, যে সমন পাবার পূর্বেই সাক্ষ্য দিতে আসে। —মুসলিম। বর্ণনায় ঃ জায়েদ (রাঃ)।

৮৬৭. রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে একজন লোক হলফ বা শপথ নিলে তিনি তাকে বললেন, 'আল্লাহ্‌র নামে হলফ কর; আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তোমার দখলে বাদীর কোন মাল নেই।'—আ. দাউদ। মুস্‌। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৮৬৮. স্বেচ্ছায় মিথ্যা শপথ করে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সাথে তার এমন সময় সাক্ষাৎ হবে যখন আল্লাহ্‌ ক্রুদ্ধ থাকবেন। এরই সমর্থনে আল্লাহ্‌তা'লা অবতীর্ণ করলেন—'যারা আল্লাহ্‌র চুক্তি এবং তাদের শপথের বিনিময়ে তল্প মূল্য গ্রহণ করে...' শেষ আয়াত পর্যন্ত। —বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ ইবনে মসউদ (রাঃ)। [উক্ত আয়াতটি 'বিবাদ-বিসংবাদ' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

৮৬৯ রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফজরের নামাজের পর উঠে বললেন, 'আল্লাহ্‌র সাথে অংশী (শির্‌ক) করা আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া একই কথা।' তিনবার তিনি একথা উচ্চারণ করলেন। তারপর পাঠ করলেন, মূর্তিপূজা ত্যাগ কর, মিথ্যা সাক্ষ্য ত্যাগ কর, আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠচিত্ত হও এবং আল্লাহ্‌র সাথে অংশী করো না। —আ. দাউদ। তির। বর্ণনায় ঃ খোরায়মে বিন ফাতেক (রাঃ)।

৮৭০. সর্বাপেক্ষা উত্তম আমার যুগের মানুষেরা, তারপর তাদের পরবর্তী মানুষেরা, তারপর তাদের পরবর্তী মানুষেরা। তারপর এমন মানুষ আসবে, তারা শপথ গ্রহণের পূর্বেই সাক্ষ্য দেবে এবং সাক্ষ্য দেবার পূর্বেই শপথ গ্রহণ করবে। [অর্থাৎ হয় শপথ না করেই সাক্ষ্য দেবে, নয়তো মিথ্যা শপথ করবে।]—বুখারী। মুস। বর্ণনায়। ইবনে মসউদ (রাঃ)।

৮৭১. যে ব্যক্তি শপথ দ্বারা কোন মুসলমানের স্বত্ব আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্‌-তা'লা তার জন্য বেহেশ্‌তকে নিষিদ্ধ এবং দোজখের আগুনকে সুনিশ্চিত করে রেখেছেন। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'সামান্য জিনিস হলেও?' তিনি বললেন, 'আরাক বৃক্ষের একখণ্ড লাঠি হলেও।'—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু ওমামাহ্‌ (রাঃ)।

৮৭২. বিশ্বাসঘাতক পুরুষ ও নারী, ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী এবং ভায়ের সংগে শত্রুতারত ব্যক্তির সাক্ষ্য বৈধ নয়। তিনি ঐ ব্যক্তিরও সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেছেন যে তার স্ত্রীর সতীত্বহীনতায় সন্তুষ্ট থাকে।—আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ আমর বিন শোয়ায়েব রাঃ)।

৮৭৩. বাদীর ওপর প্রমাণের ভার এবং বিবাদীর ওপর শপথ গ্রহণ।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আমর বিন শোয়ায়েব (রাঃ)।

৮৭৪. রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) একটা শপথ ও একজন সাক্ষীর দ্বারা বিচার করেছেন —মুসলিম। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

বিবাদ-মীমাংসা

'পরস্পর শলা-পরামর্শ ও কানাঘুষার মধ্যে কোন সুফল নেই ; হ্যাঁ—যদি দান-খয়রাত বা সৎকর্ম বা মানুষের মধ্যে বিবাদ-মীমাংসা সম্পর্কে ওসব অনুষ্ঠিত হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিবাদ-মীমাংসার কাজে সচেষ্ট আমি তাকে নিকটবর্তী সময়ের মধ্যেই অতি বড় প্রতিদান ও প্রতিফল দান করব।' (৫ পারা, ১৪ রুকু)।

'মোমেন মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে বিবাদ বাধলে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।' (২ পারা, ১৩ রুকু)।

'এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের চিত্তের দৃঢ়তা বিলুপ্ত হবে।' ৮ (৪৬)

'আর তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লাই) শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।' ৭ (৮৭)

—আল্‌-কোরআন।

৮৭৫. একদিন কোবা নগরবাসীদের মধ্যে বিবাদ বাধল, এমন কি তাদের পরস্পরের মধ্যে ঢিল-ছোঁড়াছুঁড়িও হল। হজরত রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তা জানতে পেরে সাহাবীদের (অনুচরদের) বললেন, 'আমাকে সেখানে নিয়ে চল, তাদের মধ্যেকার বিবাদ মীমাংসা করে দেবার চেষ্টা করব।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ)।

৮৭৬. যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে বিবাদ-মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে একজনের পক্ষ থেকে অপরজনের কাছে কোন সুনামের কথা বা অন্য কোন ভাল কথা অতি-রঞ্জিতরূপে বলে, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী পরিগণিত হবে না।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ উম্মে কুলসুম বিনতে ওক্কাবা (রাঃ)।

৮৭৭. মানুষের (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ৩৬০টা জোড়া আছে। ওর) প্রতিটি জোড়ার জন্য প্রতিদিন ভোরে একটা করে দানের আবশ্যক হয়। পরস্পরের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে বিবাদ-মীমাংসা করে দেওয়া একটা দান।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৮৭৮. সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ঝগড়া বা বিবাদকারী হয়।—বুখারী।

৮৭৯. রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেন, 'আমি কি তোমাদের ঐ লোকের সন্ধান দেব না যে নামাজ, রোজা ও জাকাতের সম্মান অপেক্ষা অধিক সম্মানের অধিকারী ?' আমরা বললাম, 'হাঁ।' তিনি বললেন, 'দুজন বিবাদকারীর মধ্যে শান্তি স্থাপন-কারী। দুজন লোকের মধ্যে বিবাদই অনিষ্টকারী।'—তির। আ. দাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু দারদায়া (রাঃ)।

৮৮০. আমি এক ব্যক্তিকে একটা আয়াত এমনভাবে পাঠ করতে শুনলাম যা আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে ভিন্ন রকমভাবে বলতে শুনেছিলাম। তখন আমি তার হাত ধরে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি বললেন, 'তোমাদের উভয়েই ঠিক। তোমরা বাদানুবাদ করো না। নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা বাদানুবাদ করেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ)।

৪৮১. একজন ইহুদী একটা মেয়ের মাথা দুই পাথরের মাঝখানে রেখে থেঁতলে দিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কে তোমার এই দশা করেছে—অমুক? অমুক?' অবশেষে ইহুদীর নাম করা হলে সে তার মাথার দ্বারা ইশারা করল। ফলে ইহুদীকে গ্রেফতার করা হল। সে (দোষ) স্বীকার করল। তখন নবী (সঃ) তার সম্বন্ধে আদেশ দিলেন। সেই (আদেশ) অনুসারে তার মাথাকে দুই পাথরের মধ্যে রেখে থেঁতলে দেওয়া হল।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৪৮২. একজন মুসলমান আর একজন ইহুদী পরস্পরকে গালাগাল করেছিল। মুসলমানটি বলেছিল, 'যিনি মুহম্মদ (দঃ) কে সমস্ত জগতের মধ্যে মনোনীত করেছেন তাঁর শপথ'। তখন ইহুদীটি বলল, 'যিনি মুসা (আঃ)কে সমস্ত জগতের মধ্যে মনোনীত করেছেন তাঁর শপথ।' তাতে মুসলমানটি হাত তুলে ইহুদীর গালে এক চড় বসিয়ে দিল। ইহুদী তখন নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তাদের সব ঘটনা জানাল। নবী (সঃ) ঐ মুসলমানকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় সে সকল কথা বলল। তখন নবী (সঃ) বললেন, 'তোমরা আমাকে মুসার উপরে প্রাধান্য দিও না। কারণ, কেয়ামতের দিন সকল লোক অজ্ঞান হয়ে পড়বে, আমিও তাদের সাথে অজ্ঞান হব—তখন দেখব যে মুসা আল্লাহ্‌র আরশের এক পার্শ্ব ধরে রয়েছেন। আমি জানি না—যারা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন কিনা এবং আমার আগেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন কিনা অথবা আল্লাহ্ তাকে জ্ঞানশূন্য হওয়া থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন কিনা।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৮৩. প্রতি বৃহস্পতিবার এবং সোমবার মানুষের কর্মলিপি আল্লাহ্‌র কাছে পেশ করা হয়। তখন যে ব্যক্তি তাঁর সাথে বিন্দুমাত্র শেরেক বা অংশী করেনি তাকে (আল্লাহ্) সেই দিনের পাপ ক্ষমা করেন। কিন্তু যারা পরস্পর শত্রুতা করে এবং মীমাংসা করে না, তিনি তাদের ক্ষমা করেন না।—মুস। আ. দাউদ। তির। মালেক।

৪৮৪. আমি কি তোমাদের নামাজ, রোজা ও জাকাত অপেক্ষা উত্তম জিনিস সম্বন্ধে বলব না? তা হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা; কারণ, শত্রুতা ও ঈর্ষা পুণ্যফলের মূলোৎপাটন করে।—আ. দাউদ। তির।

৪৮৫. আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত ঐ ব্যক্তি, যে বিরোধে সর্বাধিক অটল থাকে (অর্থাৎ মীমাংসা চায় না)।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৪৮৬. দ্বন্দ্ব-বিবাদের মন্দ পরিত্যাগ কর, কেন না এ ধ্বংসকর।—তির। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৮৬.(ক) সেই সৌভাগ্যশালী যে কলহ-বিবাদ থেকে দূরে থাকে এবং বিপদে পড়লে ধৈর্য ধারণ করে।—আ. দাউদ।

৪৮৭. নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ ক'রে অন্য কোন মুসলমানের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করে (কেয়ামতে) সে আল্লাহ্‌কে তাঁর ক্রুদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাবে।' তারপর পয়গম্বর মোস্তফা সমর্থনে আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন: 'নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে চুক্তি এবং তাদের শপথের পরিবর্তে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা এমন লোক যে পরলোকে (পুরস্কারে) তাদের কোন অংশ নেই। আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে বাক্যালাপ করবেন না, তাদের দিকে

তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।' এমন সময় আশ্‌আ'স এসে বললেন : আবু আব্দুর রহমান (ইব্‌নে মসউদ) তোমাদের যে হাদীস বলছেন—এই আয়াত তো আমার বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। আমার এক চাচাত ভায়ের জমিতে আমার একটা কুয়া (কূপ) ছিল। (সেই বিষয়ে বিবাদ হলে) তিনি (নবী সঃ) আমাকে বললেন, 'তোমার সাক্ষী (উপস্থিত কর)।' আমি বললাম, 'আমার কোন সাক্ষী নেই।' তিনি বললেন, 'তবে তার হলফ (চাওয়া হবে)।' আমি বললাম, 'হে রসূলুল্লাহ্‌! সে তো হলফ করবেই (অর্থাৎ মিথ্যা হলফ বা শপথ করবে)।' তখন নবী (সঃ) এই হাদীস বর্ণনা করলেন এবং আল্লাহ্‌তা'লা তার সত্যতা প্রমাণের জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন।—বুখারী। বর্ণনায় : ইবনে মসউদ (রাঃ)।

৮৮৮. একদিন রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাঁর ঘরের দুয়ারের কাছে বাদী-বিবাদীর তর্ক-বিতর্কের শব্দ শুনতে পেলেন। বাইরে এসে তাদের দুজনকেই বললেন, 'মনে রেখো, আমি একজন মানুষ। বাদী-বিবাদীর নালিশ আমার কাছে উপস্থিত করা হয়। অনেক সময় এক পক্ষ ভাল বক্তা এবং বাক্‌পটু হওয়ার ফলে (তাদের দাবী মিথ্যা হওয়া সত্বেও) হয়তো আমি তাদের স্বপক্ষে রায় দান করে থাকতে পারি। তোমরা জেনে রেখো, আমি যদি ঐভাবে কাউকে অন্যের স্বত্ব ও হক্‌ দান করে' থাকি তাহলে বুঝতে হবে আমি যেন তাকে নরকের অগ্নিখণ্ড দান করলাম। এ কথাটা ভালভাবে উপলব্ধি করেই সে নরকের অগ্নিখণ্ড গ্রহণ করবে অথবা বর্জন করবে।'—বুখারী। বর্ণনায় : উম্মে সালেমা (রাঃ)।

বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ

'নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদের বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না, অবশ্য যা অতীতে হয়ে গেছে তা নিশ্চয় অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ। তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগিনী, ফুফু (পিসি), খালা (মাসি), ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুধমাতা, দুধভগিনী, শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস হয়েছে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমার অভিভাবত্বে আছে, কিন্তু যদি তাদের (কন্যাদের মাতার) সাথে সহবাস না হয়ে থাকে তবে তাতে (বৈধভাবে সংগত হওয়াতে) তোমাদের কোন দোষ নেই। এবং তোমাদের জন্য তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগিনীকে একসঙ্গে বিবাহ (নিষিদ্ধ করা) করা হয়েছে। কিন্তু যা গত, তা গত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' ৪ (২২, ২৩)

'আর তোমরা যদি আশংকা কর যে পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমার ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে (ক্রীতদাসী অথবা যুদ্ধবন্দিনীকে)। এতেই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা। এবং তোমরা নারীদের মোহর (স্ত্রীধন) সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও, পরে তারা খুশী মনে তর (অর্থাৎ ঐ দেন-মোহরের বা স্ত্রীধনের) কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে।' ৪ (৩, ৪)

'আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস বৈধ করা হল, যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে, তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদের গ্রন্থ দান করা হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, যদি তোমরা বিবাহের জন্য তাদের মোহর (স্ত্রীধন) প্রদান কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নয়।' ৫ (৫)

'এবং অংশীবাদী রমণী যে পর্যন্ত না (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস করে, তোমরা বিবাহ করো না। অবিশ্বাসী নারী তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় ধর্মে-বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তা অপেক্ষা উত্তম। (ইসলাম) ধর্মে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষ তোমাদের চমৎকৃত করলেও ধর্মে-বিশ্বাসী ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম। কারণ ওরা তোমাদের আগুনের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ্ তোমাদের নিজ অনুগ্রহ ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন।' ২ (২২১)

'যারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে না যাবার শপথ করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে, তারপর তারা যদি মিলে যায়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যদি তারা তালাকই দিতে (অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদ করতে) সংকল্প করে, তবে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন রজঃস্রাবকাল প্রতীক্ষায় থাকবে (অর্থাৎ পুনর্বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে), তারা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। এবং এই সময়ের মধ্যে তাদের স্বামীদের তাদের পুনরায় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার অধিকার আছে, যদি তারা আপোষে মিলেমিশে থাকতে চায়। নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের, কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এ তালাক দুবার; তারপর হয় স্ত্রীকে বিধিসম্মতভাবে রাখবে, অথবা সদয়ভাবে বিদায় দেবে। আর স্ত্রীগণকে দেওয়া কোন কিছু ফেরত নেওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়।' ২(২২৬-২২৯)

'যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে এবং যখন তাদের ইদ্দৎ (শোকের বা অপেক্ষার কাল) সম্পূর্ণ শেষ হয়, তারা ন্যায়তঃ যা করে (অর্থাৎ বিবাহ করে)—তাতে কোন দোষ নেই।' [অর্থাৎ বিধবা-বিবাহে কোন দোষ নেই।]

'তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে এ একটা—তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া স্থাপিত হয়। যারা চিন্তা করে তাদের জন্য এ একটা নিদর্শন।'

—আল্-কোরআন।

৮৮৯. যখন কোন বান্দা বিবাহ করে, সে তার ধর্মকে অর্ধেক পূর্ণ করে। সে যেন বাকী অর্ধেকের জন্যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে।—ইবনে মাজা। বয়হাকী। মিশকাত। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৮৯০. হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তাদের বিবাহ করা কর্তব্য। কারণ বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং গুপ্তস্থানকে রক্ষা করে। যে ব্যক্তি অসমর্থ, তার পক্ষে রোজা কর্তব্য, কারণ তা তাকে সংযমী করবে। —শায়খান। বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন মসউদ (রাঃ)।

৮৯১. দুজন প্রেমিকের পক্ষে পরস্পরকে বিবাহ করার মত আর কিছুই নেই।—ইবনে মাজা। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৮৯২. সেই বিবাহই উত্তম যাতে অল্প যন্ত্রণা এবং অল্প ব্যয় হয়।—মিশকাত।

৮৯৩. যে বিবাহে সর্বাপেক্ষা কম কষ্ট হয়, তাতে সর্বাপেক্ষা অধিক বরকত আছে।—মুসলিম। বয়হাকী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৮৯৪. বিবাহবন্ধন দ্বারা অন্য সব কিছু অপেক্ষা বন্ধুত্ব অধিকতর দৃঢ় হয়।—মিশকাত।

৮৯৫. বিবাহ করা আমার সুন্নত, যে তা পালন করে না সে আমার কেউ নয়।—ইবনে মাজা।

৮৯৬. বিবাহ করা আমার বিধান; অতএব তা কেউ লংঘন করো না।—সাগির।

৮৯৭. পূর্ব-বিবাহিতা (বিধবা অথবা পতি-পরিত্যক্তা) কোন স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যতীত তার বিবাহ হবে না এবং কুমারীর সম্মতি না চাওয়া পর্যন্ত তাকে বিবাহ দেওয়া যাবে না। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুমারীর সম্মতি কিভাবে জানা যাবে?' তিনি বললেন, 'বিবাহ-প্রস্তাবের পর চুপ করে থাকাই তার সম্মতি বলে গণ্য হবে।'—বুখারী। মিশকাত। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৮৯৮. পূর্ব-বিবাহিতা স্ত্রীলোক তার অভিভাবকের চেয়ে নিজেই নিজের অভিভাবক হবার অধিকতর অধিকারী এবং কুমারী বালিকার সম্মতি চাইতে হবে এবং তার নীরবতাই তার সম্মতি।—মুসলিম। বর্ণনায়ঃ ই. আব্বাস (রাঃ)।

৮৯৯. মদীনাবাসিনী একজন মহিলা সাহাবী খান্‌ছা বিনতে খেজাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন: তিনি বিবাহিতা ছিলেন, পরবর্তী বিবাহকালে তাঁর পিতা তাঁকে বিবাহ দেন, কিন্তু তিনি সেই বিবাহে মোটেই সম্মত ছিলেন না। তিনি রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানালেন। রসুলুল্লাহ (সঃ) সেই বিবাহ বাতিল করে দিলেন।—বুখারী।

৯০০. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) যখন তাঁকে বিবাহ করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছ বছর ছিল এবং তাঁর দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হয়েছে ন বছর বয়সে। আর হজরতের সঙ্গে তিনি ন বছরকাল অবস্থান করার সুযোগ পেয়েছিলেন।—বুখারী।

৯০১. তোমরা কুমারী কন্যা বিবাহ করবে, কারণ তাদের মুখ মধুর, উদর বহুসন্তানধারী এবং তারা অল্পতেই অধিক সন্তুষ্ট থাকে।—সাগির। মিশকাত। বর্ণনায়ঃ আব্দুর রহমান বিন সালেম (রাঃ)।

৯০২. বিবাহে স্ত্রীলোকের চারটি বিষয় দেখতে হবে—১) তার ঐশ্বর্য, ২) তার গুণ বা আভিজাত্য, ৩) তার সৌন্দর্য এবং ৪) তার চরিত্র। অতএব যে নারী সাধবী এবং পুণ্যবতী তাকেই বিবাহ কর, নয়তো তোমার হাত মরলাযুক্ত হবে।—বুখারী। মুস। তির ও আরো ২ জন। বর্ণনায়ঃ ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)।

৯০৩. যে সকল স্ত্রীলোক স্নেহশীলা এবং সন্তানধারণে সুযোগ্যা তাদের বিবাহ কর।—আ. দাউদ। নাসায়ী। বর্ণনায়ঃ মাকাল বিন ইয়াসার (রাঃ)।

৯০৪. কোন স্ত্রীলোক এবং তার চাচীকে (অর্থাৎ কাকী বা খুড়ীকে) একসঙ্গে

(বিবাহ) করা যাবে না, কোন স্ত্রীলোক এবং তার খালাকে (মাসি) একসঙ্গে (বিবাহ) করা যাবে না।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৯০৫. যদি কোন লোক কোন নারীকে বিবাহ করে' তার সঙ্গে সঙ্গম করে, তবে তার কন্যাকে বিবাহ করা তার পক্ষে বৈধ নয়। যদি সঙ্গম না করে' থাকে, তবে বিবাহ করতে পারে। বিবাহিতা নারীর সঙ্গে সঙ্গম হউক বা না হোক, তার মাকে (শাশুড়ীকে) যেন সে বিবাহ না করে।—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ আমর বিন শোয়াইব (রাঃ)।

৯০৬. যখন কোন লোক তোমাকে বিবাহ করতে চায়, যার ধর্মে' মতির জন্য এবং চরিত্রের জন্য তুমি সন্তুষ্ট, তাকে বিবাহ কর। যদি তা না কর, তবে দুনিয়াতে বিপদ-আপদ এবং ব্যাপক অশান্তি বিরাজ করবে।—তির। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৯০৭. কোন ব্যক্তি কোন স্থানে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে প্রস্তাব ত্যাগ না করা পর্যন্ত যেন তার (কোন) মুসলমান ভাই সেখানে বিবাহের প্রস্তাব না করে।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৯০৮. বিবাহভোজের মধ্যে সেগুলোই নিকৃষ্ট যাতে দরিদ্রদের বঞ্চিত করে ধনীদের নিমন্ত্রণ করা হয় এবং যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অবাধ্য হয়।—শায়খান।

৯০৯. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি এক বিবাহে এক মদীনাবাসী বরের কাছে কন্যাকে সমর্পণ করার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। সেই উপলক্ষে নবী (সঃ) তাঁকে বললেন, 'তোমাদের কাছে কি আমোদ-আনন্দের কোন ব্যবস্থা ছিল না? মদীনাবাসীরা আমোদ-আনন্দ-প্রিয়।'—বুখারী।

৯১০. বিবাহ ঘোষণা করে দাও এবং তা মসজিদে কর এবং এতে দফ বাজাও। তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ হজরত আয়েশা (রাঃ)।

৯১১. ঐ সকল স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী যারা সাক্ষী ব্যতীত নিজে নিজে বিবাহ করে।—মিশকাত। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। [সাক্ষী প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে আছে—'তোমাদের পুরুষদের থেকে দুজন সাক্ষী রাখ, যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন নারী।' কেননা সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ অবৈধ।]

৯১২. বৈধ হওয়া সত্ত্বেও যা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় তা হল তালাক (বা বিবাহ বিচ্ছেদ)।—আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৯১৩. বিবাহ কর, কিন্তু তালাক দিও না, কারণ ওতে আল্লাহ্‌র আরশ কম্পিত হয়।—সগির।

৯১৪. বিশেষ কোন অপ্রিয় কারণ না থাকলে স্ত্রীদের তালাক দিও না, কারণ আল্লাহ্ স্বাদগ্রহণকারী পুরুষ বা স্বাদগ্রহণকারিণী স্ত্রীলোকদের ভালবাসেন না।—সগির।

৯১৫. যে নারী বিনা কারণে তার স্বামীর কাছে তালাক প্রার্থনা করে তার জন্য বেহেশতের সুঘ্রাণ হারাম (অবৈধ) হয়।—আ. দাউদ। তির। ই. মাজা। দিল। বর্ণনায়ঃ সাওবান (রাঃ)।

৯১৬. যে সব নারী তাদের স্বামীদের অবাধ্য হয় এবং তাদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হতে ইচ্ছা করে তারা নিশ্চয়ই মুনাফিক (কপট)।—মিশকাত।

৯১৭. পাগল এবং মস্তিষ্ক-বিকৃতের তালাক ছাড়া অন্যান্য তালাক বৈধ।—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৯১৮. একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক বালিকা রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে এসে বলল যে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিতা তাকে বিবাহ দিয়েছে। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে (বিবাহ বাতিল করার) স্বাধীনতা দান করলেন।—আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৯১৯. আবু ওসাইদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন আমরা নবী (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। এক জায়গায় দুটো বাগান ছিল, আমরা সেই দুই বাগানের মাঝখানে গিয়ে বিশ্রাম নিলাম। রসুলুল্লাহ (সঃ) আমাদের সেখানে বসে থাকতে বলে বাগানের মধ্যে একটা ঘরে প্রবেশ করলেন। জওনিয়া নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত রমণীর সঙ্গে রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল। সেই রমণীকে ঐ ঘরে উপস্থিত করা হল। ঘরের মধ্যে গিয়ে রসুলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে ডাকলে সে বলল—'বাদশাজাদী একজন সাধারণ লোকের স্ত্রী হবে কেন?' তবুও রসুলুল্লাহ (সঃ) তার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে বলে ফেলল—'আমি আপনার কাছ থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই।' তখন রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'তুমি মহান আশ্রয়স্থলে আশ্রয় নিয়েছ; (তুমি মুক্ত); তুমি তোমার (পিতার) পরিবারে চলে যাও।' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আবু সাইদ (রাঃ)কে বললেন—'তাকে এক জোড়া কাপড় দিয়ে দাও এবং তাকে তার পরিবারের লোকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে এস।' [পরবর্তী কালে রমণীটি নিজেকে 'পোড়া-কপালী' বলে দুঃখ করত।]—বুখারী।

বিশ্বনবীর চেহারা ও চরিত্রমাধুরী

'যারা অবিশ্বাস করে এবং অপরকে আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত করে, তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। যারা বিশ্বাস করে, সৎকাজ করে এবং মুহম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের প্রতিপালক হতে প্রেরিত সত্য বলে বিশ্বাস করে, তিনি তাদের মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।' ৪৭(১, ২)

'হে বস্ত্রআচ্ছাদনকারী (মুহম্মদ)! উপাসনার জন্য রাত্রি জাগরণ কর, রাত্রির কিছু অংশ বাদ দিয়ে; অর্ধরাত্রি জাগতে পার কিংবা তদপেক্ষা অল্প অথবা তদপেক্ষা বেশী। কোরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে—আমি তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। উপাসনার জন্য রাত্রি জাগরণ—গভীর অভিনিবেশ এবং হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অতিশয় অনুকূল। দিবাভাগে রয়েছে তোমার জন্য অতিশয় কর্মব্যস্ততা। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও।' ৭৩(১-৮)

'তোমার প্রতিপালক তো জানেন, তুমি কখনো রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ উপাসনার জন্য জাগরণ কর।' ৭৩(২০)

'(হে মুহম্মদ !) তোমার জন্য রয়েছে অবশ্যই নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার, তুমি অবশ্যই মহৎ চরিত্রের উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত ।' ৬৮(৩, ৪)

—আল্-কোরআন ।

৯২০. হজরত জাবের ইবনে সামের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : আমি এক চাঁদের-আলোয়-উদ্ভাসিত-রাতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে দেখেছিলাম।···আমি একবার রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দিকে আর একবার চাঁদের দিকে তাকালাম। অবশ্য তিনিই চাঁদ অপেক্ষা অধিক সুন্দর ।—তিরমিজী ।

৯২১. এক ব্যক্তি বরা ইবনে আজেব (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল কি তরবারির মত ছিল ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'না, বরং চাঁদের মত (ছিল) । [অর্থাৎ তরবারির মত চকচকে সাদা নয়, চাঁদের মত নূরানী উজ্জ্বলতায় ভরপুর ছিল ।—তিরমিজী । বর্ণনায় : আবু ইস্হাক (রাঃ) ।

৯২২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) অতি সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট মধ্যমাকৃতির মানুষ ছিলেন, অত্যন্ত লম্বা বা অত্যন্ত বেঁটে ছিলেন না। তাঁর পবিত্র মস্তকের কেশরাজি অত্যন্ত কুঞ্চিত বা একেবারে অকুঞ্চিত ছিল না। তিনি (রক্তিমাভাযুক্ত লাবণ্যময় উজ্জ্বল) গমের মত রঙ বিশিষ্ট (অর্থাৎ ফর্সা) মানুষ ছিলেন। যখন হাঁটতেন সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে হাঁটতেন ।—তির । বর্ণনায় : আনাস (রাঃ) ।

৯২৩. হজরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেছেন : আমার মামা ইবনে আবিহালা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পবিত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনাকারী ছিলেন। (তিনি) পরিষ্কার ভাষায় বিস্তারিত বর্ণনা করতেন। আমি তাঁর কাছে অঙ্গ (বা হুলিয়া)-মোবারক সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। আমার মনে এই ইচ্ছা ছিল যে তিনি আমার সামনে পবিত্র অঙ্গলাবণ্য বর্ণনা করবেন, আর আমি তা আমার মানস-পটে মুদ্রিত করে নেব এবং ভবিষ্যতে এই বর্ণনা আমার জন্য দলিল ও প্রমাণ (স্বরূপ) হবে। তিনি বললেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজে মহামহিম ছিলেন এবং অপরের চোখে পরম মহিমময় রূপে প্রতিভাত হতেন। পূর্ণিমারাতের উজ্জ্বল চাঁদের মত তাঁর পবিত্র অঙ্গজ্যোতিঃ ঝলমল করত। একজন খর্বাকার ব্যক্তি অপেক্ষা তিনি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ এবং দীর্ঘকায় ব্যক্তি অপেক্ষা তিনি (কিছুটা) খর্বকায় ছিলেন। পবিত্র মস্তক মানানসই রকমের বড়, কেশরাজি সামান্য কুঞ্চিত (এবং) মসৃণ। আপনা আপনি মাথায় সিঁথি প্রকাশ পেলে তা রেখে দিতেন, নয়তো সিঁথি কাটতেন না। যখন তাঁর কেশরাজি বড় বড় হ'ত তখন কানের নীচে পর্যন্ত তা ঝুলে পড়ত। পবিত্র দেহের রঙ বড় উজ্জ্বল, ললাট প্রশস্ত, ভ্রূযুগল কিছুটা (বাঁকা বা) ঘোরানো, সরু ও ঘনসন্নিবিষ্ট ছিল। ভ্রূযুগল পরস্পর সন্নিহিত ছিল না, পৃথক পৃথক ছিল। উভয় ভ্রূর মধ্যস্থলে একটা শিরা ছিল, চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ পেলে তা দেখা যেত। পবিত্র নাসিকা তীক্ষ্ম ও উন্নত ছিল। ওতে একটা নূরের (জ্যোতির) চমক ভেসে উঠত। কেউ হঠাৎ দেখলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট ব্যক্তি বলে মনে করত, কিন্তু ভালভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারত যে ওটা মানানসই রকমেরই দীর্ঘ ছিল। তাঁর পবিত্র দাড়ি ঘন ও ভরপুর, গণ্ডদ্বয় সমতল ও হাল্কা, মুখগহ্বর মানানসই রকমের প্রশস্ত, দন্তরাজি চিকন ও উজ্জ্বল এবং সম্মুখের দন্তদ্বয়ের মাঝখানে একটু ফাঁক ছিল। তাঁর বক্ষ-মোবারক থেকে নাভি পর্যন্ত লোমের একটা সরুরেখা ছিল। কণ্ঠদেশ রজত মূর্তির ন্যায় সুঠাম ও সুন্দর, চাঁদীর ন্যায় ওর

রঙ চমৎকার ও উজ্জ্বল। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশ মাংসল ও সুসমঞ্জস ছিল। পবিত্র উদর ও বক্ষ সমতল, উভয় বাহুমূলের মধ্যস্থল (অর্থাৎ বক্ষ) সুপ্রশস্ত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোগ-অস্থিগুলো স্থূল ও সুদৃঢ়। অনাবৃত অবস্থায় পবিত্র অঙ্গখানা উজ্জ্বল ও মনোহর দেখাত। বক্ষ-দেশ থেকে নাভিমূল পর্যন্ত বিরাজিত লোমের একটা সরু রেখা ছাড়া বক্ষ ও উদরে লোম ছিল না। অবশ্য উভয় বাহু, স্কন্ধ ও বক্ষের ঊর্ধ্বাংশ লোমশ ছিল। কনুই থেকে হাতের নিম্নাংশ মানানসই রকমের দীর্ঘ, হাতদুটো প্রশস্ত, হাতের তালু ও পায়ের পাতা দৃঢ়, পুরু ও মাংসল। হাত-পায়ের আঙুলগুলো সুসমঞ্জস রকমের দীর্ঘ। পায়ের তালু কিছুটা গভীর এবং পায়ের পাতা এমন মসৃণতাযুক্ত সমতল ছিল যে ওতে পানি লেগে থাকতে পারত না; পানি ঢালার সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে যেত। (তিনি) হাঁটার সময় সবলে পা তুলে সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন, মাটির ওপরে সজোরে পা ফেলতেন না। একটু লম্বা লম্বা পা ফেলে কিছুটা দ্রুতবেগে হাঁটতেন—যেন কোন উঁচু জায়গা থেকে নীচে নামছেন। যখন কারো দিকে তাকাতেন তখন সারা শরীর (তার দিকে) ফিরিয়ে থাকতেন। প্রায়ই তাঁর দৃষ্টি আনত থাকত, আকাশের চেয়ে মাটির দিকেই তাঁর দৃষ্টি অধিক নিবন্ধ থাকত। স্বভাবসুলভ লাজুকতাবশতঃ প্রায়ই (তিনি) আড়চোখে (চোখের কোণে) তাকাতেন, (কাউকে পূর্ণদৃষ্টি মেলে প্রায়ই দেখতেন না)। পথে চলার সময় সঙ্গিগণকে আগে রেখে নিজে চলতেন। কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে নিজেই আগে সালাম দিতেন।—তিরমিজী।

৯২৪. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পবিত্র দেহ যেন চাঁদী গলিয়ে গড়া হয়েছে। তিনি কিছুটা কুঞ্চিত মসৃণ কেশরাজিবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। [অতি উজ্জ্বল চেহারার খুব সুন্দর মানুষকে আরবী ভাষায় প্রায়ই চাঁদীর (রুপার) গড়া মানুষ বলে প্রশংসা করা হয়, (যেমন বাংলায় বলা হয় চাঁদের মত রূপ)—চাঁদীর মত সাদা ধপধপে হওয়া এর অর্থ নয়।]—তির। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৯২৫. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) অতি সুন্দর গঠনের মানানসই দেহবিশিষ্ট লাবণ্যময় রক্তিমাভাযুক্ত উজ্জ্বল রঙের মানুষ ছিলেন।—তিরমিজী। বক্তা ঃ আবু তোফায়েল, বর্ণনায় ঃ সঈদ জরীরী (রাঃ)।

৯২৬. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনের দাঁতের মধ্যে সামান্য ফাঁক ছিল। তিনি যখন কথা বলতেন তখন মনে হত সামনের দাঁতগুলোর মধ্যে দিয়ে নূরের ঝিলিক বেরিয়ে আসছে। [কেউ কেউ মনে করেন, ইবনে আব্বাস 'নূরের ঝিলিক' দ্বারা নবীজীর নূরের মত উজ্জ্বল অমূল্যবাণীকে বুঝিয়েছেন।]—তির। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৯২৭. আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর চেয়ে অধিক সুপুরুষ আমি দেখিনি। তাঁর মুখমণ্ডলে এমন অপূর্ব জ্যোতি দেখা যেত যে মনে হত যেন সূর্য সেখানে খেলা করছে। তিনি হাসলে তাঁর দাঁতের আলো দেওয়ালে গিয়ে ঠিকরে পড়ত।

৯২৮. হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ একদিন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মুচকি হাসি হাসলে আমি তাঁর দাঁতের আলোয় সূচের মধ্যে সুতো পরিয়েছিলাম।

৯২৯. হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি কখনো রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে দেখিনি, তবে তিনি কেবল মুচকি হাসি হাসতেন এবং তাঁর মুখের সামান্য ফাঁক দিয়ে মুক্তার মত দাঁতগুলো দেখা যেত।—বুখারী।

৯৩০. হজরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ তাঁর মত সুন্দর ও ধার্মিক ব্যক্তি আমি পূর্বে বা পরে কখনো দেখিনি। উম্মে মা'বদ বলেন ঃ তিনি দূর থেকে যেমন সুন্দর দেখাতেন, কাছে থেকেও তেমনি সুন্দর দেখাতেন।

৯৩১. তিনি (নবী সঃ) অতিরিক্ত মোটা (বা) একেবারে গোল চেহারা বিশিষ্ট ছিলেন না , অবশ্য তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ গোলাকৃতি ছিল। পবিত্র দেহের রঙ উজ্জ্বল রক্তিমাভাযুক্ত ছিল। উভয় চক্ষুতারকা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, ভ্রুযুগল বড় বড়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংযোগ-অস্থিগুলো (যেমন কনুই, হাঁটু, কব্জি ইত্যাদি) মানানসই রকমের মোটা ছিল। তেমনি বাহুমূল দুটির মধ্যস্থলও মোটা এবং পুরু মাংসল ছিল।—তাঁর দুই বাহুমূলের মধ্যস্থলে (ঘাড়ের নীচে) 'মোহরে নবুয়ত (নবুয়তের চিহ্ন)' ছিল। তিনি সর্বশেষ নবী ছিলেন। তিনিই মানবকুলে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশস্ত বক্ষ-(অন্তর)-বিশিষ্ট দানবীর, সর্বোত্তম মধুর বাক্য বিশিষ্ট সত্যবাদী, নম্র স্বভাব (এবং) বংশ মর্যাদায় সর্বপ্রধান ছিলেন। হঠাৎ কেউ তাঁকে দেখলে সভয়ে সসম্ভ্রমে অবনত হত। যে তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করে তাঁর পরিচয় পেত (সেই) তাঁর গুণে মুগ্ধ ও প্রেমে আত্মহারা হত। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যে কোন হুলিয়া অর্থাৎ অঙ্গলাবণ্য-বর্ণনাকারী এ কথা বলতে বাধ্য যে (রূপ, গুণ, মহত্ত্ব ইত্যাদিতে) 'আমি পূর্বে বা পরে তাঁর মত কাউকে দেখিনি।'—তির। বর্ণনায় ঃ হজরত আলী (রাঃ) এবং ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ।

৯৩২. হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আলোতে যেমন দেখতে পেতেন, অন্ধকারেও তেমনি দেখতে পেতেন। সামনে-পেছনের সব কিছু সমানভাবে দেখতে পেতেন। তাঁর আকৃতি প্রভুত্বব্যঞ্জক, চেহারা মহিমান্বিত, নেত্রতারকা রক্তিম আভাবিশিষ্ট এবং দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম ও মর্মভেদী ছিল। তাঁর নাসিকা ঈষৎ উন্নত, মুখমণ্ডল সুগঠিত ও মুক্তাবিনিন্দিত দন্তরাজি দ্বারা সুশোভিত এবং গণ্ডদেশ সুন্দর স্বাস্থ্যহেতু আরক্তিম ছিল। তাঁর মনমাতানো হাসি, তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, সুদৃশ্য ও সসম্ভ্রম গতি এবং সরল মধুর ব্যবহার সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করত। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অনুভূতি ক্ষিপ্র প্রখর ও কার্যকরী ছিল। তাঁর স্মৃতিশক্তি ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী এবং তাঁর চিন্তাধারা জীবন্ত ও নির্ভীক ছিল। তাঁর সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল, তাঁর সাহস অদম্য ও অপরিসীম। তাঁর স্বাভাবিক তেজস্বিতা আরবের বিশুদ্ধতম ভাষার প্রয়োগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং সুন্দর বাগ্মিতার মোহিনী শক্তি দ্বারা সুশোভিত ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এই দৈহিক দান থেকে যারা বঞ্চিত তারাই কেবল এর নিন্দা করতে পারে। ব্যক্তিগত ব্যাপার হোক আর সাধারণ ব্যাপার হোক—বলার আগে তিনি সকলের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তাঁর মধুর হাসি, প্রবহমান দাড়ি, আনন্দিত মুখমণ্ডল এবং আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গি সকলের প্রশংসা অর্জন করত। জীবনের সাধারণ কাজকর্মে তিনি স্বদেশের নিয়ম অনুসারে শিষ্টাচার পালন করতেন। সম্পদশালীদের প্রতি তিনি সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন, আর মক্কার দরিদ্রতম নাগরিকের প্রতি তাঁর ব্যবহার করুণা ও সৌজন্যের দ্বারা মহিমান্বিত হত। তাঁর শিষ্টাচারের মধ্যে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব বা সর্বজনীন মহানুভবতা প্রকাশিত হত। তিনি চিন্তায় ও কাজে সাহসী ছিলেন। তাঁর বাক্পটুতা বিশুদ্ধ ছিল এবং (সে বিশুদ্ধতা) সময়োপযোগী, সমীচীন (কথা) ও নীরবতার সাহায্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। অত্যন্ত ভয়, ভক্তি, বিনয় ও সরলতার মাধ্যমে মহানবী (সঃ) প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ পড়তেন।

এশার নামাজ যাকে 'এতমা' বলা হয়, তার শেষে তিনি কোন কথাবার্তা বলা পছন্দ করতেন না। গভীর রাতে তিনি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন ; কি শীত কি গ্রীষ্ম কোন ঋতুতেই তিনি এ নামাজ ত্যাগ করেন নি। প্রতি চান্দ্র মাসের শুক্ল-পক্ষের শেষ তিন দিন অর্থাৎ ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে তিনি রোজা রাখতেন। প্রতি রমজান মাসের শেষ দশদিন তিনি এ'তেকাফে অতিবাহিত করতেন এবং তাঁর পরলোক গমনের বৎসরে তিনি ২০ দিন এ'তেকাফ করেন। কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেও তিনি কখনো নামাজ পরিত্যাগ করেন নি। তিনি বলতেন, 'নামাজ মোমেনদের জন্য মে'রাজ (অর্থাৎ স্বর্গ-ভ্রমণ)।'—তির।

৯৩৩. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কখনো অশ্লীল কথা বলতেন না, নিন্দাযোগ্য কাজ করতেন না, বাজারে গিয়ে গোলমাল করতেন না অথবা কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেন না বরং ক্ষমা করতেন এবং ভুলে যেতেন।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৯৩৪. নিজের জন্য তিনি (দঃ) কখনো কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেন না ; কেউ আল্লাহ্‌র সীমা লঙ্ঘন করলে তিনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তার প্রতিশোধ নিতেন।—শায়খান। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৯৩৫. (পরম শত্রু) আবু জেহেল রসূলুল্লাহ (সঃ)কে সম্বোধন করে বলত, আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না, তবে তুমি যে প্রত্যাদেশসহ উপস্থিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।—তির। বর্ণনায় ঃ হজরত আলী (রাঃ)।

৯৩৬. লোকেরা বললো, 'হে রসূলুল্লাহ্! পৌত্তলিকদের অভিশাপ দিন।' তিনি বললেন, 'আমি কখনো অভিশাপ দেবার জন্য প্রেরিত হইনি বরং শুধু দয়া প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়েছি।'—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৯৩৭. আনাস বিন সাইদ বলেন, 'আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর চেয়ে কাউকে অধিকতর দয়ালু দেখিনি।'—মুসলিম।

৯৩৮. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে কেউ কিছু চাইলে তিনি কখনো না বলেননি।—শায়খান। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

৯৩৯. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) অত্যন্ত উপাসনা করতেন। (তিনি) অল্প কথা বলতেন, বেশী করে উপাসনা করতেন এবং সংক্ষেপে খোৎবা পাঠ করতেন। তিনি বিধবা ও দরিদ্রদের সাথে চলতে ঘৃণা বোধ করতেন না, বরং তাদের সকলের অভাব পূরণ করতেন।—নাসায়ী। মিশ। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন আবু আউফা (রাঃ)।

৯৪০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বাড়ীতে পরিজনদের সঙ্গে কাজ করতেন, তারপর নামাজের সময় হলে নামাজ পড়তে যেতেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৯৪১. হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজের জুতো নিজে মেরামত করতেন, নিজের কাপড় নিজে সেলাই করতেন ; তোমাদের প্রত্যেকের মত তিনিও ঘর-সংসারের কাজ করতেন। মানুষের মধ্যে তিনিও একজন মানুষ ছিলেন—নিজের কাপড় নিজে ধুতেন, নিজের ছাগী নিজে দুইতেন এবং নিজের কাজ নিজে করতেন।—তিরমিজী।

৯৪২. হজরত আয়েশা (রাঃ) আমাদের একখানা তালিযুক্ত চাদর আর একখানা মোটা কাপড়ের লুঙ্গি দেখালেন এবং বললেন, এই দুখানা কাপড়েই রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু বরদাহ্ (রাঃ)।

৯৪৩. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মাটির ওপরে বসতেন, মাটির ওপরে আহার করতেন, ছাগল চরাতেন ও ক্রীতদাসদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন।—সাগির। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৯৪৪. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কখনো কোন খাদ্যের নিন্দা করেন নি। পছন্দ হলে খেতেন, নয়তো খেতেন না।—শায়খান।

৯৪৫. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কখনো আগামী দিনের জন্য কিছু রেখে দিতেন না।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৯৪৬. তিনি গর্দভের নগ্ন পৃষ্ঠে আরোহণ করতেন।—সাগির। বর্ণনায় ঃ ইবনে সা'দ (রাঃ)।

৯৪৭. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর মৃত্যুর পর একটা শ্বেত গর্দভ, কয়েকখানা অস্ত্র এবং কিছু ভূমি যা তিনি পথিকদের দান করেছিলেন—তাছাড়া কোন দিনার-দিরহাম, কোন ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী বা অন্য কোন জিনিস রেখে যান নি।—বুখারী। নাসায়ী। বর্ণনায় ঃ আমর বিন হারেস (রাঃ)।

৯৪৮. তিনি (সঃ) সর্বাপেক্ষা পরোপকারী, মহানুভব এবং ধৈর্যশীল ছিলেন।—শায়। তির। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৯৪৯. আনাস (রাঃ) বলেন, আমি দশ বছর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সেবায় নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু তিনি কখনো আমাকে 'ছিঃ' বলেন নি বা 'তুমি একাজ কেন করেছ বা কেন করনি' জিজ্ঞাসা করেন নি।—শায়খান।

৯৫০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) জেহাদ ব্যতীত অন্য কোন সময় ভৃত্য বা রমণীকে নিজের হাতে প্রহার করেননি।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৯৫১. হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ তোমাদের মত দ্রুতভাবে কোন কথা বলতেন না। তিনি প্রতিটি বাক্য ধীরে ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন। তোমরা গণনা করলে ওর প্রতিটি শব্দ গুণতে পারতে।—শায়খান।

৯৫২. আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবার পূর্ব পর্যন্ত যবের পাতলা রুটি চোখে দেখেছেন বলে আমি জানি না।—বুখারী।

৯৫৩. নো'মান বিন বশির (রাঃ) বলেছেন, তোমরা কি তৃপ্তিভরে পানাহার করছ না? নিশ্চয় আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে তোমাদের নবী (সঃ) একটা দিনও পেট ভরে খাবার মত পোকায়-খাওয়া খেজুরও পাননি।—মুসলিম।

৯৫৪. আয়েশা (রাঃ) বলেন, (সময় সময়) আমাদের পরিজনদের একটা মাস অতিবাহিত হত, কিন্তু তার মধ্যে আমরা উনুনে আগুন জ্বালতাম না। শুধু খেজুর, পানি ও কিঞ্চিৎ মাংস ব্যতীত কিছুই আহার্য ছিল না।—শায়খান।

৯৫৫. মহানবীর পরিজনদের জন্য দুদিনের মত আটা কখনো ঘরে থাকত না এবং কোনদিন শুধু খেজুর থাকত।—শায়খান।

৯৫৬. খাওয়ার শেষে যা থাকত মহানবী (সঃ) তাতেই তৃপ্ত হতেন।—তির। বয়হাকী।

৯৫৭ এক দর্জি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে দাওয়াত করেছিল এবং তাঁর জন্যে কিছু খাবার তৈরী করেছিল। আমি তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম। আটার রুটি, লাউ-এর ঝোল এবং খাসীর কাবাব উপস্থিত করা হল। নবী (সঃ) পেয়ালা থেকে

শুধু এক টুকরো লাউ তুলে নিতেন। সেদিন থেকেই আমি লাউ খুব পছন্দ করতাম।—শারখান। তির। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৯৫৮. জাবের ইবনে তারেক (রাঃ) বলেছেন, আমি একবার হুজুর (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হলাম। দেখলাম, তাঁর কাছে একটা লাউ টুকরো টুকরো করা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এর দ্বারা কি তৈরী হবে?' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) উত্তর দিলেন, 'এর দ্বারা তরকারি বাড়ানো হচ্ছে।' [লাউ জ্ঞানশক্তি প্রখর করে এবং মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে।]—তিরমিজী।

৯৫৯. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, সিরকা বেশ ভাল তরকারি।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৯৬০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন খাওয়া দাওয়া শেষ করতেন তখন বলতেন, সেই আল্লাহ্‌তা'লারই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদের আহার ও পান করিয়েছেন এবং আমাদের মুসলমান করেছেন।—তির। আ. দাউদ। ই. মাজা।

৯৬১. আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রতিবেশী ছিলাম। (কাজেই) প্রায় সময়ই তাঁর সেবায় উপস্থিত থাকার সুযোগ হত। আবার আমি তাঁর ওহী-লেখক-গণের মধ্যে একজন ছিলাম। যখন তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হত তখন তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন, আমি উপস্থিত হয়ে তা লিখে দিতাম। যখন আমরা পার্থিব বিষয়ে আলোচনা করতাম তিনিও আমাদের সঙ্গে সেই বিষয়ে আলোচনা করতেন। আর যখন আমরা পরকাল সম্বন্ধে আলোচনা করতাম, তিনি-ও পরকাল সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। আবার কখনো যদি আমরা পানাহার সম্বন্ধে আলোচনা করতাম, তিনিও আমাদের সঙ্গে সেই বিষয়ে আলোচনা করতেন। —তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)।

৯৬২. হজরত হাসান (রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ) সব সময় হাসিমুখে থাকতেন; বিনয় ও সরলতার সঙ্গে সকলের সাথে মেলামেশা করতেন; রুক্ষ মেজাজ বা কটুকথা বা অপ্রিয় বাক্য দ্বারা কাউকে অসন্তুষ্ট করতেন না। তিনি কারো দোষের আলোচনা করতেন না বা কাউকে অতিরিক্ত প্রশংসা করতেন না।—বুখারী।

৯৬৩. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেছেন, সর্বোত্তম বাণী হল আল্লাহ্‌র গ্রন্থ কোরআন শরীফ, এবং সর্বোত্তম আদর্শ হল হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর আদর্শ। —বুখারী।

৯৬৪. আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর চেয়ে অধিক সুন্দর কিছু দেখিনি—উজ্জ্বল সূর্য যেন তাঁর পবিত্র চেহারা ঝলমল করছে। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেয়ে অধিক দ্রুতগামী লোকও দেখিনি—যেন পথ তাঁর চলার সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। তিনি তাঁর স্বাভাবিক নিয়মে পথ চলতেন, আমাদের অনেক চেষ্টা করে তাঁর সঙ্গে থাকতে হত।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৯৬৫. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন পথ চলতেন তখন সামনে একটু ঝুঁকে খুব তাড়াতাড়ি পা তুলতেন, যেন কোন উঁচু জায়গা থেকে নীচে নামছেন।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আলী (রাঃ)।

৯৬৬. কেউ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)র সাথে করমর্দন করলে ঐ ব্যক্তি কর মুক্ত না করা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কখনই আপন কর (হাত) মুক্ত করতেন না এবং ঐ ব্যক্তি তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি না ফেরান পর্যন্ত তিনি কখনো তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে

ফেরাতেন না এবং কেউ তাঁর সামনে বসে থাকলে তিনি কখনই তাঁর পা দুটো সামনে বিস্তার করে দিতেন না। [আদর্শ শিষ্টাচার।] —তির। বর্ণনায়—আনাস (রাঃ)।

বিশ্বনবী (সঃ)-র খাদ্য

৯৬৭. আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে কখনো উত্তম রুটি ভক্ষণ করতে দেখিনি। যে পর্যন্ত আল্লাহ্র রসূল আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ না করেছেন সে পর্যন্ত তাঁকে উত্তম (পাতলা) রুটি ভক্ষণ করতে দেখিনি। তিনি কখনো ভুনা ছাগ-মাংস ভক্ষণ করেন নি।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৯৬৮. আমাদের এমন সময়ও আসত যে মাসাধিক কাল উনুনে আগুন জ্বলত না। সামান্য মাংস ব্যতীত শুধু খেজুর ও পানি (আমাদের খাদ্য) ছিল। —বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৯৬৯. মুহম্মদ (দঃ)-এর পরিবারবর্গ পরপর দুদিন পেট ভরে উত্তম আটার রুটি খেতে পারেননি। তার মধ্যে একদিন খেজুর খেতেন।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৯৭০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত আমরা ইচ্ছামত খেজুর ও পানি গ্রহণ করতে পারিনি।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৯৭১. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) টাটকা খেজুর সহ তরমুজ খেতেন।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৯৭২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, দুজনের খাদ্য তিনজনের জন্য এবং তিনজনের খাদ্য চার জনের জন্য যথেষ্ট।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৯৭৩. রসূলুল্লাহ্ কখনো কোন খাদ্যের নিন্দা করতেন না। যা ভাল লাগত তা তিনি খেতেন, যা ভাল লাগত না তা খেতেন না।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৯৭৪. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) রান্না করা ছাড়া পেঁয়াজ খেতে নিষেধ করেছেন। —তিরমিজী। আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ আলী (রাঃ)।

৯৭৫. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে কোন খাদ্য এলে তিনি তা থেকে খেয়ে বাকিটুকু আমার কাছে পাঠাতেন। একদিন তিনি কিছুই না খেয়ে খাবারের পাত্রটা আমার কাছে পাঠালেন, কেন না তাতে পেঁয়াজ ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'এ কি হারাম ?' তিনি বললেন, 'না, কিন্তু এর গন্ধের জন্য আমি পছন্দ করি না।' —মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু আইয়ুব (রাঃ)।

বিশ্বনবী (সঃ)-কে স্বপ্নে দর্শন

৯৭৬. যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে সে প্রকৃতই আমাকে দেখে ; কারণ শয়তান আমার মূর্তি ধারণ করতে পারে না।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রার কাছ থেকে শুনে কলীব (রাঃ)।

১৭৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে বললেন, তুমি স্বপ্নের মধ্যে (নবীর) যে মূর্তি দর্শন করেছ তার অনুরূপ বর্ণনা করতে পারবে কি?' আমি বললাম, 'তিনি (দঃ) একজন মধ্যমাকৃতির লোক। উজ্জ্বল গমের মত রঙ। দু'চোখে সুরমা লাগানো, মৃদু হাসিতে ভরা মুখমণ্ডল, সুন্দর গোলগাল চেহারা, বুকের ওপরে বিস্তৃত ভরপুর দাড়ি যা তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারাকে ঘিরে রেখেছে।' তিনি আরো বলেন, 'তুমি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)কে তাঁর জীবৎকালে জাগ্রত অবস্থায় দেখলেও যা বর্ণনা করেছ তার চেয়ে অধিক বর্ণনা করতে পারতে না।'—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ এজিদ পারসি [ইনি কোরআনের অন্যতম অহী-লেখক।]

১৭৮. 'যে ব্যক্তি আমাকে ঘুমের মধ্যে দেখতে পেল সে ঠিক আমাকেই দেখতে পেল, কারণ শয়তান আমার মূর্তি ধারণ করতে পারে না।' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আরো বলেন, 'প্রকৃত মুসলমানের স্বপ্ন পয়গম্বরীর ৪৬ অংশের একাংশ।'—তির। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

বুদ্ধি ও বিবেচনা

১৭৯. আল্লাহ্‌তা'লা বুদ্ধিকে সৃষ্টি করে বললেনঃ আমি তোমার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন জিনিস সৃষ্টি করি নি এবং তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর কিছুই নেই। তোমার সঙ্গেই শাস্তি, তোমার সঙ্গেই পুরস্কার,—তোমার সঙ্গে পরিচয়ের মাত্রা অনুসারেই সন্তুষ্টি এবং তোমার জন্যই অসন্তুষ্টি, পুরস্কার অথবা শাস্তি লাভ করা যায়। —খামসা।

১৮০. নিশ্চয় মানুষ যদিও নামাজ পড়ে, রোজা রাখে ও জাকাত দেয় এবং হজ্জ্ ও ওমরা পালন করে এবং অন্যান্য সৎকার্য সম্পন্ন করে, তবুও সে তার বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে পুরস্কৃত হবে।—মিশকাত।

১৮০(ক). মানুষ যখন আল্লাহ্‌তা'লার উপাসনা করে তখন সেটাই তার বুদ্ধির পরিচয়, আর যখন সে তার নিজের বুদ্ধির তারিফ করে তখন সেটাই তার মূর্খতার পরিচয়।—সাগির।

১৮১. মানুষের উপসনার এক ষষ্ঠাংশ বা এক-দশমাংশ যে আল্লাহ্‌তা'লা কবুল করেন তা নয়, বরং যেটুকু সে বুদ্ধি-বিবেচনা ও আগ্রহের সাথে করে সেই-টুকুই কবুল হয়।—সাগির।

১৮২. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে মুয়াজ, ইয়েমেনের শাসন-কার্যে নিযুক্ত হয়ে তুমি কোন্ বিধান অনুসরণ করবে?' তিনি বললেন, 'কোরআনের বিধান।' 'কিন্তু কোরআন শরীফে যদি সে সম্পর্কে কোন আদেশ না পাও?' তিনি বললেন, 'তবে আমি আল্লাহ্‌র রসুলের আদর্শ অনুসরণ করব।' 'কিন্তু তাতে যদি বিফল হও?' 'তবে আমি আমার বুদ্ধি ও বিবেচনা প্রয়োগ করব।' —তিরমিজী। আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)।

১৮৩. আল্লাহ্‌তা'লা পৃথিবীতে বুদ্ধি অপেক্ষা অল্পসংখ্যক কিছু সৃষ্টি করেন নি।। [বুদ্ধি দুর্লভ সৃষ্টি।]—সাগির।

৯৮৪. জিব্রাইল (আঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মানুষের নেতা কে?' তিনি বললেন, 'বুদ্ধি।'—সগির।

৯৮৫. মানুষের পরিচয় তার বুদ্ধির পরিমাপ হিসেবে; যার বুদ্ধি নেই তার ধর্ম নেই।—বয়হাকী।

ব্যঙ্গ-বিদ্বেষ-হিংসা

'হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ! তোমাদের কেউ কারো প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে না; হতে পারে—যার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হচ্ছে, (আল্লাহ্‌র কাছে) তার মর্যাদা বিদ্রূপকারী অপেক্ষা অধিক। তোমাদের নারীগণকেও বিশেষরূপে নিষেধ করা হচ্ছে—তারাও যেন একে অন্যের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ না করে, যাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে (আল্লাহ্‌র কাছে) তার মর্যাদা বিদ্রূপকারিণী অপেক্ষা অধিক হতে পারে। আর তোমরা পরস্পর খোঁটা দিয়ে কটাক্ষপাত করে কথা বলবে না এবং কারো প্রতি কুৎসাজনক খেতাবী নাম প্রয়োগ করবে না, এ সব অন্যায় কাজ। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে খারাপ নামে ডাকা অন্যায় কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ থেকে নিবৃত্ত না হয় তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।' ৪৯(১১)

'তোমরা একে অন্যের গোপন বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে চাইবে?' ৪৯(১২)

বল আমি আশ্রয় নিচ্ছি ঊষার স্রষ্টার—তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে;...এবং হিংসুক যখন হিংসা করে তার অনিষ্ট থেকে।' ১১৩(১, ২, ৫)

—আল্‌-কোরআন।

৯৮৬. সন্দেহ করা থেকে বিরত থাক; কারণ সন্দেহ সবচেয়ে বড় মিথ্যা। অপরের দোষত্রুটি সন্ধান করো না এবং তাদের দোষত্রুটির সমালোচনা করে বেড়িও না। কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। পরস্পর বিচ্ছেদভাব প্রদর্শন করো না। তোমরা সকলে এক আল্লাহ্‌র সেবক ও পরস্পরের ভাই হও।—বুখারী। তির সমেত ৫জন। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৯৮৭. কারো প্রতি কেউ বিদ্বেষ পোষণ করবে না, কারো প্রতি কেউ হিংসা করবে না, পরস্পর বিচ্ছেদমূলক আচরণ করবে না। তোমরা সকলে এক আল্লাহর বান্দা—ভাই ভাই হয়ে থাকবে। কোন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমানের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনদিনের বেশী কথাবার্তা বন্ধ রাখা সিদ্ধ নয়।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৯৮৮. আপন মুসলমান ভায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে সাক্ষাৎ হলেও এড়িয়ে চলা—তিন দিনের বেশী সিদ্ধ নয়। যে বিচ্ছেদ-ভাব ভঙ্গ ক'রে প্রথমে অপরকে সালাম করে, সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌তা'লার কাছে শ্রেষ্ঠ। বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু আয়ুব আনসারী (রাঃ)।

৯৮৯. তোমরা হিংসা (করা) থেকে সাবধান হও; কারণ আগুন যেমন কাঠ

যা তৃণকে দগ্ধ করে, হিংসাও তেমনি সৎকাজ গুলোকে ধ্বংস করে।—আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৯৯০. কোন মানুষের মধ্যে ঈমান ও হিংসা একত্র হয় না। [অর্থাৎ প্রকৃত ঈমানদার হিংসুক হয় না।]—মুস। আ. দাউদ।

৯৯১. যে অনিষ্ট করে, আল্লাহ্ তার অনিষ্ট করেন, যে শত্রুতা করে, আল্লাহ্ তার শত্রুতা করেন।—তির। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ আবু সেরমা (রাঃ)।

৯৯২. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে বলেছেন, 'হে পুত্র, যদি তুমি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান কর এবং তোমার অন্তরে কারো প্রতি হিংসা-দ্বেষ না থাকে, তবে তাই কর।' তারপর বললেন, 'হে পুত্র, এ আমার সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত এবং যে আমার সুন্নত ভালবাসে সে আমাকে ভালবাসে এবং যে আমাকে ভালবাসে সে বেহেশ্তে আমার সঙ্গে থাকবে।'—তির। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

ব্যবসা-বাণিজ্য

'ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় যে সব লোকেদের আল্লাহ্তা'লার স্মরণ করা থেকে এবং নামাজ পড়া ও জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত করে না, এবং যারা (ব্যবসা বাণিজ্যের সময়ও) সেই বিচার-দিনের ভয় করে যে দিন ভীষণ আতঙ্কের দরুন মানুষের অন্তর থর থর করে কাঁপবে আর চোখ দুটো উল্টে যাবে—তারা যে সব সৎকাজ করেছে তার পুরস্কার পাবে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহে প্রাপ্যের অধিক পাবে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।' ২৪ (৩৭,৩৮)

'হে বিশ্ববাসিগণ! জুম্'আ'র দিনে (শুক্রবার) যখন নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ত্বরা করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখবে, এইটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়ঃ—যদি তোমরা উপলব্ধি কর।' ৬২ (৯)

—আল্-কোরআন।

৯৯৩. যে ব্যক্তি ক্রয়, বিক্রয় এবং আপন প্রাপ্যের তাগাদা করার সময় কোমল ব্যবহার করবে নিশ্চয়ই তার ওপর আল্লাহ্তা'লার করুণা বর্ষিত হবে।—বুখারী।

৯৯৪. এক ব্যবসায়ী লোকেদের ধার বাকি দিত এবং যদি কোন দেনাদারের পক্ষে ধার শোধ করা কঠিন হয়ে পড়ত তাহলে সে তার কর্মচারীদের আদেশ দিত, 'ওকে মুক্তি ও রেহাই দাও। এই উপলক্ষে আল্লাহ্তা'লাও আমাদের মুক্তি ও রেহাই দিতে পারেন।' ফলে সত্য সত্যই আল্লাহ্তা'লা ঐ ব্যক্তিকে রেহাই দান করেছেন।—বুখারী।

৯৯৫. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ একজন লোক তার বিক্রি করার মালপত্র বাজারে নিয়ে গেল। অন্য একজন মুসলমান তা ক্রয় করার জন্যে এল। তখন বিক্রেতা তাকে ধাপ্পা দেবার উদ্দেশ্য শপথ করে বলল, 'আমার এ জিনিসের এত দাম বলা হয়েছে।' অথচ (আসলে) ঐ দাম বলা হয় নি। তখন ঐ ধরনের মিথ্যা শপথের বিষময় ফল বর্ণনা করে এই বাণী অবতীর্ণ হল—'যারা আল্লাহ্র নাম করে' এবং আল্লাহ্র নামে মিথ্যা শপথ করে' পৃথিবীর সামান্য জিনিস উপার্জন করবে পরকালে তাদের ভাগ্যে কিছুই মিলবে না এবং

আল্লাহ্ তাদের পবিত্র করবেন না। অর্থাৎ তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করবেন না।' (৩ পারা, ১৬ রুকু)।—বুখারী।

৯৯৬. যে ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণ কোন জিনিসের দোষ প্রকাশ না করেই বিক্রয় করে সে আল্লাহ্‌র ক্রোধে পড়ে এবং ফেরেশ্‌তারা তাকে অভিসম্পাত করে।—ইব্‌নে মাজা। বর্ণনায়ঃ ওয়াসেলা (রাঃ)।

৯৯৭. মিথ্যা শপথ কোন জিনিসকে বাজারে চালু করে দেয় বটে, কিন্তু বরকত (প্রাচুর্য) এবং উন্নতি মুছে ফেলে।—বুখারী।

৯৯৮. নিজের হাতে ও আয়ত্তে আনার পূর্বে কোন খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিষেধ করেছেন।—বুখারী।

৯৯৯. অগ্রিম দাদনে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয় এবং এক বিক্রয়ে দুই শর্ত নেই। দখলে না-আসা পর্যন্ত কোন লাভ নেই—তোমার দখলে যা নেই, তার ক্রয়-বিক্রয় নেই।—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ আমর বিন শোয়ায়েব (রাঃ)।

১০০০. যে খাদ্যশস্য ক্রয় করে তার পরিমাপ না করা পর্যন্ত যেন বিক্রয় না করে।—বুখারী। মুস। বর্ণনায়ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

১০০১. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন— ১) গ্রামের লোকেরা খাদ্যবস্তু, তরিতরকারি ইত্যাদি শহরে বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসলে শহরের ব্যবসায়ীরা বাজারদর উঁচু (বা চড়িয়ে) রাখার জন্য নিজেদের হাতে তা বিক্রি করতে চায়—এটা নিষিদ্ধ। ২) প্রকৃত ক্রেতাদের ঠকানোর উদ্দেশ্যে (মিথ্যা) ক্রেতা সেজে পণ্যের মূল্য অধিক বলা নিষিদ্ধ। ৩) কোন মুসলমান ভায়ের সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চলার সময় সেখানে অন্য কারো ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলা নিষিদ্ধ। ৪) কোন মুসলমান ভাই যখন কোথাও বিবাহের কথাবার্তা চালায় তখন সেখানে অন্য কারো বিবাহের প্রস্তাব দান করা নিষিদ্ধ। ৫) স্বামীর সর্বস্ব একা ভোগ করার উদ্দেশ্যে এক স্ত্রী কর্তৃক অন্য স্ত্রীর তালাক দাবী করা নিষিদ্ধ।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১০০২. কোন মুসলমান ভায়ের পক্ষ থেকে ক্রয়ের কথাবার্তা চলা কালে— অন্য কেউ কথা চালাতে পারবে না, চালান উচিতও নয়।—বুখারী।

১০০৩. কেউ যেন তার ভায়ের ক্রয়ের ওপরে ক্রয় না করে।—মুস। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১০০৪. প্রকৃত ক্রেতাদের প্রতারণার উদ্দেশে নকল ক্রেতা সেজে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির অসদুপায় অবলম্বন করাকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিষিদ্ধ করেছেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)।

১০০৫. গাছের ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রি করাকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিষিদ্ধ করেছেন—বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন। —বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)।

১০০৬. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কালে বাগানে ফল ধরার পূর্বেই ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তারপর ফল পাকার ও তোলার সময় হলে বিক্রেতা দাম আদায়ের জন্য তাগাদা করত—তখন কোন কোন ক্রেতা এমন আপত্তি জানাত যে এ বছর নানারকম দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় গাছের ফল নষ্ট হয়ে

করে। এ ধরনের বহু অভিযোগ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে আসতে থাকায় তিনি ঘোষণা করলেন যে—ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে গাছের ফল বিক্রি করবে না।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)।

১০০৭. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফল বড় না হওয়া পর্যন্ত অভাবী এবং অবিবেচক লোকের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।—আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ আলী (রাঃ)।

১০০৮. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) গাছের ফল পাকার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। জিজ্ঞাসা করা হল—পাকা হওয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন—লাল বর্ণ হওয়া। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, তোমরা ভেবেছ কি যে পূর্বেই ফল বিক্রি করার পর যদি ঐ বছর ঐ গাছে ফল না হয় তবে তোমার আপন মুসলমান ভাই-ক্রেতার কাছ থেকে কিসের বিনিময়ে অর্থ আদায় করবে?—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

১০০৯. খেজুর গাছে খেজুর আছে, তা শুকিয়ে কি পরিমাণ খোরমা হতে পারে তা অনুমান করে ঐ পরিমাণ শুকনো খোরমার বিনিময়ে ঐ গাছের খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা—কিংবা জমিতে ফসল (যেমন ধান) আছে তা তৈরী হয়ে কি পরিমাণ খাদ্য (চাউল) হতে পারে তা অনুমান করে সেই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে ঐ জমির ফসল ক্রয়-বিক্রয় করা-কে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)।

১০১০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন হিজরত করে মদীনায় পৌঁছুলেন তখন, মদীনা অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে খেজুরের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় প্রচলিত ছিল, এমন কি তারা দু তিন বৎসরের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ও করত। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সাবধান করে দিয়ে বললেন, যে কেউ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করবে সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাণ ও ওজনের উল্লেখ করেই করে এবং বিক্রয়-বস্তু প্রদানের দিন-তারিখও নির্দিষ্ট করে।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

১০১১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)-র কাছে জিজ্ঞাসা করা হল, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কালে সাহাবীরা গমের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতেন কি? তিনি উত্তরে বললেন, আমরা সিরিয়ার এক শ্রেণীর লোকেদের কাছ থেকে গম, যব এবং জয়তুনের তেল নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ করে ক্রয়-বিক্রয় করতাম।—বুখারী।

১০১২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটা খাদ্যশস্যের স্তূপের কাছ থেকে যাবার সময় তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, তাঁর হাত ভিজে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে শস্যের মালিক, এ কি?' সে বলল, 'বৃষ্টিতে ভিজেছে।' তিনি বললেন, 'তুমি কি এ শস্যের উপরিভাগে রাখতে পারলে না? তাহলে তো লোকে দেখতে পেত। যে প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়।' [ভেজাল নিষিদ্ধ।] —বুখারী।

১০১৩. এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে উল্লেখ করল যে, বেচা-কেনায় তাকে ঠকান হয়। তিনি (সঃ) বললেন, যখন তুমি বেচা-কেনা করবে বলে দিও, 'ঠকান ভাল নয়।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

১০১৪. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিষেধ করেছেন,—'কোন নগরবাসী যেন

গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে, তোমরা যেন প্রতারণা করে দাম বাড়াবাড়ি করো না। কেউ যেন তার ভায়ের দামের ওপরে দাম না করে এবং ভায়ের বিবাহ প্রস্তাবের ওপর বিবাহ-প্রস্তাব না করে, আর কোন স্ত্রীলোক যেন না চায় যে তার ভগ্নীর তালাক হোক আর তার অংশ নিজের পাত্রে আসুক।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১০১৫. নবী (সঃ)-এর মুক্ত দাস আবু রাফি' সা'দ ইবনে আবু ওক্কাসের কাছে গিয়ে বললেন, 'হে সা'দ আপনার বাড়ীতে আমার যে দুটো ঘর আছে, তা আমার কাছ থেকে কিনে নিন।' সা'দ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, "আমি আপনাকে চার হাজার দিরহামের বেশি দেব না, তাও কিস্তিতে কিস্তিতে।" আবু রাফি' বললেন, "আমাকে তো ওর জন্য পাঁচশ দিনার (পাঁচ হাজার দিরহাম) প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যদি আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে একথা বলতে না শুনতাম যে, 'প্রতিবেশী তার সংলগ্ন সম্পত্তির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি হকদার' তবে আমি আপনাকে চার হাজার দিরহামে (চার 'শ দিনারে) দিতাম না, যখন আমাকে পাঁচ 'শ দিনার দেওয়া হচ্ছে।" তারপর তিনি তাকেই তা দিলেন। [প্রতিবেশীর সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিকটতম প্রতিবেশীরই অগ্রাধিকারের মহান আদর্শের এ হাদীসটি এক অসাধারণ নিদর্শন!]—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু রাফি'।

ব্যভিচার ও বলাৎকার

'অবৈধ যৌনসংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, এ অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।' ১৭ (৩২)

'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—ওদের প্রত্যেককে একশো করে কশাঘাত করবে; আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরী করণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের অভিভূত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা অংশীবাদিনীকেই বিবাহ করবে; বিশ্বাসীদের জন্য এদের বিবাহ করা অবৈধ।' ২৪ (২, ৩)

—আল্-কোরআন।

১০১৬. পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টির নাম ব্যভিচার।—সগির।

১০১৭. তোমরা কি জান, কোন্ জিনিস অধিক সংখ্যক লোককে নরকে নিক্ষেপ করে?—জিহ্বা এবং গুপ্তাঙ্গ।—তিরমিজী ও ইব্‌নে মাজা।

১০১৮. চোখের ব্যভিচার হল দৃষ্টি, মুখের ব্যভিচার হল কথাবার্তা, তারপর মনে কামাবেগ ও আকর্ষণ জাগে (তা অন্তরের ব্যভিচার), এরপর জননেন্দ্রিয় সেই আবেগ ও আকর্ষণকে কার্যে পরিণত করে। অথবা মনের আবেগ ও আকর্ষণকে সে প্রত্যাখ্যান করে।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১০১৯. একব্যক্তি বলল, 'হে রসূলুল্লাহ্, কোন্ পাপ আল্লাহ্‌র কাছে গর্হিত?' তিনি বললেন, 'যদি তুমি আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী নির্ধারণ কর, যদিও তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' সে বলল, 'তারপর কি?' তিনি বললেন, 'যদি তুমি তোমার সন্তানকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা কর।' সে বলল, 'তারপর কি?' তিনি

বললেন, 'যদি তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার কর।'—আবু দাউদ ও আরো ৫ জন।

১০২০. শেরেকের পর ব্যভিচার অপেক্ষা গর্হিত পাপ আর নেই।

১০২১. হে আলী, যদি দৈবাৎ কোন রমণীর প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়ে, তবে দ্বিতীয়বার তার দিকে দৃষ্টিপাত করোনা, কারণ প্রথম দৃষ্টি বৈধ হলেও দ্বিতীয় দৃষ্টি বৈধ নহে।—আবু দাউদ। তিরমিজী।

১০২২. একমাত্র ব্যভিচার ৭০ বৎসরের এবাদত ধ্বংস করে।—সগির।

১০২৩. মাগের আসলামী নামে এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে বলল যে, সে ব্যভিচার করেছে। রসুলুল্লাহ্ তার দিক থেকে পাশ ফিরিয়ে নিলেন। সে (সেই) অন্যপাশে এসে বলল যে, সে ব্যভিচার করেছে। রসুলুল্লাহ্ পুনরায় পার্শ্বপরিবর্তন করলেন। এভাবে চতুর্থবার বলার পর তার সম্বন্ধে আদেশ হল এবং একটা মাঠে নিয়ে তাকে পাথর দিয়ে মারা হল। যখন তার দেহে একটি পাথর লাগল; সে পালিয়ে যেতে লাগল। এক ব্যক্তির হাতে উট চালনার লাঠি ছিল, সে তাই দিয়ে তাকে মারতে লাগল এবং অন্য লোক-জনও তাকে মারতে লাগল। তারপর সে মরে গেল। পরবর্তী কালে তার পালিয়ে যাবার কথা রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, 'কেন তাকে ছেড়ে দিলেনা?' অন্য বর্ণনায়, 'তোমরা কেন তাকে ছেড়ে দিলে না? হয়তো সে অনুতাপ (তওবা) করত এবং আল্লাহ্ তার অনুতাপ কবুল করতেন।' —তিরমিজী। ইবনে মাজা। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১০২৪. রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কালে এক স্ত্রীলোকের ওপর বলাৎকার করা হয়েছিল। তিনি সেই স্ত্রীলোককে নির্ধারিত শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়ে বলাৎকারকারীর ওপরে তা প্রয়োগ করলেন।—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ ওয়ায়েল বিন হোজর (রাঃ)।

১০২৫. ব্যভিচার দারিদ্র্য সৃষ্টি করে, মুখের জ্যোতি হরণ করে এবং আয়ু হ্রাস করে।—সগির।

১০২৬. ঐশ্বর্য এবং ব্যভিচার কখনো মানুষের সাথে সমসূত্রে থাকে না। —সগির।

ভ্রমণ (সফর)

[ইসলামের দৃষ্টিতে সফর বা ভ্রমণ শিক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—Travelling is a part of education. তীর্থভ্রমণ (হজ্জ্) সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমানদের জন্য ফরজ (অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য) এবং কলেমা, নামাজ, রোজা, জাকাত প্রভৃতি ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ।]

'পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং পাপীদের পরিণাম অবলোকন কর।' ৩ (১৩৭)

'তিনি পবিত্র ও মহিমময় যিনি তাঁর দাস মুহম্মদ-কে তাঁর নিদর্শ-

দেখাবার জন্যে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল-হারাম (কাবাশরীফ) থেকে মসজিদুল আকসা।' ১৭ (১)

—আল্-কোরআন।

১০২৬.(ক) জ্ঞানান্বেষণের জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশেও গমন কর। —মিস্‌বাহোশ্‌শারিয়ত।

১০২৬.(খ) যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে বিদেশে ভ্রমণ করে, আল্লাহ্‌-তা'লা তার জন্যে বেহেশ্‌তে উন্নতস্থান নির্ধারণ করেন এবং তার প্রতিটি পদক্ষেপ আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়।—ওসিয়াতুন্নবী।

১০২৬.(গ) যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করে আল্লাহ্‌-তা'লা তার জন্যে বেহেশ্‌তের পথ সহজ করে' দেন।—মুসলিম। বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১০২৬.(ঘ) বিদেশ ভ্রমণকালে (একসঙ্গে) তিনজন থাকলে একজনকে নেতা (আমীর) নির্বাচিত কর।

১০২৬.(ঙ) রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) একবার ভ্রমণোপলক্ষে ১৯ দিন বাইরে ছিলেন। তিনি প্রত্যেক দিন (মগরিব ছাড়া) প্রত্যেক নামাজ দু'রাকাত করে পড়েছেন।—বুখারী। বর্ণনায় : ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)। [এ নিয়ম বিদেশ-ভ্রমণকারী প্রবাসী বা মুসাফিরের জন্য। ইমাম আবু হানীফা (রাঃ)-র মতে কারো ভ্রমণ বা সফরকাল ১৫ দিনের কম হলে তাঁকে মুসাফির বলা যাবে না।]

মজুদ্দারী

১০২৭. যে মজুদ্দার, সে পাপী।—মুস। বর্ণনায় : মে'মার (রাঃ)।

১০২৮. শস্য আনয়নকারী ভাগ্যবান এবং মজুদ্দার অভিশপ্ত।—ইব্‌নে মাজা। বর্ণনায় : ওমর (রাঃ)।

১০২৯. যে ব্যক্তি অধিক মূল্যের আশায় ৪০ দিন যাবৎ খাদ্যশস্য মজুদ ক'রে রাখে সে আল্লাহ্‌র থেকে মুক্ত এবং আল্লাহ্‌ও তার কাছ থেকে মুক্ত।—রাজীন। বর্ণনায় : ইব্‌নে ওমর (রাঃ)

১০৩০. যারা মুসলমানদের ক্ষতি করে' তাদের খাদ্যশস্য মজুদ করে রাখে আল্লাহ্‌ তাদের সংক্রামক ব্যাধি ও দারিদ্র্য দ্বারা দুঃখ দেবেন। ই. মাজা। বর্ণনায় : ওমর (রাঃ)।

মজুরী

১০৩১. শ্রমিকের (গায়ের) ঘাম শুকোবার আগেই (তার) মজুরী মিটিয়ে দাও।—ইব্‌নে মাজা। বর্ণনায় : আব্দুল্লাহ্‌ বিন ওমর (রাঃ)।

১০৩২. আল্লাহ্‌ বলেন : আমি বিচারের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াব—

জন ব্যক্তি আমার নামে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু রক্ষা করেনি ; যে ব্যক্তি স্বাধীন লোককে বিক্রয় করে' তার মূল্য ভোগ করেছে এবং যে ব্যক্তি মজুরের দ্বারা সম্পূর্ণ কাজ করিয়ে তার মজুরী দেয়নি।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১০৩৩. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) শিঙ্গাদারকে তার মজুরী দিয়েছিলেন। তাঁর নাসিকায় তিনি ঔষধ ব্যবহার করেছিলেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

১০৩৪. আল্লাহ্ এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি মেষ চরাননি। সাহাবীগণ প্রশ্ন করল ঃ আপনিও ? তিনি বললেনঃ আমি কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মেষ চরাতাম। [এক কিরাত প্রায় এক পয়সার সমান।]—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায় (রাঃ)।

মদ্যপায়ী ও তার শাস্তি

'হে রসূল। লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করে ; বল, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য (যৎকিঞ্চিৎ) উপকারও আছে, কিন্তু ওদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।' ২ (২১৯)।

'হে বিশ্বাসিগণ, মদ, জুয়া, মূর্তি-পূজারীর বেদী এবং ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ ; সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর···যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহ্‌র স্মরণে ও নমাজে বাধা দিতে চায়। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবেনা ?' ৫ (৯০,৯১)।

'হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়োনা—যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ তা বুঝতে পার।' ৪ (৪৩)।

—আল্-কোরআন।

১০৩৫. মদ নিষিদ্ধ বলে আল্লাহ্‌র আদেশ (অহী) অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পাঁচটা জিনিষ থেকে তৈরী হয়—আঙ্গুর, খেজুর, যব, আটা ও মধু। মদ এমন জিনিষ যা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ ওমর (রাঃ)।

১০৩৬. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মদ প্রসঙ্গে দশ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন ঃ যে এর রস নেয়, যে রস নিয়ে যাবার জন্য নিযুক্ত হয়, যে এ পান করে, যে বহন করে, যার কাছে বহন করে, যে এ পান করতে দেয়, যে বিক্রয় করে, যে মূল্য গ্রহণ করে, যে ক্রয় করে এবং যার জন্য ক্রয় করা হয়।—তির। ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

১০৩৭. কখনো মদ পান করো না, কারণ ও সমস্ত কুকার্যের কুঞ্জিকা।—ইবনে মাজা।

১০৩৮. তিন ব্যক্তির জন্য বেহেশ্ত হারাম—১) মদ্যপায়ী, ২) মাতা পিতার অবাধ্য ব্যক্তি, ৩) অসতর্ক গৃহকর্তা যে আপন পরিবারের মধ্যে অপবিত্রতা স্থাপন করে।—নাসায়ী। বর্ণনায়ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

১০৩৯. যে ব্যক্তি চারটে জিনিষ থেকে সতর্ক থাকে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে —অন্যায় রক্তপাত, অবৈধ অর্থ সঞ্চয়, ব্যভিচার এবং মদ্যপান।—সগির।

১০৪০. প্রত্যেক নেশা-উৎপাদনকারী পানীয় অবৈধ।—বুখারী, ও মুসলিম সহ ৬জন। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১০৪১. সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য থেকে বিরত থাক।—সগির।

১০৪২. মদ্যপায়ী মূর্তিপূজকের তুল্য। —সগির।

১০৪৩. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে মদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি নিষেধ করলেন। তখন বলা হল ঃ আমি এ ঔষধের জন্য তৈরী করি। তিনি বললেন ঃ এ ঔষধ নয় বরং ব্যাধি।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ ওয়ায়েল হাজরামী(রাঃ)।

১০৪৪. যে ব্যক্তি ইহকালে মদ পান করবে এবং অনুতাপ করবে না, সে পরকালে শারাবন তহুরা (বা পবিত্র মদিরা) পান করবে না।—সগির।

১০৪৫. যদি মদ্যপানে অভ্যাসবত ব্যক্তি মারা যায়, সে এমন ব্যক্তির মত আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে যে মূর্তি পূজা করে।—ইব্‌নে মাজা। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

১০৪৬. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মদ্যপানের অপরাধে লাঠি এবং জুতার দ্বারা প্রহার করতেন। হজরত আবুবকর চল্লিশবার বেত্রাঘাত করতেন। অন্য বর্ণনায় ঃ মদ্যপানের অপরাধে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) লাঠি ও জুতার প্রহারের সঙ্গে ৪০ বার বেত্রাঘাত করতেন।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

১০৪৭. এক ব্যক্তি মদ পান করলে তাকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত করা হল। তিনি তাকে প্রহার করার নির্দেশ দিলেন। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে হাতের দ্বারা, কেউ জুতার দ্বারা এবং কেউ বস্ত্রের দ্বারা প্রহার করল। বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১০৪৮. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ মদ পান করলে তাকে বেত্রাঘাত কর। চতুর্থবার পান করলে তাকে হত্যা কর। এক ব্যক্তি চতুর্থবার মদ পান করলে তাকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-র কাছে উপস্থিত করা হল। তিনি তাকে বেত্রাঘাত করলেন, কিন্তু হত্যা করলেন না।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

১০৪৯. যে সব পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মাদকতা থাকবে তা সবই হারাম।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

মধ্যপথ

'আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমারা মানব জাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ হতে পার।' ২(১৪৩)

'নামাজে স্বর উচ্চ করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না—এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।' ১৭ (১১০)

'ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।' ৪ (১৭১)

—আল্-কোরআন।

১০৫০. মধ্যপথই সকল কাজে উত্তম।—বয়হাকী।

১০৫১. আনাস (রাঃ) বলেনঃ একদিন তিনজন লোক রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সহধর্মিণীদের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর (রসূলের) উপাসনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। যখন তাঁদের (ঐ লোকেদের) ঐ বিষয়ে বলা হল, তখন তাঁরা নিজেদের অত্যন্ত নগণ্য মনে করলেন এবং বললেন, 'আমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর তুলনায় কোথায় আছি, আর আল্লাহ্ তাঁর (রসূলের) পূর্ব ও পরের সমস্ত পাপ মাফ করে দিয়েছেন।' তারপর তাঁদের (লোকেদের) একজন বললেনঃ 'আমি সারা রাত নামাজ পড়ব।' অপরজন বললেনঃ 'আমি প্রতিদিন রোজা রাখব এবং কোনদিন এফতার করবনা।' তৃতীয়জন বললেন, 'আমি চিরকাল স্ত্রীলোকের সঙ্গ ত্যাগ করব এবং কখনো বিবাহ করবনা।' এমন সময় নবী (সঃ) তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, 'তোমরা এই কথাগুলো বলছিলে না? আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয় তোমাদের অপেক্ষা আমি আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করি এবং তাঁর প্রতি অধিকতর কর্তব্যপরায়ণ। কিন্তু আমি রোজা রাখি, এফতার করি, নামাজ পড়ি, রাত্রিজাগরণ করি এবং বিবাহ করেছি।' তারপর বললেন, 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের প্রতি উদাসীন সে আমার কেউ নয়।' [কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি অপেক্ষা মধ্যপথই শ্রেয়ঃ]—শায়খান।

১০৫২. 'তোমাদের কাউকেও তার কর্ম মুক্তিদান করতে পারবেনা।' সাহাবীরা বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্, আপনাকেও না?' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'আমার কর্মও আমাকে মুক্তিদান করতে পারবে না, যদি না আল্লাহ্‌র করুণা আমার সর্বাঙ্গ আবৃত করে। অবশ্য তোমরা সত্য ও সঠিক পথে অগ্রসর হতে থাক এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সচেষ্ট থাক। আর সকালে, বিকালে ও শেষ রাত্রির অন্ধকারে উপাসনার অভ্যাস কর এবং মধ্যপন্থায় সৎকর্মে আত্মনিয়োগ কর—লক্ষ্যে পৌঁছুতে সক্ষম হবে।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১০৫৩. ইসলামধর্ম অত্যন্ত সহজ ও সরল। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি ধর্মের সংগে বাড়াবাড়ি করবে সে কাবু হয়ে পড়বে। তাই সকলের কর্তব্য হবে, সঠিক ভাবে দৃঢ়তার সংগে ইসলামের নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি বা বাড়াবাড়ি না করে ধীর স্থির গতিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলা এবং আল্লাহ্ তা'লার আশীর্বাদ ও করুণার আশা পোষণ করা এবং সকাল-বিকাল ও শেষরাত্রে সকল উপাসনার মাধ্যমে (আল্লাহ্‌র) সাহায্য গ্রহণ করা।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১০৫৪. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ একবার ভ্রমণকালে নবী (সঃ) আমাদের পেছনে পড়লেন। তিনি আমাদের কাছে এমন সময়ে পৌঁছুলেন যে নামাজ আমাদের ওপর চেপে গিয়েছিল (অর্থাৎ দেরী হয়েছিল) এবং আমরা অজু করছিলাম আর (তাড়াতাড়িতে) পা ওপর-ওপর ধুচ্ছিলাম। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে দু'তিনবার বললেন, 'এই গোড়ালিগুলির দুর্গতি হবে আগুনের শাস্তিতে।' —বুখারী।

১০৫৫ লোকেদের জন্য সহজ সরল পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না। তাদের মধ্যে শান্তি ও আস্থা সৃষ্টির চেষ্টা কর, ঘৃণা ও অনাস্থা সৃষ্টি হতে পারে এমন পথ অবলম্বন করো না।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

১০৫৬. আজরাক ইবনে কায়েস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আমরা একটা শুকনো খালের ধারে নামাজ পড়ছিলাম। সেই সময় সাহাবী আবু বুরজা

(রাঃ) একটা ঘোড়ায় চড়ে সেখানে এসে পৌঁছুলেন এবং ঘোড়া রেখে নামাজে শরিক হলেন। এমন সময় তাঁর ঘোড়াটা ছুটে দূরে চলে যেতে লাগল। তিনি নামাজ ছেড়ে ঘোড়ার পেছনে ছুটলেন এবং তাকে ধরে আনলেন। তারপর আবার নামাজ পড়ে নিলেন। আমাদের মধ্যে এক স্বল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি সাহাবী আবু বুরজা (রাঃ)-র প্রতি কটাক্ষ করে বলল, 'ঐ বুড়ো মিঞাকে দেখ—উনি ঘোড়ার জন্য নামাজ ছেড়ে দিয়েছেন।' (তখন) আবু বুরজা (রাঃ) সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সঃ) দুনিয়া থেকে চলে যাবার পর আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে কোন বিষয়ে কটাক্ষ করেনি। আমার বাড়ী অনেক দূর, আমি নামাজ ভঙ্গ না করলে আমার ঘোড়া নাগালের বাইরে চলে' যেত, ফলে আমি সারা রাতেও বাড়ী পৌঁছুতে পারতাম না।' তারপর আবু বুরজা (রাঃ) উল্লেখ করলেন যে নবী (সঃ)এর সংসর্গে তিনি দেখেছেন যে ধর্মের ব্যাপারে হজরত (দঃ) সরল ও সহজ পথ অবলম্বনের কত বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। —বুখারী।

১০৫৬(ক). মন্থরতা আল্লাহ্‌তা'লার বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষিপ্রতা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। —তিরমিজী।

মাতাপিতা ও সন্তানের কর্তব্য

'মায়েরা তাদের সন্তানদের পুরো দুবছর দুধপান করাবে, যদি কেউ দুধপান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়।···আর যদি পিতামাতা পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শ-ক্রমে দুবছরের মধ্যেই (শিশুর) দুধপান ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কোন দোষ হবে না।' ২ (২৩৩)

'তোমার প্রতিপালক তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাসনা না করতে এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। ওদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবিত থাকাকালে বার্ধক্যে উপনীত হলেও ওদের বিরক্তিসূচক কিছু বলোনা এবং ওদের ভর্ৎসনাও করো না, ওদের সাথে সম্মানসূচক নম্রকথা বলো, অনুকম্পায় ওদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো 'হে আমার প্রতিপালক! ওদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে ও'রা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন'।' ১৭ (২৩, ২৪)

'আমি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি, তবে ওরা যদি আমার সাথে এমন কিছু অংশীদার করতে তোমাকে বাধ্য করে যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই—তুমি তাদের কথা মান্য করোনা।' ২৯ (৮)

'আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মাতা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু বছর (২) অতিবাহিত হয়। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই কাছে তো প্রত্যাবর্তন। তোমার পিতামাতা যদি (কাউকে) আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে তোমায় পীড়াপীড়ি করে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই—তুমি তাদের কথা মান্য করো না; তবে পৃথিবীতে তাদের সংগে সদ্ভাবে বসবাস করবে।' ৩১ (১৪, ১৫)

"আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে এবং যন্ত্রণা ভোগ করে' প্রসব করে;—তাকে

গর্ভে ধারণ করতে এবং স্তন্য ত্যাগ করাতে ত্রিশ মাস সময় লাগে ; ক্রমে সে যোগ্য বয়সে উপনীত হওয়ার পর বলে, 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি—আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর ; আমার সন্তানসন্ততিদের সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।' আমি এদেরইতো সুকৃতিসমূহ গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দ কাজসমূহ উপেক্ষা করি, এরা হবে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে। এমন লোক আছে যে তার পিতামাতাকে বলে, 'তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু মানুষ গত হয়েছে এবং তারা পুনরুত্থিত হয়নি।' তখন তার পিতামাতা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে বলে, 'দুর্ভোগ তোমার জন্য, বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌র কথা অবশ্যই সত্য।' কিন্তু সে বলে, 'এতো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।' এদের পূর্বে যেসব জিন ও মানুষ গত হয়েছে তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহ্‌র শাস্তি অবধারিত। এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। প্রত্যেকের স্থান তার কর্মানুযায়ী. এজন্য যে আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।' ৪৬ (১৫-১৯)

'হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ ! তোমরা তোমাদের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের নরকের অগ্নি থেকে রক্ষা কর।'

—আল্-কোরআন।

১০৫৭. যার সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে যেন তাকে একটা উত্তম নাম দেয় এবং আদব শিক্ষা দেয় ; যখন সে বয়স্ক হয় তখন সে যেন তাকে বিবাহ দেয়। যদি বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ না দেয়, তাহলে সে পাপ করলে তার ভার পিতার ওপরই বর্তাবে। —ই. মাজা। বয়হাকী। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

১০৫৮. ভিক্ষুককে একবস্তা আটা দান করা অপেক্ষা তোমাদের সন্তানগণকে শিক্ষা দান করা উৎকৃষ্টতর। —তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আউফ (রাঃ)।

১০৫৯. কোন পিতামাতাই তাদের সন্তানগণকে আদবকায়দা শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছু শিক্ষা দেয়না। —তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু মুসা (রাঃ)।

১০৬০. 'আমার সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করলে কি আমার পুণ্য আছে ?' তিনি (দঃ) বললেন, 'তাদের জন্য ব্যয় কর, তাতে পুণ্য আছে।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ সালামা (রাঃ)

১০৬১. বিবাহ একটা আশীর্বাদ এবং সন্তানের জন্ম অনুগ্রহ স্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের স্নেহ কর। কারণ তাদের স্নেহ করা উপাসনা বিশেষ। —মিশকাত।

১০৬২. আনাস (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমরা রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গে ইব্রাহীমের ধাত্রী আবি সাইফ লাইকানের বাড়ীতে উপস্থিত হলে তিনি (মৃতপুত্র) ইব্রাহীমকে চুম্বন করলেন এবং ঘ্রাণ নিলেন। তারপর আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। (জীবিত) ইব্রাহীমের কথা তখন তাঁর মন থেকে দূরে হয়েছিল। রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরছিল। তারপর আব্দুর

রহমান ইবনে আউফ বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্! আপনিও কি (শোকার্ত হন)?' তিনি বললেন, 'হে ইবনে আউফ। এ হল স্নেহ।' তারপর তিনি আর একটা কথা বললেন, 'নিশ্চয়ই চক্ষু অশ্রুবর্ষণ করে, অন্তঃকরণ দুঃখ বোধ করে, আর আমরা শুধু তাই (এ প্রসঙ্গে) বলি যাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। হে ইব্রাহীম! তোমার শোকে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।'—শায়খান।

১০৬৩. এক বেদুইন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, 'আপনি কি সন্তানদের চুম্বন দেন? আমরা দিই না।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'আল্লাহ্ তোমার অন্তর থেকে স্নেহ কেড়ে নিলে আমি কি কিছু করতে পারি?' —বুখারী। মুস। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১০৬৪. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হাসান বিন আলী (রাঃ)কে চুম্বন করলেন। আকরায়া বিন হারেছ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমার দশটি সন্তান, তাদের একটিকেও আমি কখনো চুম্বন করিনি। তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, যে দয়া করে না তাকে দয়া করা হবে না।'—শায়খান। বুখারী। মুস। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১০৬৫. হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, স্বভাবচরিত্র, পরিচালনা ও আচার ব্যবহার (এবং অন্য বর্ণনায়) কার্য ও বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গে ফাতেমা অপেক্ষা অন্য কারো অধিকতর সাদৃশ্য দেখিনি। যখনই ফাতেমা তাঁর কাছে হাজির হতেন, তিনি তাঁর জন্যে উঠে দাঁড়াতেন; তারপর তাঁর হাত ধরতেন, চুমু খেতেন, তাঁর আসনে তাঁকে বসতে দিতেন; এবং যখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর কাছে উপস্থিত হতেন তিনি তাঁর হাত ধরতেন, তাঁকে চুমু খেতেন এবং আপন আসনে তাঁকে বসাতেন। —আবু দাউদ।

১০৬৬. এক শিশুকে নবী (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত করা হলে তিনি তাকে চুম্বন করলেন এবং বললেন, নিশ্চয় এরা কৃপণতা ও কাপুরুষতার কারণ এবং নিশ্চয়ই এরা আল্লাহ্র সুগন্ধি পুষ্প।—মিশকাত। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১০৬৭. যে তার শিশুকন্যাকে জীবন্ত কবর দেয় না, বা অবহেলা করেনা কিংবা তার চেয়ে পুত্রকে অধিক পছন্দ করে না···সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ করবে। [সে সময় আরবে কন্যাসন্তান ভূমিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত কবর দেওয়া হত।]—আ. দাউদ।

১০৬৮. যে ব্যক্তি তার কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষণ করে সে এবং আমি কেয়ামতের দিন এইভাবে থাকব, (বলে) তিনি (দঃ) তাঁর অঙ্গুলি সমূহ একত্র করে' দেখালেন। —মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আব্বাস (রাঃ)।

১০৬৯. আলী (রাঃ) আবু জেহেলের মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছিলেন। সে খবর শুনে (আলী-পত্নী, নবী-কন্যা) ফাতেমা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনার আত্মীয়-স্বজনগণ বলে যে আপনি আপনার মেয়েদের হয়ে কারো প্রতি একটুও রাগ দেখান না। এই দেখুন, আলী (রাঃ) আবু জেহেলের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছেন।' একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ভাষণের শুরুতে কলেমা শাহাদাৎ পাঠ করে আবুল আ'ছ-এর প্রশংসা করে বললেন, 'তার সঙ্গে আমার এক মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলাম; সে আমাকে যে কথা দিয়েছিল তা রেখেছে। নিশ্চয় ফতেমা আমার কলজের টুকরো, তার

ব্যথায় আমি ব্যথিত হই। খোদার কসম, আল্লাহ্‌র রসূলের মেয়ে এবং আল্লাহ্‌র শত্রুর মেয়ে একই ব্যক্তির (সঙ্গে) বিবাহ-সূত্রে একত্রিত হতে পারবে না।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-র এই কথার পর আলী (রাঃ) উক্ত বিয়ের প্রস্তাব পরিত্যাগ করলেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ মেস্‌ওয়ার ইব্‌নে মাখ্‌রামাহ্ (রাঃ)।

১০৭০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বেদীর ওপরে দাঁড়িয়ে তাঁর ভাষণে বললেন, '(আবু জেহেল-পরিবার) বনি-হেশাম তাদের মেয়েকে আলীর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য আমার অনুমতি চেয়েছে। সে অনুমতি আমি দেব না, দেব না, দেব না। হ্যাঁ, তবে যদি আবু তালেবের পুত্র (আলী) আমার মেয়েকে তালাক দিয়ে (ত্যাগ করে) তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চায় (তো করুক)। ফাতেমা আমার হৃদয়ের ধন (কলিজার টুকরো), তার দুঃখে আমি দুঃখ পাই, তার ব্যথায় আমি ব্যথা বোধ করি।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ মেস্‌ওয়ার ইব্‌নে মাখ্‌রামাহ্ (রাঃ)।

১০৭১. প্রার্থনা ব্যতীত অদৃষ্টের পরিবর্তন হয় না, পিতামাতার প্রতি ভক্তি ব্যতীত দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় না। নিশ্চয় মানুষ আপন পাপের জন্য জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়। —ই. মাজা।

১০৭২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'তার নাসিকা ধূলি-ধূসরিত হোক!' সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করল, 'কার?' তিনি (দঃ) বললেন, 'যার মাতা ও পিতা বা তাদের মধ্যে কোন একজন বৃদ্ধ হয়েছে এবং সে তাদের সেবা করে' বেহেশ্‌তে যাবার যোগ্য হয়নি।'—মুস। তির।

১০৭৩. নিশ্চয় আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের জন্য মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, কন্যাকে জীবন্ত কবর দেওয়া, বাজে গল্পগুজব ও অর্থহীন আলোচনা করা, অত্যধিক প্রশ্ন করা এবং অপব্যয় করা নিষেধ করেছেন।—শায়।

১০৭৪. বনি-সালেমা গোত্রের এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে রসূলুল্লাহ্! মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের পর আরও কিছু বাকী থাকে কি যা আমি তাদের মৃত্যুর পরে করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা, তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া, তাদের মৃত্যুর পর তাদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করা, তাদের অছিলায় যাদের সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে সদ্ভাব রক্ষা এবং তাদের বন্ধুবান্ধবদের সম্মান করা।—আ. দাউদ। ই. মাজা।

১০৭৫. মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুবান্ধবের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা।—মুসলিম।

১০৭৬. এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলল, আমি পুণ্যলাভের আশায় গৃহত্যাগ এবং জেহাদ করার ইচ্ছা করি; আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, 'তোমার মাতা-পিতা কেউ জীবিত আছেন কি?' সে বলল, 'হ্যাঁ, উভয়েই জীবিত আছেন।' তিনি বললেন, 'তুমি কি সৎকার্য করে পুরস্কার পাবার ইচ্ছা কর? সে বলল, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, 'তবে তুমি তোমার মাতাপিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদের সেবা কর।'—মুসলিম।

১০৭৭. মাতাপিতার সন্তোষেই আল্লাহ্‌র সন্তোষ এবং মাতাপিতার অসন্তোষেই আল্লাহ্‌র অসন্তোষ।—তিরমিজী।

১০৭৮. এক ব্যক্তি হজরতের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমি জেহাদ করার

ইচ্ছা করি। তিনি বললেন, 'তোমার মা আছে ?' সে বলল, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, 'তাকেই সেবা কর, তার পায়ের কাছেই বেহেশ্‌ত।'—মিশ। নাসায়ী। বয়হাকী।

১০৭৯. এক ব্যক্তি বলল, 'আমি মহাপাপ করেছি, আমার জন্য কি তওবা আছে ?' তিনি বললেন, 'তোমার মা আছে ?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'তোমার কোন মাসী আছে ?' সে বলল, 'হাঁ।' তিনি বললেন, 'তুমি তার সেবা কর।'—তিরমিজী।

১০৮০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বসেছিলেন, এমন সময়ে তাঁর পালক-পিতা উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাঁর চাদরের কিয়দংশে তাঁকে বসতে দিলেন। এরপর তাঁর পালক-মাতা (বিবি হালিমা) উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাঁকে তাঁর চাদরের অবশিষ্ট অংশে বসতে দিলেন এবং নিজে তার উপরে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর পালক-ভ্রাতা তাঁর কাছে আসলেন ; তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের মধ্যে তাঁকে বসতে দিলেন।—আবু দাউদ।

১০৮১. এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হল এবং জিজ্ঞাসা করল, কোন ব্যক্তি আমার সদ্ব্যবহার পাবার সর্বাধিক অধিকারী ? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে বলল, তারপর কে ? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে বলল, তারপর কে ? তিনি বললেন, তারপরেও তোমার মাতা। সে বলল, তারপর কে কে ? তিনি বললেন, তোমার পিতা। অন্যত্র বর্ণিত আছে—তোমার মাতা তারপর তোমার পিতা, তারপর তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন, তারপর নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজন।—শায়খান। বুখারী।

১০৮২. পিতা বেহেশ্‌তের মধ্যবর্তী দ্বার, হয় তা ধ্বংস কর অথবা তা রক্ষা কর। [পিতার অবাধ্য হলে সে দ্বার ধ্বংস হবে এবং দোজখে যেতে হবে।] —তিরমিজী। ই. মাজা।

১০৮৩. এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, সন্তানের ওপর তার পিতামাতার দাবী কি ? রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, তারা তোমার বেহেশ্‌ত এবং দোজখ। [দাবী হল বাধ্যতা ; তাদের বাধ্য হলে বেহেশ্‌ত—বাধ্য না হলে দোজখ।]—ইবনে মাজা।

১০৮৪. আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সমস্ত পাপ ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু মাতা-পিতার প্রতি অশ্রদ্ধারূপ পাপ ক্ষমা করবেন না ; এবং মৃত্যুর পূর্বে তার জীবদ্দশাতেই (তিনি) তার শাস্তি দান করতে দ্রুত অগ্রসর হন।—বয়হাকী।

১০৮৫. যে ব্যক্তি তার মাতাপিতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লার বাধ্য থেকে সকালে শয্যা ত্যাগ করে তার জন্য বেহেশ্‌তের দুটি দুয়ার খুলে যায়। যদি তাদের (মাতা ও পিতার) একজন (সম্পর্কে বাধ্য) থাকে তবে একটা দুয়ার খুলে যায়। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তার মাতাপিতার সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লার অবাধ্য হয় তার জন্য দোজখের দুটি দুয়ার খুলে যায় ; যদি একজন হয় তবে একটা দুয়ার খুলে যায়। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, যদি তারা (মাতাপিতা) তার প্রতি অত্যাচার করে ? তিনি বললেন, যদিও তারা তার প্রতি অত্যাচার করে। তিনি তিনবার একথা বললেন।—বয়হাকী।

১০৮৬. কবীরা গুনাহ্ বা মহা পাপসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় পাপ হল, মাতাপিতাকে গালাগালি করা। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মানুষ আপন পিতামাতাকে কিভাবে গালাগালি করতে পারে ? রসূলুল্লাহ্

(সঃ) বললেন, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, ঐ ব্যক্তি (প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আবার) এই ব্যক্তির (গালাগালিকারীর) পিতাকে গালি দেয়। তেমনি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মাতাকে গালি দেয় এবং সেই ব্যক্তি এই (গালাগালি-কারী) ব্যক্তির মাতাকে গালি দেয়। [তাই অন্যের মাতাপিতাকে গালি দিলে পরোক্ষভাবে তা নিজের মাতাপিতাতে বর্তায়।]—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আম্‌র (রাঃ)।

১০৮৭. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, একদিন তিন ব্যক্তি পথ চলছিল, সহসা তারা ঝড়বৃষ্টি দ্বারা আক্রান্ত হল। তারা পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে আশ্রয় নিল। পাহাড়ের উপর থেকে একটা বিরাট পাথর গড়িয়ে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। (তখন) তারা পরস্পর বলাবলি করল, অকপটভাবে আল্লাহ্‌তা'লারই-উদ্দেশ্যে-করেছ এমন কোন কাজ যদি তোমরা স্মরণ করতে পার তাহলে সেই উপলক্ষ্যে আল্লাহ্‌কে আহ্বান কর—হয়তো তিনি তোমাদের উদ্ধার করবেন। তারপর তাদের মধ্য থেকে একজন লোক বলল, হে আল্লাহ্! আমার বৃদ্ধ ও দুর্বল মাতাপিতা এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছিল। আমি তাদের তত্ত্বাবধান করতাম। রাত্রে আমি যখন তাদের কাছে হাজির হতাম তখন আমি টাটকা দুধ দুইতাম এবং আমার সন্তানদের পান করাবার পূর্বে আমার পিতামাতাদের থেকে শুরু করতাম। একদিন আমি (মেষ চরাবার উদ্দেশ্যে বহুদূরে) একটা গাছের কাছে গিয়েছিলাম, রাত্রি সমাগমের পূর্বে আমি ফিরতে পারিনি। তারপর (গৃহে ফিরে) দেখলাম, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও দুধ দুইলাম, তারপর সেই টাটকা দুধ নিয়ে তাঁদের শিয়রে দাঁড়ালাম। তাঁদের জাগাতে আমার ইচ্ছা হলো না এবং আমার শিশু সন্তানেরা আমার পায়ের ধারে কান্নাকাটি শুরু করা সত্ত্বেও দুধ প্রথমে তাদের পান করতে দেওয়া সঙ্গত মনে করলাম না। সকাল হওয়া পর্যন্ত তাদের ও আমার অবস্থা ঐ একই রকম রইল। (হে আল্লাহ্!) যদি তুমি জান যে আমি ও (কাজ) তোমার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য করেছি তাহলে আমার জন্য গুহার মুখ একটু ফাঁক করে দাও, যাতে আমরা ওর মধ্য দিয়ে আকাশ দেখতে পাই। তারপর আল্লাহ্‌তা'লা তাদের জন্য একটা মুখ খুলে দিলেন, তারা আকাশ দেখতে পেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহ্ আমার এক চাচাতো বোন ছিল। পুরুষোচিত প্রগাঢ় প্রেম এবং আসক্তি সহকারে আমি তাকে ভালবাসতাম। আমি তাকে চাইলাম, সে অস্বীকার করল। অবশেষে আমি আমার অতিকষ্টে-সঞ্চয়-করা একশ দিনার নিয়ে তার কাছে গেলাম। তারপর আমি যখন তার দুই জানুর মধ্যে উপবেশন করলাম তখন সে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র বান্দা, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং শিলমোহর খুলোনা।' তখন আমি তাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। (বললাম) হে আল্লাহ্, যদি তুমি জান তোমারই সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে আমি অমন করেছিলাম, তাহলে আমাদের জন্য (দ্বার) মুক্ত কর। তখন আল্লাহ্ তাদের জন্য আর একটা দ্বার মুক্ত করে দিলেন।

অপর ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহ্, আমি কিছু শস্য দেবার শর্তে একজন মজুর নিযুক্ত করেছিলাম। সে কাজ শেষ করে বলল, 'আমার প্রাপ্য আমাকে দিন'—কিন্তু আমি (তাকে) তা দিতে চাইলাম না। সে দাবী না করে' ও ত্যাগ করে চলে গেল। আমি ও (শস্য) কৃষিকার্যে নিযুক্ত করলাম। পরে ওর সাহায্যে

একটা গাভী এবং রাখাল কেনার উপযুক্ত অর্থ সঞ্চয় করলাম। তখন সে আমার কাছে উপস্থিত হল এবং বলল, 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার উপর অত্যাচার করো না—আমার প্রাপ্য আমাকে দান কর।' আমি বললাম, 'এই গোরু আর ওই রাখালের কাছে যাও।' সে বলল, 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমাকে উপহাস করোনা।' আমি বললাম, 'নিশ্চয় আমি উপহাস করছি না, ঐ গাভী আর ওই রাখালকে গ্রহণ কর।' তারপর সে ও গ্রহণ করল এবং চলে গেল। (হে আল্লাহ্‌!) যদি তুমি জান যে আমি তোমারই সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে ও কাজ করেছি তাহলে ওর বাকি অংশ (দুয়ারটা) খুলে দাও। এখন আল্লাহ্‌ তাদের বিপদ দূর করলেন।—শায়খান। বর্ণনায়ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

১০৮৮. ভক্ত সন্তান যখনই তার মাতাপিতার প্রতি সদয়ভাবে দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ্‌ তার প্রত্যেক দৃষ্টির জন্য একটি মনোনীত হজ্জের পুরস্কার লিপিবদ্ধ করেন। তারা জিজ্ঞাসা করল, যদি সে প্রতিদিন একশ বার দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেন, হাঁ, আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা অধিক দানশীল।—বয়হাকী।

১০৮৯. ছোট ভায়ের ওপর বড় ভায়ের দাবী পিতার ওপর পুত্রের দাবীর সমান।—বয়হাকী।

১০৯০. যার মধ্যে তিনটে গুণ থাকবে আল্লাহ্‌ তার মৃত্যু সহজ করবেন এবং তাকে বেহেশ্‌ত দান করবেনঃ দুর্বলের প্রতি সদয় ব্যবহার, মাতাপিতার সাথে সদ্ভাব এবং ক্রীতদাসদের প্রতি করুণা।—তির।

১০৯১. বড় পাপগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হল—আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা শপথ গ্রহণ করা এবং মাছির ডানার মত (সামান্য) স্বত্ব হলেও স্বেচ্ছায় আল্লাহ্‌র নামে (মিথ্যা) শপথ করে তা আত্মসাৎ করা। এ (কাজ) কেয়ামত পর্যন্ত তার অন্তরে কালো কলঙ্ক-চিহ্ন অঙ্কিত করে রাখবে।—তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্‌ বিন ওনায়েস (রাঃ)।

১০৯২. পিতার কাছ থেকে ফিরে যেও না; পিতার কাছ থেকে যে ফিরে যায় সে ধর্মদ্রোহী।—বুখারী। মুস। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১০৯৩. যে ব্যক্তি জেনে শুনেও নিজের পিতাকে পরিত্যাগ করে অন্যকে পিতা বলে স্বীকার করে, তার জন্য বেহেশ্‌তে অবৈধ। বুখারী। মুস। বর্ণনায়ঃ সায়াদ বিন আবু ওয়াক্কাস্‌ (রাঃ)।

১০৯৪. বেহেশ্‌ত মায়ের পদ-প্রান্তে।

১০৯৫. পিতার সন্তোষেই আল্লাহ্‌র সন্তোষ, পিতার অসন্তোষে আল্লাহ্‌র অসন্তোষ।

১০৯৬. মানুষ প্রাণত্যাগ করলে তিনটি জিনিস ছাড়া তার আর সমস্ত কার্য-ফল বন্ধ হয়—সদকায়ে জারিয়া (চিরস্থায়ী দান), লাভজনক জ্ঞান এবং সৎকর্মশীল পুত্র যে তার পিতার জন্য প্রার্থনা করে।—মুস।

১০৯৭. তোমরা আপন পিতার সম্পর্কে ঘৃণা করো না। যে ব্যক্তি পিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে নিশ্চয় কুফরী করে।—মুস্‌। বর্ণঃ আ. হোরায়রা (রাঃ)।

১০৯৮. যে ব্যক্তি পিতাকে ছাড়া অপর কাউকে পিতা বানিয়ে নেবে তার বেহেশ্ত হারাম হয়ে যাবে।—মুস। বর্ণনায় ঃ সা'দ ও আবুবকর (রাঃ)।

মানত করা

১০৯৯. মানত মানুষকে এমন কোনো জিনিস এনে দিতে পারে না যা তার জন্য (আল্লাহ্ কর্তৃক) নির্ধারিত ছিলনা। হাঁ, মানত মানুষকে ঐ জিনিসের কাছে পৌঁছে দেয় যা তার জন্য নির্ধারিত করা ছিল। ফলতঃ, আল্লাহ্‌তা'লা কৃপণের মাল বের করে থাকেন—কৃপণ মানত-সূত্রে মাল খরচ করে থাকে যা সে মানত ব্যতীত খরচ করত না। বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১১০০. মানত তক্দিরকে পরিবর্তন করতে পারে না—অবশ্য ওর দ্বারা কৃপণের ধন বের হয়ে যায়।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)।

১১০১. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে মান্য করার জন্য মানত করে সে যেন সে মানত পূর্ণ করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানির (অবাধ্যতার) কাজে মানত করে সে যেন সে কাজ কখনো না করে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১১০২. নবী (সঃ) খোৎবা (জুমআর নামাজের ভাষণ) দান কালে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি (দঃ) তার দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল, এর নাম আবু ইস্রাইল। এ মানত করেছে, 'দাঁড়িয়ে থাকবে—বসবেনা, রৌদ্রে থাকবে—ছায়ায় আশ্রয় নেবেনা, কথা বলবেনা, সব সময় রোজা রাখবে।' নবী (সঃ) লোকেদের বললেন, 'তাকে বলে দাও—সে যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে এবং বসে ; আর রোজার মানত পূর্ণ করে।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

মানুষ

'সমস্ত মানবমণ্ডলী একজাতি।' ২ (২১৩)

'হে মানুষ, আমি তোমাদের একই পুরুষ ও একই নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন গোত্র ও পরিবারে বিভক্ত করেছি—যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহতা'লার কাছে অধিক মর্যাদা-সম্পন্ন—যে ব্যক্তি অপরের প্রতি আপন কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ।' ৪৯ (১৩)

মানুষ ছিল একজাতি, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে।' ১০ (১৯)

'যখন ফেরেশতাদের বললাম, আদমের (আদি মানবের) প্রতি নত হও, তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই প্রণত হল ; সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হল।' ২ (৩৪)

'আমি পৃথিবীতে (মানুষকে) প্রতিনিধি সৃষ্টি করেছি।, ২ (৩০)

'আমি তো ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি।' ১৫ (২৬)। 'বল, তোমাদেরই মত মানুষ আমি।'

—আল্-কোরআন।

১১০২. (ক) মানুষ মাত্রই আদম-সন্তান এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।—সগির।

১১০২. (খ) সমস্ত মানুষ স্বর্ণ-রৌপ্যের খণি সদৃশ।—মুসলিম।

১১০২. (গ) আমি মানুষ, মরণশীল।—মিশ। বর্ণনায় ঃ ইবনে মসউদ (রাঃ)।

১১০২. (ঘ) মানুষের মন গিরগিটির মত প্রত্যহ সাতবার বদলায়।—সগির।

মৃত্যু, শোক, কবর ও শাস্তি

'জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।' ৩ (১৮৫)

'এবং আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হবে না, কেন না ওর মেয়াদ অবধারিত।' ৩ (১৪৫)

'শোক ও দুঃখ-কষ্ট আসলে যারা এই ভেবে ধৈর্য ধারণ করে যে, আমরা সকলেই আল্লাহ্র এবং আমাদের সকলকেই আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, সেই সব লোকদের প্রতি তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ, বিশেষ রহমত ও করুণা ; আর তারাই হেদায়েত ও সৎপথের ওপর।' (২য় পারা, ৩য় রুকু)

—আল্-কোরআন।

১১০৩. মরণের পূর্বে মরণের জন্য প্রস্তুত হও।—সগির।

১১০৪. শিশুরা যেমন সহজে মাতৃগর্ভ থেকে বহির্গত হয়, মোমেন ব্যক্তিরাও তেমনি সহজে পৃথিবী থেকে বহির্গত হয়। —সগির।

১১০৫. মৃত্যু মোমেনদের জন্য একটা অনুগ্রহ। —বয়হাকী।

১১০৬. মৃত্যু মোমেনদের জন্য সমস্ত পাপের বিনিময়। —সগির।

১১০৭. মৃত্যু দরিদ্রের পক্ষে শাহাদাত।—সগির।

১১০৮. তোমাদের কেউই যেন মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা না করে—তা সে সৎ-কর্মশীল হোক আর অসৎ-কর্মশীলই হোক। কারণ সে সৎকর্মশীল হলে দীর্ঘ-জীবী হয়ে আরো সৎকাজ করবে এবং অসৎকর্মশীল হলে পরিণামে হয়তো অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র মার্জনা লাভ করবে।—বুখারী।

১১০৯. মুমূর্ষু অবস্থাতেও তোমরা মৃত্যুর ইচ্ছা বা প্রার্থনা করো না। কারণ তোমরা প্রাণত্যাগ করলে তোমাদের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হবে এবং তোমরা পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হবে। মোমেনের দীর্ঘায়ু নিশ্চয় তার সৎকর্মবৃদ্ধির উপায়। —মুসলিম।

১১১০. মৃত ব্যক্তি মাত্রেই অনুতপ্ত হয়। যে সৎকর্মশীল সে অনুতাপ করে যে দীর্ঘজীবী হলে সে আরো সৎকর্ম করতে পারত, আর যে অসৎকর্মশীল

সে অনুতাপ করে যে দীর্ঘজীবী হলে হয়তো পরে অসৎকর্ম পরিত্যাগ করত। —তিরমিজী।

১১১১. আল্লাহ্র ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ এবং তাঁর করুণা ও মার্জনা লাভের আশা না নিয়ে তোমরা কেউ মরো না। —মুসলিম।

১১১২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসে আল্লাহ্তা'লাও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসে না আল্লাহ্তা'লাও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসেন না। তারপর হজরত আয়েশা (রাঃ) বা নবী (সঃ)-এর অন্য কোন স্ত্রী বললেন, 'নিশ্চয়ই আমরা মৃত্যুকে অপছন্দ করি।' তিনি বললেন, 'সে কিছু নয়। তবে কোন মোমেনের কাছে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাকে আল্লাহ্তা'লার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহের সুসংবাদ দেওয়া হয়; সুতরাং তার সামনে যা থাকে (অর্থাৎ মৃত্যু) তার চেয়ে আর কোন কিছু প্রিয়তর হয় না। অতএব সে আল্লাহ্র সাথে মিলিত হতে ভালবাসে এবং আল্লাহ্তা'লাও তার সাথে মিলিত হতে ভালবাসেন। আর অবিশ্বাসীর কাছে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তাকে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও শাস্তিদানের দুঃসংবাদ দেওয়া হয়, সুতরাং তার সামনে যা থাকে (মৃত্যু) তার চেয়ে কোন কিছুই আর তখন অধিক অপ্রিয় বলে মনে হয় না। অতএব সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে ঘৃণা বোধ করে এবং আল্লাহ্তা'লাও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ঘৃণা বোধ করেন।'

১১১৩. তোমরা মৃত্যু লাভ না করা পর্যন্ত তোমাদের মহিমময় প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে না।—সগির।

১১১৪. মুমেন বান্দাই পৃথিবীর দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ করে। অসৎ মানুষের কাছ থেকে গ্রাম, গাছপালা কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি (পৃথিবীর সবকিছুই) মুক্তি প্রার্থনা করে।—বোখারী।

১১১৫. 'যদি তোমরা জানতে চাও, আমি তোমাদের জানাব—কেয়ামতের দিন আল্লাহ্তা'লা মোমেনদের সর্বাগ্রে কি বলবেন এবং মোমেনরা তাঁকে কি বলবে।' বললাম, 'হে রসুলুল্লাহ্! আমাদের বলুন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্তা'লা বলবেন, তোমরা কি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভালবাস?' তারা জবাব দেবে, 'হাঁ, প্রভু।' তিনি বলবেন, 'কেন?' তারা বলবে, 'আপনার ক্ষমা ও মার্জনা আশা করি।' তিনি বলবেন, 'নিশ্চয়ই আমার মার্জনা তোমাদেরই জন্য রয়েছে।' —মিশকাত। বর্ণনায়ঃ মুয়াজ ইব্নে জাবাল (রাঃ)।

১১১৬. কাফনে অধিক ব্যয় করো না, কেন না এ শীঘ্র নষ্ট হবে।—আ. দাউদ বর্ণনায়ঃ আলী (রাঃ)।

১১১৭. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলবেন, 'সুখনাশককে বহুবার স্মরণ কর।' জিজ্ঞাসা করা হল, 'ও কি?' তিনি বললেন, 'মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু!'—তির। নাসায়ী। ই. মাজা।

১১১৮. নিদ্রা মৃত্যুর সহোদর এবং বেহেশ্তবাসিগণ মরে না।—সগির।

১১১৯. মানুষ দুটি জিনিস ভালবাসে না—একটা মৃত্যু, যদিও তা মোমেনের পক্ষে বিবাহ করা অপেক্ষা উত্তম; অপরটা দারিদ্র্য, যদিও পরিণামে ওর হিসাব সংক্ষিপ্ত হবে।—মিশকাত।

১১২০. যদিও তুমি মৃত্যু ও তার দূরত্ব দর্শন করতে, তবুও তোমার আশা ও অহংকার তোমাকে প্রতারিত করত।—সাগির।

১১২১. মৃত ব্যক্তিদের গালাগাল করো না, কারণ ওতে তোমরা তাদের আত্মীয়দের কষ্ট দেবে।—তিরমিজী।

১১২২. মৃত ব্যক্তিদের গালাগাল করো না, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের নিকটে পৌঁছেছে।—বুখারী। আ. দাউদ। নাসায়ী।

১১২৩. তোমাদের মৃতদের সৎকর্মের উল্লেখ কর এবং তাদের অসৎকর্মের উল্লেখ করো না।—আবু দাউদ। তিরমিজী। সাগির।

১১২৪. যখন মরণাপন্ন ব্যক্তির কাছে উপস্থিত থাক তখন তার চক্ষু মুদ্রিত করে দাও, কারণ ও আত্মাকে অনুসরণ করে; এবং তার সম্বন্ধে ভাল কথা বল, কারণ তার পরিজনগণ তার সম্বন্ধে যা বলে ফেরেশতাগণ তাতেই বিশ্বাস করেন।—ইবনে মাজা।

১১২৫. বিবি উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন যে—"যদি কোন মুসলমানের ওপর বিপদ আসে এবং যদি সে বলে 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁরি দিকে আমরা ফিরে যাব; হে আল্লাহ্! বিপদে আমাকে আশ্রয় দাও এবং ওর চেয়ে উত্তম জিনিস দান কর,—তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে তার চেয়ে উত্তম জিনিস দান করবেন।" ফলতঃ যখন (আমার স্বামী) আবু সালমা মারা গেলেন, আমি বললাম—'কোন্ মুসলমান আবু সালমার চেয়ে ভাল, যিনি সর্বপ্রথম সপরিবারে রসুলুল্লাহ্‌র জন্য হিজরত করেন?' তারপর আমি (আবার) ঐ কথাই বললাম। পরে আল্লাহ্ আমাকে তার পরিবর্তে রসুলুল্লাহ্ (সঃ)কে দান করলেন।—মুসলিম।

১১২৬. এমন কোন মুসলমান পুরুষ বা রমণী নেই যার যখন কোন বিপদ হয় তখন সে তা স্মরণ করে, যদিও তা দীর্ঘকালব্যাপী হয় এবং তার জন্য 'ইন্নালিল্লাহে' ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ পাঠ করে, তবে নিশ্চয়ই মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্ তার (অর্থাৎ ইন্নালিল্লাহের) জন্য সেই বিপদের পুরস্কার দান করবেন।—বয়হাকী।

১১২৭. মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্ বলেছেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমার তিরোভাবের পর এমন এক জাতি পাঠাব যারা তাদের অভিপ্রেত ফল পেলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে এবং অনভিপ্রেত ফল পেলে ধৈর্যধারণ করবে ও পুরস্কার আশা করবে—যখন ধৈর্যধারণ করা এবং বুদ্ধি স্থির রাখা অসম্ভব।' তিনি বললেন, 'হে প্রভু! কি ভাবে তাদের পক্ষে সম্ভব হবে যখন ধৈর্য ও জ্ঞানের অভাব হবে?' তিনি বললেন, 'আমি আমার নিজের ধৈর্য ও জ্ঞানের অংশ তাদের দান করব।'—বয়হাকী।

১১২৮. নবী-নন্দিনী হজরত জয়নব (রাঃ) প্রাণত্যাগ করলে পুরনারীরা ক্রন্দন করতে লাগলেন। হজরত ওমর (রাঃ) তাঁদের প্রহার করতে উদ্যত হলেন। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) (তখন) স্বহস্তে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'হে ওমর! ক্ষান্ত হও!' তারপর বললেন, 'হে রমণীগণ! তোমরা শয়তানের সোরগোল থেকে সাবধান হও।' তারপর বললেন, 'শোক যখন নয়ন ও অন্তরের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তখন তা মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে এবং তা (তাঁর) করুণার অংশ-

বিশেষ ; আর যা হাত ও রসনার মাধ্যমে প্রকাশ পায় তা নিশ্চয়ই শয়তানের পক্ষ থেকে।'—মিশ্‌ক। আহ্‌। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

১১২৯. (আমার স্বামী) আবু সালমার মৃত্যু হলে আমি বললাম, 'বিদেশে বিদেশী লোক! আমি তার জন্য এমন কান্না কাঁদব যে তা সর্বত্র আলোচিত হবে।' তারপর আমি তার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম এবং একজন স্ত্রীলোক আমাকে সাহায্য করতে আসল। তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমার কাছে এগিয়ে এলেন এবং বললেন, 'তুমি কি শয়তানকে সেই ঘরে প্রবেশ করাতে চাও যেখান থেকে আল্লাহ্‌ তাকে বিতাড়িত করেছেন?' অতএব আমি কান্না থেকে বিরত হলাম।'—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ উম্মে সালমা (রাঃ)।

১১৩০. রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাঁর এক মুমূর্ষু কন্যাকে কোলে তুলে নিলেন এবং নিজের সামনে রাখলেন। সেই অবস্থায় সেই কন্যার প্রাণ বিয়োগ হল। তখন উম্মে আয়মন (নামে এক পরিচারিকা) চীৎকার করে কেঁদে উঠল। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেন, 'তুমি আল্লাহ্‌র রসূলের সামনে চীৎকার করে কাঁদছ?' উম্মে আয়মন বলল, 'হুজুরও তো কাঁদছেন!' রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেন, 'আমি কাঁদছি না। অবশ্য (চোখে) যা (অশ্রু) দেখছ তা আল্লাহ্‌র করুণা। মোমেন সকল অবস্থায় পুণ্য ও মঙ্গলের মধ্যে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার দেহের উভয় পার্শ্ব থেকে যখন তার প্রাণ বের করা হয় তখনও সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে থাকে।'—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

১১৩১. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ "আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এক কন্যার (উম্মে কুলসুমের) জানাজায় উপস্থিত ছিলাম। হজরত কবরের কাছে বসেছিলেন। দেখলাম, হুজুরের উভয় চক্ষু অশ্রু বর্ষণ করছে। তারপর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে গত রাতে স্ত্রী-সঙ্গম করে নি?' হজরত আবু তালহা (রাঃ) বললেন, 'হজুর, আমি আছি।' তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেন, 'তুমি কবরে নাম।' তখন তালহা উম্মে কুলসুমের কবরে নামলেন।"—তিরমিজী।

১১৩২. রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) (তাঁর দুধভাই) ওসমান ইবনে মজউনের মৃত্যুর পর তার কপালের ওপর চুম্বন দান করেছিলেন। সে সময় তাঁর উভয় চক্ষু অশ্রু বর্ষণ করছিল।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১১৩৩. রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এক স্ত্রীলোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে একটা কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ধৈর্য অবলম্বন কর।' সে তাঁকে চিনতে না পেরে বলল, 'তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও; তুমি তো আর আমার মত বিপদে পড়নি।' পরে তাকে বলা হল যে ঐ ব্যক্তি স্বয়ং নবী (সঃ)। এ কথা শুনে সে নবী (সঃ)-এর দুয়ারে ছুটে এল, সেখানে কোন দুয়ার-রক্ষী ছিল না। সে বলল, 'আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।' তিনি বললেন, 'প্রথম আঘাতে ধৈর্য অবলম্বনই প্রকৃত ধৈর্য।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

১১৩৪. যে ব্যক্তি (শোকার্ত হয়ে) মুখ ও কপাল চাপড়ায়, বুকের জামা ছিঁড়ে ফেলে এবং অজ্ঞতার যুগের রীতি অনুসারে উম্মাদের মত বিলাপ করে সে আমাদের কেউ নয়।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ)।

১১৩৫. যার জন্য বিলাপ করা হয়, বিলাপের কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ মুগীরাহ্ (রাঃ)।

১১৩৬. মৃত ব্যক্তি আপন পরিবারবর্গের কোন কোন ক্রন্দনের জন্য শাস্তি ভোগ করে।—বু। বর্ণনায়ঃ ওমর (রাঃ)।

১১৩৭. নবী (সঃ)-এর কাছে যখন ইব্নে হারেসা, জাফর এবং ইব্নে রাওয়াহার নিহত হওয়ার সংবাদ এল, তখন তিনি বসে পড়লেন, তাঁর চেহারায় শোকের চিহ্ন প্রকাশিত হল। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম। তাঁর কাছে একজন লোক এসে জাফরের (পরিবারের) স্ত্রীলোকদের ক্রন্দনের কথা বর্ণনা করল। তিনি সেই ব্যক্তিকে তাদের নিষেধ করতে বললেন। সে চলে গেল এবং আবার ফিরে এসে বলল যে মেয়েরা তার কথা মানছে না। তিনি বললেন, 'তাদের নিষেধ কর।' সে তৃতীয়বার তাঁর কাছে ফিরে এসে বলল, 'হে রসুলুল্লাহ্! আল্লাহ্র কছম, তারা আমাদের হার মানিয়েছে।' মনে হয় তিনি বলেছিলেন, 'তাদের মুখের মধ্যে মাটি গুঁজে দাও।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১১৩৮. যে ব্যক্তি শোক-সন্তপ্তা রমণীকে সান্ত্বনা দেয় বেহেশ্তে সে এক মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত হবে।—তিরমিজী।

১১৩৯, যখন কারো সন্তান প্রাণত্যাগ করে, আল্লাহ্তা'লা তাঁর ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের প্রাণ হরণ করেছ? তারা বলে, হাঁ। তিনি বলেন, আমার বান্দা কি বলেছে? তারা বলে, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্নালিল্লাহ্ উচ্চারণ করেছে। তিনি বলেন, বেহেশ্তে আমার বান্দার জন্য একটা গৃহ নির্মাণ কর এবং ওকে 'প্রশংসার গৃহ' নামে অভিহিত কর। দুঃখীর দুঃখে যে সান্ত্বনা দেয় সেও তার মত পুরস্কার পায়। [অর্থাৎ আপন শোকে ধৈর্যধারণ করা ও অপরের শোকে সান্ত্বনা দান করা—সমান পুরস্কারযোগ্য কাজ।] —তির। ই. মাজা।

১১৪০. আল্লাহ্তা'লা বলেন, আমার মোমেন বান্দার জন্য বেহেশত ব্যতীত আমার কাছে আর অন্য কোন পুরস্কার নেই। যখন তার প্রিয়জনকে আমি গ্রহণ করি, সে ওতে পুরস্কার আশা করে।—বুখারী।

১১৪১. কোন রমণী তার স্বামী ছাড়া অন্য কোন মানুষের জন্য তিনদিনের বেশী শোক করবে না; তবে মৃত স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক করবে। এ সময় কোন প্রকার রঙিন পোশাক পরিধান করবে না, শুধু সাদাসিধা পোশাকই পরিধান করবে; চোখে সুরমা বা কাজল ব্যবহার করবে না, কোন সুগন্ধি স্পর্শ করবে না, তবে ঋতু থেকে পবিত্র হলে সামান্য ধূপধুনা জাতীয় সুঘ্রাণ ব্যবহার করতে পারে।—শায়খান।

১১৪২. আমুর-বিন-আল্-আস মৃত্যুকালে তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিলেন, আমার মৃত্যু হলে কোন শোককারী অথবা অগ্নি যেন আমাকে অনুগমন না করে। যখন তোমরা আমাকে সমাহিত করবে তখন ধীরে ধীরে আমার ওপর মৃত্তিকা নিক্ষেপ করবে এবং একটা উষ্ট্রীকে জবেহ করে ওর মাংস বণ্টন করে দিতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কবরের পাশে অবস্থান করবে—যাতে আমি তোমাদের সৌজন্যে স্বস্থ বোধ করতে পারি এবং আমার প্রভুর দূতদের প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।—মুসলিম।

১১৪৩. কোন এক ঘটনায় ৭০ জন কোরআন-বিদ্ সাহাবী একদল বিশ্বাস-ঘাতক দস্যুর হাতে শহীদ হলেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এক মাস যাবৎ ঐ দস্যুদের অভিশাপ দিলেন, নামাজের মধ্যে দোয়া কুনুত পড়লেন এবং এত বেশী শোকবিহ্বল হয়ে পড়লেন যে তাঁকে কখনো অমন হতে দেখিনি।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

১১৪৪. যখন কোন মৃতদেহকে কাফন দেওয়া হয় এবং লোকেরা তাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যায়, (তখন) যদি ও ধার্মিকের হয় তাহলে বলে, আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল ; আর যদিও অধার্মিকের হয় তবে ও তার পরিজনকে বলে, এর জন্য আক্ষেপ, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? মানুষ ছাড়া আর সকলেই তা শুনতে পায়। মানুষ তা শুনতে পেলে নিশ্চয়ই মূর্চ্ছিত হত।—বুখারী।

১১৪৫. মৃতদেহ নিয়ে দ্রুত চলবে। কারণ মৃত ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয় তাহলে তার জন্যে আল্লাহ্‌র বহু করুণা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, তাই যতশীঘ্র সম্ভব তাকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়া চাই। আর মৃত ব্যক্তি যদি পাপাচারী হয় তবে তো সে একটা জঘন্য জিনিস, যথাসম্ভব শীঘ্র তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১১৪৬. যখন কোন মৃতদেহকে নিয়ে যেতে দেখ তখন দাঁড়িয়ে যাও ; এবং যে ব্যক্তি তার পেছনে পেছনে যায় সে ওকে সমাধিস্থ না করা পর্যন্ত যেন না বসে।—শায়খান।

১১৪৭. আউফ বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এক ব্যক্তির জানাজা নামাজ সম্পাদন করলেন। তিনি যা প্রার্থনা করেছিলেন তার মধ্যে আমার যেটুকু মনে আছে তা হল এই—"হে আল্লাহ্। তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি করুণা কর, তাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা কর, তাকে মার্জনা কর, তাকে অতিথির মত সমাদর কর, তার বাসস্থান প্রশস্ত কর, পানি ও বরফের দ্বারা তাকে ধৌত কর, শ্বেতবস্ত্রকে যে ভাবে তুমি পবিত্র কর সেই ভাবে পাপ থেকে তাকে পবিত্র কর। তাকে তার নিজের গৃহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গৃহদান কর, নিজের পরিজন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিজন দান কর এবং নিজের স্ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্ত্রী দান কর। তাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাও এবং কবরের শাস্তি থেকে অথবা বললেন, দোজখের শাস্তি থেকে আশ্রয় দাও।' তিনি তার সম্বন্ধে এত কিছু প্রার্থনা করলেন যে আমার ইচ্ছা হল, আমি যদি সেই মৃত ব্যক্তি হতাম।—মুসলিম।

১১৪৮. সাহাবীরা এক ব্যক্তির জানাজার কাছ দিয়ে গেলেন এবং তার গুণ বর্ণনা করলেন। তখন নবী (সঃ) বললেন, 'অবধারিত হল।' পরে তাঁরা আর একজনের জানাজার কাছ দিয়ে গেলেন এবং তার দোষ বর্ণনা করলেন। তখন নবী (সঃ) বললেন, 'অবধারিত হল।' ওমর ইবনে খাত্তাব জিজ্ঞাসা করল, 'কি অবধারিত হল ?' তিনি বললেন, 'তোমরা ঐ ব্যক্তির গুণবর্ণনা করলে তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হল আর ঐ ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করলে এর জন্য জাহান্নাম অবধারিত হল। এ পৃথিবীতে তোমরাই আল্লাহর সাক্ষী।' [যার মৃত্যুতে লোকে ব্যথা পায় সে বেহেশতে যাবে, যার মৃত্যুতে লোকে গালাগাল করে সে দোজখে যাবে।]—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

১১৪৯. তোমাদের মরণাপন্ন ব্যক্তিদের সামনে সুরা ইয়াসিন পাঠ কর। [এই

সূরা কোরআনের প্রাণ ; একবার এ পাঠ করলে দশবার সম্পূর্ণ কোরআন পাঠের পুণ্য হয়।]—আ. দাউদ। ই. মাজা। মিশ। আহ্।

১১৫০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কবরে চুনকাম করতে বা ওর ওপরে ঘর তুলতে বা ওর ওপরে বসতে নিষেধ করেছেন।—মুসলিম।

১১৫১. যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবারে মাতা-পিতা বা তাঁদের কোন একজনের কবর জেয়ারত করে সে ক্ষমা লাভ করবে এবং বাধ্য বলে গণ্য হবে।—বয়হাকী।

১১৫২. বিবি আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে রসূলুল্লাহ্! কবর-জেয়ারত-কালে আমি কি বলব ?' তিনি বললেন, 'বল, মোমেন ও মুসলমান গৃহবাসীর ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের মধ্যে থেকে যাঁরা পূর্বে প্রাণত্যাগ করেছেন এবং যাঁরা পরে প্রাণত্যাগ করবেন আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি দয়া করুন এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই আমরা আপনাদের সাথে মিলিত হব।'—মুসলিম।

১১৫৩. (কবর জেয়ারত) আমাদের ইহলোকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেয় এবং পর-লোকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।—ইবনে মাজা।

১১৫৪. মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় তখন তার কাছে একজন কালো ও একজন নীল রঙের ফেরেশ্তা উপস্থিত হন। তাঁদের একজনের নাম মনকির, অন্যজনের নাম নকির। তাঁরা তাকে (মৃতকে) জিজ্ঞাসা করবেন, 'এই ব্যক্তি [হজরত মুহম্মদ (সঃ)] সম্বন্ধে তুমি কি বলতে ?' যদি সে প্রকৃত মুসলমান হয় তাহলে বলবে, 'তিনি [মুহম্মদ (সঃ)] আল্লাহ্র বান্দা ও রসূল এবং আমি সাক্ষ্য দিই যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল।' তাঁরা বলবেন, 'আমরা জানতাম, তুমি একথা বলবে।' তারপর তার কবরকে চারদিকে সত্তর (৭০) গজ করে প্রশস্ত করা হবে। তারপর তাকে বলা হবে—'ঘুমাও'।' সে বলবে, 'আমার পরিজনদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের (আমার অবস্থা) জানাতে চাই।' তাঁরা বলবেন, 'ঘরের সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন ব্যতীত যেমন কেউ তার ঘুম ভাঙায়না, তেমনি আল্লাহ্তা'লা তোমাকে জাগ্রত না করা পর্যন্ত তুমি সুখে নিদ্রা যাও।' আর যদি মৃতব্যক্তি মোনাফেক (কপটাচারী) হয়, তাহলে সে (ফেরেশতাদের প্রশ্নের জবাবে) বলে, 'মানুষকে যেমন বলতে শুনেছি, আমিও তেমনি বলেছি—আমি জানিনা।' তাঁরা বলবেন, 'আমরাও জানতাম তুমি এই কথা বলবে।' তারপর পৃথিবীকে বলা হবে, 'তুমি তার জন্য সংকীর্ণ হও।' তারপর তা তার প্রতি অত্যন্ত সংকীর্ণ হবে এবং তার দুই পার্শ্বে পরিবর্তিত হবে এবং আল্লাহ্ তাকে সেই শয্যা থেকে উত্থান না করান পর্যন্ত সে শাস্তি ভোগ করবে।—তিরমিজী।

১১৫৫. যখন কোন মানুষকে কবরে রেখে তার সহচরেরা দূরে চলে যায় (তখন) সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে থাকে। তারপর তার কাছে দুজন ফেরেশ্তা উপস্থিত হন, তাকে তুলে বসান এবং বলেন, 'মুহম্মদ (সঃ) সম্পর্কে তুমি কি ধারণা করতে ?' যে প্রকৃত মুসলমান সে বলবে, 'আমি সাক্ষ্য দিই যে তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও রসূল।' তখন তাঁরা বলেন, 'দোজখে তোমার বাসস্থানের দিকে লক্ষ্য কর, আল্লাহ্তা'লা ওকে বদল করে বেহেশ্তে তোমার স্থান নির্ধারিত করেছেন।' সে উভয় স্থান লক্ষ্য করবে। এবং মোনাফেক ও অবিশ্বাসীকে প্রশ্ন করা হবে, 'তুমি এই ব্যক্তি সম্বন্ধে কি ধারণা করতে ?' সে বলবে, 'আমি জানিনা, মানুষ যা বলত আমি তাই বলতাম।' তাকে বলা হবে, 'তুমি জানতেও না, পড়তেও না।' তখন তাকে লোহার মুগুর দ্বারা আঘাত করা হবে। সে সময় সে এমন

চীৎকার করবে যা দুই শ্রেণীর ভারবাহী (মানুষ ও জিন) ছাড়া আর সকলেই শুনতে পাবে।—শারখান।

১১৫৬. যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় তখন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাকে তার বাসস্থান দেখান হয়। যদি সে বেহেশ্তবাসী হয় তবে তাকে বেহেশ্তের বাস-গৃহ দেখান হয়; যদি সে দোজখবাসী হয় তবে তাকে দোজখের বাসগৃহ নরকের দেখান হয়। তারপর বলা হয়, 'এই তোমার ঘর; যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাকে পুনরুত্থিত না করেন ততদিন পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করবে।'—শায়।

রাজ্য শাসন

'যারা নির্যাতিত ও অত্যাচারিত জনগণের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করে, তারা শাসনক্ষমতা লাভ করে।'

'ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে—আল্লাহ্ এদেরই অভিশপ্ত করেন এবং করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন। ৪৭ (২২, ২৩)

'আল্লাহ্কে মান্য কর, রসূলকে মান্য কর এবং তোমাদের শাসনকর্তাকে মান্য কর।'

'হে দাউদ আমি তোমাকে ভূপৃষ্ঠে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছি; তোমাকে লোকেদের মধ্যে সত্য ও খাঁটি বিচার-মীমাংসা করতে হবে। আর তুমি প্রবৃত্তির বশে কোন কাজ করো না, তাহলে প্রবৃত্তি তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে—কেননা সে হিসাব নিকাশের দিনকে ভুলে গেছে।'

—আল্-কোরআন।

১১৫৭. সাবধান। তোমরা সবাই রাজা, এবং তোমাদের সকলকেই আপনাপন প্রজা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। নেতা জনসাধারণের রাজা এবং তাকে তার প্রজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে। গৃহস্বামী তার পরিজনগণের রাজা এবং তাকে তার প্রজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে। গৃহিণী স্বামীর গৃহবাসিনী ও সন্তানগণের রাণী এবং তাদের সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করা হবে। দাস তার মনিবের বিষয়-সামগ্রীর রাজা এবং তাকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই রাজা এবং প্রত্যেককেই আপনাপন প্রজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ)।

১১৫৮. যে ব্যক্তি আল্লাহ্তা'লা কর্তৃক তার প্রজাপুঞ্জের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত হয় সে যদি তাদের মঙ্গলের জন্য সুব্যবস্থা না করে তাহলে সে বেহেশ্তের গন্ধও পাবেনা।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) ও মা'কেল (রা)।

১১৫৯. মুসলমান প্রজাদের যে-শাসনকর্তা তাদের (প্রজাদের) প্রতি (দায়িত্ব-পালনে) শঠ ও প্রতারণাকারী ছিল এবং সেই অবস্থাতেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে

তার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা বেহেশ্‌তকে হারাম করবেন।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ মা'কেল (রাঃ)।

১১৬০. ক্ষমতা পরিচালনার (দায়িত্বলাভের) জন্য প্রার্থনা করো না, কারণ যদি প্রার্থনা দ্বারা ও লাভ কর তাহলে ওর সমস্ত ভার তোমার ওপরেই পড়বে, আর যদি অযাচিতভাবে পাও তবে ও পালন করার জন্যে অনেক সাহায্য পাবে।—খামসা।

১১৬১. আমাকে যে মান্য করে সে আল্লাহ্‌কে মান্য করে, এবং যে আমার অবাধ্য হয় সে আল্লাহ্‌তা'লারও অবাধ্য হয়। শাসনকর্তাকে যে অমান্য করে সে আমাকেও অমান্য করে। নিশ্চয়ই দলনেতা ঢাল স্বরূপ। তার অনুপস্থিতিতে তারা যুদ্ধবিগ্রহ করে তার প্রতিরক্ষা করে। সে যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করার আদেশ করে এবং সুবিচার করে তার জন্য তার পুরস্কার রয়েছে এবং যদি অন্যথা করে তাহলে সেজন্য তার শাস্তি রয়েছে।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১১৬২. তোমাদের উত্তম নেতা ঐ ব্যক্তি যাকে তোমরা ভালবাস এবং যে তোমাদেরও ভালবাসে, যার জন্য তোমরা কল্যাণ-কামনা কর এবং যে তোমাদের জন্যে কল্যাণ-কামনা করে। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নেতা ঐ ব্যক্তি যাকে তোমরা ঘৃণা কর এবং যে তোমাদেরও ঘৃণা করে, যাকে তোমরা অভিসম্পাত কর এবং যে তোমাদেরও অভিসম্পাত করে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, তাকে কি আমরা তাড়িয়ে দেব না? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তোমাদের মধ্যে নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, তবে তার পরিবর্তে অন্য শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে সে কথা স্বতন্ত্র। পরীক্ষা করে দেখবে আল্লাহ্‌র আইন ভংগ হয় কি না। আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে সে যা করে তাকে ঘৃণা করবে। কিন্তু আনুগত্য যেন প্রত্যাহার করা না হয়।

১১৬৩. যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলমানকে কোন পাপের কাজ করার আদেশ দেওয়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শাসনকর্তার আদেশ মান্য করতে হবে। যখন সে পাপকাজের আদেশ দেবে তখন তাকে মান্য করতে হবে না। —বুখারী। মুসলিম। বর্ণনা ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

১১৬৪. অত্যাচারী শাসনকর্তার সম্মুখে সত্য কথা বলাই সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ)।—তিরমিজী। আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ আবু সাঈদ।

১১৬৫. স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টজীবকে মান্য করতে নেই।—শরহী সুন্নত। বর্ণনায়ঃ নাওয়াস।

১১৬৬. (নবী সঃ-এর) একটা কথায় জামাল যুদ্ধের সময় আমি খুব উপকৃত হয়েছি। নবী (সঃ) যখন জানতে পারলেন, পারস্যবাসীরা তাদের পরলোকগত শাসনকর্তা কেছরার কন্যাকে শাসক নিযুক্ত করছে তখন তিনি বলেছিলেন, 'যে জাতি তাদের শাসন-কার্য পরিচালনার ভার কোন নারীর ওপর ন্যস্ত করেছে, সে জাতির উন্নতি হবেনা।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু বকরাহ (রাঃ)।

রোগ ও ঔষধ

১১৬৭. রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ওপর রোগের প্রকোপ যত কঠোর হ'ত অমন আর কারো ওপর দেখি নি।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১১৬৮. একদিন আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তাঁর জ্বর এসেছে। আমি নিবেদন করলাম, 'হে রসূলুল্লাহ্! আপনার তো অত্যন্ত জ্বর!' হজরত (দঃ) বললেন, 'আমার জ্বর আসলে তোমাদের (জ্বরের) দ্বিগুণ জ্বর এসে থাকে।' আমি বললাম, 'এ কি এই জন্যে যে আপনার পুণ্য দ্বিগুণ?' হজরত (সঃ) বললেন, 'বস্তুতঃ তাই।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)।

১১৬৯. আল্লাহ্‌তা'লা যখন কোন (মোমেন) মানুষের মঙ্গল চান তখন তাকে বালা-মছিবত বা আপদ-বিপদে নিক্ষিপ্ত করেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১১৭০. মুসলমানের ওপর কোন প্রকার বালা-মছিবত আসলে আল্লাহ্‌তা'লা ওর দ্বারা তার পাপ মাফ করে দেন, এমন কি একটা কাঁটা বিদ্ধ হলেও।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১১৭১. মুসলমানের ওপর দুঃখ, কষ্ট, যাতনা, দুর্ভাবনা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা (প্রভৃতি) কোনপ্রকার কষ্ট এবং কোন প্রকার শোক আসলে, এমন কি একটা কাঁটা বিদ্ধ হলেও—ওর দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লা ঐ ব্যক্তির পাপ মার্জনা করেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু সাঈদ (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১১৭২. প্রকৃত মুসলমানের অবস্থা শস্য গাছের মত। বিভিন্ন দিকের বাতাসের আক্রমণ তাকে কাত করে ফেলে। সে একবার সোজা হয়, আবার কাত হয়। প্রকৃত মুসলমানও আপদ-বিপদের (বা রোগ-অসুখের) দ্বারা আক্রান্ত হতে থাকে। পক্ষান্তরে কপট পাপাত্মার অবস্থা বৃহৎ ও শক্ত বৃক্ষের ন্যায়। বাতাসের বেগ ওকে নত করতে পারে না, কিন্তু যখন আল্লাহ্‌তালা'র ইচ্ছা হয় তখন ওকে একেবারে ভেঙে ধ্বংস করে' দেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১১৭৩. বাঘ-ভালুকের কাছ থেকে যেমন দূরে থাকার চেষ্টা কর, তেমনি কুষ্ঠ রোগীর কাছ থেকে দূরে সরে থেকো।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১১৭৪. খালেদ ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ গালেব নামক আমাদের এক ব্যক্তি রোগাক্রান্ত ছিল। আবু আতীক (রাঃ) তাকে দেখতে এলেন এবং আমাদের বললেন, 'তোমরা কালো জিরার ব্যবস্থা কর। ওর পাঁচটা বা সাতটা দানা পিষে জয়তুন তেলের সাথে রোগীর নাকের উভয় ছিদ্রে ফোঁটা রূপে প্রবেশ করিয়ে দাও।' আয়েশা (রাঃ) আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে তিনি হজরত নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন—'কালোজিরা একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত সর্ব রোগেই অব্যর্থ মহৌষধ।'—বুখারী।

১১৭৫. একদিন একজন লোক নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, 'আমার ভায়ের ভয়ানক পায়খানা হচ্ছে।' হজরত (সঃ) বললেন, 'তাকে মধু পান করাও।' সে মধু পান করাল। (কিন্তু পায়খানা বন্ধ হল না, তাই) সে দ্বিতীয় বার এসে ঐ খবরই দিল। এবারও হজরত (সঃ) তাকে ঐ কথাই বললেন। তৃতীয় বারও বললেন, 'তাকে মধু পান করাও।' চতুর্থ বার সে এসে বলল, 'মধু পান করিয়েছি, কিন্তু পায়খানা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।' হজরত (সঃ) বললেন, 'আমার কালাম সত্য, তোমার ভায়ের পেটে এখনো দোষ রয়েছে, আবার

তাকে মধু পান করাও।' এবার মধু পান করাবার পর সে ভাল হয়ে গেল। [পবিত্র কোরআন শরীফে আছে, 'ও (মধু) মানুষের জন্য অব্যর্থ মহৌষধ।']—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ)।

১১৭৬. রোগের প্রতিকার কর, কারণ যিনি রোগ দিয়েছেন তিনি রোগের প্রতিকারও দিয়েছেন।—সগির।

১১৭৭. আল্লাহ্‌তা'লা যে কোনো রোগ সৃষ্টি করেছেন, তার জন্যে ঔষধও সৃষ্টি করেছেন।—বুখারী।

১১৭৮. প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ আছে; যে রোগ তার সেই ঔষধ পড়লে আল্লাহ্‌র হুকুমে আরোগ্য লাভ হয়।—মুস।

রোগীর সেবা

১১৭৯. রোগীর সেবার অর্থ এই যে, তোমাদের মধ্যে কেউ রোগীর কপালে বা (তার) হাতের ওপরে হাত রাখবে; তারপর জিজ্ঞাসা করবে সে কেমন আছে।—তিরমিজী ও মিশকাত।

১১৮০. যখন তোমরা কোন রোগীকে দেখতে যাও তখন তার দুঃখে সান্ত্বনা দান কর এবং বল, 'তুমি সত্বর সেরে উঠবে আর দীর্ঘজীবী হবে।' কারণ, যা তার জন্য নির্দিষ্ট আছে এ তা রোধ করবে না, কিন্তু তার অন্তরকে আনন্দিত করবে।—তির। ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ আবু সঈদ (রাঃ)।

১১৮১. রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) এক রুগ্‌ণ ব্যক্তিকে দেখে বললেন, 'তোমার কি খেতে ইচ্ছা হয়?' সে বলল, 'বার্লির রুটি।' তিনি বললেন, 'যার কাছে বার্লির রুটি আছে সে যেন তার (এই) ভায়ের জন্য পাঠায়।' তারপর তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের কোন পীড়িত ব্যক্তি (কারো কাছে) কিছু খেতে ইচ্ছা করে—সে যেন তাকে তা খেতে দেয়।'—ইবনে মাজা। বর্ণনায়ঃ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)।

১১৮২. রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) একজন পীড়িত আরবকে দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি যখনই কোন পীড়িতকে দেখতে যেতেন, বলতেন, ভয়ের কোন কারণ নেই, আল্লার মর্জি এ হল শুদ্ধিকারক। তিনি তাকেও বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই, আল্লার মর্জি এ হল শুদ্ধিকারক। সে বলল: তা কক্ষনো নয়; এ এমন জ্বর যা কোন বুড়ো মানুষকে ধরলে তাকে কবরে নিয়ে যায়। রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেন, তাহলে তাই হোক।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)।

১১৮৩. হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন কোন লোক আমাদের কাছে রোগের কথা বলত, রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাঁর ডান হাত তার গায়ে বুলিয়ে দিতেন আর বলতেন—'হে মানুষের প্রভু, কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য কর—তুমিই আরোগ্যদাতা। তোমার আরোগ্য ছাড়া আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য কর, যাতে কোন রোগ অবশিষ্ট না থাকে।'—বুখারী। মুসলিম।

১১৮৪. যে ব্যক্তি রোগীর সেবা করতে গমন করে, সে তার পাশে না বসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-সাগরে ভাসতে থাকে, তারপর যখন সে তার পাশে বসে

তখন সে তার (অর্থাৎ অনুগ্রহ সাগরের) মধ্যে ডুবে যায় ।—মিশ । মালেক । সাগির ।

১১৮৫. যখন কোন ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা করতে যায়, তখন একজন ফেরেশ্‌তা আকাশ থেকে বলতে থাকেন, 'এ জগতে তুমি সুখী হও, তোমার যাত্রা সুখকর হোক, এবং বেহেশ্‌তের এক প্রাসাদে তোমার বসতি হোক ।'—ই. মাজা । তির । বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) ।

১১৮৬. রোগীর সেবাকারী স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত বেহেশ্‌তের পথে চলতে থাকে ।—মুসলিম ।

১১৮৭. যদি কোন মুসলমান প্রভাতে কোন পীড়িত মুসলমানকে দেখতে যায় তাহলে সত্তর (৭০) হাজার ফেরেশ্‌তা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকে ; আর যদি সে রাত্রে দেখতে যায় তাহলে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা ভোর পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকে । তার জন্য বেহেশ্‌তে একটা বাগান নির্ধারিত হয় ।—তির । আ. দাউদ । বর্ণনায়ঃ আলী (রাঃ) ।

১১৮৮. কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তা'লা বলবেন, হে আদম-সন্তান ! আমি রুগ্‌ণ ছিলাম—তুমি আমার সেবা কর নি । সে বলবে, হে প্রভু ! আমি কিভাবে আপনার সেবা করব, আপনি তো নিখিল জগতের প্রভু । আল্লাহ্‌ বলবেন, আমার অমুক বান্দা পীড়িত ছিল, তুমি তাকে দেখ নি । তুমি কি জানতে না যে যদি তুমি সেখানে যেতে তবে অবশ্যই আমাকে দেখতে পেতে ?—মুসলিম ।

১১৮৯. যখন তুমি কোন রোগীর কাছে উপস্থিত হও, তখন তাকে তোমার জন্য দোয়া করতে বল, কারণ তার দোয়া ফেরেশ্‌তাদের দোয়ার সমতুল্য । —ইবনে মাজা ।

লজ্জা

'আর তোমরা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার নির্লজ্জ শালীনতাহীন অবান্তর কার্যকলাপ থেকে সর্বদা দূরে থেকো—ওসবের ধারে-কাছেও যেও না । এই সব আদেশ-উপদেশ দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের সতর্ক করেছেন যেন তোমাদের কার্যকলাপে বিবেক-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় ।' (পারা, ৮, রুকু ৬) ।

(হে নবী !) আপনি জগৎবাসীকে জানিয়ে দিন, আমার প্রভু পালনকর্তা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার নির্লজ্জ অশালীন অবান্তর কার্যাবলীকে হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন ।' (সূরা আ'রাফ, পারা ৮, রুকু ১১) ।

—আল্‌-কোরআন ।

১১৯০. রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন, অশালীন নির্লজ্জ অবান্তর কার্যকলাপকে আল্লাহ্‌তা'লা সর্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে থাকেন । সেইজন্য আল্লাহ্‌তা'লা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার অবান্তর কার্যকলাপকে হারাম করে দিয়েছেন ।—বুখারী । বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ) ।

১১৯১. রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) পর্দানশীন রমণীদের অপেক্ষা অধিক লজ্জাশীল

১২১৯. হে খোদা ! মুহম্মদে (সঃ)র পরিজনগণকে জীবন-ধারণের উপযোগী জীবিকা দান কর ।—শায়খান । তিরমিজী ।

১২২০. সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে বিরত থাকার আশায় যে ব্যক্তি সন্দেহশূন্য জিনিসও পরিত্যাগ করে সেই প্রকৃত সংযমী ।—তিরমিজী ।

সৎকর্ম

'সৎকর্ম' অবশ্যই অসৎকর্মকে দূর করে' দেয় । যারা উপদেশ গ্রহণ করে এ তাদের জন্য এক উপদেশ ।' ১১ (১৪) ।

'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয় তাদের দোষত্রুটিগুলো দূর করে দেব এবং তাদের কর্মের উত্তম ফল দান করব ।' ২৯ (৭)

'যারা সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে, তার ফল তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দুঃখিত হবে না ।' ২ (১১২) ।

'কেউ কোন সৎকর্মের সুপারিশ করলে ওতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন অসৎকর্মের সুপারিশ করলে ওতেও তার অংশ থাকবে । বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে লক্ষ্য রাখেন ।' ৪(৮৫)

'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং এসকল লোকই হবে সফলকাম ।' ৩ (১০৪)

'তোমরা সৎকর্মে আদেশ দেবে এবং অসৎকর্মে নিষেধ করবে আর আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান রাখবে ।'

'তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর ।' ২ (১৪৮) ।

—আল্-কোরআন

১২২১. সৎকর্ম মহৎ লোকের সংগী ।—সগির ।

১২২২. সৎকর্ম মাত্রই দান সদৃশ ।—শায়খান ।

১২২৩. 'চার জন লোক যে মুসলমানকে সৎ বলে' সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ্ তাকে বেহেশ্‌তে পাঠাবেন ।' আমরা তখন বললাম, 'আর তিন জন লোক (সাক্ষ্য দিলে) ?' তিনি বললেন, 'তিনজন লোক হলেও ।' আমরা আবার বললাম, 'আর দুই ?' তিনি বললেন, 'আর দুই...ও ।' আমরা তাঁকে একজন সম্পর্কে প্রশ্ন করিনি ।—বুখারী । বর্ণনায় ঃ ওমর (রাঃ) ।

১২২৪. সাহাবীরা এক ব্যক্তির জানাজার পাশ দিয়ে গেলেন এবং তার গুণ বর্ণনা করলেন । তখন নবী (সঃ) বললেন, 'অবধারিত হল ।' পরে তাঁরা আর এক ব্যক্তির জানাজার পাশ দিয়ে গেলেন এবং তার দোষ বর্ণনা করলেন । তখন নবী (সঃ) বললেন, 'অবধারিত হল ।' তখন ওমর ইব্‌নে খাত্তাব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করল, 'কি অবধারিত হল ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমরা ঐ ব্যক্তির সৎগুণ বর্ণনা করলে তাই তার জন্য জান্নাত (স্বর্গ) অবধারিত হল, আর এই ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করলে তাই এর জন্য জাহান্নম (নরক) অবধারিত হল । এই পৃথিবীতে তোমরাই আল্লাহ্‌র সাক্ষী ।'

[মানুষে যাদের সৎকর্মকে স্মরণ করে তারা বেহেশ্‌ত বাসী হয়, যাদের অসৎ কর্মের জন্য বিরক্তি প্রকাশ করে তারা দোজখবাসী হয়।]—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস রাঃ ।

১২২৫. সৎকর্ম পরিমাণে সামান্য হলেও তার পুরস্কারও সামান্য।—সাগির।

১২২৬. যে ব্যক্তি সৎকর্মের দিকে মানুষকে আহ্বান করে সে সৎকর্ম পালনকারীর তুল্য, অথচ এতে সৎকর্মশীলদের পুরস্কার হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। আর যে অসৎকর্মের পথে মানুষকে আহ্বান করে সে পাপাচারীর সমান হয় এবং এতে পাপীদের শাস্তির কোন লাঘব হয় না।—মুস আ. দাউদ। তির। মালেক।

১২২৭. নিশ্চয় আল্লাহ্ মোমেনের সৎকর্মের পুরস্কার নষ্ট করেন না, ইহলোকে তিনি তাকে পুরস্কৃত করেন এবং পরলোকেও তার জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করেন। কিন্তু অবিশ্বাসীকে তিনি শুধু ইহকালেই পুণ্যকর্মের পুরস্কার দেন, পরকালে তাকে পুরস্কৃত করার মত কোন পুণ্য থাকে না।—মুসলিম।

১২২৮. সেই ব্যক্তিই জ্ঞানী যে আপন আত্মাকে চিনেছে এবং মৃত্যুর পর পুরস্কৃত হবার উদ্দেশ্যে সৎকর্ম সম্পন্ন করে, আর সেই ব্যক্তি মূর্খ যে নীচ বাসনাকে অনুসরণ করে এবং আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার আশা করে।—তিরমিজী।

১২২৯. সৎকর্মের সংখ্যা অনেক কিন্তু তার পালনকারীর সংখ্যা অতিশয় নগণ্য।—সাগির।

১২৩০. আমার উম্মতদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা অসৎকর্ম করলে ক্ষমা ভিক্ষা করে এবং সৎকর্ম করলে আনন্দ প্রকাশ করে।—সাগির।

১২৩১. আল্লাহ্‌তা'লার কাছে সর্বাপেক্ষা উত্তম কর্ম হল অনাহারী অসহায়কে অন্নদান বা তার দুঃখমোচন বা তার বিপদ দূর করা।—সাগির।

১২৩২. যে ব্যক্তি জানতে ইচ্ছা করে আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্য কি আছে—সে দেখুক, তার কাছে আল্লাহর জন্য কি আছে।—সাগির।

১২৩৩. একজন লোক রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে হাজির হয়ে বলল, 'আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, আমাকে কিছু সাহায্য করুন।' হজরত (সঃ) বললেন, 'আমার কাছে তো কিছু নেই।' তখন একজন বলল, 'হে রসুলুল্লাহ্, যে লোক তাকে সাহায্য করবে আমি কি তার খবর দেব?' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের খবর দেবে সে ঐ ভাল কাজ করার সমান পুরস্কার পাবে।' —মুস।

১২৩৪. হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি বললাম, 'হে রসুলুল্লাহ্, অজ্ঞানতার যুগে ইব্‌নে যুদ্‌আ'ন আত্মীয়তা রক্ষা করে চলত, আর্তকে আহার করাত—এসব কাজ তার কোন উপকারে আসবে কি?' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'সে কোনদিন এ-ও বলেনি, প্রভু হে, আমার পাপ মাফ কর।'—মুসলিম।

অসৎসঙ্গ

'আমাকে স্মরণ করা থেকে যে সরে যায়—তার সঙ্গ থেকে সরে যাও।'

—আল্-কোরআন।

এবং পবিত্রতা বেহেশ্‌তের পথপ্রদর্শক ; মিথ্যা অপবিত্রতা এবং অপবিত্রতা দোজখের পথ-নির্দেশক।—বুখারী। মুস। বর্ণনায় ঃ আবদুল্লাহ্‌ বিন মসউদ (রাঃ)।

১২৫০. মিথ্যা কথা বলা মহা পাপ।—সগীর।

১২৫১. মিথ্যাবাদী মিথ্যা কথা দ্বারা কেবল নিজেকে নষ্ট করে।—সগীর।

১২৫২. মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন তার মুখের দুর্গন্ধে ফেরেশ্‌তা তার কাছ থেকে এক মাইল দূরে সরে যায়।—তির।

১২৫৩. আমি কি তোমাদের সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত পাপের সংবাদ দেবনা? সাবধান হও—তা হল আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থাপন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা।—বুখারী। মুস। বর্ণনায় ঃ আবুবকর্‌রাহ্‌ (রাঃ)।

১২৫৪. ইয়াজিদ-কন্যা আসমা বলেন ঃ একদিন রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সামনে কিছু খাদ্যদ্রব্য রাখা হলে তিনি সেগুলো সমবেত মহিলাদের সামনে রেখে বললেন, 'খাও।' যদিও আমরা ক্ষুধার্ত ছিলাম, তবু বললাম, 'আমাদের ক্ষুধা নেই।' তিনি বললেন ঃ 'হে মহিলাগণ! ক্ষুধার সঙ্গে মিথ্যাকে মিশ্রিত করো না।' —মিশকাত।

১২৫৫. 'মোমেন কি কখনো কাপুরুষ হয়?' নবী (সঃ) বললেন, 'হাঁ।' কৃপণ কি কখনো কাপুরুষ হয়?' তিনি বললেন, 'হাঁ।' 'মিথ্যাবাদী কি কখনো কাপুরুষ হয়?' তিনি বললেন, 'না।'—মালেক।

১২৫৬. মিথ্যা কথার থেকে সতর্ক হও, কারণ তা ঈমানকে কলুষিত করে।—সগির।

১২৫৭. যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আমার নাম দিয়ে কোন মিথ্যা হাদীস প্রচার করে সে একজন মিথ্যাবাদী।—মুসলিম।

১২৫৮. আমার কাছ থেকে একটিমাত্র বাক্য হলেও তা সকলের কাছে পেঁাছে দাও। আর আমার নাম দিয়ে যে ইচ্ছে করে মিথ্যা হাদীস প্রচার করে সে নরকের মধ্যে আপন বাসস্থান নির্মাণ করুক।—বুখারী।

১২৫৯. আল্লাহ্‌তা'লা সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করেন যে আমার কাছে যা শোনে অবিকৃতভাবে তা (অন্যের কাছে) পেঁাছে দেয়। কারণ অনেক সময় এমন দেখা যায় যে লোকে প্রথমে যা শোনে তাই-ই গ্রহণ করে। [অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। প্রথমেই নবীর হাদীস ভুল বা মিথ্যা শেখানো হলে সমূহ বিপদ।]—তির। ই. মাজা। মিশ।

১২৬০. যা নিশ্চিতরূপে আমার হাদীস বলে জানো শুধু তাই প্রচার কর। তোমরা কি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে?—বুখারী। সগির।

১২৬১. অত্যধিক হাদীস বর্ণনা হতে সাবধান থাক। এরপর যে ব্যক্তি আমার সম্বন্ধে কিছু বলতে চায় সে যেন সত্য ও প্রকৃত কথা বলে এবং যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি সেই কথা আমার নামে প্রচার করে—নরক মধ্যে সে তার বাসস্থান নির্মাণ করুক।—ই. মাজা।

১২৬২. আমি যা বলিনি যে ব্যক্তি আমার প্রতি তা আরোপ করে সে নিশ্চয় মহাপাপী হবে। —ই. আসাকের।

১২৬৩. আল্লাহ্ সেই বান্দাকে খুশী করেন যে আমার বাণী গ্রহণ করে, স্মরণ রাখে, সতর্কতার সাথে রক্ষা করে এবং প্রচার করে' পরিপূর্ণ করে।—তিরমিজী। আ. দাউদ।

১২৬৪. মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্ তোমাদের তিনটি বিশেষত্ব দান করেছেন — ১) নবী (সঃ) তোমাদের সকলের বিনাশের জন্য প্রার্থনা করবে না, ২) মিথ্যা অনুসন্ধানকারীরা সত্যানুসরণকারীদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না এবং ৩) ভ্রান্তির মধ্যে সকলে ঐক্যবদ্ধ হবে না।—আবু দাউদ।

১২৬৫. প্রকৃত মুসলমানের দোষ থাকতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে বিশ্বাস-ঘাতকতা ও মিথ্যাবাদিতার দোষ থাকবে না।—বয়হাকী। মিশকাত। আহ্মদ।

১২৬৬. 'আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় পাপগুলোর কথা বলে দেবনা?' (তারপর বললেন,) 'মিথ্যা কথা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।'—মুস। বর্ণনায়ঃ আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)।

১২৬৭. আল্লাহ্ যখন কারো কল্যাণ কামনা করেন, তখন তার অন্তরের দ্বার মুক্ত করেন, তার মধ্যে বিশ্বাস ও সততা স্থাপন করেন, তার অন্তরকে বিবেকের বাধ্য করেন, তার হৃদয়কে নির্মল, রসনাকে সত্যবাদী, ব্যবহারকে সুষ্ঠু ও সুন্দর, কর্ণকে শ্রোতা এবং চক্ষুকে দর্শকে পরিণত করেন।—সাগির।

১২৬৭ (ক) যখন বিচার কর তখন ন্যায় বিচার কর, যখন কথা বল তখন সত্য-কথা বল, কারণ আল্লাহ্ পুণ্যশীল এবং তিনি পুণ্যশীলদের ভালবাসেন।—সাগির।

সদ্ব্যবহার

'মাতা-পিতা, আত্মীয় স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।' ২ (৮৩)

'তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করবে ও কোন কিছুকে তাঁর অংশীদার করবে না, এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, সঙ্গীসাথী, কোন পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। ৪ (৩৬)।

'সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ—যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখাপ্রশাখা ঊর্ধ্ব-বিস্তৃত, যে প্রত্যেক মৌসুমে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে ফলদান করে। অসৎ বাক্যের তুলনা এক অসার বৃক্ষ যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।' ১৪ (২৪)।

—আল্-কোরআন।

১২৬৮. আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে ফরজগুলো (অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় কাজ-গুলো) পালন করার মতই মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন।—সাগির।

১২৯৫. হে আবুবকর, তিনটি জিনিস সর্বাংশে সত্য—১) যে বান্দা অন্যায়ভাবে উৎপীড়িত হয় এবং মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ওর প্রতিরোধে বিরত থাকে, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন ; ২) যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দানের দরজা খুলে দেয় আল্লাহ্ তার (ধন) নানাভাবে বৃদ্ধি করেন এবং ৩) যে ব্যক্তি ধনবৃদ্ধির লালসায় পরের কাছে ভিক্ষা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার অভাব বৃদ্ধি করেন।—মিশকাত।

১২৯৬. যে ব্যক্তি তার জীবিকা বৃদ্ধি করতে এবং দীর্ঘ জীবন পেতে আশা করে সে যেন তার স্বজনগণের সাথে সদ্ভাব রাখে।—বুখারী।

১২৯৭. কেউ তার সামনে বসে থাকলে তিনি (দঃ) কখনো তাঁর পা দুটো সামনে বিস্তার করে দিতেন না।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

১২৯৮. হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ একজন লোক রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হবার জন্য অনুমতি চেয়ে পাঠাল। আমি তখন তাঁর কাছে ছিলাম। তিনি (নবী সঃ) বললেন, 'এই ব্যক্তি তার গোত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক।' তারপর তিনি সেই লোককে আগমনের অনুমতি দিলেন। সে যখন আসল, তিনি বেশ মিষ্টি ভাষায় তার সাথে আলাপ করলেন। তারপর সে বেরিয়ে গেলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে রসূলুল্লাহ্! আপনি না তাঁকে খুব মন্দ-লোক বলেছিলেন! আবার তার সাথে এত মিষ্টি ভাষায় আলাপ করলেন!' তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'হে আয়েশা, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ মানুষ সে যার কটূক্তির ভয়ে লোকেরা তার কাছে ঘেঁষতে চায় না এবং তার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে।'—তিরমিজী।

১২৯৯. আমি দীর্ঘ দশ বছর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সেবা করেছি, তিনি কোন সময় (বিরক্ত হয়ে) 'আঃ' শব্দটি পর্যন্ত বলেন নি। আমি কোন একটা কাজ করে ফেলেছি, কিন্তু তার জন্য তিনি কখনো 'কেন করেছ?' বলেননি। আবার কোন সময় আমি কোন (করণীয়) কাজ করিনি, তার জন্যে তিনি আমাকে 'কেন করনি' বলেননি। সংস্বভাবে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বিশ্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। দৈহিক দিক দিয়েও তেমনি তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর হাতের তালুর চেয়ে অধিকতর নরম, মোলায়েম ও মসৃণ কোন রেশমবস্ত্র আমি কখনো স্পর্শ করিনি এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ঘর্ম অপেক্ষা অধিক সুঘ্রাণযুক্ত কোন কস্তুরী বা আতরের গন্ধ আমি গ্রহণ করিনি।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ হজরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)।

১৩০০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে একজন লোক বসেছিল, তার পরনে গেরুয়া রঙের কাপড় ছিল। কারো কোন কিছু অপছন্দ হলে সামনা-সামনি না-বলাটা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল। যখন লোকটা উঠে চলে গেল তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'যদি তোমরা তাকে এই রঙের পোশাক ত্যাগ করার জন্য বলে দিতে তাহলে ভাল হত।'—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

১৩০১. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সর্বদা স্বীয় সহচরবৃন্দের সঙ্গে হাস্যমুখ, সদাচার ও নম্রব্যবহারে পরিপূর্ণ থাকতেন। তিনি কটুভাষী এবং পাষাণহৃদয় ছিলেন না। তিনি চীৎকার করতেন না বা অশ্লীল কথা বলতেন না। তিনি মানুষের দোষ-দুর্বলতা খুঁজে বেড়াতেন না। তিনি কারো অতিরঞ্জিত প্রশংসা করতেন না, অতিরিক্ত হাসি-তামাসাও করতেন না। তিনি কৃপণ ছিলেন না। তিনি অসংগত কথার প্রতি

এমনভাবে অমনোযোগী হয়ে থাকতেন যেন তিনি তা শোনেননি। কারো অসঙ্গত মনোবাসনা ব্যক্ত হলে তিনি তাকে নিরাশাসূচক কথাও বলতেন না এবং অঙ্গীকারও করতেন না। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ঝগড়াঝাটি, অহঙ্কার এবং বাজেকথা-বাজেকাজ—এই তিনটি আচরণ থেকে নিজেকে বলিষ্ঠভাবে নিবৃত্ত করেছিলেন। তিনি কারো দুর্নাম করতেন না, কাউকে দোষারোপ করতেন না, কারো ছিদ্রান্বেষণও করতেন না। তিনি যখন কথা বলতেন, শুধু এমন কথাই বলতেন যাতে কিছু-না-কিছু পুণ্যের আশা থাকত। তাঁর কথা বলার সময় সবাই এমন ভাবে ঘাড় ঝুঁকিয়ে বসে থাকতেন যেন তাঁদের মাথার ওপর পাখী বসে আছে (নড়লেই উড়ে যাবে)। তাঁর কথা বলা শেষ হলে তাঁরা কথা বলতেন। তাঁর কথা বলার সময় কেউ টুঁ শব্দও করতেন না। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে কোন বিষয়ে হট্টগোল বা বাদানুবাদ করতেন না। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গে কেউ কথা বললে সে ব্যক্তি কথা শেষ না করা পর্যন্ত সবাই চুপচাপ থাকতেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁদের প্রত্যেকের কথা সমান মনোযোগের সাথে শোনার পর বিরক্ত হয়ে পরবর্তিগণের কথার প্রতি অমনোযোগী হতেন না। যে কথায় সকলে হাসতেন (সেকথায়) তিনি-ও হাসতেন, আর যে বিষয়ে সবাই বিস্মিত হতেন সে বিষয়ে তিনিও বিস্মিত হতেন। নবাগত মুসাফিরের কর্কশ আলাপ, অসঙ্গত প্রশ্ন এবং বাচালতায় তিনি ধৈর্য অবলম্বন করতেন।···কেউ তাঁর প্রশংসা করলে তিনি তা পছন্দ করতেন না, কিন্তু কোন উপকারের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রশংসা করলে তিনি চুপ করে থাকতেন; কারণ উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য। তিনি কাউকে তাঁর কথার মাঝখানে থামিয়ে দিতেন না। অবশ্য কথা বলতে বলতে সীমা লঙ্ঘন করলে (বা) অতিরিক্ত ও অন্যায় বকতে শুরু করলে তিনি তা বন্ধ করে দিতেন, নয়তো মুখে কিছু না বলে' নিজে উঠে চলে যেতেন। —তিরমিজী। বর্ণনায়ঃ আলী (রাঃ)।

সালাম

['সালাম' এই আরবী শব্দের অর্থ শান্তি। কোন মুসলমানের সঙ্গে অন্য কোন মুসলমানের সাক্ষাৎ হলেই সম্ভাষণ হিসেবে বলতে হয়—'আস্-সালাম আলাইকুম'—অর্থাৎ 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' উত্তরদানকারীকে বলতে হয়, 'অ-আলাইকুম-আস্সালাম'—অর্থাৎ 'আপনার ওপরেও শান্তি বর্ষিত হোক।' পরস্পরের শান্তি-কামনার মাধ্যমেই মুসলমাসের সাক্ষাতের সূত্রপাত।]

'যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে —এ হবে আল্লাহ্‌র কাছে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন।' ২৪ (৬১)।

'আর যখন তোমাদর অভিবাদন অর্থাৎ (সালাম) করা হয়, তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করবে অথবা ওরই অনুরূপ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।' ৪ (৮৬)

'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করান হবে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম।' ১৪ (২৩)।

—আল্-কোরআন।

১৩১৭. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সুদ প্রদানকারী, এর লেখক এবং এর সাক্ষীকে অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন তারা সকলেই সমান।—মুস। বর্ণনায়ঃ জাবের (রাঃ)।

১৩১৮. হজরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন—১) যে ব্যক্তি মানুষের শরীরে সূচীবিদ্ধ করে' ছবি আঁকার কাজ ও ব্যবসা করে ; ২) যে ব্যক্তি নিজের শরীরে ছবি আঁকে ; ৩) যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করে এবং ৪) যে ব্যক্তি সুদ প্রদান করে।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোজায়ফা (রাঃ)।

১৩১৯. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বাকিতে একটা প্রাণীর বিনিময়ে অন্য প্রাণী ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।—নাসায়ী। বর্ণনায়ঃ সামোরা বিন জুন্দুব (রাঃ)।

১৩২০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'বাকির কারবারে সুদ আছে।' অন্য বর্ণনায়ঃ নগদ কারবারে সুদ নেই।—বুখারী। মুস। বর্ণনায়ঃ ওসামা বিন জায়েদ (রাঃ)।

১৩২১. সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপোর বিনিময়ে রূপো, যবের বিনিময়ে যব, নুনের বিনিময়ে নুন—একই প্রকার জিনিসের বিনিময়ে একই প্রকার জিনিসের নগদে (আদান-প্রদান)। যদি কেউ বেশি দেয় বা বেশি নেয়, তাহলে দানকারী ও গ্রহণকারী দুজনেই সুদ খাওয়ার ব্যাপারে একই রকম।—মুস। বর্ণনায়ঃ আবু সঈদ খুদ্‌রী (রাঃ)।

১৩২২. একই মাপের না হলে সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করো না ; এর কিছুর জন্যে কিছু বৃদ্ধি করো না। একই মাপের না হলে রূপোর বিনিময়ে রূপো বিক্রি করো না ; এর কিছুর জন্য কিছু বৃদ্ধি করো না। নগদ জিনিস বাকি জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করো না।—বুখারী। মুস। মিশ্। বর্ণনায়ঃ আবু সঈদ খুদ্‌রী (রাঃ)।

১৩২৩. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) অ-পরিমিত খেজুর পরিমিত খেজুরের বিনিময়ে ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।—মুস। বর্ণনায়ঃ জাবের (রাঃ)।

১৩২৪. আল্লাহ্‌র সাথে শেরক (অংশী) করা, জাদু করা, নরহত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতীমদের জিনিস অন্যায়ভাবে ভোগ করা, বিপদের দিনে বন্ধুদের পরিত্যাগ করা এবং নির্দোষ স্ত্রীলোকদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া—এই সাতটি মহাপাপ পরিত্যাগ কর।—বুখারী।

স্ত্রীশিক্ষা

১৩২৫. জ্ঞান শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য ফরজ।—ইবনে মাজা ও বয়হাকী।

১৩২৬. ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গে কোন ঈদের জামাতে উপস্থিত ছিলেন?' তিনি বললেন, 'হাঁ। অবশ্য হজরতের বিশেষ নৈকট্য লাভ না ঘটলে

আমার ভাগ্যে অমনটা হত না, কারণ আমি ছোট ছিলাম। এক ঈদের দিন আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গেই বেরিয়েছিলাম। যেখানে পতাকা উড়ছিল রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সেখানে এলেন, নামাজ আদায় করলেন, তারপর বক্তৃতা (খোৎবা) দিলেন। তাঁর মনে হল, পেছনে বসে-থাকা মহিলারা হয়তো তাঁর ভাষণ শুনতে পায় নি। এই ভেবে তিনি বেলাল (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে তাদের কাছে গেলেন এবং উপদেশ দিলেন, আর আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার জন্য তাদের আহ্বান জানালেন। তিনি তাদের দানের প্রতি পুনরায় উৎসাহ দিলেন এবং বললেন, 'আমার মাতা-পিতা তোমাদের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত। মহিলারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের অলংকারাদি খুলে দিতে লাগল আর বেলাল (রাঃ) ওগুলো সংগ্রহ করতে লাগলেন।—বুখারী।

১৩২৭. একদিন নারীরা নবী (সঃ)-এর কাছে নিবেদন করল, 'পুরুষদের জন্য আমরা আপনার নিকটবর্তী হতে পারি না, অতএব কেবলমাত্র আমাদেরই (শিক্ষা ও উপদেশ দানের) জন্য আপনি একটা দিন নির্ধারিত করে দিন। সে কথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদের কাছে একটা দিনের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং ঐ দিন তাদের কাছে গিয়ে উপদেশ দান করলেন ও শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের কথা জানালেন। তাদের তিনি যে সব উপদেশ দিলেন তার মধ্যে ছিল ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিনের জন্য তিনটে শিশুসন্তান পাঠিয়ে দেবে (অর্থাৎ শিশুসন্তানের মৃত্যু হলে যে মাতা ধৈর্যধারণ করবে) তার জন্য ঐ শিশুসন্তানগুলো দোজখের আগুন থেকে ঢাল স্বরূপ (রক্ষাকবচ) হয়ে দাঁড়াবে। একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করল, 'দুটি সন্তান হলে?' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'হাঁ, দুটি সন্তান হলেও এরকমই হবে।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু সঈদ খুদ্‌রী (রাঃ)।

১৩২৮. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'যার দুটি সন্তানের মৃত্যু হবে, আল্লাহ্‌তা'লা তাকে ঐ বিপদে ধৈর্যধারণের পুরস্কার স্বরূপ তাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবেন।' আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করলেন 'একটা সন্তান মারা গেলে?' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'একটা সন্তান মারা গেলেও তাই হবে।'—তিরমিজী।

১৩২৯. তিন শ্রেণীর লোক দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হবে ঃ ১) যে ব্যক্তি ইহুদী ছিল কিন্তু ইসলাম কবুল করেছে, ২) যে ক্রীতদাস তার মনিব এবং আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি কর্তব্য পালন করে, ৩) যার কাছে কোন ক্রীতদাসী ছিল (যাকে সে এমনিতেই ব্যবহার করতে পারত, কিন্তু) সে তাকে ভালভাবে আদবকায়দা শিক্ষা দিয়েছে, উত্তমরূপে ধর্মশিক্ষা দান করেছে, তারপর তাকে মুক্ত করে' বিবাহ করার মাধ্যমে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দান করেছে।— বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু মুসা আশ্‌য়ারী (রাঃ)।

১৩৩০. একবার ঈদুল আজহা অথবা ঈদুল ফিৎর-এর দিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঈদগাহে বের হলেন এবং মহিলাদের কাছে পৌঁছলেন। তারপর তিনি বললেন, 'হে মহিলাবৃন্দ, তোমরা দান খয়রাত কর। কেন না আমাকে জানান হয়েছে যে দোজখের অধিকাংশ অধিবাসী তোমাদের নারী সমাজেরই হবে।' তারা বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল, কেন এমন হবে?' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'তোমরা অন্যের প্রতি অতিমাত্রায় অভিশাপ বর্ষণ করে থাক এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। তোমরা বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হলেও বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধি হরণকারিণী হিসেবে তোমাদের মত আর কাউকে আমি দেখিনি।' তারা জিজ্ঞাসা করল, 'হে রসূলুল্লাহ্! আমাদের ধর্ম ও বুদ্ধির অপূর্ণতা কিরূপ?'

রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'নারীর সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেকের সমান নয় ?' তারা বলল, 'হাঁ।' তিনি বললেন, 'এটা স্ত্রী-বুদ্ধির অপূর্ণতার কারণেই।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের কারো যখন ঋতু হয় তখন সে নামাজ-রোজা করে না —একথা সত্য তো ?' তারা বলল, 'হাঁ।' তিনি বললেন, 'এই হল তোমাদের ধর্মের অপূর্ণতা।' —বুখারী। মুস। বর্ণনায় ঃ আবু সঈদ খুদরী (রাঃ)।

স্ত্রীর সঙ্গে একটা খোশ-গল্প

১৩৩১. হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ একদিন [হজরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটা গল্প শোনালেন। কোন এক অঞ্চলের] এগার জন মহিলা এক সঙ্গে বসে' পরস্পর অঙ্গীকার করল যে, তারা কোন কিছু গোপন না রেখে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা বর্ণনা করবে। প্রথমে একজন তার স্বামীর কুৎসা করে বলল, 'আমার স্বামী জীর্ণ শীর্ণ উটের মাংসের মত (বিস্বাদ ও শক্ত), তার ওপর তার কাছ থেকে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গেলে পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করার সমান কষ্ট ভোগ করতে হয়। সহজ ও সুলভ নয় বলে' অল্পে তুষ্ট হতে পারি না এবং মাধুর্য নেই বলে কষ্ট ভোগ করতে মন চায় না।' দ্বিতীয় জনও তার স্বামীর কুৎসাই করল। (বলল) যে, 'আমি আমার স্বামীর কোন আলোচনাই করতে চাই না ; আমার ভয় হয়, আমি তার দোষগুলো বর্ণনা করতে শুরু করলে আর ক্ষান্ত হতে পারব না।' তৃতীয় জনও কুৎসাই করল—'আমার স্বামী অত্যন্ত বদমেজাজী, (তার) স্বভাব খারাপ। কিছু বললে তালাক দেবে, আর চুপ করে' থাকলে অভাব-অনটনে-পূর্ণ জীবন-যাপন করতে হবে।' চতুর্থ জন বলল, 'আমার স্বামী খুব শান্ত মেজাজের—গরমও নয়, অচেতন (ঠাণ্ডা)-ও নয়। তার জন্যে ভীত থাকতে হয় না এবং বিষন্ন হতাশও হতে হয় না।' পঞ্চম জন বলল, 'আমার স্বামী বাইরে তো সিংহের মত গর্জনশীল, কিন্তু ঘরের ভেতরে নেকড়ের ন্যায় অলস ; বিশেষ চেতনা নেই, কৈফিয়ৎ তলবও নেই।' ষষ্ঠ জন বলল, 'আমার স্বামী পানাহারে রাক্ষস-স্বভাবের—খাওয়ার সময় সবকিছু খেয়ে ফেলে, পান করার সময় সবটুকু নিঃশেষে পান করে ; আর বিছানায় শুয়ে পড়লে হাত-পা-বাঁধা জড়ের মত পড়ে থাকে—প্রাণের আগুন নেভাবার জন্যে হাতও ছোঁয়ায় না।' সপ্তম জন বলল, 'আমার স্বামী সব দিক দিয়েই অজ্ঞ, নিষ্কর্মা, নির্বোধ, সর্বরোগের রোগী। এমন গোঁয়ার যে মাথা ফাটিয়ে ফেলে বা দাঁত ভেঙে ফেলে—অনেক সময় উভয় প্রকারেই জখম করে। অষ্টম জন বলল, 'আমার স্বামী অত্যন্ত কোমল—যেন খরগোশ. আবার অত্যন্ত সুগন্ধময়—যেন জাফরান।' নবম জন বলল, 'আমার স্বামী দীর্ঘকায়, (তাঁর) প্রাসাদোপম অট্টালিকা, দান-খয়রাতের অন্ত নেই, তাঁর গৃহ সকল মানুষের সভা। দশম জন বলল, 'আমার স্বামীর নাম মালেক, তার প্রশংসা কি শোনাব ? সে হল সবার ওপরে। গোয়ালের মধ্যে তার উটের সংখ্যা বেশী কিন্তু মাঠে-ময়দানে কম (অর্থাৎ অতিথিদের জবাই করে খাওয়াবার জন্যেই বেশীর ভাগ উট গোয়ালে বাঁধা থাকে)। আমোদ-ফূর্তির বাদ্য-বাজনা শুনলে উটগুলো মনে করে যে তাদের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে।' একাদশ জন বলল, 'আমার প্রথম স্বামীর নাম ছিল আবু জরা' — তার প্রশংসার শেষ নেই। সে আমার কান (পর্যন্ত সর্বাঙ্গ) অলঙ্কারে পূর্ণ করে' দিয়েছিল এবং ভালো ভালো খাইয়ে আমাকে মোটাসোটা করে তুলেছিল। সর্বদিক

দিয়ে সে আমার সন্তুষ্টি-সাধন করেছিল—এমনকি আমি সে সন্তুষ্টিতে পরিতৃপ্ত হয়েছিলাম। আমাকে সে মরুপ্রান্তের মেষপালক দরিদ্র পরিবার থেকে এনে এমন ধনীর পরিবারে স্থান দিয়েছিল—যাদের ঘোড়া আছে, উট আছে, এবং শস্য-ফসল ইত্যাদির প্রাচুর্য আছে। ও সব আহরণের জন্য সর্বশ্রেণীর চাকর মজুরও তাদের সর্বদা বিদ্যমান ছিল। আমার প্রতিটি কথাই সে মেনে নিত। দিনের আলো আসা পর্যন্ত আমি শুয়ে থাকলেও কোন বাধা ছিল না। আমার শাশুড়ীর গুণের অন্ত ছিল না, তাঁর গাঁটরী ভরা কাপড়, বস্তাভরা খাদ্য শস্য (এবং) অতিশয় সুপ্রশস্ত গৃহ (ছিল)। আমার স্বামীর অপর স্ত্রীর পক্ষের একটা ছেলে ছিল—তার অশেষ গুণ, সে অল্প আহার-নিদ্রায় অতিশয় তুষ্ট। তার একটা মেয়েও ছিল, তার গুণের তুলনা (ছিল না)—মাতা-পিতার অতিশয় বাধ্য, ঘাগরায়-আঁটে-না-এমন হৃষ্টপুষ্ট। তার গুণের কথা প্রতিবেশিনীদের ঈর্ষার বিষয় ছিল। তার একটা দাসী ছিল, তারও প্রশংসা অনেক—সে ঘরের কথা বাইরে বলে না, খাদ্য বা জিনিসপত্রের কোন ক্ষতি করে না, ঘরে কোন আবর্জনা থাকতে দেয় না।' তারপর সে তার স্বামী আবু জরা'র প্রশংসা করে' বলল, 'এক সময় আবু জরা' বিদেশভ্রমণে বের হল, অথচ তখন দেশের অবস্থা খুবই ভাল ছিল, (কিন্তু আমার কপাল দোষে) ঐ সুযোগে অন্য একটা নারীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। নারীটা-র পূর্বস্বামীর পক্ষের দুটি নেকড়ে-বাঘের মত ছেলে ছিল, তারা তাদের মায়ের সঙ্গে খেলা করছিল। ঐ সময় আমার স্বামী আবু জরা' তাকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হল এবং তাকে বিবাহ করে' আমাকে তালাক দিয়ে দিল। ঐ স্বামীর পর আমি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছি। সেও সর্দার শ্রেণীর, অতিশয় বাহাদুর, বহু রকম পশুপালের মালিক, আমাকেও সবরকমের এক এক জোড়া (পশু) দিয়েছে এবং আমার অবাধে খাওয়া-পরার সুযোগ করে' দিয়েছে। কিন্তু তার দেওয়া সমস্ত ধনসম্পদ এক সঙ্গে করলে তা প্রথম স্বামীর দেওয়া সম্পদের এক সামান্য ভগ্নাংশেরও সমতুল্য হবে না।' আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই খোশ-গল্পটি শুনিয়ে আমাকে বললেন, 'উল্লিখিত স্বামীদের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে একাদশতমা রমণীটির প্রথম স্বামী আবু জরা' তার জন্য যেমন ছিল (আদর যত্নে) আমিও তোমার পক্ষে তদ্রূপ।' আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্, আপনি আমার কাছে তার চেয়েও অধিক উত্তম।' হজরত (দঃ) আয়েশার উক্তির সমর্থনে রসিকতা করে' বললেন, 'উভয়ের পার্থক্য এই যে আবু জরা' তার ঐ স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিল, আমি তোমাকে তালাক দেব না।' —ফত্হুল-বারী।

স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য

'তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের অঙ্গাবরণ এবং তোমরাও তাদের অঙ্গাবরণ; তাদের প্রতি তোমাদের যেমন অধিকার আছে তোমাদের প্রতিও তাদের তেমনি অধিকার আছে।'

'এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরকে ঝোলানো অবস্থায় রেখো না।' ৪(১২৯)

'স্ত্রীর অবাধ্যতা দেখলে তাকে সদুপদেশ দাও, তারপর তার শয্যা বর্জন কর এবং তাকে প্রহার কর।' ৪(৩৪)

'পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের একেকে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' ৪(৩৪)

—আল্-কোরআন।

১৩৩২. তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে তোমাদের ওপরও তাদের তেমনি অধিকার আছে। অতএব তাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ও সদয় ব্যবহার কর।—তিরমিজী।

১৩৩৩. নারী হল পুরুষের অর্ধাঙ্গিণী।—সগির।

১৩৩৪. তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম ব্যবহার করে।—তিরমিজী। বর্ণনায় : আয়েশা (রাঃ)।

১৩৩৫. বিশ্বাসীদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের অধিকারী ঐ ব্যক্তি যার স্বভাব-চরিত্র তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম। তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম—যে তার স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারে উত্তম।—মিশকাত। বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৩৩৬. কোন মুসলমান তার স্ত্রীকে যেন ঘৃণা না করে। একটা দোষের জন্যে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলে অন্য গুণের জন্য যেন সে তাকে ভালবাসে।—মুসলিম। বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৩৩৭. আমি বললাম, 'হে রসুলুল্লাহ্! আমার স্ত্রীর প্রতি আমার কর্তব্য কি?' তিনি বললেন, 'যখন তুমি আহার কর তখন তাকে আহার করতে দেবে, যখন তুমি পরিধান কর তখন তাকে পরিধান করতে দেবে, তার মুখের ওপর আঘাত করবে না, তাকে গালাগালিও দেবে না এবং বিরক্ত হয়ে তাকে একলা ঘরে পরিত্যাগ করবে না।'—আবু দাউদ। তির। ই. মাজা। বর্ণনায় : হাকিম বিন মাবিয়া (রাঃ)।

১৩৩৮. কোন ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকলে সে যদি তাদের উভয়ের প্রতি সম-ব্যবহার না করে তবে বিচার-দিবসে সে তার দেহের অর্ধেক-লোপ-পাওয়া অবস্থায় উপস্থিত হবে।—তির। আ. দাউদ। বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৩৩৯. যখন কোন মুসলমান পুণ্য লাভের আশায় তার স্ত্রীর জন্য কিছু ব্যয় করে, (তখন) তা তার পক্ষে একটা দানের তুল্য হয়।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় : আবু মসউদ (রাঃ)।

১৩৪০. কোনো স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর ঘর থেকে সামান্য মালও ব্যয় করবে না। প্রশ্ন করা হল, 'হে রসুলুল্লাহ্! খাদ্য-দ্রব্যও না?' তিনি বললেন, 'ও আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট মাল।'—তির। বর্ণনায় : আবু উমামা (রাঃ)।

১৩৪১. 'কোন্ স্ত্রী সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট?' তিনি বললেন, 'সেই স্ত্রীই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে তার স্বামী যখনই তার দিকে তাকায় তখনই তার সন্তুষ্টি বিধান করে, তাকে কোন কাজ বা কথা বললে সে তা পালন করে এবং তার ধন, প্রাণ বা কোন বিষয়েই তার সাথে কলহ করে না যাতে সে অসন্তুষ্ট হয়।'—ই. মাজা। বয়হাকী। নাসায়ী।

১৩৪২. যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর দিকে তাকায় এবং সেও তার দিকে

তাকায় তখন আল্লাহ্‌তা'লা তাদের উভয়ের দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকান। তারপর যখন সে তার স্ত্রীর হাত ধরে, তখন তাদের পরস্পরের প্রীতি ও সন্তুষ্টি-বিধানের জন্যে আল্লাহ্‌ তাদের উভয়ের পাপ মাফ করেন।—সগির।

১৩৪৩. আল্লাহ্‌কে ভয় করার পর প্রকৃত মুসলমান পুণ্যময়ী স্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট কিছু দেখতে পায় না। সে যদি তাকে আদেশ করে সে তা পালন করে, যদি তার দিকে দৃষ্টিপাত করে সে তাকে আনন্দ দান করে, যদি তাকে কোন প্রতিজ্ঞা করায় সে তা পালন করে এবং যদি তার কাছ থেকে অনুপস্থিত থাকে তাহলে সে তার প্রবৃত্তি ও মালকে রক্ষা করে।—ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ আবু ওমামা (রাঃ)।

১৩৪৪. আমি কি তোমাদের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধনসম্পদ সম্পর্কে সংবাদ দেব না যা তোমাদের সঞ্চয় করা উচিত? ও হচ্ছে পুণ্যময়ী স্ত্রী! তার স্বামী—যখনই তার দিকে দৃষ্টিপাত করে সে তাকে সন্তুষ্ট করে, যখন কোন আদেশ দেয় সে তা পালন করে এবং যখন সে (স্বামী) অনুপস্থিত থাকে সে তার সতীত্ব রক্ষা করে। —আবু দাউদ।

১৩৪৫. পুণ্যময়ী স্ত্রী-রত্নই হল পৃথিবীর সকল সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

১৩৪৫ (ক). পুণ্যময়ী স্ত্রী, ভক্তিবৎসল সন্তান, সৎবন্ধু এবং পরিমিত জীবিকা—এই চারটি জিনিস মানুষের সৌভাগ্যের সূচক।—সগির।

১৩৪৬. যখন কোন রমণীকে তার স্বামী শয্যায় আহ্বান করে এবং সে অস্বীকার করে এবং তার জন্য তার স্বামী ক্ষোভে রাত কাটায়—সেই রমণীকে প্রভাত পর্যন্ত ফেরেশ্‌তাগণ অভিশাপ দেয়। —বুখারী। মুস। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৩৪৭. যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীকে শয্যায় আহ্বান করে তখন সে উনুনের কাছে থাকলেও যেন তার কাছে এসে উপস্থিত হয়।—তির। তালকে বিন আলী (রাঃ)।

১৩৪৮. রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)এর কাছাকাছি আমি আমার সঙ্গিনীদের নিয়ে ঘরের মেঝেতে খেলছিলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করলে আমরা খেলা বন্ধ করে দিলাম। তিনি আবার তাদের আমার কাছে পাঠালেন এবং তারা আমার সাথে খেলতে লাগল।—বুখারী। মুস। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১৩৪৯. একদিন রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) কিছু সংখ্যক মুহাজের ও আনসারদের মধ্যে বসেছিলেন। এমন সময় একটা উট এসে তাঁকে সিজদা (প্রণাম) করল। তারা বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্‌! গাছপালা এবং পশুরাও আপনাকে সিজদা করে, অতএব আমাদেরও কি আপনাকে সিজদা করা উচিত নয়?' তিনি বললেন, 'তোমাদের প্রভুর উপাসনা কর এবং তোমার ভাইকে সম্মান কর। যদি আমি অন্য কাউকে সিজদা করতে আদেশ দিতাম তাহলে নারীদেরই বলতাম তাদের স্বামীদের সিজদা করতে।'—মিশকাত। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১৩৫০. কয়েস বিন সাইদ বলেন ঃ আমি হিরাতে উপস্থিত হলে সেখানকার অধিবাসীদের আমি তাদের প্রধান ব্যক্তিকে সিজদা করতে দেখেছিলাম। আমি মনে করলাম, নবী (সঃ) কি আমাদের সিজদা পাবার যোগ্য নন? তারপর আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)র কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, 'আমি হিরাতে গিয়ে সেখানকার

অধিবাসীদের তাদের প্রধান ব্যক্তিকে সিজদা করতে দেখেছি ; অতএব আপনি কি আমাদের সিজদা পাবার অধিকতর যোগ্য নন ?' তিনি বললেন, 'তুমি আমার কবরের পাশ দিয়ে গেলে ওকে কি সিজদা করবে ?' আমি বললাম, 'না ।' তিনি বললেন, 'এমন কোরোনা। যদি আমি কাউকে সিজদা করতে বলতাম তাহলে নারীদের বলতাম তাদের স্বামীদের সিজদা করতে। কেন না আল্লাহ্ তাদের (নারীদের) ওপর তাদের (অর্থাৎ পুরুষদের) অধিকার দিয়েছেন ।'—আ. দাউদ। মিশকাত।

১৩৫১. স্ত্রী যদি স্বামীর অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকত তা হলে কখনো সে তার (স্বামীর) প্রাতর্ভোজন থেকে নৈশভোজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসতে পারত না ।—সগির ।

১৩৫২. যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, তার অর্থের জাকাত দেয়, রোজা রাখে, স্বামীর বাধ্য থাকে এবং সতীত্ব রক্ষা করে—সে তার খুশীমত যে কোন দ্বার দিয়ে বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারে ।—মিশকাত।

১৩৫৩. যে নারী তার স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের জন্য সুগন্ধ মাখে, সে নরকে প্রবেশ করে ও ঘৃণিত হয় ।—সগির ।

১৩৫৪. নারীদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে ভয় কর—আল্লাহ্‌র জামিনে তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্‌র আয়াতের সাহায্যে তাদের গুপ্তঅঙ্গ তোমাদের জন্য বৈধ করেছ। তোমাদের প্রতি তাদের কর্তব্য এই যে, তারা যেন অন্যকে তোমাদের শয্যায় অভ্যর্থনা না করে, একাজ তোমাদের কাছে ঘৃণিত ; যদি তারা তা করে তবে ক্ষতি না করে তাদের প্রহার কর ; এবং তাদের প্রতি তোমাদের কর্তব্য এই যে, তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের অন্ন-বস্ত্র দান কর ।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ)।

১৩৫৫. তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার কর, কারণ তারা তোমাদের বিবাহিতা পত্নী। এছাড়া তাদের প্রতি তোমাদের অন্য কোন অধিকার নেই। তবে যদি তারা প্রকাশ্যে কোন গর্হিত কাজ করে, তবে তাদের তোমাদের শয্যার ধারে ঘেঁষতে দিওনা এবং মৃদু প্রহার কর। তারপর যদি তারা তোমাদের বাধ্য হয়, তবে তাদের শাস্তি দিতে অন্য কৌশল অবলম্বন করো না। জেনে রেখো তোমাদের প্রতি (তাদের) তেমনি অধিকার। তোমাদের অধিকার এই যে, যাদের তোমরা পছন্দ কর না তাদের তোমাদের শয্যায় বসতে দেবে না এবং তাদের অধিকার এই যে আহার-বিহার পোশাক-পরিচ্ছদে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে ।—তিরমিজী।

১৩৫৬. স্বামী তার স্ত্রীকে কি জন্যে প্রহার করেছে তা যেন কেউ জিজ্ঞাসা না করে ।—আবু দাউদ। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ ওমর (রাঃ)।

১৩৫৭. স্ত্রীগণকে সদুপদেশ দাও, কেননা পাঁজরেব হাড় দ্বারা তারা সৃষ্ট। পাঁজরের হাড়ের মধ্যে ওপরের হাড় সর্বাপেক্ষা বাঁকা—যদি ওকে সোজা করতে যাও তবে ও ভেঙ্গে যাবে, যদি ছেড়ে দাও তবে আরো বাঁকা হবে। সুতরাং স্ত্রীগণকে উপদেশ দিতে থাক ।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৩৫৮. স্ত্রীলোক তোমার মনের মত সম্পূর্ণ সোজা হয়ে চলবে না, অতএব ওব দ্বারা লাভবান হতে চাইলে ঐ বাঁকা অবস্থাতেই তুমি ওর দ্বারা কাজ উদ্ধার কর। যদি ওকে পূর্ণ সোজা করার চেষ্টা কর, তবে ভেঙে ফেলবে। ভেঙে ফেলার অর্থ হল স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ।—মুসলিম।

১৩৫৯. পুরুষ নারীর বাধ্য হলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—সগির।

১৩৬০. আল্লাহ্ তোমাদের নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দিচ্ছেন—কেননা তারা তোমাদের মা, মেয়ে আর মাসি।—সগির।

১৩৬১. তোমরা কি জাননা যে নারীরা পুরুষ অপেক্ষা অধিক পুরস্কার পাবার যোগ্য? কারণ মহিমময় আল্লাহ্ বেহেশতে পুরুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন যেহেতু তার স্ত্রী তার ওপরে সন্তুষ্ট ছিল।

১৩৬২. কারো স্ত্রী মসজিদে যাবার অনুমতি চাইলে তাকে বাধা দিও না।—শায়খান।

১৩৬৩. যে নারীর মৃত্যুর সময় তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, মৃত্যুর পর সে বেহেশ্তে যাবে।—তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ উম্মে সালমা (রাঃ)।

১৩৬৪. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'যখন নবী (সঃ)-এর রোগ কঠিন আকার ধারণ করল এবং যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেল তখন তিনি পত্নীদের কাছে আমার (আয়েশার) ঘরেই তাঁর রোগ-সেবার অনুমতি চাইলেন। তাঁরা রোগ-সেবার অনুমতি দিলেন।'—বুখারী।

১৩৬৫. আবুবকর-কন্যা আসমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এক বিশিষ্ট অনুচর (সাহাবী) জোবায়েরের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। তখন তাঁর কোন ধন-সম্পত্তি, বন্দী-গোলাম প্রভৃতি কিছুই ছিল না, ছিল কেবল একটা ঘোড়া আর পানি-বয়ে-আনার-জন্য একটা উট। ঘোড়াকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা, উটের পিঠে পানি-বয়ে-আনা, পানি তোলার ডোল সেলাই করে নেওয়া, রুটির জন্য আটা তৈরী করা প্রভৃতি সমস্ত কাজই আমাকে সম্পন্ন করতে হত। আমি ভালভাবে রুটি বেলতে পারতাম না, কয়েকজন মদীনাবাসিনী প্রতিবেশিনী আমার রুটি বেলে দিতেন। ঐ প্রতিবেশিনীরা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত মহীয়সী ছিলেন। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) জোবায়েরকে যে এক খণ্ড জমি দিয়েছিলেন তা আমাদের ঘর থেকে প্রায় এক মাইল দূরে ছিল। ঐ জমি থেকে আমি (ঘোড়াকে খাওয়ানোর জন্য) খেজুরের দানা সংগ্রহ করে মাথায় করে বয়ে আনতাম। একদিন খেজুরের দানা মাথায় করে বয়ে আনার সময় পথে রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, তাঁর সঙ্গে কয়েকজন মদীনাবাসী সাহাবী ছিলেন। হজরত (দঃ) আমাকে তাঁর যানবাহনে ওঠার জন্য আহ্বান করলেন, কিন্তু আমি পরপুরুষের সঙ্গে চলতে লজ্জা বোধ করলাম এবং আমার স্বামী জোবায়েরের আত্মাভিমানের কথাও আমার মনে পড়ল। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আমার লজ্জা বুঝতে পারলেন এবং চলে গেলেন। ঘরে ফিরে আমি স্বামী জোবায়রের কাছে সব বললাম এবং এও বললাম যে, আপনার গায়রত এবং আত্মাভিমানও আমার তখন স্মরণ হয়েছিল। একথা শুনে জোবায়ের (রাঃ) বললেন, '(আমার অভিমান থাকলেও) হজরত (দঃ)-এর যানবাহনে চড়ে আসার চেয়ে তোমার খেজুর দানার বোঝা মাথায় বয়ে-আনার-পরিশ্রম আমার কাছে অধিক কঠিন ও বেদনাদায়ক মনে হচ্ছে।' আসমা (রাঃ) বলেন, তারপর আমার পিতা আবুবকর (রাঃ) আমার জন্য একজন চাকর পাঠিয়ে দিলে আমি ঘোড়ার সেবার কাজ থেকে হাঁফ ছাড়ার অবকাশ পেলাম—তিনি যেন আমাকে মুক্তি দিলেন।—বুখারী।

১৩৬৬. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ একদিন রসুলুল্লাহ্ (সঃ)

আমাকে বললেন, 'কোন্ সময় তুমি আমার ওপর খুশী থাক আর কোন্ সময় অভিমানিনী হও তা আমি বুঝতে পারি।' আমি বললাম, 'আপনি তা কিভাবে বুঝতে পারেন ?' হজরত (দঃ) বললেন, 'খুশী থাকাকালে শপথ গ্রহণের সময় তুমি বল—'মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রভু পরওয়ারদেগারের কসম' আর অভিমান-ভারক্রান্ত হওয়ার সময় বল, 'ইব্রাহীমের প্রভু পরওয়ারদেগারের কসম।' আমি বললাম, 'একথা সত্য। কিন্তু হে রসূলুল্লাহ্, খোদার কসম, (অভিমানস্বরূপ) কেবল আপনার নাম উচ্চারণ করাটাই ত্যাগ করি, (আপনার প্রতি প্রেমভক্তি বা শ্রদ্ধা ত্যাগ করিনা)।—বুখারী।

১৩৬৭. বিশ্বাসী স্বামী বিশ্বাসিনী স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণকারী হবে না, কারণ স্ত্রীর কোন ব্যবহারে মনে কষ্ট আসলেও পুনঃ তার দ্বারাই এমন ব্যবহার পাবে যাতে সন্তুষ্টি লাভ হবে।—মুস।

স্বপ্ন

১৩৬৮. যখন তোমাদের কেউ সুস্বপ্ন বা কুস্বপ্ন দেখে তখন সে যেন তার ব্যাখ্যা না করে এবং কাউকে সে সম্পর্কে খবর না দেয়।—তিরমিজী।

১৩৬৯. যখন তোমাদের কেউ এমন কোন স্বপ্ন দেখে যা সে ঘৃণা করে তখন সে তার বাঁ দিকে তিনবার থুথু ফেলবে এবং তিনবার শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।—মুস। আ. দাউদ। ই. মাজা।

১৩৭০. যখন তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা সে ভালবাসে, তখন সে যেন মনে করে যে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এসেছে এবং তার জন্য আল্লাহ্‌কে প্রশংসা করে এবং তা বর্ণনা করে। আর যখন সে তার বিপরীত দেখে অর্থাৎ যা ঘৃণা করে তাই দেখে তখন সে যেন মনে করে যে তা শয়তানের পক্ষ থেকেই এসেছে এবং শয়তানের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে তা না বলে—তাহলে ওর দ্বারা তার কোন ক্ষতি হবে না।—তির। বুখারী। আহ্‌মদ।

স্বাস্থ্য

১৩৭১. অধিকাংশ লোক আল্লাহ্‌তা'লার দুটো বিশেষ দান সম্পর্কে অমনোযোগী—একটা স্বাস্থ্য, অপরটা অবসর।—বুখারী।—তির। বর্ণনায়ঃ বনে আব্বাস (রাঃ)।

১৩৭২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) প্রায়ই এই বলে প্রার্থনা করতেনঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে সচ্চরিত্র, ক্ষমা, স্বাস্থ্য, আমানত এবং অদৃষ্টের প্রতি সন্তুষ্টি প্রার্থনা করি।—বয়হাকী। বর্ণনায়ঃ আবদুল্লাহ্ বিন আমুর (রাঃ)।

হত্যা

'ন্যায় সঙ্গত কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করো না। কেউ কোন বিশ্বাসীকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলে সে নরকগামী হবে।'

'হে বিশ্বাসিগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের (বিনিময়ের) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস, ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভায়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত।' ২(১৭৮)

—আল্-কোরআন।

১৩৭৩. অন্যায় ভাবে হত্যা না করা পর্যন্ত যেকোন বিশ্বাসী মঙ্গলের মধ্যে বর্ধিত হয়। যখন সে অন্যায় ভাবে হত্যা করে তখন তা বন্ধ হয়ে যায়।—আবু দাউদ। বর্ণনায় : আবু দারদায়া (রাঃ)।

১৩৭৪. যদি একজন বিশ্বাসীর হত্যার ব্যাপারে আকাশ ও ভূমণ্ডলের সকল অধিবাসী অংশ গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্ তাদের সকলকেই নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন।—তিরমিজী। বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৩৭৫. কোন বিশ্বাসীর হত্যার ব্যাপারে যে ব্যক্তি অর্ধেক বাক্য দ্বারাও সাহায্য করে, 'আল্লাহ্র সাহায্য হতে বঞ্চিত' এই বাক্য তার উভয় চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে লিখিত অবস্থায় সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে।—ইব্নে মাজা বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৩৭৬. পুনরুত্থানের দিন মানুষের প্রথম যে বিষয়ের বিচার হবে, তা হত্যার। –বুখারী। বর্ণনায় : আব্দুল্লাহ্ বিন মসউদ (রাঃ)।

১৩৭৭. মসজিদের মধ্যে কোন শাস্তি দেওয়া যাবেনা এবং পুত্রের বিনিময়ে পিতার নিকট থেকে হত্যার মূল্য আদায় করা যাবে না।—তিরমিজী। বর্ণনায় : ইব্নে আব্বাস (রাঃ)।

১৩৭৮. কোন এক জেহাদ উপলক্ষে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। তা দেখে নবী (সঃ) শিশু ও নারী হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। —বুখারী। বর্ণনায় : আব্দুল্লাহ্ ইব্নে ওমর (রাঃ)।

হাঁচি ও হাই তোলা

১৩৭৯. আল্লাহ্ হাঁচি ভালবাসেন এবং হাই তোলাকে ঘৃণা করেন। তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় এবং 'আলহাদুলিল্লাহ্' (অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রশংসাবাদ) পড়ে তা যে মুসলমানেরা শোনে তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য 'ইয়ার-হামুকুমুল্লাহ্' (অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের দয়া করুন) বলা। হাই দিতে দেখলে শয়তান সন্তুষ্ট হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে সে যেন তা যথাসাধ্য দমন করে; কেননা বড় রকম হা করে সশব্দে হাই তুললে শয়তান তা নিয়ে হাস্য করে। [হাঁচি মানুষের মস্তিষ্ককে পরিষ্কার করে, শরীরে স্ফূর্তি আনয়ন করে, তাই আল্লাহ্ তা পছন্দ করেন; পক্ষান্তরে হাইতোলা জড়তা ও

অসৎ-এর পরিচায়ক—তাই আল্লাহ্ তা অপছন্দ করেন।]—মিশকাত। বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৩৮০. একদিন দুই ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে হাঁচি দিল। তিনি একজনের উত্তর দিলেন, অপরজনের উত্তর দিলেন না। লোকটা জিজ্ঞাসা করল ঃ 'হে রসুলুল্লাহ্! এই লোকটার উত্তর দিলেন কিন্তু আমার উত্তর দিলেন না কেন?' তিনি বললেন ঃ এই লোকটা আল্লাহ্র প্রশংসাবাদ করেছে, কিন্তু তুমি করনি। —বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

১৩৮১. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) যখন হাঁচি দিতেন তখন হাত বা কাপড় দ্বারা স্বর বন্ধ করতেন। —তির। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

ক্ষমা

'ক্ষমা করা উত্তম কাজ।' ২(২৬৩)

'যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ (সেই) কল্যাণকারীদের ভালবাসেন।' ৩(১৩৪)

'যারা বলে—হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস করেছি ; অতএব আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর এবং নরকের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর—তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দাতা এবং প্রভাতকালে ক্ষমাপ্রার্থী।' ৩(১৬, ১৭)

'তোমরা আল্লাহ্তা'লার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' ৭৪(২০)

—আল্-কোরআন।

১৩৮২. এমরানের পুত্র মুসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে প্রভু, তোমার কাছে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বান্দা কে?' আল্লাহ্ বললেন, 'ক্ষমতাশালী হয়েও যে ক্ষমা করে।'—বয়হাকী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৩৮৩. যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! আমি যদি বড় শপথকারী হতাম তাহলে আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করতাম—১) দানে ধন কমে না, ২) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে কোন অত্যাচারীকে ক্ষমা করবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার সম্মান বৃদ্ধি করবেন, এবং ৩) যে ব্যক্তি ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে আল্লাহ্ তার জন্যে দারিদ্র্যের দ্বারকে মুক্ত করেন।—তির। বর্ণনায় ঃ আবু কাবশাহ (রাঃ)।

১৩৮৪. 'আমি কি তোমাকে ইহলোক ও পরলোক-বাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্ধান দেব না?' সে বলল, 'হাঁ।' তিনি (দঃ) বললেন, 'যে তোমার আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তুমি (তার সাথে তা) সংযুক্ত করবে ; যে তোমায় বঞ্চিত করে, তুমি তাকে ক্ষমা করবে।'—বয়হাকী। বর্ণনায় ঃ ওকাবা বিন আমের (রাঃ)।

১৩৮৫. মানুষের অসদাচরণ ক্ষমা করার জন্যে আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আদেশ দিয়েছেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)।

১৩৮৬. আল্লাহকে ভয় কর, তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন।—সগির।

১৩৮৭. নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার উম্মতদের নিরুপায়-হয়ে-করা ভুলভ্রান্তি ও অবৈধ কাজকর্ম ক্ষমা করেছেন।—ই. মাজা।

দ্বিতীয় খণ্ড

আল্লাহ্ ও রসূল

[আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয় আর মুহম্মদ (দঃ) তাঁর রসূল বা প্রেরিত পুরুষ'—এই মহান বিশ্বাসই হল ইসলামের মূল ভিত্তি।]

'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌তা'লারই প্রাপ্য, যিনি অনন্ত করুণাময় ও পরম দয়ালু (এবং যিনি) কর্মফল দিবসের প্রভু।' ১(১-৩)

'আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের নির্ভরস্থল। তিনি জনক নন, জাতকও নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।' ১১২(১-৩)

'আল্লাহতা'লাই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উপমা যেন সে তাকের মত—যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্রসদৃশ—পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের (তেল দ্বারা) এ প্রজ্বলিত হয়, যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নিসংযোগ না করলেও মনে হয় ওর তেল যেন উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। জ্যোতির ওপর জ্যোতি! আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর জ্যোতির দিকে পথ নির্দেশ করেন। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।' ২৪(৩৫)।

'আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।' ২(১০৯)

'পূর্ব ও পশ্চিম সব দিকই আল্লাহ্‌র এবং তুমি যে দিকেই মুখ ফেরাও সে দিকই আল্লাহ্‌র দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।' ২(১১৫)

'আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন 'হও'– আর অমনি তা হয়ে যায়।' ২(১১৭)

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌তা'লারই এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তন। তুমি কি দেখনা, আল্লাহ্ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, তার পর তাদের একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, তুমি দেখতে পাও, তারপর তা থেকে নির্গত হয় বারিধারা ; আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং এরদ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার ওপর থেকে এ অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ-ঝলক দৃষ্টিশক্তিকে বিভ্রান্ত করে। আল্লাহ্ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য এতে শিক্ষা রয়েছে।' ২৪(৪২,৪৩)

'তুমি কি জান না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লারই এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই?' ২(১০৭)

'আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। এরপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী ; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে। রসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া!' ২৪(৫৪)

'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম।' ২৪(৫২)

'রসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করো না; তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে পড়ে আল্লাহ্ তাদের জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সাবধান হোক—বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদের বিপর্যস্ত করবে। জেনে রেখো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহ্রই, তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ্ তা জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তারা যা করত তিনি তাদের জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।' ২৪(৬৩, ৬৪)

—আল্-কোরআন।

১. আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিন্তু আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করো না।—সগির।

২. আল্লাহ্ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বস্তুর পরিণতি, কার্যাবলী ও জীবিকা নির্ধারণ করেছেন।—সগির।

৩. সম্পদে আল্লাহ্কে স্মরণ কর, বিপদে তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন।—সগির।

৪. আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং তার জন্য কৃতজ্ঞ হও।—সগির।

৫. যে ব্যক্তি আমার (অর্থাৎ রসূল সঃ-এর) বাধ্য হয় সে আল্লাহ্তা'লার বাধ্য হয় এবং যে আমার অবাধ্য হয় সে আল্লাহ্তা'লার অবাধ্য হয়। শায়খান।

আল্লাহ্র ভালবাসা

৬. আল্লাহ্ বলেন, আমাকে যারা ভালবাসে পরলোকে তাদের জন্য আলোক-মঞ্চ থাকবে—নবী ও শহীদগণ তাদের দেখে হিংসা করবেন।—তিরমিজী।

৭. পরলোকে আল্লাহ্ বলবেন: আমার প্রেমিকগণ কোথায়? আজ আমি তাদের আমার ছায়া দান করব। আমার ছায়া ছাড়া আজ অন্য কোন ছায়া নেই।—মুসলিম।

৮. 'আল্লাহ্র এমন অনেক বান্দা আছে যাদের আমি নবী বা শহীদগণের সঙ্গে কখনো দেখিনি—কিন্তু শহীদগণ তাদের আল্লাহ্তা'লার সঙ্গে দেখে হিংসা করবে।' তারা জিজ্ঞাসা করল, 'হে রসূলুল্লাহ্! তারা কারা?' তিনি (দঃ) বললেন, 'তারা সেই সব লোক যারা আপন আপন আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা আল্লাহ্তা'লাকে অধিকতর ভালবাসত এবং আল্লাহ্তা'লার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্য ছাড়া কখনো তাদের ধন দান করত না; তাদের মুখে জ্যোতি (থাকত) এবং তারা আলোক দ্বারা বেষ্টিত থাকত। সাধারণ মানুষ যাতে ভয় করে তারা তাতে ভয় করে না এবং সাধারণ মানুষ যাতে দুঃখ বোধ করে তাতে তারা দুঃখ বোধ করে না।'—আবু দাউদ।

৯. আল্লাহ্‌ যখন কারো মঙ্গল কামনা করেন (অর্থাৎ ভালোবাসেন) তখন তার অন্তরকে অভাবমুক্ত ও শক্তিশালী করেন—এবং যখন তিনি কারো অমঙ্গল ইচ্ছা করেন তখন তিনি তার চারদিকে অভাব স্থাপন করেন ।—সগির ।

১০. আল্লাহ্‌ যখন কারো কল্যাণ কামনা করেন (অর্থাৎ ভালোবাসেন) পৃথিবীতে তার শাস্তি দ্রুতগামী করেন—এবং যখন কারো অমঙ্গল ইচ্ছা করেন তখন কেয়ামত পর্যন্ত তার শাস্তি স্থগিত রাখেন ।—সগির ।

১১. আল্লাহ্‌ যখন কারো কল্যাণ কামনা করেন তখন তাকে ধর্মবুদ্ধি দান করেন, তাকে পৃথিবীতে সংযম শিক্ষা দান করেন এবং তার দোষ-দুর্বলতা তাকে দেখিয়ে দেন ।—সগির ।

১২. একদিন কিছু যুদ্ধবন্দী নবী (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত হল । তাদের মধ্যে একজন মহিলার স্তন দুধে পরিপূর্ণ ছিল । সে তার দলের মধ্যে কোন শিশু দেখলেই তাকে জড়িয়ে ধরত এবং বুকে তুলে দুধ পান করাত । নবী (সঃ) সাহাবীদের বললেন, 'তোমরা কি মনে কর এই মহিলাটি তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারবে ?' সাহাবীরা বললেন, 'না ; ফেলার অবকাশ থাকলেও সে কখনো ফেলবে না ।' তখন নবী (সঃ) বললেন, 'খোদার কসম, এই মহিলা তার সন্তানের প্রতি যত স্নেহশীল, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর বান্দাদের প্রতি তার চেয়ে অনেক বেশী স্নেহশীল ।' —বুখারী । বর্ণনায় ঃ হজরত ওমর (রাঃ) ।

১৩. (হে আল্লাহ্‌ !) আমি তোমার প্রেম এবং যে তোমাকে ভালবাসে তার প্রেম এবং যে কাজের মাধ্যমে আমি তোমার নৈকট্য লাভ করব সেই কাজের জন্য প্রেম প্রার্থনা করি ।—তির । মিশ ।

আল্লাহ্‌কে ভয়

'হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মর না ।' ৩(১০২)

'তোমাদের পূর্বে যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তাদের এবং তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, আর তোমরা অবিশ্বাস করলেও আকাশে ও পাতালে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত প্রশংসা-ভাজন ।' ৪(১৩১)

"নূহের সম্প্রদায় রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল । যখন ওদের ভ্রাতা নূহ ওদের বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না ? নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল । অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর । আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছেই আছে । সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর ।' ওরা বলল, 'আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যখন দেখছি ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করছে ?" ২৬(১০৫-১১১)

'হে মানুষ তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, বিচার দিনের ভূমিকম্প এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার ।' ২২(১)

'হে বিশ্বাসিগণ ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।' ৩৩(৭০)

'যারা দৃষ্টির অগোচরে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।' ৬৭(১২)

—আল্-কোরআন।

১৪. আল্লাহ্কে ভয় কর, তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন।—সগির।

১৫. যখন কোন পুণ্যবান মুসলমানের চোখ দিয়ে আল্লাহ্র ভয়ে অশ্রু ঝরে এবং তা গড়িয়ে তার মুখের মধ্যে পড়ে এবং যদিও তার আকার মাছির মাথার চেয়েও ক্ষুদ্র হয়—তবু আল্লাহ্ তার জন্য নরক নিষিদ্ধ করেন।—মিশকাত।

১৬. দুটি চোখকে আগুন স্পর্শ করবে না :—একটা যা আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে, অপরটা যা আল্লাহ্র পথে জীবন অতিবাহিত করে।—তিরমিজী।

১৭. আল্লাহ্কে ভয় কর এবং পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর।—সগির ও আরো ৯ জন।

১৮. এক ব্যক্তি জীবনে কোন সৎকাজ করে নি। মৃত্যুর পূর্বে সে তার পুত্রকে উপদেশ দিল যে, মৃত্যুর পর তাকে পুড়িয়ে যেন অর্ধেক ছাই স্থলে ও অর্ধেক জলে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ্র শপথ ! যদি তারা আল্লাহ্কে ভয় করত, তবে অবশ্যই জানত যে, নিখিল বিশ্বে তাঁর মত শাস্তি দেবার শক্তি আর কারও নেই। তারপর সে প্রাণত্যাগ করলে পুত্রের প্রতি যে আদেশ ছিল সে তা পালন করল। তারপর আল্লাহ্ জল ও স্থলভাগকে তাদের মধ্যে যা ছিল তা একত্র করার আদেশ দিলেন। তারপর তাকে বললেন, 'কেন তুমি অমন আদেশ দিয়েছিলে ?' সে বলল, 'হে প্রভো, কেবল তোমার ভয়ে এবং তুমি সব জান।' তারপর আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন।—মিশকাত।

১৯. আবু দরদা (রাঃ) বলেন—একদিন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বেদীর ওপরে দাঁড়িয়ে পাঠ করছিলেন, 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে ভয় করে তার জন্য দুটি বেহেশ্ত।' আমি বললাম, 'হে রসূলুল্লাহ্ ! যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে ?' তিনি দ্বিতীয়বার পাঠ করলেন, 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে ভয় করে তার জন্য দুটি বেহেশ্ত।' আমিও দ্বিতীয়বার বললাম, 'হে রসূলুল্লাহ্ ! যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে ?' তিনি তৃতীয়বার পাঠ করলেন, 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে ইত্যাদি।' আমিও তৃতীয়বার প্রশ্ন করলাম, 'যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে ?' তিনি বললেন, 'যদিও আবু দারদার নাসিকা ধূলিধূসরিত হয়।' [অর্থাৎ যত পাপই সে করুক না কেন !]—মিশকাত।

২০. যেটুকু জান সেটুকু সম্বন্ধে আল্লাহ্কে ভয় কর।—সগির।

২১. সম্পদে বিপদে আল্লাহ্কে ভয় কর।—সগির।

২২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করে সে সেই ব্যক্তির সমান যে যথাসময়ে সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করে এবং তাতে সফলকাম হয়।—তিরমিজী।

২৩. একদিন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এক মুমূর্ষু তরুণের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেমন আছ ?' সে বলল, 'আল্লাহ্তা'লার ক্ষমা-কামনা করি এবং আপন পাপের জন্য ভয় করি।' তিনি বললেন, 'যখন কোন

মো'মেনের মধ্যে এর (অর্থাৎ এই ব্যক্তির) মত এই দুটো জিনিষ একসঙ্গে দেখা যায়, তখন আল্লাহ্ তার প্রার্থনা পূরণ করেন এবং যা সে ভয় করে তার থেকে মুক্তি দেন।'—তিরমিজী ও ইবনে মাজা।

২৪. যদি তোমরা আল্লাহ্‌তা'লাকে উপযুক্তভাবে ভয় করতে, তাহলে তোমরা সকল বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে—আর যদি সেই বাস্তবজ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্‌কে চিনতে পারতে, তাহলে তোমাদের প্রার্থনায় পর্বত ধসে যেত।—সগির।

২৫. আল্লাহ্‌কে ভয় করা শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান।—সগির।

২৬. নিজের সম্বন্ধে মানুষের খারাপ ধারণাকে ভয় কর।—সগির।

২৭. হে আলী, তোমার প্রভু ব্যতীত অন্য কারো কাছে কিছু আশা করো না এবং তোমার পাপ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ভয় করো না।—সগির।

২৮. দোহন-করা-দুধ যেমন স্তনের মধ্যে ফিরে যায় না, তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে, সে কখনো দোজখে প্রবেশ করে না ; এবং আল্লাহ্‌র পথের ধূলা আর নরকের ধূম্রজাল কোন বান্দার জন্য একত্র হয় না।—তিরমিজী। নাসায়ী।

ইসলাম ও মুসলমান

['ইসলাম' শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ আর মুসলমান শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহ্‌র কাছে যে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে সেই-ই প্রকৃত মুসলমান।]

'নিশ্চয়, ইসলাম আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত ধর্ম।' ৩ (১৯)

"বল, 'আমরা আল্লাহ্‌তে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে —তাতে বিশ্বাস করি, আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী। এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।" ৩ (৮৪, ৮৫)

"তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর,' সে বলেছিল, 'বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।' এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়েছিল, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করোনা।" ২ (১৩১, ১৩২)

'আল্লাহ্ ব্যতীত যারা অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তাদের উপমা সেই মাকড়সার মত যে জাল বোনে যা সব চেয়ে ক্ষণভঙ্গুর।'

'তিনি তাঁর রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, অন্য সমস্ত ধর্মের ওপর একে জয়যুক্ত করার জন্যে।...মুহম্মদ আল্লাহ্‌র প্রেরিতপুরুষ, তাঁর সহচরগণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানু-

স্তুতিশীল, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিকামনায় তুমি তাদের রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে। তওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জিলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা থেকে কিশলয় নির্গত হয়, তারপর এ শক্ত ও পুষ্ট হয়, এবং পরে কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় যা চাষীদের জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের সমৃদ্ধি দ্বারা সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন।' ৪৮ (২৮, ২৯)

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম।' ৫ (৩)

—আল্‌-কোরআন।

২৯. পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলামের সৌধ স্থাপিত : (১) আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহম্মদ (দঃ) তাঁর রসূল বা প্রেরিত পুরুষ—একথা স্বীকার করা ও সাক্ষ্য দেওয়া ; (২) পূর্ণরূপে নামাজ পালন করা ; (৩) জাকাত দান করা ; (৪) হজ্জ্‌ করা ; এবং (৫) রমজান মাসে রোজা পালন করা।—বুখারী বর্ণনায় : আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৩০. তারা জিজ্ঞাসা করল, 'ইসলাম কি ?' তিনি বললেন, 'সংযম ও বাধ্যতা'। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'উত্তম ঈমান কি ?' তিনি বললেন, 'অমায়িক ব্যবহার।' 'সর্বাপেক্ষা উত্তম হিজরত কি ?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌ যা পছন্দ করেন না তা পরিত্যাগ করা।' —মিশকাত।

৩১. একদিন আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে রসূলুল্লাহ্‌, ইসলাম কি ?' তিনি বললেন, 'সুমিষ্ট বাক্য ও অন্নদান।' তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঈমান কি ?' তিনি বললেন, 'ধৈর্য ও দানশীলতা।' তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন প্রকার ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ?' তিনি বললেন, 'যার কথা ও হাত থেকে মুসলমানেরা নিরাপদ থাকে।' পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন প্রকার ঈমান সর্বোৎকৃষ্ট ?' তিনি বললেন, 'সদ্ব্যবহার।' বললাম, 'কোন্‌ প্রকারের নামাজ উৎকৃষ্ট ?' তিনি বললেন, 'ভয় ও ভক্তি সহকারে গভীর ধ্যান।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন্‌ প্রকারের হিজরত সর্বশ্রেষ্ঠ ?' তিনি বললেন, 'তোমার প্রতিপালক যা পছন্দ করেন না তা ত্যাগ করা।' তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন জেহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ ?' তিনি বললেন, 'যার অশ্ব নিহত হয়েছে এবং তার শরীর থেকে রক্ত ঝরছে।' পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন সময় সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ?' তিনি বললেন, 'রজনীর শেষ প্রহরের মধ্যবর্তী সময়।' —মিশকাত। বর্ণনায় : আমর বিন আবাসা (রাঃ)।

৩২. আমি বললাম, 'হে রসূলুল্লাহ্‌, আমাকে এমন একটা কাজ শিক্ষা দিন যা আমাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবে এবং দোজখ থেকে দূরে রাখবে।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তুমি কঠিন প্রশ্ন করেছ ; তবে আল্লাহ্‌তা'লা যার জন্য সহজ করেছেন তার জন্য এ নিশ্চয় সহজ। আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, তার সঙ্গে কাউকে অংশী করো না, নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর, জাকাত আদায় কর, রমজানের রোজা পালন কর এবং আল্লাহ্‌র ঘর দর্শন (হজ্জ্‌) কর।' তারপর বললেন, 'আমি কি তোমাকে পুণ্য-কর্মের দুয়ারগুলি সম্পর্কে জানাব না ? রোজা হল ঢালস্বরূপ ; দান লঘু পাপ-

-গুলোকে সেইভাবে ধ্বংস করে যেভাবে পানি অগ্নিকে নির্বাপিত করে ; আর মধ্য-রজনীতে মানুষের নামাজ।' তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, 'শয্যা থেকে তাদের শরীর পৃথক হয়, ভয় ও আশার সাথে তারা তাদের প্রভুকে স্মরণ করে এবং যা আমি তাদের দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। ফলতঃ কেউই জানে না যে তাদের কাজের পুরস্কার স্বরূপ কত নয়নাভিরাম জিনিষ গোপন রাখা হয়েছে।' তারপর তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাকে কর্মের মূল, তার খুঁটি ও তার শিখর সম্বন্ধে জানাব না ?' আমি বললাম, 'হাঁ, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) !' তিনি বললেন, 'কর্মের শিকড় ইসলাম, নামাজ তার খুঁটি এবং জেহাদ তার সুউচ্চ শিখর।' তারপর বললেন, 'আমি কি তোমাকে এদের সকলের অধিপতি সম্পর্কে বলব না ?' আমি বললাম, 'হে মহানবী, বলুন।' তিনি তার জিহ্বা স্পর্শ করে' বললেন, 'একে সংযত কর।' আমি বললাম, 'হে মহানবী, আমরা যা কিছু ওর দ্বারা উচ্চারণ করি, তার সবটুকুর জন্যই কি আমাদের শাস্তি হবে ?' তিনি বললেন, 'হে মুয়াজ, তোমার মা তোমাকে গর্ভে ধারণ করুক (অর্থাৎ রক্ষা করুক) ! জিহ্বার পাপ (অর্থাৎ অসংযত কথা) ছাড়া আর কোন্ জিনিষ মানুষকে নাকে-মুখে-গুঁজড়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে পারবে ?'—তির। ই. মাজা। মিশ। আহ্মদ। বর্ণনায় ঃ মুয়াজ (রাঃ)।

৩৩. একদিন আমি নবী (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, 'আপনার দক্ষিণহস্ত বিস্তার করুন, আমি আপনার কাছে বয়াত (বা প্রতিশ্রুতিবন্ধ) হব।' সুতরাং তিনি তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমি তা চেপে ধরলাম। তিনি বললেন, 'হ আমর, তোমার কি হয়েছে ?' আমি বললাম, 'আমি একটা প্রতিশ্রুতি নেবার ইচ্ছা করছি।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন বিষয়ের প্রতিশ্রুতি ?' বললাম, 'যাতে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে ক্ষমা করতে পারেন।' তিনি বললেন, 'হে আমর ! তুমি কি জান না যে ইসলাম গ্রহণ পূর্ববর্তী পাপকে ধ্বংস করে।'—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আমুর ইবনুল আস (রাঃ)।

৩৪. আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে বলতে শুনেছি, পৃথিবীতে এমন কোন ঘর বা তাঁবু বাকি থাকবে না সেখানে আল্লাহ্‌তা'লা পরাক্রমশালীদের পরাক্রম অথবা দুর্বলদের দুর্বলতা সত্ত্বেও ইসলামের বাণী পেঁছে দেবেন না। হয় আল্লাহ্ তাদের সম্মানিত করবেন অথবা অপমানিত করবেন। যাদের সম্মানিত করবেন তাদের ওর হকদার করবেন, যাদের অপমানিত করবেন তাদের ওর কাছে নতি স্বীকার করাবেন।' আমি বললাম, 'তারপর ধর্ম একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই পালিত হবে।'—মিশ। আহ্। বর্ণনায় ঃ মিকদাদ।

৩৫. সেই ব্যক্তিই সুখী যে ইসলামের দিকে পরিচালিত হয়েছে এবং তার জীবিকাকে যথেষ্ট মনে করে এবং তাতেই পরিতৃপ্ত থাকে। —তির।

৩৬. আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলী দ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত কর। —সগির।

৩৭. আল্লাহ্‌তা'লা সেরাতল মোস্তাকিমের (অর্থাৎ সরল পথ বা ইসলামের পথের) উপমা দিয়েছেন ঃ তার (অর্থাৎ সেইপথের) প্রত্যেক দিকে দুটো প্রাচীর আছে, তার মধ্যে উন্মুক্ত দ্বার আছে এবং সেই দ্বারের সাথে ঝোলান পর্দা আছে এবং পথের মাথায় একজন আহ্বানকারী আছে। সে বলে, 'সোজা ভাবে এই পথে চল, বেঁকোনা।' তার (অর্থাৎ আহ্বানকারীর) ওপরে আর একজন আহ্বানকারী আছে। যখনই কোন বান্দা সেই দ্বারসমূহের পর্দা সরাতে

চায় তখনই সে বলে, 'থাম, এগুলো খুলো না, যদি খোল তবে তুমি নিশ্চয় পতিত হবে।' তারপর তিনি ওর ব্যাখ্যা করে বললেন, 'এই পথই ইসলাম, উন্মুক্ত দ্বারগুলো হল আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বস্তু, ঝোলান পর্দাগুলো হল আল্লাহ্ তা'লার সীমা, পথশীর্ষে আহ্বানকারী কোরআনশরীফ, আর তার ওপর যে আহ্বানকারী সে হল প্রত্যেক মোমেনের অন্তরস্থিত আল্লাহ্ তা'লার উপদেষ্টা। [কোরআন এবং অন্তরস্থিত আল্লাহ্‌র উপদেষ্টা অর্থাৎ প্রদত্ত বিবেক মানুষকে তার চলার পথের ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে' সরল সঠিক ইসলামের পথে বা শান্তি ও পুণ্যের পথে চলতে সাহায্য করে।] —তিরমিজী। বয়হাকী। মিশকাত।

৩৮. জনৈক ইহুদী তাঁকে (ওমর রাঃ-কে) বলল, 'হে আমীরুল মু'মেনিন ! আপনাদের গ্রন্থের একটা আয়াত (বাক্য) যা আপনারা পাঠ করেন তা যদি আমাদের ইহুদী সম্প্রদায়ের ওপর অবতীর্ণ হত তবে আমরা ঐ দিনকে উৎসবের দিনে পরিণত করতাম।' তিনি বললেন, (সেটা) 'কোন্ আয়াত ?' ইহুদীটি বলল, 'আজ আমি তোমার ধর্মকে পূর্ণ করলাম, তোমার ওপর আমার অনুগ্রহকে পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম।' ওমর (রাঃ) বললেন, 'যে দিন এবং যে স্থানে ঐ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল তা আমি জানি। তিনি (দঃ তখন) শুক্রবার আরাফাতে অবস্থান করছিলেন।' [শুক্রবার ইসলামে উৎসবের দিন।]—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ওমর ইব্‌নে খাত্তাব (রাঃ)।

৩৯. এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'ইসলামের উত্তম কাজ কি ?' তিনি বললেন, 'খাদ্যদান এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম করা।' —বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন্ আমর (রাঃ)।

৪০. যখন তোমাদের কেউ ইস্‌লামকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে, তখন যে পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ না করে সে পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত) তার প্রতিটি পুণ্যকর্মের জন্য দশ থেকে সাতশ পুণ্য লেখা হয় এবং তার প্রত্যেক পাপকর্মের জন্য মাত্র একটি পাপ লেখা হয়। [আল্লাহ্‌র করুণা কি অপরিসীম !]—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪১. ইসলাম অল্প সংখ্যক মুসলমান নিয়ে শুরু হয়েছে এবং শীঘ্রই সেইভাবে শেষ হবে। ঐ অল্পসংখ্যককে ধন্যবাদ।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪২. সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলমান যার কথা ও কাজের দ্বারা অন্য কোন মুসলমান কষ্ট পায় না। (আর) সেই ব্যক্তি প্রকৃত মোহাজের যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে বর্জন করেছে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর (রাঃ)।

৪৩. কোন ব্যক্তি নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্য মুসলমান ভাই-এর জন্য তা পছন্দ না করা পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৪৪. বিশ্বাসী মুসলমান একটা সবুজ গাছের মত, যার পাতা পড়ে না এবং ছায়া দূর হয় না—তা হল খেজুর গাছ।—শারখান।

৪৫. মুসলমান সবুজ শস্যগাছের মত—বাতাস তাকে মাটিতে নুইয়ে দেয় আবার তাকে সোজা করে—মৃত্যু পর্যন্ত সে এইভাবে চলতে থাকে। কিন্তু

মুনাফেক (কপট ব্যক্তি) শাখাহীন কাণ্ডের মত—মুলোৎপাটন না করা পর্যন্ত কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।—বুখারী। তিরমিজী।

৪৬. কোন মুসলমানই প্রকৃত মুসলমান হয়না, যে পর্যন্ত না মানুষ তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে, কোন মুসলমান কাফের হয় না যে পর্যন্ত না সে ইচ্ছা করে নামাজ ত্যাগ করে, কোন অনুতপ্ত ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষে অনুতপ্ত হয় না যে পর্যন্ত না সে যতটা খোদার অবাধ্য হয়েছিল খোদার প্রতি ততটা বাধ্য হয়, কোন নীচ ব্যক্তি নীচ হয়না যে পর্যন্ত না সে আপন নীচ কার্যকে যুক্তি দ্বারা সমর্থন করে, কোন নির্বোধ ব্যক্তিই নির্বোধ হয় না যে পর্যন্ত না আপন গোপন কথা অপরের কাছে প্রকাশ করে, কোন মূর্খ ব্যক্তি মূর্খ হয় না যে পর্যন্ত না সে কেবল আপন উদর-পূর্তির জন্যই সকল কিছু ব্যয় করে এবং কোন আত্মপ্রশংসাকারী আত্মপ্রশংসাকারী হয় না যে পর্যন্ত না সে নিজের প্রশংসা বা স্তুতির জন্য সকল কাজকর্ম সম্পন্ন করে।—ওসিয়াতুন্নবী।

৪৭. মুসলমানের আন্তরিকতা তাতেই প্রমাণিত হয়—যা তার নিজের ব্যাপার নয়, তাতে সে মনোযোগ দেয় না।—আবু দাউদ।

৪৮. প্রকৃত মুসলমানের প্রতিটি কাজই আশ্চর্যজনক; কারণ প্রতিটি কাজই তার জন্য উৎকৃষ্ট এবং মুমেন ছাড়া অন্য কারো ভাগ্যে তা ঘটে না। যদি সে সুখে থাকে তবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তা তার পক্ষে ভাল; আর যদি দুঃখে থাকে তবে ধৈর্য ধারণ করে—তাও তার পক্ষে ভাল।—মুসলিম।

৪৯. প্রকৃত মুসলমান সুখের সময় আল্লাহ্‌তা'লার শোকর করবে এবং দুঃখের সময় তাঁর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে।—সগির।

৫০. মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি ছটি কর্তব্য আছে। তারা জিজ্ঞাসা করল, 'হে রসুলুল্লাহ্‌, কর্তব্যগুলি কি?' তিনি বললেন—"১) যখন কোন মুসলমানের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয় তখন তাকে সালাম কর, ২) যখন সে তোমাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করে তখন তা গ্রহণ কর, ৩) যখন সে তোমার উপদেশ গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে তখন তাকে উপদেশ প্রদান কর, ৪) যখন সে হাঁচি দেয় এবং বলে 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তা'লার'—তুমি বল 'আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি সদয় হউন'; ৫) যখন সে পীড়িত হয় তখন তার সাথে সাক্ষাৎ কর, এবং ৬) যখন সে প্রাণত্যাগ করে তখন তার জানাজা অনুসরণ কর।"—খামসা।

৫১. আমার প্রতিপালক আমাকে নটি কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন: ১) অন্তরে ও বাইরে তাঁকে ভয় করা, ২) সুখে দুঃখে সমভাবে সত্যকথা বলা, ৩) সম্পদে ও দারিদ্র্যে মিতব্যয়িতা অভ্যাস করা, ৪) আত্মীয়-স্বজন উপকার না করলেও তাদের উপকার করা, ৫) যে আমাকে দান করতে অস্বীকার করে তাকে দান করা, ৬) যে আমার প্রতি অন্যায় করে তাকে ক্ষমা করা, ৭) আমার নীরবতাকে আমার ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা, ৮) কথা বলার সময় তাঁর জেকের করা এবং ৯) আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্ট জীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করার সময় আমাকে তাদের কাছে আদর্শ স্থানীয় করে তোলা এবং আল্লাহ্‌র পথে তাদের পরিচালিত করার চেষ্টা করা।—মিশকাত।

৫২. আমাকে যে দেখেছে সে সুখী এবং আমাকে যে দেখেনি অথচ বিশ্বাস করেছে সে সাতগুণ বেশী সুখী।—মিশ। আহ্‌মদ।

৫৩. আমার উম্মতদের মধ্যে যারা আমাকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় মনে করবে তারা আমার পরে জন্মাবে, তারা প্রত্যেকেই আমাকে দেখার জন্য তাদের ধন প্রাণ উৎসর্গ করতে চাইবে।—মুসলিম।

৫৪. আমার উম্মতদের মধ্যে একদল সর্বদাই সত্যের জন্য সংগ্রাম করতে থাকবে। তাদের শত্রুদের ওপর তারা জয়লাভ করতে থাকবে। তাদের শেষ দল দজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে।

৫৫. একদিন আমি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। তিনি একদল লোককে দান করলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একজনকে কিছুই দিলেন না যাকে আমি ঐ দলের মধ্যে সর্বোত্তম বলে মনে করতাম। তা দেখে আমি বললাম 'হে রসুলুল্লাহ্! আপনি অমুককে দান করলেন না? আমি শপথ করে বলছি, সে মোমেন।' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'মোমেন বল না, মোসলেম বল।' আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম, কিন্তু আমার মনে কথাটা আবার প্রবল হয়ে উঠল, আমি আবার ঐ রকম বললাম, তিনিও আবার পূর্বের মত বললেন, 'মোমেন বলনা মোসলেম বল।' তৃতীয় বার ঐ রকম প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, 'হে সায়াদ, আমি যাকে পছন্দ করিনা তাকেও দান করি শুধু এই কারণে যে সে হয়তো (অভাবে পড়ে) দোজখের পথে চলে যেতে পারে।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ সায়া'দ (রাঃ)।

৫৬. মোমেন (অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান) এক ছিদ্র থেকে দুবার দংশিত হয় না [অর্থাৎ একবার আঘাত পেলেই সাবধান হয়]।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৭. মোমেন বেহেশ্‌তে না যাওয়া পর্যন্ত সৎকার্যে ক্লান্তি বোধ করবে না।—তিরমিজী।

৫৮. একজন মোমেন আল্লহ্‌তা'লার কাছে কাবা শরীফ অপেক্ষাও সম্মানিত।—ইবনে মাজা।

৫৯. দুনিয়াতে মোমেনগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—১) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস করে এবং সন্দেহ করে না, তার পর আল্লাহ্‌র পথে আপন ধনপ্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করে; ২) মানুষ যাকে তাদের ধনপ্রাণ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে এবং ৩) সেই ব্যক্তি যে লোভে পড়ে কিন্তু মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্‌র জন্য তা ত্যাগ করে।—মিশ্‌। আহ্।

৬০. যে আমাদের নামাজ পড়ে, এবং কেব্‌লা গ্রহণ করে, আমাদের কোরবানীর মাংস খায়, সেই ব্যক্তিই মুসলমান। তার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের জামানত আছে। অতএব আল্লাহ্‌র জামানত সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করোনা।—বুখারী।

৬১. মুসলমান মুসলমানকে গালি দিলে গালিদাতা ফাসেক হয়ে যায়, আর মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করলে সে কাজ কাফেরের কাজ বলে' গণ্য হয়।

৬২. যে ব্যক্তি মুসলমানের মানহানির বিষয় গোপন করে' সম্মান রক্ষা করে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার সম্মান রক্ষা করবেন।—বুখারী।

৬৩. যদি তোমার ওপর খোদার আদেশ অবতীর্ণ হয় এবং তুমি তাতে রাজী থাক, তবে তুমি পুরস্কৃত হবে এবং যদি তুমি অধীর হও, তবে শাস্তি ভোগ করবে।—সগির।

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য

'বিশ্ববাসিগণ পরস্পর ভাই-ভাই ; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।' ৪৯ (১০)

"তোমরা একযোগে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং দলে দলে যেন বিভক্ত হয়ে পড়ো না।"

—আল্-কোরআন।

৬৪. সমস্ত মুসলমান এক দেহ ; যদি কোন ব্যক্তি মস্তকে বেদনা অনুভব করে তবে তার সমস্ত শরীর বেদনাগ্রস্ত হয় এবং যদি তার চক্ষু বেদনাগ্রস্ত হয় তবে সে তার সমস্ত শরীরে বেদনা বোধ করে।—মুসলিম।

৬৫. 'সমস্ত মুসলমান একটা ইমারতের মত যার এক অংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় করছে।' তারপর তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলোর মধ্যে আঙ্গুল-চালনা করে দেখালেন যে, এইভাবে (অর্থাৎ ইমারতের গাঁথুনিতে এক ইঁট অপর ইঁটকে যে ভাবে সাহায্য করে সেই ভাবে) তারাও পরস্পরকে সাহায্য করবে।—বুখারী। বর্ণনায় : আবু মুসা আশ্‌য়ারী (রাঃ)।

৬৬. সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই ; কারো প্রতি অত্যাচার করবে না, কাউকে বিপদের মধ্যে ফেলে চলে যাবে না। যে ব্যক্তি তার ভাই-এর অভাব দূর করে আল্লাহ্ তার অভাব দূর করবেন ; যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ দূর করে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দুঃখ দূর করবেন ; এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দোষ গোপন করবেন। —আবু দাউদ।

৬৭. মুসলমানেরা পরস্পর ভাই ভাই—তারা পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করবে না, পরস্পরকে সাহায্য করতে বিরত থাকবে না এবং পরস্পরকে ঘৃণার চক্ষে দেখবে না। অন্তঃকরণই পুণ্য কর্মের বাসস্থান, অতএব সেই ব্যক্তিই পুণ্যবান যে অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করে না। এক মুসলমানের জিনিস—তার রক্ত, সম্পত্তি এবং সম্মান—অন্য মুসলমানের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ)।—মুসলিম।

৬৮. জেনে রেখো, মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই এবং তোমরা এক ভ্রাতৃমণ্ডলী। ভাই যদি ভাইকে মুক্ত হস্তে দান না করে তাহলে ভায়ের জিনিস ভায়ের পক্ষে বৈধ (হালাল) নয়। অন্যায় ও অবিচার থেকে সাবধান থাক। —মুসলিম।

৬৯. তোমাদের ভায়েদের সাথে সহযোগিতা কর। সব সময় তাদের উপকার কর। তোমাদের বিপদে তাদের সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাদের বিপদে তোমরা সাহায্য দান কর।—সগির।

৭০. নিশ্চয় তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের ভ্রাতার দর্পণ স্বরূপ। অতএব যে-কেউ তার ভ্রাতার অন্তরে পাপের অস্তিত্ব দেখতে পাবে সে অবশ্য তাকে তা দূর করতে বলবে।—তিরমিজী।

৭০ (ক). তোমার মুসলমান ভাইকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করাই মার্জনা লাভের উপায়।—সগির।

৭১. আমার উম্মতের তুলনা বারিধারা সদৃশ। কেউ জানে না তার প্রথম বা শেষ কোন্ অংশ উৎকৃষ্ট।—তিরমিজী।

৭২. যে ব্যক্তি তার ভায়ের সম্মান রক্ষা করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।—তিরমিজী।

৭৩. 'তোমরা অত্যাচারী ও অত্যাচারিত ভ্রাতাকে সাহায্য কর।' এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল. 'যদি সে অত্যাচারিত হয় তবে তাকে সাহায্য করব ; কিন্তু যদি সে অত্যাচারী হয় তবে তাকে কিভাবে সাহায্য করব ?' তিনি বললেন, 'তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখ—ওটাই তার সাহায্য।'—বুখারী। তির।

৭৪. তোমরা পরস্পরের পরামর্শ গ্রহণ করবে—ও আত্মাকে সুদৃঢ় এবং মস্তিষ্ককে শক্তিশালী করবে।—সগির।

৭৫. মুসলমানের সঙ্গে গালাগালি করা বড় পাপ এবং তার সাথে মারামারি করা কুফুরী।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মসউদ (রাঃ)।

ঈমান

['ঈমান' শব্দের সাধারণ অর্থ বিশ্বাস, শাস্ত্রীয় অর্থ—আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস।]

'যারা ঈমান এনেছে এবং কোন অন্যায় অত্যাচার করেনি একমাত্র তারাই পরিত্রাণ পাওয়ার উপযুক্ত।'—পারা ৭, রুকু ১৫।

'নিশ্চয় যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তারা তো সরল পথ হতে বিচ্যুত' ২৩ (৭৪)

"হে আমাদের রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা ! আমরা ঈমানের প্রতি আহ্বানকারীর উদাত্ত আহ্বান শুনতে পেয়েছি—'হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা তোমাদের সৃষ্টি-পালন-ও-রক্ষাকর্তার ওপর ঈমান (বিশ্বাস) আন।' আমরা এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছি ও আপনার প্রতি ঈমানকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে নিয়েছি। আপনি আমাদের সমস্ত দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করুন, সমস্ত অপরাধ মার্জনা করুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত সৎলোকেদের দলভুক্ত থাকার শক্তি দান করুন।" ৩ (১৯৩)

—আল্-কোরআন।

৭৬. সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহ্তা'লাকে প্রভু, ইসলামকে তার ধর্ম এবং মুহম্মদ (দঃ)-কে আল্লাহ্র রসূল রূপে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছে। —মুসলিম। শায়খান। বর্ণনায় ঃ আব্বাস (রাঃ)।

৭৭. কোন মানুষ চারটি বিষয়ে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত বিশ্বাসী বা ঈমানদার হতে পারবে না।—সে সাক্ষ্য দেবে— ১) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি (মুহম্মদ দঃ) আল্লাহ্র রসূল, ২) তিনি আমাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, ৩) মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানে সে বিশ্বাস করবে এবং ৪) তকদির বা ভাগ্যে বিশ্বাস করবে।—তিরমিজী। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ হজরত আলী (রাঃ)।

৭৮. যে কেউ সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নেই এবং মুহম্মদ (দঃ) তাঁর রসূল—আল্লাহ্ তার জন্য নরক নিষিদ্ধ করেন।—মুস। বর্ণনায়ঃ ওবাদা (রাঃ)।

৭৯. যে ব্যক্তি তিনটি কাজ পালন করেছে সে ঈমানের স্বাদ ভোগ করেছেঃ ১) কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করা, ২) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য বলে স্বীকার না করা, এবং ৩) প্রতি বৎসর মালের নির্ধারিত জাকাত সন্তুষ্টির সাথে দান করা—পশু সম্বন্ধে কোন বৃদ্ধ, রুগ্ণ, অকর্মণ্য বা ছোট জন্তু নয়, সুস্থ জন্তু দান করা, কেননা আল্লাহ্ যেমন তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস দান হিসেবে চান না, তেমনি নিকৃষ্ট জিনিসও পছন্দ করেন না। —আ. দাউদ।

৮০. তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তা'লা তোমার সঙ্গে আছেন—এই উপলব্ধি হল সর্বোৎকৃষ্ট ঈমান।—সগির।

৮১. ঈমান হল অন্তর দ্বারা উপলব্ধি করার, রসনা দ্বারা ঘোষণা করার এবং অনুষ্ঠানের সাহায্যে পালন করার বিষয়।—সগির।

৮২. ঈমান ও আমল (অর্থাৎ বিশ্বাস কর্ম) দুই বন্ধু—একের অভাবে অপরের দ্বারা কোন উপকার হয় না।—সগির।

৮৩. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই বলে সাক্ষ্য দেওয়াই হল বেহেশ্‌তের চাবি।—আহ্‌মদ। বর্ণনায়ঃ মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ)।

৮৪. এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'ঈমান কি?' তিনি বললেন, 'যদি তুমি সৎকাজ করে আনন্দ পাও এবং অসৎকাজ করে বেদনা বোধ কর তবেই তুমি প্রকৃত ঈমানদার।' লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'পাপ কি?' তিনি বললেন, 'যখন কোন কাজ তোমার আত্মাকে যন্ত্রণা দেয় তখন (তা পাপ,) তা পরিত্যাগ কর।'—মিশকাত।

৮৫. 'আল্লাহ্‌র কছম সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর কছম সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর কছম সে ঈমানদার নয়।' জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে রসূলুল্লাহ্, কে ঈমানদার নয়?' তিনি বললেন, 'যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।' —বুখারী। মুস। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৮৬. ঈমানদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে স্বভাব চরিত্রে সর্বোত্তম। —আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৮৭. মুয়াজ বিন জাবাল নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সর্বাপেক্ষা উত্তম ঈমান কি?' তিনি বললেন, 'তুমি সব সময় আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসবে, আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করবে এবং আল্লাহ্‌র আরাধনায় রসনাকে নিযুক্ত রাখবে।' তারপর (মুয়াজ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কি?' তিনি বললেন, 'তুমি নিজের জন্য যা ভালবাস অপরের জন্য তাই ভালবাসবে এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ কর অপরের জন্য তা অপছন্দ করবে।'—মিশকাত। বর্ণনায়ঃ মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ)।

৮৮. কোন লোক ঈমানদার হতে পারে না যে পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভায়ের জন্যও তা পছন্দ করে।—বুখারী। মুস। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) ও আনাস (রাঃ)।

৮৯. দৃঢ় ঈমানদার ব্যক্তি দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট ও প্রিয়—তাদের প্রত্যেকেই ভাল। যাতে তোমার উপকার হয় তাই আশা কর, আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর, ক্লান্তি বোধ করো না এবং যদি কোন বিপদ আসে তবে বল না যে, যদি আমি এমন করতাম তবে এমন হত, বরং বলো, আল্লাহ্ এ নির্ধারিত করেছেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন। অন্যথায় তুমি শয়তানের পথ প্রশস্ত করবে।—মুসলিম।

৯০. সেই ব্যক্তি তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে যে আল্লাহ্‌র জন্যে ভালবাসে, আল্লাহ্‌র জন্যে ঘৃণা করে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দান করে অথবা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিষেধ করে।—আ. দাউদ। তির।

৯১. আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মিত্রতা করা ও শত্রুতা করা সকল কাজের সেরা কাজ।—আ. দাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু জর (রাঃ)।

৯২. তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মনুষ্য অপেক্ষা আমি তোমাদের কাছে অধিকতর প্রিয় হই।—শায়খান। বুখারী। মুস। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৯৩. তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশ্‌তে যাবে না এবং পরস্পরকে ভাল না বাসা পর্যন্ত ঈমান আনবে না। আমি তোমাদের এমন কথা বলব যা পালন করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে—তা হল পরস্পরকে সালাম করা।—আবু দাউদ। তির।

৯৪. যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের মাধুর্য পূর্ণরূপে উপভোগ করবে—১) সব কিছু অপেক্ষা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূল তার কাছে অধিক প্রিয় হবে; ২) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোন কারণে কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না; ৩) আল্লাহ্ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করার পর পুনরায় আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে সে যেমন ভয় করে কুফ্‌রীতে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায়) প্রত্যাবর্তন করতে সে তেমনি ঘৃণা করবে।—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৯৫. ঈমানের সত্তরেরও অধিক শাখা আছে। তার মধ্যে উত্তম শাখা 'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই—একথা বলা এবং অধম শাখা পথের কাঁটা দূর করা। আর লজ্জা তার আর একটা শাখা।—খামসা। বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৯৬. ঈমানের তিনটি শিকড় আছে ঃ প্রথম—যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই বলে তাকে কষ্ট না দেওয়া, দ্বিতীয়—কোন একটা দোষের জন্য কাউকে বেইমান (বা অবিশ্বাসী) বলে গণ্য না করা, তৃতীয়—একটি মাত্র অপরাধের জন্য কাউকে সমাজচ্যুত না করা।—আ. দাউদ।

৯৭. ঈমানের শিকড় বাড়ে বা কমেনা. কিন্তু তার সীমা আছে; অতঃপর যে তার সীমা হ্রাস করে সে ঈমানকে হ্রাস করে এবং যে তার সীমা বৃদ্ধি করে সে ঈমানকে বৃদ্ধি করে—এবং তার শিকড় হচ্ছে আল্লাহ্‌তা'লা ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহম্মদ (দঃ) তার বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ একথায় সাক্ষ্যদান করা। এর সীমা হচ্ছে নামাজ, রোজা, হজ্জ্, জাকাত, ফরজ গোসল; তারপর যে ব্যক্তি উপর্যুক্ত সৎকার্য বৃদ্ধি করে তাদের পুণ্য বৃদ্ধি পায় এবং যে সেগুলো হ্রাস করে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। লবাবুল আখবার।

৯৮. ফরজসমূহ পালন না করা পর্যন্ত ঈমান পূর্ণ হয় না, এবং সেসব অস্বীকার না করা পর্যন্ত ঈমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি ফরজগুলো অস্বীকার না করে' তা পালন করতে আলস্য বোধ করে সে তার জন্য শাস্তি ভোগ করবে এবং যে ব্যক্তি সেসব পরিপূর্ণ ভাবে পালন করে সে বেহেশ্‌ত লাভ করবে। —লবাবুল আখবার।

৯৯. মানুষ কেবলই জিজ্ঞাসা করতে থাকবে—আল্লাহ্‌ সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছে? যার অন্তরে এই ভাবের উদয় হয়, সে যেন বলে. 'আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনলাম।'—বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১০০. মানুষ অনুসন্ধান হতে বিরত হবে না। এমন কথাও বলা হবে—আল্লাহ্‌ তো সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা কিন্তু আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছে? তখন বল—আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়, তিনি অভাবশূন্য, তিনি কারো সন্তান নন, তাঁরও কোন সন্তান নেই, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।' সে যেন বিতাড়িত শয়তানের থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে।—আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১০১. যখন কেউ ব্যভিচার করে তখন তার ঈমান থাকে না, যখন কেউ চুরি করে তখন তার ঈমান থাকে না, যখন কেউ মদ্যপান করে তখন তার ঈমান থাকে না, যখন কেউ দস্যুবৃত্তি করে তখন তার ঈমান থাকে না এবং যখন কেউ পরনিন্দা করে তখন তার ঈমান থাকে না। অতএব তাদের সম্বন্ধে সাবধান ও সতর্ক হও। —শায়খান। বুখারী। মুস। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১০২. যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে সে কখনো নরকে প্রবেশ করবে না।—তির।

১০৩. যখন বেহেশ্‌ত অর্জনকারীরা বেহেশ্‌তে এবং দোজখ-অর্জনকারীরা দোজখে প্রবেশ করবে, তখন যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে আল্লাহ্‌ তাদের দোজখে থেকে বের করে আনার আদেশ দেবেন। ফেরেশ্‌তারা তাদের আগুনে-পুড়ে-ছাই-হয়ে-যাওয়া অবস্থায় বের করে আনবেন। তারপর তাদের আবেহায়াতের নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। সেখান থেকে তারা নতুন জীবন লাভ করে অতিশয় সুন্দর রূপ ধারণ করে বেরিয়ে আসবে। বুখারী।—বর্ণনায়ঃ আবু সঈদ খুদরী (রাঃ)।

১০৪. 'দুটি ঘটনা অবশ্যই ঘটবে।' একজন জিজ্ঞাসা করল. 'হে রসূলুল্লাহ্‌, সেই দুটি ঘটনা কি?' তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে অংশীদার ক'রে প্রাণ ত্যাগ করেছে সে দোজখে যাবে, আর যে অংশীদার না করে প্রাণত্যাগ করেছে সে বেহেশ্‌তে যাবে।'—মুসলিম।

১০৫. আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন: রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) একদিন তাঁকে তাঁর পাদুকা দিয়ে পাঠান এবং বলেন, যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করবে ও বলবে 'আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহম্মদ (সঃ) তাঁর রসুল' তাকে তুমি বেহেশ্‌তের সুসংবাদ দেবে। এরপর পথের মধ্যে সর্বপ্রথম হজরত ওমর (রাঃ)-র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল এবং তিনি এই হাদীস বর্ণনা করলেন। এতে ওমর (রাঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর মুখে চপেটাঘাত করলেন। তারপর উভয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর

দরবারে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ওমর, কি কারণে তুমি এমন কাজ করলে?' তিনি বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্, আমার পিতামাতা আপনার ওপর কোরবান হোক! আপনি কি আবু হোরায়রাকে আপনার জুতাসহ প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন, যার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে সে যদি সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং এতে বিশ্বাসী হয়, তবে তাকে বেহেশ্তের সংবাদ দেবে?' রসূলুল্লাহ্ বললেন, 'হ্যাঁ।' ওমর (রাঃ) বললেন, 'একথা না বললেই ভালো হত। আমার ভয় হয় এর ফলে মানুষ অলস হয়ে পড়বে। তাই তাদের কাজ করতে দিন।' তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'তবে তাই হোক।'—মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১০৬. একদিন মুয়াজ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গে একই উটের পিঠে বসেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'হে মুয়াজ!' মুয়াজ বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্! আমি আপনার সেবার জন্য উপস্থিত আছি এবং আপনার আদেশের অপেক্ষা করছি।' এইভাবে তিনবার তিনি মুয়াজকে ডাকলেন এবং মুয়াজও তিনবার একইভাবে তাঁর উত্তর দিলেন। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যথার্থ সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহম্মদ (দঃ) তাঁর রসূল—আল্লাহ্ তার জন্য দোজখ হারাম করবেন।' মুয়াজ বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ, আমি কি মানুষকে এই সুসংবাদ জানাব যাতে তারা খুশী হতে পারে?' তিনি বললেন, 'না; তাহলে তারা এর ওপরে নির্ভর করে বসে থাকবে এবং অলস হয়ে যাবে।' তারপর মুয়াজ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে হাদীস গোপন রাখার পাপের ভয়ে তা প্রকাশ করেন।—শায়খান। মুস। বুখারী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

১০৭. মুয়াজ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন আমি নবী (সঃ)-এর পিছনে এক গাধার পিঠে চ'ড়ে আসছিলাম। আমাদের উভয়ের মধ্যে কেবল একটা যানবাহনের ব্যবধান ছিল। হজরত (দঃ) বললেন, 'হে মুয়াজ। বান্দার ওপর আল্লাহ্র অধিকার এবং আল্লাহ্র ওপর বান্দার অধিকার সম্বন্ধে তুমি জান?' আমি বললাম, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন।' তিনি বললেন, 'বান্দার ওপর আল্লাহ্র দাবী এই যে, যদি সে কাউকে তাঁর শরীক করে তবে তিনি তাকে কোন শাস্তি দেবেন না।' আমি বললাম, 'হে রসূলুল্লাহ্! আমি কি মানুষকে এ সু-সংবাদ দেব না?' তিনি উত্তর দিলেন, 'না, দিও না; তাহলে তারা অলস হবে।'—শায়খান। বুখারী। মুসলিম।

১০৮. ওমর ইব্নে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় ধপধপে সাদা পোশাক পরা এবং নিবিড় কালো কেশবিশিষ্ট একজন লোক সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁর (দেহের) ওপর ভ্রমণের কোন চিহ্ন দেখা গেল না এবং (তিনি) আমাদের কারো পরিচিতও ছিলেন না। তিনি নবী (সঃ)-এর পাশে বসলেন। তারপর তাঁর দুই হাঁটু রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দুই হাঁটুর সাথে যুক্ত করলেন এবং তাঁর উভয় হাতের তালু তাঁর উরুদেশের ওপর রাখলেন এবং বললেন, 'হে মুহম্মদ! ইসলাম কি আমাকে বলুন।' তিনি বললেন, 'ইসলাম হল—আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহম্মদ (দঃ) তাঁর রসূল'—এতে সাক্ষ্যদান করা এবং নামাজ আদায় করা, জাকাত দান করা, রমজানের রোজা পালন করা এবং পাথেয় থাকলে হজ্ পালন করা।' তিনি বললেন, 'আপনি

সত্য বলেছেন।' আমরা তাঁর প্রশ্নে এবং এই সত্য-ঘোষণায় আশ্চর্য বোধ করলাম। তারপর তিনি বললেন, 'আমাকে ঈমান সম্বন্ধে বলুন।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশ্তগণ, গ্রন্থসমূহ, রসূলগণ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং ভাল ও মন্দের ওপর তাঁর ক্ষমতায় আস্থা স্থাপনই হল ঈমান।' তিনি বললেন, 'আপনি সত্য বলেছেন।' তারপর তিনি বললেন, 'আমাকে সৎকাজ সম্বন্ধে বলুন।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র উপাসনা করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ এবং যদি তুমি তা না পার তবে (মনে করবে) নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন।' পুনরায় সেই ব্যক্তি বললেন, আমাকে কেয়ামত সম্বন্ধে বলুন।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে প্রশ্নকর্তা অপেক্ষা সে এবিষয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী নয়।' তিনি বললেন, 'তবে আমাকে তার পূর্বাভাস সম্বন্ধে বলুন।' হজরত (দঃ) বললেন, 'তা হল এই যে ক্রীতদাসী তার কর্ত্রীকে জন্মদান করবে এবং তুমি নগ্নপদ উলঙ্গ দরিদ্র মেষপালকগণকে (বাদশাহের পরিবর্তে) গর্বভরে প্রাসাদ-মধ্যে বসবাস করতে দেখবে।' এরপর তিনি চলে গেলে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে বললেন, 'ওমর, প্রশ্নকর্তাকে কি চিনতে পারলে ?' আমি বললাম, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন।' তিনি বললেন, 'প্রশ্নকর্তা জিব্রাইল, তোমাদের ধর্মশিক্ষা দান করার জন্য তোমাদের কাছে এসেছিলেন।' [জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত পৃথিবীর প্রথম শিক্ষক এবং শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি এখানে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন—যা একালের শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বা Educational Psychology-র প্রধান অবলম্বন।]—শারখান। বুখারী।

অহী

'(হে মুহম্মদ!) আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ (অহী) প্রেরণ করেছি, যেমন আমি নূহ এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছিলাম।'

'আমি আপনাকে কোরআন এমন ভাবে পড়িয়ে দেব যে আপনি আর তা ভুলবেন না।' ৮৭ (৬)

'নিশ্চয় এই কোরআন আপনার অন্তরের মধ্যে মুদ্রিত করে' দেওয়া এবং একে আপনার মুখে পড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমারই।' ২৯ (১৭)

—আল্ কোরআন।

১০৯. ঘুমের মধ্যে সত্যস্বপ্নের আকারে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে অহী (অর্থাৎ প্রত্যাদেশ) আসার সূত্রপাত হয়। কিছু-দিন এই ভাবে চলার পর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আপন অন্তরের মধ্যে লোকালয় থেকে দূরে নির্জন স্থানে অবস্থান করার প্রেরণা অনুভব করেন। তিনি (মক্কার ৩ মাইল দূরবর্তী) হেরাপর্বতের গুহায় গিয়ে নির্জন বাস করতে লাগলেন। তিনি প্রতিদিন পানাহারের জন্য বাড়ীতে না এসে কিছু (পানীয় ও আহার্য)-দ্রব্য নিয়ে সেখানে যেতেন এবং একাদিক্রমে বহু রাত্রি উপাসনা ও ধ্যানে অতিবাহিত করতেন। অনেক দিন পরে পরে তিনি একবার বিবি খাদিজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন এবং ঐভাবে আবার একাদিক্রমে বহু রাত্রি উপাসনা ও ধ্যানে অতিবাহিত করার উদ্দেশ্যে কিছু

পানাহারের দ্রব্যাদি নিয়ে চলে' যেতেন। এমনি করে' হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় আল্লাহ্‌তা'আলার ধ্যান ও উপাসনায় মগ্ন থাকা কালে সহসা একদিন প্রকৃত সত্য তাঁর সামনে এসে উদ্ভাসিত হল—আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জিব্রাঈল (আঃ) অহী অর্থাৎ (আল্লাহ্‌র বাণী বা প্রত্যাদেশ) বহন করে' প্রকাশ্যভাবে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সামনে এসে দেখা দিলেন এবং বললেন, 'আপনি পড়ুন (এক্‌রা)।' রসূলুল্লাহ। (সঃ) বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন ঃ তখন সেই ফেরেশ্‌তা আমাকে শক্ত করে' ধরে' আলিঙ্গন করলেন এবং আলিঙ্গনকালে এমন কঠিনভাবে চাপ দিলেন যে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবার মত যন্ত্রণা হল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় বার বললেন, 'আপনি পড়ুন।' আমি প্রথম বারের মতই বললাম, 'আমি তো কখনো পড়ার অভ্যাস করিনি।' রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেন, 'তখন ঐ ফেরেশ্‌তো দ্বিতীয় বার আমাকে সজোরে ধরে' এমন শক্ত করে' আলিঙ্গন করলেন যে আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে বলে' মনে হল। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় বার বললেন, 'আপনি পড়ুন।' আমি (এবারেও) বললাম, 'আমি তো কোনদিন পড়তে শিখিনি।' তিনি তৃতীয় বার আমাকে আলিঙ্গন করে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র এই বাণী পাঠ করলেন, 'আপনি পড়ুন, আপনার সেই মহিমময় প্রভুর নামে যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন—সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। আপনি পড়ুন, আপনার প্রভু যে অত্যন্ত দানশীল, যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দান করেছেন—শিক্ষাদান করেছেন মানুষকে যা সে জানত না।' (৯৬ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫,) এই পাঁচটি বাক্য (মুখস্থ ও অন্তরস্থ করে') নিয়ে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ঘরে ফিরলেন। যা হয়েছে তাতে তাঁর অন্তর তখনো থর থর করে' কাঁপছিল। তাই তিনি ঘরে ফিরে খাদিজার কাছে গেলেন এবং বললেন, 'আমার গায়ে কম্বল দাও, আমার গায়ে কম্বল দাও।' খাদিজা কম্বল এনে (তাঁর) গায়ে দিয়ে দিলেন। তখন হজরত (দঃ) খাদিজাকে সকল কথা খুলে বললেন। তিনি বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে (যে-দায়িত্ব-ভার আমার ওপর অর্পণ করা হবে মনে হয়) আমার প্রাণ তা কুলোবে কি' না, আমার শরীরে তা সহ্য হবে কি না! নাকি জীবন বের হয়ে যাবে, স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে?' খাদিজা অত্যন্ত তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্না মহিলা ছিলেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে তিনি প্রায় বাল্যকাল থেকেই জানতেন এবং দীর্ঘ পনের বৎসর যাবৎ অতি অন্তরঙ্গ সঙ্গিনীরূপেই (তাঁর সঙ্গে) বসবাস করছেন। (তিনি তাঁকে) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'খোদার কসম (শপথ), কিছুতেই আল্লাহ্‌ আপনাকে অপদস্থ করবেন না। কেননা মানবতার চরমোৎকর্ষের মূলে সাতটি স্বভাবই আপনার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান আছে। যেমন—১) আপনি আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন, আত্মীয়দের প্রতি কর্তব্য পালন দ্বারা আত্মীয়তা রক্ষা করে চলেন; আত্মীয়দের প্রতি কখনো দুর্ব্যবহার করেন না এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদন করেন না। ২) আপনি সর্বদা সত্য কথা বলেন, কখনো মিথ্যা বলেন না। ৩) আপনি চিরকাল বিশ্বাসী আমানতদার—কখনো আমানত অর্থাৎ গচ্ছিত দ্রব্যের ক্ষতি সাধন করেননি। ৪) আপনি অনাথ অক্ষম এতীম বিধবা অন্ধ খঞ্জদের বোঝা বহন করেন অর্থাৎ যাদের উপার্জনের ক্ষমতা নেই তাদের খাওয়া, পরা ও থাকার বন্দোবস্ত করেন। ৫) আপনি বেকার সমস্যার সমাধান করে' থাকেন অর্থাৎ যাদের উপার্জন করার ক্ষমতা আছে কিন্তু কাজ পায় না বলে' উপার্জনে করতে পারে না আপনি তাদের কাজ ও উপার্জনের ব্যবস্থা করে' দিয়ে সাহায্য করে' থাকেন। ৬) আপনি অতিথি-

অভ্যাগতদের সেবা করে' থ কেন। (৭) আপনি যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিনে দুঃস্থ জনগণের সাহায্য, করার জন্য জীবন উৎসর্গ করে রেখেছেন। মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সূচক এই গুণগুলো যার মধ্যে আছে সে সফলকাম না হয়ে পারে না—আল্লাহ্ তা'লা কখনো তাকে নিষ্ফল (ব্যর্থ) করেন না।' খাদিজা (রাঃ) এই ভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বংশের বৃদ্ধ মুরব্বি চাচা অরাকা-ইবনে-নওফেলের কাছে গেলেন। অরাকা সত্যান্বেষী সুজ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, অতি বৃদ্ধ হওয়ার দরুন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অজ্ঞানতার যুগেই তিনি সত্যধর্মের সন্ধানে সিরিয়ায় গিয়ে একজন প্রকৃত খৃষ্টান পণ্ডিতের কাছে সত্যকার খৃীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এবরানী (হিব্রু) ভাষায় লিখতেন এবং এবরানী ভাষা থেকে ইঞ্জিল (অর্থাৎ বাইবেল) গ্রন্থের আরবী ভাষায় অনুবাদও করতেন। খাদিজা (রাঃ) অরাকাকে বললেন, 'চাচা! আপনাদের ছেলে কি বলে একটু শুনুন!' খাদিজা ঘটনার কিছু বর্ণনা দিলেন। তখন অরাকা হজরত (দঃ)-কে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন, আপনি কি দেখেন?' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) যা দেখেছেন সব অরাকাকে খুলে বললেন। অরকা বললেন, 'এ তো সেই মঙ্গল যা আল্লাহ্‌র দূত জিব্রাঈল ফেরেশ্‌তা—যাকে আল্লাহ্ মূসা (আঃ)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হায়রে কপাল যদি সেদিন আমি যুবক থাকতাম যেদিন আপনি আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করবেন; হায়রে কপাল, যদি সেদিন আমি জীবিত থাকতাম যেদিন আপনার দেশবাসী আপনাকে দেশান্তরিত করে ছাড়বে।' শেষের বাক্যটি শুনে হজরত (দঃ) স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'কি! আমার দেশবাসী আমাকে দেশান্তরিত করবে?' অরাকা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, যে-সত্যধর্ম আপনি প্রচার করতে এসেছেন সেই রকম সত্যধর্মের বাণী দুনিয়াতে যে কেউ প্রচার করতে এসেছেন দুনিয়ার মানুষ তাঁর সাথে শত্রুতা না করে' ছাড়েনি। যদি আমি সেই দিন পাই (অর্থাৎ জীবিত থাকি) তাহলে আমি প্রাণপণে আপনার সাহায্য করব। এর পর অল্পদিনের মধ্যেই অরাকা পরলোক গমন করলেন। হেরাগুহার এই ঘটনার পর কিছুদিন জন্য অহী আসা বন্ধ থাকে।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১১০. হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ) রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে রসুলুল্লাহ্, আপনার কাছে কিভাবে অহী (অর্থাৎ প্রত্যাদেশ বা আকাশবাণী) আসে?' তিনি বললেন, 'কোন কোন সময় এমন হয় যে আমি একটা ঘণ্টার শব্দের মত টুন্ টুন্ শব্দ শুনতে পাই। ঐ শব্দ বন্ধ হতে না হতে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) যা বলা হয় তা সবই আমি অন্তরে মুদ্রিত করি এবং মুখস্থ করে' নিই। এই শ্রেণীর অহী আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হয়। আর কোন কোন সময় স্বয়ং ফেরেশ্‌তা (জিব্রাঈল আঃ) আমার কাছে আসেন এবং আল্লাহ্‌র বাণী আমাকে শোনান; আমি তা মুখস্থ করি এবং অন্তরে মুদ্রিত করি।' প্রথম প্রকারের অহী সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি অত্যন্ত শীতেও অহী অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে নবী (সঃ)-কে ঘেমে উঠতে দেখেছি।' —বুখারী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১১১. প্রথম প্রথম যখন অহী অবতীর্ণ হত তখন রসুলুল্লাহ্ (সঃ) অত্যন্ত কষ্ট করতেন। এমন কি জিব্রাঈল (আঃ) যখন অহী পড়ে' শোনাতেন হজরত (দঃ) তখন সঙ্গে সঙ্গেই জিভ এবং ঠোঁট নেড়ে তা পড়তে আরম্ভ করতেন, যাতে অহীর একটা অক্ষরও বাদ না পড়ে বা কমবেশী না হয়। এতে রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যে কষ্ট হত তা লাঘব করার জন্যে কোরআনের এই চারটি বাণী অবতীর্ণ হল—'(হে প্রিয়

রসূল !) আপনি অহীকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে জিভ ও ঠোঁট নাড়বেন না, জিব্রাঈল যখন বলে, তখন আপনি মনোযোগ সহকারে কান পেতে শুনবেন। সম্পূর্ণ মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করিয়ে দেওয়া এবং পুনরায় আপনার মুখে অবিকলরূপে তা পড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার—আমিই তার জামিন। অতএব আমি যখন (জিব্রাঈলের মুখে আমার অহী) পাঠ করব তখন আপনি শুধু মনোযোগ সহকারে তা অনুধাবন করবেন ও শুনবেন। পুনরায় বলছি, ঐ অহী পূর্ণরূপে আপনার মুখে পুনরাবৃত্তি করান এবং ও নির্ভুলভাবে পড়ানোর দায়িত্ব আমার।' (২৮ পারা, সূরা কেয়ামাহ্)। এই বাণী অবতীর্ণ হবার পর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সঙ্গে-সঙ্গে-পড়া বন্ধ করে দিলেন। জিব্রাইল (আঃ) যখন যা পড়তেন একাগ্রচিত্তে তিনি তা শুনতেন, তাতেই সবকিছু তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। আর জিব্রাঈল (আঃ) চলে' যাবার পর অবিকল রূপে তিনি তা পড়তে পারতেন, একটা অক্ষরও এদিক ওদিক হত না।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

১১২. উসামা (রাঃ)-র কাছ থেকে আবু ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ একদিন হজরত নবী (সঃ)-এর কাছে মোমেনগণের মাতা উম্মে সালেমা (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় জিব্রাঈল ফেরেশ্‌তা এলেন এবং হজরত (সঃ)-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। হজরত (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই লোকটা কে তাকি বলতে পার ?' উম্মে সালেমা (রাঃ) বললেন, 'এ লোকটা হল দেহ্‌ইয়া কালবী নামক সাহাবী।' উম্মে সালেমা (রাঃ) বলেন, 'খোদার কসম হজরত (সঃ) ঐ স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি ঐ আগন্তুককে দেহ্‌ইয়া-কালবী বলে' বিশ্বাস করছিলাম। এমন সময় নবী (সঃ)-এর ভাষণ শুনতে পেলাম, তিনি জিব্রাঈল (আঃ)-এর আগমন এবং তার সংবাদ বর্ণনা করেছেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আগন্তুক ব্যক্তি জিব্রাঈল ফেরেশ্‌তা ছিলেন।' [মাঝে মাঝে মানুষের মূর্তি ধরে' জিব্রাঈল (আঃ) নবী (সঃ)কে আল্লাহ্‌র আদেশ শুনিয়ে যেতেন।] —বুখারী।

১১৩. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর প্রতি সর্বাধিক প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছিলেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

কোরআন শরীফ

['একরা' হ'ল কোরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ বাণী—যার অর্থ 'পাঠ কর'। এই 'একরা' বা 'পাঠ কর' থেকেই 'কোরআন শরীফ'—অর্থ, 'মহাপাঠ্য গ্রন্থ।' এই মহাগ্রন্থের নাম স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক প্রদত্ত। নিরক্ষর মহানবী (সঃ)-এর ওপর সর্বপ্রথম পাঠকরার আদেশ এবং সেই সঙ্গে এই মহাপাঠ্য গ্রন্থ অবতীর্ণ করার ঘটনা—বিশ্বসভ্যতা এবং বিশ্বের জ্ঞান-সাধনার ইতিহাসে চির অবিস্মরণীয়। কারণ পাঠ করাই হল নিরক্ষরতাদূরীকরণ তথা জ্ঞান-আহরণের প্রধান উপায়। ৬১০ খৃস্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে ৬৩২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ২৩ বছর ধরে জীবনের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থার বিচিত্র আদেশ-নিষেধ ভরা করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লার বাণী এই মহান দিশারী-গ্রন্থ কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়।]

'পরম করুণাময় আল্লাহ্, তিনিই কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।' ৫৫(১,২)

'আমি এ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে।' ৯৭(১)

'আমি তোমার (অর্থাৎ মুহম্মদ দঃ-এর আরবী ভাষায়) ভাষায় কোরআনকে সহজ করে, দিয়েছি যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে।' ৪৪(৫৮)

'এই ভাবেই আমি তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং যাদের আমি গ্রন্থ দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে এবং এদেরও কেউ কেউ এ বিশ্বাস করে। কেবল অবিশ্বাসীরা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। তুমি তো এর পূর্বে কোন গ্রন্থ পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন গ্রন্থ লেখনি যে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করবে। বস্তুতঃ যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এ স্পষ্ট নিদর্শন।' ২৯(৪৭,৪৮)

'যদি কোরআন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো রচনা হত তবে তারা এতে পরস্পর-বিরোধী বহু বিষয় দেখতে পেত।' ৪(৮২)

'এ সেই মহাগ্রন্থ, এতে কোন সন্দেহ নেই—সাবধানীদের জন্য এ গ্রন্থ পথ-নির্দেশক।' ২(৩)

'এ কোরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত-বিশ্বাসী-সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও অনুগ্রহ।' ৪৫(২০)

'কোরআন সৎপথের দিশারী, যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি।' ৪৫(১১)

'যারা আমার (কোরআনের) বাক্যসমূহকে স্বীকার করবে না, অনতিকাল মধ্যে আমি তাদের নরকের আগুনে নিক্ষেপ করব—(সেখানে) যতবার তাদের চর্ম দগ্ধ হবে ততবার আমি তাদের নতুন চর্ম দান করব। এ রকম এই জন্য করা হবে যে তারা যেন শাস্তির দুর্বিষহতা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে।' (৫ পারা, ৫ রুকু)

'নিশ্চয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এ সংরক্ষণ করব।' ১৫(৯)

—আল্-কোরআন।

১১৪. আমি তোমাদের জন্য দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ও শক্তভাবে ধরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না ; ওদের একটা হল আল্লাহ্র গ্রন্থ (কোরআন) অপরটা তাঁর রসুলের হাদীস।—মিশ্। মুস। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

১১৫. কোর আন শরীফ পাঁচ ভাগে বিভক্ত—বৈধ বিষয়, অবৈধ বিষয়, স্পষ্ট ও প্রকাশ্য অনুশাসন, রূপক বর্ণনা এবং দৃষ্টান্ত সমূহ। অতএব যা বৈধ (হালাল) বলে ঘোষিত হয়েছে তাকে বৈধ এবং যা অবৈধ [হারাম] বলে ঘোষিত হয়েছে তাকে অবৈধ বলে গণ্য কর ; অনুশাসনগুলো পালন কর; রূপক বর্ণনাগুলোতে বিশ্বাসকর এবং দৃষ্টান্তসমূহ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর।—মিশ।

১১৬. কোরআন শরীফে তোমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সংবাদ রয়েছে। ওতে তোমাদের পরস্পরের প্রতি আদেশ রয়েছে। ওই হল চূড়ান্ত মীমাংসা, ওতে কোন বাহুল্য বাক্য নেই। যে ব্যক্তি অহঙ্কার বশতঃ ও গ্রহণ করবে না আল্লাহ্

তাকে ধ্বংস করবেন। যে ব্যক্তি ও (কোরআন) ছাড়া অন্য পরিচালনা অনুসন্ধান করে আল্লাহ্ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। ও হল আল্লাহ্র শক্ত রশি, জ্ঞানগর্ভ উপদেশ এবং সঠিক সরল পথ। ওর দ্বারা বাসনাগুলো বিপথে চলে না, রসনা বঞ্চিত হয় না (অর্থাৎ বাসনা সংযত হয় ও রসনা পরিতৃপ্ত হয়)। জ্ঞানিগণ বার বার পড়েও পরিতৃপ্ত হয় না। এ বহু বিরোধিতা থেকে সৃষ্ট হয়নি এবং এর অলৌকিকতার (মোজেজার) শেষ হয় না। এ এমন এক গ্রন্থ যে জ্বীনগণ (আগুনে দ্বারা সৃষ্ট একটা জাতি) পর্যন্ত এ ফেলে চলে যেতে পারেনি, কারণ যখনই তারা এ শুনেছিল তখনই বলেছিল, 'আমরা এক আশ্চর্য কোরআন শুনেছি, ও সত্য-পথের দিকে আহ্বান করে, সুতরাং আমরা ওতে বিশ্বাস করেছি।' যে ব্যক্তি ওর নির্দেশ মত কিছু বলে সে সত্য কথা বলে এবং যে সেই মত কাজ করে সে পুরস্কার পায় এবং যে ব্যক্তি সেই মত কোন আদেশ দেয় সে ন্যায়-বিচার করে এবং যে ওর দিকে আহ্বান করে সে 'সিরাতুল মুসতাকিমের' (অর্থাৎ সরল সঠিক পথের) দিকে পরিচালিত হয়।—তির।

১১৭. জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আবুবকর (রাঃ)-র খেলাফতকালে নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার মোসায়লেমা-কাজ্জাবের দল ইয়েমেনস্থিত ইয়ামামার অধিবাসীদের সঙ্গে মুসলমানদের জেহাদ হয়েছিল। সেই জেহাদ (বা ধর্মযুদ্ধ) সমাপ্ত হলে খলীফা আবুবকর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম যে ওমর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত আছেন। আবুবকর (রাঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওমর (রাঃ) এসে আমাকে বলেছেন, 'ইয়ামামার যুদ্ধে বহুসংখ্যক কোরআন-রক্ষক বা হাফেজ শহীদ হয়ে গিয়েছেন। আমার ভয় হয় অন্যান্য জেহাদেও এই হারে কোরআনের হাফেজ (অর্থাৎ কণ্ঠস্থকারী) শহীদ হলে কোরআনের অনেক অংশই আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে। অতএব আমার (অর্থাৎ ওমরের) পরামর্শ এই যে আপনি খলীফা হিসেবে কোরআন শরীফকে লিখিত আকারে একত্রিত করার নির্দেশ দিন।' আমি (আবুবকর) ওমর (রাঃ)কে বলেছি, 'হজরত রসুলুল্লাহ্ (সঃ) যে কাজ করে যাননি সে কাজ কিভাবে করা যেতে পারে ?' উত্তরে ওমর (রাঃ) বললেন, 'খোদার কসম, এ ব্যবস্থা অবশ্যই উত্তম হবে।' এইভাবে ওমর (রাঃ) আমাকে বারংবার বলতে লাগলেন। তাঁর দৃঢ়তা দেখে আমিও (আবুবকর) চিন্তা করলাম। আল্লাহ্ আমার হৃদয়-দুয়ার খুলে দিলেন। আমিও ওমরের মত ঐ ব্যবস্থার উত্তমতা উপলব্ধি করলাম। জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) আমাকে বললেন, 'আপনি বুদ্ধিমান যুবক, আপনার প্রতি কারো কোন খারাপ ধারণা নেই এবং আপনি রসুলুল্লাহ্ (সঃ) কর্তৃক অহী লিপিবদ্ধ করার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অতএব আপনি পবিত্র কোরআনের প্রতিটি আয়াত (বাক্য) খুঁজে বের করে, একত্রিত করুন।' জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, পবিত্র কোরআন একত্রিত করার আদেশ আমার কাছে যত কঠিন মনে হয়েছিল, তাঁরা যদি একটা পর্বতকে স্থানান্তরিত করার আদেশ আমাকে দিতেন আমার কাছে তা তত কঠিন মনে হত না। আমি (জায়েদ বিন সাবেত) বললাম, হজরত রসুলুল্লাহ্ (সঃ) যে কাজ করেননি সে কাজ আপনারা কি ভাবে করতে পারেন ? উত্তরে আবুবকর (রাঃ) বার বার বললেন, 'এ ব্যবস্থা অবশ্যই উত্তম।' আবুবকর (রাঃ) এই কথাটি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলছিলেন। এমনকি আল্লাহ্তা'লা আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-র মত ঐ ব্যবস্থার উত্তমতা উপলব্ধি করার জন্য আমার অন্তর-উন্মুক্ত করলেন। সেইমত আমি কোরআনের

বাক্যসমূহ সন্ধান করে, একত্রিত করতে লাগলাম—খেজুর ডালের বাকলে, প্রস্তর খণ্ডে (তথা চর্মখণ্ডে, অস্থিখণ্ডে, কাষ্ঠখণ্ডে) লেখা থেকে সংগ্রহ করতে লাগলাম। (এবং হাফেজদের মুখে মুখে প্রচলিত পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে লাগলাম)। এইভাবে সম্পূর্ণ কোরআন সংগ্রহণ ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম হলাম। অবশ্য সূরা তওবার শেষাংশ 'লাকাদ যা-আ-কুম রাসূলুন' থেকে 'রাব্বুল আ'রশিল আজিম' পর্যন্ত (লিখিত আকারে) পেলাম সাহাবী খোজায়মা আনসারী (রাঃ)-র কাছে; অন্য কারো কাছে এটা (মৌখিক আকারে পেলেও, লিখিত আকারে) পেলাম না। এই ভাবে পবিত্র কোরআনের সমস্ত আয়াত (বাক্য) লিখিত হল এবং ঐ লিখিত পাতাগুলো তৎকালীন খলীফা আবুবকর (রাঃ)-র তত্ত্বাবধানে রাখা গেল। তাঁর মৃত্যুর পর (ওগুলো) তাঁর কন্যা মোমেন-জননী হাফসা (রাঃ)-র হেফাজতে গেল। [এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কালে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাফেজগণ কর্তৃক কণ্ঠস্থ আকারে এবং অহী-লেখকগণ কর্তৃক খেজুরের বাকল, পাথর, চামড়া, কাঠ, হাড় প্রভৃতির ওপরে লিখিত আকারে বিচ্ছিন্নভাবে তা সংরক্ষিত হয়। হজরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে হজরত ওমর (রাঃ)-র পরামর্শক্রমে (ইয়ামামার যুদ্ধে কোরআন-কণ্ঠস্থকারী হাফেজগণ নিহত হলে) তরুণ সাহাবী জায়েদ ইবনে সাবেতকে দিয়ে কোরআনের বাণীসমূহ গ্রন্থবন্ধ করান। জায়েদ (রাঃ) নবী (সঃ)-এর কালের লিখিত সূরাসমূহের সঙ্গে হাফেজগণের কণ্ঠে রক্ষিত পাঠ মিলিয়ে ঐ সংকলন-কর্ম অত্যন্ত সাবধানে সম্পন্ন করেন।]—বুখারী।

১১৮. বিশিষ্ট সাহাবী হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) খলীফা ওসমান (রাঃ)-র কাছে উপস্থিত হলেন। খলীফা ওসমান তখন ইরাক ও সিরিয়া বাসীদের সমন্বয়ে গঠিত একটা বাহিনী আরমেনিয়া ও আজারবৈজান অধিকার করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন—সাহাবী হোজায়ফা (রাঃ)-ও সেই বাহিনীতে ছিলেন (বাহিনীর অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের সৈনিকেরা ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণে ইসলামের সেই প্রথম যুগের বিধান অনুসারে কোরআন শরীফ আবৃত্তি করত; ফলে কোরআন শরীফের বিশুদ্ধ পাঠ যে কোনটি সে বিষয়ে বাহিনীমধ্যে প্রবল বিরোধের সৃষ্টি হল)। এই বিভিন্নতা নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ-বিরোধের দরুন হোজায়ফা (রাঃ) অতিশয় বিচলিত হলেন। মদীনায় এসে প্রথমেই খলীফা ওসমান (রাঃ)-র কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আমিরুল মো'মেনিন! মুসলমান জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন—ইহুদী-নাছারাদের মত তারা যেন তাদের ঐশীগ্রন্থ সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত না হয়।' তাঁর এই প্রস্তাবে খলীফা ওসমান (রাঃ) তৎক্ষণাৎ (ওমর-কন্যা ও নবী-পত্নী) হাফসা (রাঃ)-র কাছে বলে পাঠালেন যে প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ) কর্তৃক সুরক্ষিত ও একত্র গ্রথিত কোরআন শরীফের পাতাগুলো আমাকে দেবেন। আমরা ওর কিছু অনুলিপি তৈরী করে নিয়ে পুনরায় আপনার কাছে ফেরত পাঠাব।' সেই কথামত হাফসা (রাঃ) খলীফা ওসমান (রাঃ)-র কাছে তা পাঠিয়ে দিলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) ঐ কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একটা পরিষদ (Board) গঠন করলেন। এই পরিষদের মধ্যে জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ), আব্দুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের (রাঃ), সাঈদ ইবনুল আ'স (রাঃ) এবং আব্দুর রহমান ইবনুল হারেস (রাঃ) ছিলেন। তাঁরা প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ)-র প্রচেষ্টায় সংগৃহীত পবিত্র কোরআনের কিছু নকল বা অনুলিপি তৈরীর কাজ সম্পন্ন করলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) তাঁদের নির্দেশ দিলেন, 'একই ভাষার আঞ্চলিক বিভিন্নতাসূত্রে কোরআনের কোন শব্দ সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ

দেখা দিলে আপনারা ও (শব্দটি) কোরেশদের ভাষার অনুকরণে লিখবেন। কারণ পবিত্র কোরআন মূলে অবতীর্ণ হয়েছিল কোরেশদের ভাষাতেই।' (পরে আরবীর অন্যান্য আঞ্চলিক শাখা-ভাষায়ও তা পাঠ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল মাত্র।) উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক অনুলিপি বা নকল তৈরীর কাজ সুসম্পন্ন হলে ওসমান (রাঃ) আবুবকর (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত মূল লিপিখানি হাফসা (রাঃ)-র কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এবং এক একখানা অনুলিপি এক এক অঞ্চলে পাঠালেন। সেই সঙ্গে এই নির্দেশও দিলেন যে বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখা-ভাষায় লিখিত কোরআন যার কাছে যা আছে তা (অপব্যবহার ও অমর্যাদার হাত থেকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে) আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হোক। জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এবার সূরা আহ্জাবের একটা আয়াত কারো কাছে (লিখিত আকারে) পাচ্ছিলাম না —'রেজালুন্ সাদাকু মা আহাদুল্লোহা আ'লায়হে।' এ আয়াত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মুখে আমি আবৃত্তি করতে শুনেছি— একথা আমার সুস্পষ্টরূপে মনে ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে কারো কাছে (লিখিত আকারে) পাচ্ছিলাম না। অবশেষে এই আয়াতটিও খোজায়মা ইব্নে সাবেত আন্সারী (রাঃ)-র কাছে (লিখিত আকারে) পাওয়া গেল। [মূলে যে কোরেশদের মধ্যে প্রচলিত আরবী ভাষায় কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছিল সেই কোরেশ ভাষাতেই সমগ্র কোরআন শরীফ একত্রিত করে' খলীফা ওসমান (রাঃ) তা সারা সাম্রাজ্যে প্রচারের সুব্যবস্থা করেন। সেইসঙ্গে আরবের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় কোরআন পাঠের পূর্ববর্তী রীতিকে চিরকালের মত বাতিল করে' দিয়ে এবং হজরত আবুবকর (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত কোরআনকে সামনে রেখে সূরা ও অধ্যায়সমূহকে ধারাবাহিক ভাবে সুসজ্জিত করে' তিনি কোরআন একত্রিকরণের কাজকে সর্বদিক দিয়ে সুসংহত করেন। তাই সর্বসাধারণের কাছে তিনি, 'জামেউল কোরআন' অর্থাৎ 'কোরআন একত্রিকরণকারী' বলে খ্যাতিলাভ করেন।]—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

১১৯. জিব্রাঈল (আঃ) রমজান মাসে প্রতিদিন এসে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে কোরআন 'দওর' করাতেন। ['দওর' অর্থ 'পরস্পরকে পাঠ করে' শোনান। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে' সমগ্র কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়। প্রতি বছর কোরআন শরীফের যতটুকু অংশ অবতীর্ণ হত সেই বছর রমজান মাসে হজরত জিব্রাঈল (আঃ) তা নবী (সঃ)-কে পাঠ করে শোনাতেন এবং নবী (সঃ)-ও তা জিব্রাঈল (আঃ)-কে শোনাতেন। শেষ দিকে সমগ্র কোরআন শরীফ এইভাবে দুবার 'দওর' করান হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে পরম করুণাময় আল্লাহ্ (তাঁর নবীকে) 'কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।' ৫৫ ঃ ১, ২]—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইব্নে আব্বাস (রাঃ)।

১২০. কোরআন শরীফের একটা আয়াত (বাক্য) পাঠ করা একশ রাকাত নফল নামাজ পড়া অপেক্ষা উত্তম। অনুরূপভাবে কোরআনের একটা অধ্যায় শিক্ষা করার মর্যাদা হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়া অপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃ।—তরগীব।

১২১. কোরআন পাঠ কর, কেয়ামতের দিন তা তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে। —মুসলিম।

১২২. কোরআন শরীফ শিক্ষা কর ও পাঠ কর। কারণ যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ শিক্ষা করে, নামাজে তা আবৃত্তি করে এবং সেই অনুসারে চলে তার তুলনা কস্তুরীর থলির মত—সর্বত্র তার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করেছে কিন্তু ঘুমিয়ে থাকে (নামাজে পড়ে না), শুধুও তার মনের মধ্যে থাকে—

সে সেই থলির মত যাতে কস্তুরী (বা মৃগনাভি) বন্ধ করে রাখা হয়েছে।—তির। নাসায়ী। ই. মাজা।

১২৩. কোরআন শরীফ পাঠ কর। কারণ পরলোকে ওর পাঠকের জন্য ও সাহায্যকারী হবে।—মুস।

১২৩. (ক) না দেখে কোরআন শরীফ পাঠ করলে এক হাজার পুরস্কার, আর দেখে পাঠ করলে তার সঙ্গে আরো দু হাজার পুরস্কার।—বয়হাকী।

১২৪. কোরআন শরীফ বিশুদ্ধভাবে পাঠ কর এবং ওর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-গুলো ফরজ ও ওয়াজেবাত।—বয়হাকী।

১২৫. যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়ে ও মনে রাখে এবং ওর হালালকে (বৈধ) হালাল এবং হারামকে হারাম বলে' মনে করে, খোদা তাকে বেহেশতে দাখিল করবেন এবং তার পরিজনের দশটি লোকের শাফায়াত কবুল করবেন, যদিও তাদের প্রত্যেকের জন্য দোজখ সুনিশ্চিত ছিল।—তির। মিশ।

১২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র গ্রন্থ(কোরআন) শিক্ষা করে, আল্লাহ্‌তালা পৃথিবীতে তাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন এবং পরলোকে হিসাব-নিকাশের দুর্দশা থেকে উদ্ধার করবেন।—মিশ।

১২৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বাণী (কোরআন) অনুসরণ করে, সে ইহলোকে পথভ্রষ্ট হয়না এবং পরলোকে দুঃখবোধ করে না। তারপর তিনি পাঠ করলেন, 'যে আমার হেদায়েত অনুসারে চলে, সে পথভ্রষ্ট হয় না ও দুঃখবোধ করে না।'—মিশ।

১২৮. যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে এবং ওতে যা আছে তা পালন করে তার মাতাপিতাকে কেয়ামতের দিন একটা মুকুট পরান হবে—যার ঔজ্জ্বল্য পৃথিবীতে তোমাদের ঘরে যে সূর্যের আলো পড়ে তার চেয়ে অধিকতর হবে। অতএব যে ব্যক্তি ওর আদেশ-অনুযায়ী চলে তার সম্বন্ধে তোমরা কি ধারণা কর?—আ. দাউদ। মিশ (আহ্)।

১২৯. যে মোমেন কোরআন শরীফ পাঠ করে তার তুলনা কমলানেবুর মত—ওর গন্ধ উত্তম, স্বাদও উত্তম; যে মোমেন কোরআন পাঠ করেনা তার তুলনা খোরমার মত—ওর গন্ধ নেই, তবে স্বাদ মিষ্ট। যে মুনাফেক (অর্থাৎ কপট) কোরআন শরীফ পড়ে না তার উপমা তিক্ত ফলের মত, ওর কোন গন্ধ নেই এবং স্বাদও তিক্ত; যে মুনাফেক কোরআন পড়ে সে সুগন্ধি ফুলের মত, ওর গন্ধ উত্তম তবে স্বাদ তিক্ত।—শায়। তির।

১৩০. যার হৃদয়ে কোরআন শরীফের কোন অংশ নেই সে পরিত্যক্ত গৃহের মত।—মুস।

১৩১. 'লোহায় যেমন পানি লাগলে মরিচা ধরে আত্মাও তেমনি মরিচা-প্রাপ্ত হয়।' জিজ্ঞাসা করা হল, 'কিসে ও উজ্জ্বল হয়?' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'বেশী করে মৃত্যুর কথা মনে করা এবং মনোযোগ সহকারে কোরআন শরীফ পাঠ করা।'—তির। বয়।

১৩২. তোমরা মধুর কণ্ঠস্বর দ্বারা কোরআন পাঠকে সুন্দর কর, কেননা মধুর কণ্ঠস্বর কোরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।—মিশ্।

১৩৩. কোন নবীর সুর করে' কোরআন শরীফ পাঠকরা অপেক্ষা মধুরতর কোন কিছু আল্লাহ্‌তা'লা শ্রবণ করেন না।—শায়।

১৩৪. যে ব্যক্তি মধুর স্বরে কোরআন শরীফ পাঠ করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।—বুখারী।

১৩৫. যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ থেকে একটা অক্ষর পাঠ করে তার জন্য এক থেকে দশটা পুরস্কার। আমি বলি না যে 'আলিফ লাম মিম' একটা অক্ষর—বরং 'আলিফ' একটা অক্ষর, 'লাম' একটা অক্ষর এবং 'মিম' একটা অক্ষর। —তির।

১৩৬. তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট যে কোরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ওসমান (রাঃ)।

১৩৭. ভোরে মসজিদে আসবে এবং কোরআন শরীফ থেকে দুটি (আয়াত) বাক্য পাঠ করবে বা শিক্ষা দেবে—এটাই কি তোমাদের পক্ষে উৎকৃষ্টতর নয়? এর দুটি বাক্য কি দুটি উষ্ট্রী অপেক্ষা, তিনটি বাক্য তিনটি উষ্ট্রী অপেক্ষা, চারটি বাক্য চারটি উষ্ট্রী অপেক্ষা এবং সমসংখ্যক বাক্য কি সমসংখ্যক উষ্ট্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নয়?—মুস।

১৩৮. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আম্‌র বলেন, একদিন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে রসূলুল্লাহ্, কতদিনে আমি সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ পাঠ (শেষ বা খতম) করব?' তিনি বললেন, 'একমাসে শেষ কর।' আমি বললাম, 'আমি আরো শীঘ্র শেষ করতে পারি।' তিনি বললেন, 'তবে দশদিনে শেষ (খতম) কর।' আমি বললাম, 'আমি তার চেয়েও শীঘ্র শেষ করতে পারি।' তিনি বললেন, 'তবে সাত দিনে শেষ কর এবং তার চেয়ে তাড়াতাড়ি করোনা।'—শায়।

১৩৯. যে ব্যক্তি তিনদিনের চেয়ে কম সময়ে সম্পূর্ণ কোরাআন শরীফ পাঠ শেষ করেছে সে ওর অর্থ বোঝেনি।—তির। আ. দাউদ। মিশ।

১৪০. এক ব্যক্তি বলল, 'হে রসূলুল্লাহ্, কোন্ কাজ আপনার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়?' তিনি বললেন, '(কোরআন পাঠ) শেষ করা ও শুরু করা।' —তির। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

১৪১. উচ্চৈঃস্বরে কোরআন শরীফ পাঠকারী প্রকাশ্যভাবে দানকারীর তুল্য, নিম্নস্বরে পাঠকারী গোপনে দানকারীর তুল্য।—তির।

১৪২. যতক্ষণ মনে আনন্দ পাও ততক্ষণ কোরআন শরীফ পাঠ কর, যখন ভাল না লাগে তখন রেখে দাও (অর্থাৎ পাঠ বন্ধ কর)—শায়।

১৪৩. আবু সঈদ মুয়াল্লা (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমি নামাজ পড়ছিলাম, এমন সময় নবী (সঃ) আমাকে ডাকলেন, কিন্তু আমি কোন সাড়া দিলাম না। পরে নামাজ শেষ হলে আমি তাঁর কাছে এলাম এবং বললাম, 'হে রসূলুল্লাহ্, আমি তো নমাজ পড়ছিলাম।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ কি বলেননি, আল্লাহ্ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদের ডাকেন' (৮ ঃ ২৪)? তারপর বললেন, 'তুমি মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাবার আগে আমি কি তোমাকে কোরআন শরীফের সর্বাপেক্ষা গুণশালী সূরা সম্পর্কে শিক্ষা দেব না?' তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর যখন আমরা বাইরে আসার ইচ্ছা করলাম, আমি বললাম, 'হে রসূলুল্লাহ্, আপনি তো বলেছেন, তোমাকে একটা সর্বোৎকৃষ্ট সূরা শিক্ষা দেব।' তিনি বললেন 'সমস্ত প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্-

তা'লার'—ঐ পরপর উচ্চারিত সাতটি আয়াত (অর্থাৎ সূরা ফাতেহা) এবং মহা-মহিম কোরআন যা আমাকে দান করা হয়েছে।—বুখারী। তির (কিছু পরিবর্তন সহ)।

১৪৪. সূরা ফাতেহার সমমর্যাদাসম্পন্ন অন্য কোন সূরা তওরাত, জবুর, ইঞ্জিল এমন কি কোরআনের মধ্যেও অবতীর্ণ হয়নি।—তির।

১৪৫. আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আমি সালাত তথা সূরা ফাতেহাকে আধাআধি ভাগ করেছি—অর্ধেক আমার আর অর্ধেক বান্দার।' বান্দা যখন 'আল্-হামদোলিল্লাহে রাব্বিল আ'লামিন' বলে, আল্লাহ্ বলেন, 'বান্দা আমার মর্যাদা কীর্তন করেছে।' যখন বলে, 'মালেকে ইয়াওমিদ্দীন,' আল্লাহ্ বলেন, 'বান্দা আমার মহিমা বর্ণনা করেছে।' তারপর বান্দা যখন বলে, 'ইয়্যাকানা'বুদু অ ইয়্যাকানাস্তায়ীন', আল্লাহ্ বলেন, 'এ আমার আর আমার বান্দার মধ্যে রইল এবং আমার বান্দার প্রার্থনা অবশ্য মঞ্জুর।' যখন 'এহ্দেনাস্ সিরাতল মুস্তাকিম' থেকে 'অলাদ্দাল্লিন' পর্যন্ত বলে, আল্লাহ্ বলেন, 'আমার বান্দার প্রার্থনা অবশ্য অবশ্য মঞ্জুর হবে।'—মুসলিম।

১৪৫. (ক) একদিন ভ্রমণ করার সময় হুজুর (সঃ) পাশের একজন লোককে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমাকে আমি কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা বলে' দিচ্ছি' —এই বলে তিনি আলাহামদোলিল্লাহ্ সূরা পড়ে শোনালেন।—তির।

১৪৬. একদিন প্রবাস-যাত্রায় জনৈক সাপে-কাটা রোগীকে রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এক সহচর সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁ দিলেন—লোকটা আরোগ্য লাভ করল।—বুখারী।

১৪৭. সূরা ফাতেহাতে প্রত্যেক রোগের নিরাময় আছে।—বয়হাকী।

১৪৮. একদিন জিব্রাঈল (আঃ) রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে বসে' আছেন, এমন সময় আকাশের একটা দুয়ার খুলে গেল যা পূর্বে আর কখনো খোলেনি। ঐ দুয়ার দিয়ে একজন ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হলেন। জিব্রাঈল (আঃ) বলেন, 'এই ফেরেশ্তা পূর্বে আর কখনো অবতীর্ণ হননি।' তারপর ঐ ফেরেশ্তা রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সালাম করে বললেন, 'সুসংবাদ! এমন দুটো নূর (জ্যোতি) আপনাকে দান করা হয়েছে যা পূর্বে কোন পয়গম্বরকেই দান করা হয়নি—তা হল সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত (বা বাক্য)।'—মুস।

১৪৯. সূরা বাকারাহ্ কোরআনের শিখর-সদৃশ, তার প্রতিটি বাক্য আশীজন ফেরেশ্তার সাহায্যে অবতীর্ণ হয়েছে। 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু'—তথা আয়াতল কুরসীকে আল্লাহ্র আরশের (আসনের) নিম্নদেশ থেকে বের করে' নিয়ে এই সূরার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

১৫০. যাদুকরেরা সূরা বাকারাহ্ আয়ত্ত করতে পারে না।—মুস।

১৫১. তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত করো না (অর্থাৎ এবাদৎ বা উপাসনাশূন্য করোনা), যে ঘরে সূরা বাকারাহ্ পাঠ করা হয় সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে।—মুস।

১৫২. যে কেউ রাত্রিকালে সূরা বাকারার শেষে বাক্য দুটি পাঠ করে সে রাত্রিকালীন অনিষ্ট ও উপদ্রব থেকে রক্ষা পায়।—বুখারী।

১৫৩. 'সূরা বকারাহ্' এবং 'সূরা আল্ ইমরান' এই দুটি জ্যোতির্ময় সূরা তোমরা পাঠ করো—সূরাদুটি কেয়ামতের দিন বাদলের মত তোমাদের ছায়াদান করবে।—মুসলিম।

১৫৪. সূরা মুলক (অর্থাৎ তাবারাকাল্লাজি) পাঠ করলে কবরে আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।—তির।

১৫৫. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, প্রতিটি মোমেনের অন্তরে যেন এই সূরা (মুলক) বর্তমান থাকে।—তরগীব।

১৫৬. আয়াতুল কুরসী কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত (বাক্য)—যে ঘরে তা পাঠ করা হয় সে ঘর থেকে শয়তান বের হয়ে যায়।—তির।

১৫৭. একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে রসূলুল্লাহ্ কোরআন শরীফের কোন্ সূরাটি সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বলেন, 'কুল হু আল্লাহু আহাদ।' সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোরআনের কোন্ আয়াতটি সর্বশ্রেষ্ঠ?' তিনি বলেন, 'আয়াতুল কুরছি।' সে বলল, 'হে আল্লাহ্র নবী, কোন্ আয়াত আপনার ও আপনার উম্মতের উপকার করবে?' তিনি বললেন, 'সূরা বাকারার শেষাংশ। ও আল্লাহ্তা'লার আরশের (আসনের) নিম্নে অবস্থিত রহমতের ভান্ডার থেকে এসেছে; এই উম্মতকে তিনি ও দান করেছেন। ইহলোক ও পরলোকের এমন কোন কল্যাণ নেই যা ওর মধ্যে নিহিত না আছে।'—মিশ।

১৫৮. আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দু হাজার বছর আগে আল্লাহ্তা'লা একটা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ওতে তিনি দুটি বাক্য লিখেছিলেন যার দ্বারা তিনি সূরা বাকারা শেষ করেছেন। যে গৃহে এই দুটি বাক্য (আয়াত) পরপর তিন রাত্রি পাঠ করা হয় সে গৃহে শয়তান উপস্থিত হতে পারে না।—তির।

১৫৯. উসাইদ ইব্নে হুজাইর বলেছেন, একদিন রাতে যখন তিনি (কোরআন শরীফের ২য় সূরা) বাকারা পাঠ করছিলেন তখন তাঁর পাশে-বেঁধে-রাখা ঘোড়াটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল এবং যেই তিনি পাঠ বন্ধ করলেন, ঘোড়াটা শান্ত হল। পুনরায় তিনি পাঠ শুরু করলে ঘোড়াটা আবার লাফালাফি শুরু করল এবং পাঠ বন্ধ করার পর তার লাফালাফিও বন্ধ হল। সুতরাং তিনি পাঠ শেষ করলেন, কেননা তাঁর পুত্র ইয়াহ্ইয়া ঘোড়াটার অতি কাছে ছিল এবং তাঁর ভয় হচ্ছিল যে ঘোড়াটা হয়তো তাকে (অর্থাৎ পুত্রকে) আঘাত করবে। শেষ করার পর আকাশের দিকে মাথা তুলে তিনি একটা চাঁদোয়া দেখতে পেলেন যাতে অনেকগুলো আলো জ্বল্জ্বল্ করছিল। পরদিন সকালে নবী (সঃ)-কে (এ খবর) জানান হলে তিনি (সঃ) বললেন, 'হে ইবনে হুজাইর, তুমি পড়তে, (যদি) আরো পড়তে।' তিনি বললেন, 'আমার ভয় হল, পাছে ঘোড়াটা ইয়াহ্ইয়াকে পা দিয়ে পিষে ফেলে এবং সে ওর খুব কাছেই ছিল।' তারপর আমি (আবু সাঈদ খুদরী) তার (অর্থাৎ উসাইদের) কাছে গেলাম এবং আকাশের দিকে চাইলাম। একটা চন্দ্রাতপের মত জিনিস দেখতে পেলাম যাতে প্রদীপের ন্যায় কতকগুলো আলো জ্বলছিল। পরে আমি যখন বাইরে এলাম তখন তা আর দেখতে পেলাম না। তিনি (সঃ) বললেন, 'জান ও কি?' তিনি (উসাইদ) বললেন, 'না।' তিনি (সঃ) বললেন, 'তারা ফেরেশ্তা; তোমার পাঠ শোনবার জন্য কাছে এসেছিল। যদি তুমি আরো পড়তে, তবে তারা প্রভাত পর্যন্ত থাকত, লোকেরা তখন তাদের দেখতে পেত এবং তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পারত না।'—শায়। বর্ণনায় • আবু সঈদ খুদরী (রাঃ)।

১৬০. যদি কোন ব্যক্তি প্রতিদিন দ্শবার স্রা 'ক্লহ্ আল্লাহ্ আহাদ' পড়ে তবে শ্ধ্ দেনা ব্যতীত তার পঞ্চাশ বৎসরের পাপ মাফ হয়ে যায়।—তির। মিশ।

১৬১ ওকবা ইবনে আম্র (রাঃ) বলেন, একদিন আমি রস্ল্ল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে হোজাফা ও আব্ওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সফরে (ভ্রমণে) গিয়েছিলাম, তখন প্রবল ও গভীর অন্ধকার আমাদের আচ্ছন্ন করল। রস্ল্ল্লাহ্ (সঃ) ক্ল আউজো বেরাব্বিল ফালাক এবং ক্ল আউজো বেরাব্বিন্নাস এই দ্টি স্রা দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, 'হে ওকবা, ওর দ্বারা তুমি আশ্রয় প্রার্থনা কর, ওর মত কিছ্ দ্বারা কেউ আশ্রয় প্রথনা করেনি।'—আ. দাউদ।

১৬২. (৯৯তম স্রা) ইজাজ্লজিলাত কোরআন শরীফের অর্ধেকের তুল্য. ক্লহ্ আল্লাহ্ আহাদ পবিত্র কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের তুল্য এবং ক্ল ইয়া আইয়োহাল কাফের্নে এক চতুর্থাংশের তুল্য।—তির।

১৬৩. প্রতিটি জিনিসের সৌন্দর্য আছে; কোরআন শরীফের সৌন্দর্য হল স্রা রহ্মান।—বয়।

১৬৪. প্রত্যেক জিনিসের হৃদয় আছে—পবিত্র কোরআন শরীফের হৃদয় হল স্রা ইয়াসিন। যে ব্যক্তি ও পাঠ করে তার জন্য আল্লাহ্ দশবার সম্প্র্ণ কোরআন শরীফ পাঠের প্রস্কার লিপিবদ্ধ করেন।

১৬৫. যে ব্যক্তি দিবা দ্বিপ্রহরে স্রা ইয়াসিন পাঠ করে তার সমস্ত অভাব দ্রীভূত হয়।—মিশ।

১৬৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য স্রা ইয়াসিন পাঠ করে তার অতীত পাপ মাফ করা হয়। অতএব মরণাপন্ন ব্যক্তিদের কাছে এ পাঠ কর।—বয়।

১৬৭. আল্লাহ্তা'লা আকাশ ও প্থিবী স্ষ্টির হাজার বছর আগে (২০শ) স্রা ত্বাহা এবং (৩৬শ) স্রা ইয়াসিন পাঠ করেছিলেন। যখন ফেরেশতাগণ তা শ্নলেন তখন বললেন, 'সেই জাতিই স্খী যাদের জন্য ও অবতীর্ণ হবে, সেই হৃদয়সম্হই স্খী যারা ও ধারণ করবে এবং সেই জিহ্বাসম্হই স্খী যারা সেইমত কথাবার্তা বলবে।'—মিশ।

১৬৮. অনেক সময় আমাদের উপস্থিতিতে নবী (সঃ) সিজদার আয়াত পাঠ করতেন এবং সিজদা করতেন, আমরাও সিজদা করতাম—যাতে এত ভীড় হয়ে যেত যে আমরা প্রত্যেকে মাথা রাখার স্থান প্র্ণর্পে পেতাম না।—ব্খারী। বর্ণনায় ঃ আব্দ্ল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)।

১৬৯. আব্ল ম্ন্জির নামক জনৈক সাহাবীকে রস্ল্ল্লাহ্ (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোরআন শরীফের কোন্ আয়াত তোমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়?' 'তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রস্লই ভাল জানেন।' প্নরায় জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'তিনি আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরজীবী, চিরস্থায়ী' (আয়াতুল কুরসি)। তারপর তিনি তাঁর বক্ষে করাঘাত করে বললেন, 'হে আব্ল ম্নজির, জ্ঞান তোমাকে আনন্দ দান কর্ক।'—ম্স। বর্ণনায় ঃ উবাই ইবনে কাব।

১৭০. আব্ হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন রমজান মাসে রস্ল্ল্লাহ্ (সঃ) আমাকে জাকাত দানের ভার দেন। একজন লোক (রাত্রে

অন্ধকারে) আসত এবং কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে পালিয়ে যেত। একদিন তাকে আমি ধরলাম এবং বললাম, 'তোমাকে রসূলুল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাব।' সে বলল, 'আমি অত্যন্ত গরিব, আমার পরিবারের লোকসংখ্যা অনেক এবং আমার বড় অভাব।' সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন প্রভাতে নবী (সঃ)-এর কাছে হাজির হলাম। তিনি বললেন, 'হে আবু হোরায়রা তোমার বন্দী গত রাতে কি করল ? আমি বললাম, 'হে রসূলুল্লাহ্‌, সে খুব অভাবের এবং মস্ত বড় পরিবারের অজুহাত দেখাল, তাই দয়াবশতঃ তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি।' তিনি (সঃ) বললেন, 'সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। সে আবার ফিরে আসবে।' যেহেতু নবী (সঃ) বললেন, সেই হেতু আমি বুঝলাম যে সে আবার আসবে। তারপর আমি তার দিকে লক্ষ্য রাখলাম। সে আসল এবং খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতে লাগল। আমি তাকে ধরলাম এবং বললাম, 'নিশ্চয় আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে নিয়ে যাব।' সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি বড় গরিব, আমার পরিবারের লোকসংখ্যা অনেক। আমি আর ফিরে আসব না।' সুতরাং তার প্রতি দয়াবশতঃ তার পথ ছেড়ে দিলাম। পরদিন প্রত্যূষে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বন্দী কি করল ?' বললাম, অত্যন্ত দারিদ্র্য ও বহু পরিজনের অভিযোগ করায় দয়া বশতঃ তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি (সঃ) বলেলেন, 'নিশ্চয় সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে।' সুতরাং আমিও লক্ষ্য রাখলাম। সে পুনরায় খাদ্য নিতে আসলে আমি তাকে ধরলাম এবং বললাম, 'তোমাকে নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে নিয়ে যাব এবং এই তিনবারের শেষ বার। তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আর ফিরে আসবেনা। আবার এসেছ।' সে বলল, ''আমাকে মুক্তি দিন ; আমি আপনাকে একটা কথা শিখিয়ে দেব যার দ্বারা আল্লাহ্‌ আপনার উপকার করবেন। যখন আপনি শয্যায় আশ্রয় নেন, তখন আয়াতুল কুরসি পাঠ করুন—'আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীবী, চিরস্থায়ী' থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত—তাহলে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে একজন রক্ষক সকাল পর্যন্ত আপনাকে পাহারা দেবে এবং শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবেনা'—সুতরাং তাকে ছেড়ে দিলাম।' প্রভাতে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে হাজির হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বন্দী কি করল ?' বললাম, 'সে আমাকে একটা বাক্য শিখিয়ে দেবে, আমার উপকার করবে বলেছে।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় সে সত্য কথা বলেছে, যদিও সে একজন মিথ্যাবাদী। জান, আজ তিনরাত্রি যাবৎ তুমি কার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছ ?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'সে শয়তান।'—বুখারী। [তিরমিজী শরীফে অনুরূপ একটা হাদীস আবু আইয়ুব আনসারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে]।

১৭১. যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা আল-ইমরানের শেষ রুকু পাঠ করে তার সারা রাত নামাজে দাঁড়িয়ে থাকার সমান পুরস্কার লিপিবদ্ধ হয়।—মিশ।

১৭২. যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা দোখান পাঠ করে এবং প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করে, তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশ্‌তা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।—তির।

১৭৩. যে ব্যক্তি প্রত্যূষে তিনবার 'আউজো বিল্লাহে সামীয়িল আলীমে মিনাশ্‌ শায়তানির রাজীম' বলে, তারপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করে, আল্লাহ্‌তা'লা তার হেফাজতের জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য আশীর্বাদ প্রেরণ করে এবং সেই দিন যদি সে প্রাণত্যাগ

করে তবে শহীদরূপে গণ্য হয় ; এবং যদি সে সন্ধ্যা বেলা ও পাঠ করে তবে অনুরূপ সম্মান লাভ করে।—তির। মিশ।

১৭৪. কোরআন শরীফে ত্রিশ আয়াতের একটা সূরা আছে। ও (সূরা) ওর পাঠককে ক্ষমা না করা পর্যন্ত তার ক্ষমার জন্য অনুরোধ করতে থাকে। ঐ (সূরাটি) হল (৬৭ তম) সূরা তাবারাকাল্লাজি বি ইয়াদিহিল মুল্‌ক।—তির। আ. দাউদ। মিশ্।

১৭৫ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জনৈক সাহাবী কবরের ওপর একটা তাঁবু খাটান। তিনি জানতেন না যে ওটা কবর। সেই কবরের মধ্যে একজন লোক সূরা তাবারাকাল্লাজি বিয়াদিহিল মুল্‌ক শেষ পর্যন্ত পড়েছিলেন। তিনি এ বিষয়ে জানালে নবী (সঃ) বললেন, 'এই (সূরাই আজাবে) বাধা দেয় এবং আল্লাহ্‌র আজাব (বা শাস্তি) থেকে রক্ষা করে।—তির। মিশ।

১৭৬. 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি প্রতিদিন (কোরআন শরীফের) এক হাজার বাক্য (আয়াত) পাঠ করতেপারে না?' তারা বলল, 'কে এক হাজার বাক্য পাঠ করতে পারে?' তিনি বললেন, 'তোমাদের কেউ কি (১০২ সংখক সূরা) আলহাকোমুত্তাকাছোর পাঠ করতে পারবে না?'—বয়।

১৭৭. নবী (সঃ) ঘুমোবার আগে মুসাব্বাহাত সূরাগুলো পাঠ করতেন এবং বলতেন, ওতে একটা বাক্য আছে যা হাজার বাক্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। [মুসাব্বাহাত সূরা ৭টি—১) বনি ইস্‌রাইল (১৭ সংখক সূরা); ২) হাদীদ (৫৭); ৩) হাশর (৫৯); ৪) সাফ (৬১); ৫) জুমআ (৬২); ৬) তাগাবোন (৬৪); ৭) আলা (৮৭)।]—তির। আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ ইর্‌বাদ ইবনো সারিয়া (রাঃ)।

১৭৮. একজন লোক নবী (সঃ) এর কাছে এসে বলল, 'হে রসূলুল্লাহ্, আমাকে (কোরআন শরীফের কিছু অংশ) পাঠ করে শোনান।' তিনি বললেন, তিনটি সূরা যাদের প্রথমে 'আলিফ', 'লাম', 'রা' আছে তা পাঠ কর।' সে বলল, 'আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার হৃদয় কঠিন হয়েছে এবং জিহ্বা পুরু হয়েছে।' তিনি বললেন, 'তবে সেই তিনটি সূরা পাঠ কর যাদের শুরুতে 'হা', 'মিম' আছে।' সে আগের মত আপত্তি জানাল এবং বলল, 'আমাকে একটা সম্পূর্ণ সূরা পাঠ করে শোনান।' তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে সূরা ইযাযুল যিলাতিল আরদো শেষ পর্যন্ত পাঠ করে শোনালেন। সে বলল, 'যিনি সত্যসহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম আমি এর বেশী করব না।' তারপর সে চলে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'বেচারা মুক্তিলাভ করেছে।'—মিশ। আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর (রাঃ)।

১৭৯. নামাজে কোরআন পাঠ করা, নামাজের বাইরে কোরআন পাঠ করা অপেক্ষা উত্তম ; নামাজের বাইরে কোরআন পাঠ করা, তসবীহ্ ও তকবীর পাঠ করা ছাদকা দান অপেক্ষা উত্তম ; ছাদকা দান (নফল) রোজা অপেক্ষা উত্তম এবং রোজা দোজখের বিরুদ্ধে ঢাল সদৃশ।—বয়।

১৮০. কোরআন শরীফকে পাহারা দাও ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, দড়ি-বাঁধা-উট অপেক্ষা ও অধিকতর পলায়নপর।—শার।

মসজিদ

[মুসলমানের উপাসনালয়কে মসজিদ বলে।]

'যে আল্লাহ্‌র মসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় ও ধ্বংস-সাধনে প্রয়াসী হয়, তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী কে হতে পারে ?' ২(১১৪)

'অংশীবাদীরা যখন নিজেরাই নিজেদের অবিশ্বাস স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহ্‌র মসজিদ (উপাসনাগৃহ) রক্ষণাবেক্ষণ করার সুযোগ পেতে পারে না।··· তারাই তো আল্লাহ্‌র মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং যথাযথভাবে নামাজ পড়ে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না।' ৯(১৭, ১৮)

'যারা ক্ষতি করার জন্যে, বিদ্রোহভাবে, বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছে তাদের গোপন ঘাঁটি স্বরূপ (একটা নতুন) মসজিদ নির্মাণ করেছে—তারা অবশ্যই শপথ করবে, আমরা সদুদ্দেশ্যেই তা করেছি, আল্লাহ্ সাক্ষী, নিশ্চয়ই ওরা মিথ্যাবাদী। তুমি (নামাজের) জন্য এতে কখনো দাঁড়িও না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই ধর্মানুষ্ঠানের জন্য স্থাপিত হয়েছে, সেই মসজিদেই নামাজের জন্য দাঁড়ানো তোমার পক্ষে সমুচিত।' ৯(১০৭, ১০৮)

—আল্-কোরআন।

১৮১. আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণের কাজে অংশগ্রহণ করবে আল্লাহ্‌তা'লা তার কাজ অনুসারে বেহেশ্‌তের মধ্যে তার জন্য ইমারত নির্মাণ করবেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ওসমান (রাঃ)।

১৮২. কোন এক কালো রঙের পুরুষ বা স্ত্রীলোক মসজিদে ঝাঁট দিত। তার মৃত্যুর পর নবী (সঃ) তার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সবাই বলল, 'সে মারা গেছে।' হজরত (সঃ) বললেন, 'আমাকে খবর দেওয়া হয় নি কেন ?' উত্তরে সবাই ঐ ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করল ; কিন্তু হজরত (সঃ) বললেন, 'আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও।' হজরত (সঃ) তার কবরের কাছে গিয়ে জানাজার নামাজ পড়লেন বা বিশেষভাবে দোয়া করলেন। [মসজিদে ঝাঁট দেওয়া বিশেষ পুণ্যের কাজ।]—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৮৩. একদিন আমি মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম, একজন লোক আমার ওপর কাঁকর ছুঁড়ে মারল। আমি তাকিয়ে দেখলাম, খলীফা ওমর (রাঃ)। তিনি আমাকে আদেশ করলেন, 'ঐ লোক দুটোকে ডেকে আন।' আমি তাদের ডেকে আনলাম। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোন্ দেশের লোক ?' তারা বলল, 'আমরা তায়েফবাসী।' ওমর (রাঃ) বললেন, 'তোমরা মদীনার লোক হলে আমি তোমাদের বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতাম ; তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মসজিদে বসে উচ্চকণ্ঠে কথা বল !'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ছায়েব ইবনে ইয়াজিদ (রাঃ)।

১৮৪. আব্বাস ইবনে তামিমের চাচা [আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন —তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে মসজিদে শুয়ে থাকতে দেখেছেন। হজরতের একটা পা অপর পায়ের ওপরে রাখা ছিল।—বুখারী।

১৮৫. একদিন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর কন্যা ফতেমার ঘরে এলেন। জামাতা

আলী (রাঃ)-কে দেখতে না পেয়ে (সে বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করলেন। ফাতেমা উত্তর দিলেন, 'আমার সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হওয়ায় রেগেমেগে আমাকে কিছু না বলে কোথায় চ'লে গেছেন।' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) একজনকে আলী (রাঃ) কোথায় গেছেন তা খোঁজ করতে বললেন। সে খোঁজ ক'রে এসে বলল, 'তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন।' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) মসজিদে এসে দেখলেন, তাঁর শরীরের একাংশ খালি মাটির ওপরে আছে এবং মাটি-মাখা অবস্থায় তিনি ঘুমিয়ে আছেন। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) নিজহাতে তাঁর শরীর ঝেড়ে দিতে লাগলেন এবং (পরম স্নেহভরে) বলতে লাগলেন, 'ওগো আবু তোরাব (অর্থাৎ মাটি-মাখা মানুষ), ওঠ।' [মসজিদ দৈনন্দিন জীবনের মান-অভিমানের হাত থেকেও আশ্রয় ও সান্ত্বনার স্থান।]—বুখারী। বর্ণনায় ঃ সাহল ইব্‌নে সায়াদ (রাঃ)।

১৮৬. এমন একটা সময় আসবে যখন আমার উম্মতেরা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা ক'রে (বড় বড় সুন্দর সুন্দর) মসজিদ নির্মাণ করবে, কিন্তু ঐ সব মসজিদ অতি সামান্যই আবাদ হবে। [অর্থাৎ সেখানে চাকচিক্য থাকবে কিন্তু নামাজ ও আল্লাহ্‌র জেকের সামান্যই হবে।]—বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

অজু

['অজু' শব্দের অর্থ পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্নতা বা জ্যোতি। শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পানি দিয়ে ধুয়ে সাধারণ অপবিত্রতা থেকে পরিচ্ছন্ন বা পবিত্র হবার রীতিকে অজু বলে। আর পানির অভাবে মাটির দ্বারা পবিত্র হবার চেষ্টাকে তায়াম্মুম বলে। 'তায়াম্মুম' অর্থ চেষ্টা করা।]

'হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথায় হাত বুলাবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধোবে; যদি তোমরা অপবিত্র থাকো তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা প্রবাসে (সফরে) থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা স্ত্রী সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে বিশুদ্ধ মাটির চেষ্টা করবে এবং তোমাদের মুখে ও হাতে বুলোবে, আল্লাহ্ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।' ৫(৬)

—আল্-কোরআন।

১৮৭. অজু (অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতা) ঈমানের অর্ধেক।—তির। মুস। বর্ণনায় ঃ জনৈক সাহাবী।

১৮৮. যার অজু নেই, অজু না করা পর্যন্ত তার নামাজ হবে না।— বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৮৯. অজু ব্যতীত নামাজ মঞ্জুর হয় না এবং চুরি-করা জিনিসের দ্বারা দান হয় না।—তির। মুস। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৯০. অজু নামাজের চাবি, তকবীর তার বন্ধন (অর্থাৎ তাহরিম), এবং

তসলিম তার মুক্তি (অর্থাৎ তাহলিল)। [অজুর চাবি দিয়ে নামাজের দুয়ার খুলতে হয়, তকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবর বলে নিয়ত সংকল্প করার সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় সাংসারিক কাজ হারাম হয়। তকবীর হল তাহরিম বা বন্ধন আর সালাম ফিরলে সাংসারিক কাজ হালাল হয়—তাই সালাম হল তাহ্লিল।]—তির। আ. আউদ। বর্ণনায় ঃ আলী (রাঃ)।

১৯১. একদিন হজরত (দঃ) ফজরের নামাজ পড়লেন। কিন্তু তাঁর সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল।' নামাজ শেষ ক'রে তিনি বললেন, 'তাদের কি হয়েছে যারা আমার সাথে নামাজ পড়ে অথচ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন (অর্থাৎ অজু) করে না? এরাই আমাদের কোরআন পাঠে গোলোযোগ সৃষ্টি করে।'—নাসায়ী। বর্ণনায় ঃ শাবী (রাঃ)।

১৯২. যখন কোন মুসলমান অজু করে, তারপর তার মুখ ধোয়, তখন চোখের দ্বারা সে যেসব পাপ কাজ করেছে তা ঐ অজুর পানির শেষ বিন্দুর সাথে দূরীভূত হয়। এরপর যখন সে তার দুটো হাত ধোয় তখন হাতের দ্বারা সে যে সব পাপ কাজ করেছে তা সবই বিদূরিত হয়।—তির।

১৯৩. যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে, তার সমস্ত পাপ শরীর থেকে এমন কি নখের নীচে থেকেও বেরিয়ে যায়।—বুখারী। মুস। বর্ণনায় ঃ ওসমান (রাঃ)।

১৯৪. যখন কোন মুসলমান অজু করে এবং তার মুখ, হাত ও পা ধোয়—তখন চোখ, হাত ও পায়ের সাহায্যে সে যে সমস্ত পাপ কাজ করেছে ঐ অজুর পানির সাথে কিংবা ঐ পানির শেষ বিন্দুর সাথে তা ধুয়ে যায়। ফলে সে সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত ও পবিত্র হয়।—মুস। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

১৯৫. হজরত ওসমান (রাঃ) অজু করলেন,—হাতের কব্জির ওপর পর্যন্ত তিন বার পানি দিয়ে ভালভাবে ধুলেন, ভালভাবে কুল্লি করলেন, নাকের মধ্যে পানি দিলেন, প্রথমে ডান হাত পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে মাথা মুছে ফেললেন, এবং তিনবার করে প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা ধুয়ে বললেন, 'আমার অজুর মত হজরত (দঃ)-কে অজু করতে দেখেছি।' তিনি আরো বললেন, 'যে ব্যক্তি আমার মত অজু করে' কোন কথা না বলে' অন্য কোন কথা চিন্তা না ক'রে দু রাকাত নামাজ আদায় করবে তার সকল অতীত পাপ ক্ষমা করা হবে।'—বুখারী। মুস।

১৯৬. একজন গ্রাম্য আরব অজু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে হজরত (দঃ) তাঁর প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধুয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'অজু এই রকম। যে এর অতিরিক্ত করে, সে মন্দ করে, সীমা লঙ্ঘন করে এবং অত্যাচার করে।'—নাসায়ী। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ [illegible])।

১৯৭. রসুলুল্লাহ্ (দঃ) একমদ (অর্থাৎ প্রায় আধ সের) পরিমাণ পানির দ্বারা অজু করতেন এবং এক ছা (অর্থাৎ প্রায় তিন সের) পরিমাণ পানির দ্বারা স্নান করতেন।—তির। বর্ণনায় ঃ সুফিয়া (রাঃ)।

১৯৮. হজরত (দঃ) অজু কেশবিন্যাস, পাদুকা পরিধান প্রভৃতি সকল কাজ যতদূর সম্ভব ডানদিক দিয়ে শুরু করতেন এবং এটাই তিনি ভালবাসতেন। —বুখারী। মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

১৯৯. যখন তোমরা কিছু পরিধান করবে বা অজু করবে ডান দিক থেকে আরম্ভ করবে।—আহ্মদ। আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২০০. অজ্‌ু আরম্ভ করার সময় যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ্‌ পড়ে নি তার অজ্‌ু হয় নি।—তির। ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ সাঈদ বিন জায়েদ (রাঃ)।

২০১. রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যখন অজ্‌ু করতেন তখন হাতে এক কোষ পানি নিয়ে চিবুকের নীচে প্রবেশ করাতেন এবং দাড়ি খিলাল করতেন। তিনি বলেছেন, ‘আমার প্রভু আমাকে এইভাবে করতে আদেশ দিয়েছেন।’—আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

২০২. ‘আমি কি তোমাদের সেই জিনিসের কথা জানাব না যার দ্বারা পাপ মুছে যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়?’ লোকেরা বলল, ‘হাঁ।’ তিনি বললেন, ‘কষ্ট বা অনিচ্ছা সত্বেও অজ্‌ু করা, সর্বদা মসজিদের দিকে গমন করা এবং এক নামাজ শেষ করে পরবর্তী নামাজের জন্য অপেক্ষা করা—ওটাই তোমাদের জন্য রিবাত (অর্থাৎ রক্ষাকবচ)।’—মুস। তির। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) ও মালেক বিন আনাস (রাঃ)।

২০৩. যে ব্যক্তি অজ্‌ু থাকতে থাকতে আবার অজ্‌ু করে তার জন্য দশটি পুরস্কার লিপিবদ্ধ হয়।—তির। বর্ণনায়ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

২০৪. যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজ্‌ু করে তারপর বলে, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহম্মদ (দঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল; হে আল্লাহ্‌, আমাকে অনুতাপকারী ও পবিত্র ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত কর’—তার জন্য বেহেশ্‌তের আটটি দুয়ার খুলে যায়, সে তার ইচ্ছামত যে কোন দুয়ার দিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে পারে।—তির।

২০৫. যার অজ্‌ু ভঙ্গ হয়েছে পুনরায় অজ্‌ু না করা পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হবে না।—বুখারী। মুস। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২০৬. রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) একটা কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘তোমার প্রতি সালাম, হে মুমেনদের বাসস্থান। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে আমরা শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমাদের ভায়েদের সঙ্গে মিলিত হতে আমার কত না ভাল লাগে!’ সহচরবৃন্দ বললেন, ‘হে রসূলুল্লাহ্‌! আমরা কি আপনার ভাই নই?’ তিনি বললেন, ‘তোমরা আমার সহচর; আমার ভায়েরা আমাদের পরে আসবে।’ তারা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে রসূলুল্লাহ্‌, কিভাবে আপনি তাদের চিনতে পারবেন যারা আপনার পরে আসবে?’ তিনি বললেন, ‘বল দেখি, যদি কারো একটা ঘোড়া থাকে এবং তার কপাল উজ্জ্বল হয়, তাহলে অসংখ্য ঘোর কালো বর্ণের ঘোড়ার মধ্যে থেকে সে কি তার ঘোড়াটাকে চিনতে পারবে না?’ তারা বলল, ‘হাঁ, নিশ্চয়ই।’ তিনি বললেন, ‘আমার উম্মত-ভায়েরাও অজ্‌ুর দরুন তাদের উজ্জ্বল ললাট নিয়ে উপস্থিত হবে, আমি অমৃত সরোবরের (অর্থাৎ হাওজে কওসরের) তীরে তাদের জন্য অপেক্ষা করব।’—মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২০৭. অজ্‌ু করার ফলে উজ্জ্বল ললাট-বিশিষ্ট আমার উম্মতদের কেয়ামতের দিন ডাকা হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম —সে যেন তা করে।—বুখারী। মুস। বর্ণনায়ঃ আবু হোরোয়রা (রাঃ)।

২০৮. কেয়ামতের দিন সবার আগে আমাকে মাথা নত করে সিজদা করতে

এবং মাথা তুলতে হুকুম দেওয়া হবে। তখন আমার সামনে যা আছে সব কিছু দেখতে পাব, সব মানুষের মধ্যে থেকে আমার উম্মতদের চিনতে পারব। তাদের মধ্যে একদল আমার পেছনে, একদল আমার ডাইনে ও বামে থাকবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে রসূলুল্লাহ্! কিভাবে হজরত নূহ্ ও আপনার উম্মতদের চিনতে পারবেন?' তিনি বললেন, 'অজুর দরুন তাদের উজ্জ্বল ললাট হবে, তাদের মত অমন আর কাউকে দেখা যাবে না। তাদের ডান হাতে তাদের আমলনামা (অর্থাৎ কর্মলিপি) থাকবে এবং তাদের ছেলেমেয়েরা তাদের সামনে ছুটোছুটি করতে থাকবে—তাই তাদের আমি চিনতে পারব।'—মিশ্। আহ্।

২০৯. মোমেনের চিহ্ন সেই পর্যন্ত পেঁছুবে যে পর্যন্ত অজুর পানি পেঁছুবে।—মুস। আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২১০. বাতকর্ম বা বায়ু নির্গত হলে সে যেন (পুনরায়) অজু করে।—তির। আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ আলী (রাঃ)।

২১১. যে নিদ্রা যায় সে যেন অজু করে—(কেননা) নিদ্রিতাবস্থায় গ্রন্থিগুলি শিথিল হয়ে যায়।—তির। আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

২১২. মজি বের হলে অজু এবং মণি বের হলে গোসল করতে হয়।—তির। বর্ণনায়ঃ আলী (রাঃ)।

উপাসনা

'হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ, আমার পৃথিবী বিশাল, সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা কর। জীব মাত্রই মরণশীল; অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আমি অবশ্যই বেহেশ্তে তাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, সৎকর্মপরায়ণদের কত উত্তম পুরস্কার।' ২৯ (৫৬-৫৮)

'আমি জিন এবং মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল মাত্র আমার উপাসনার জন্যে।'

"এবং বল, 'আমাদের প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য তো একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।" ২৯ (৪৬)

—আল্-কোরআন।

২১৩. প্রত্যেক জিনিসেরই সৌন্দর্য আছে এবং অন্তরের সৌন্দর্য হল আল্লাহ্‌তা'লার উপাসনা।—বয়হাকী।

২১৪. তারাই আল্লাহ্‌র উত্তম সেবক যারা অধিকবার তাঁর উপাসনা করে।—মিশ্।

২১৫. সেই ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট যার রসনা সর্বদা আল্লাহ্‌র উপাসনা করে, যার হৃদয় সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যার সহধর্মিণী নিজে

বিশ্বাসিনী ও তাকে (অর্থাৎ স্বামীকে) বিশ্বাসের ঈমানের পথে সর্বদা সাহায্য করে।—তির।

২১৬. আল্লাহ্‌র উপাসনা ব্যতীত বাহুল্য বাক্য অন্তরের আবর্জনা স্বরূপ এবং অপরিচ্ছন্ন অন্তরবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই আল্লাহ্‌তা'লার কাছে অপ্রিয়।—মিশ।

২১৭. 'আমি কি তোমাদের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাজ সম্বন্ধে বলব না যা তোমাদের প্রভুর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, মর্যাদায় সর্বাপেক্ষা উন্নত, স্বর্ণ-রৌপ্য দান অপেক্ষা পুণ্যজনক এবং যদি শত্রু তোমাদের আক্রমণ করে আর তোমরা তাদের নিহত কর বা তাদের দ্বারা নিহত হও তার চেয়েও উত্তম?' তারা বলল, 'হাঁ।' তিনি বললেন, 'ও হল আল্লাহ্‌তা'লার উপাসনা।'—তির। মালেক।

২১৮. 'রোজ কেয়ামতে কে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা উন্নত?' হজরত (দঃ) বললেন, 'যে সকল পুরুষ ও নারী অধিকবার আল্লাহ্‌র উপাসনা করে।' জিজ্ঞাসা করা হল, 'আল্লাহ্‌র পথে যারা যুদ্ধ করে তাদের অপেক্ষা কি তারা শ্রেষ্ঠ?' তিনি বললেন, 'হাঁ; যদিও সেই যোদ্ধা তার তরবারি ভগ্ন না হওয়া পর্যন্ত বা তার শরীর থেকে রক্তপাত না হওয়া পর্যন্ত বিধর্মীদের প্রতি অস্ত্র চালনা করে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র উপাসনাকারী-শ্রেণীতে (তারা) তার চেয়ে উন্নত।'—তির। মিশ।

২১৯. রোজ কেয়ামতে আল্লাহ্‌ বলবেন, 'যে ব্যক্তি একদিনও আমার উপাসনা করেছে বা কখনো আমার ভয় করেছে তাকে দোজখ থেকে বের কর।'—তির। বয়। মিশ্‌।

২২০. আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তাঁর উপাসনা অপেক্ষা অন্য কোন কিছুই আর অধিক শক্তিশালী নয়।—তির। মালেক।

২২১. আল্লাহ্‌ বলেন, 'আমি আমার বান্দার চিন্তার নিকটবর্তী। যখন সে আমার স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গী হই এবং যখন সে আমাকে সর্বান্তঃকরণে উপাসনা করে তখন আমিও তাকে সর্বান্তঃকরণে স্মরণ করি। যখন সকলের সঙ্গে সমবেত ভাবে সে আমার উপাসনা করে, তখন আমিও তাকে সকলের সঙ্গে স্মরণ করি। এবং যদি সে আমার দিকে আধ হাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, এবং যদি সে এক হাত পরিমাণ আমার দিকে অগ্রসর হয় তবে আমি তার দিকে দু হাত পরিমাণ অগ্রসর হই এবং যদি সে আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসতে থাকতে তাহলে আমি তার দিক দৌড়ে অগ্রসর হই।—শার। তির।

২২২. শয়তান মানুষের মনের মধ্যে বাস করে। মানুষ যখন আল্লাহ্‌তা'লার উপাসনা করে তখন সে পলায়ন করে, এবং মানুষ যখন আল্লাহ্‌কে ভুলে যায় তখন সে তাকে কুমন্ত্রণায় দান করে।—বুখারী।

২২৩. যারা সুখে-দুঃখে আল্লাহতা'লার প্রশংসা করে পুরলোক সর্বাগ্রে তাদেরই বেহেশ্‌তের দিকে আহ্বান করা হবে।—বয়হাকী।

২২৪. আল্লাহ্‌ বলেন, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর (নবী সঃ-এর) সাথে শত্রুতা স্থাপন করে আমি তাকে আমার সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দিই। যদি আমার কোন সেবক (তার) কোন কাজের দ্বারা আমার কাছাকাছি আসার ইচ্ছা করে এবং সেটাকে কর্তব্য মনে করে' পালন করে তবে আমার অত্যন্ত প্রিয় হয় এবং যখন সে নফল নামাজ দ্বারা আমার নৈকট্য প্রার্থনা করে তখন আমি তাকে ভালবাসি এবং যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কান হই যার দ্বারা সে শোনে, তার

চোখ হই যার দ্বারা সে দেখে, তার হাত হই যার দ্বারা সে ধরে, তার পা হই যার দ্বারা সে যাতায়াত করে ; এবং যদি সে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তবে আমি তা পূরণ করি, যদি সে আশ্রয় চায় তবে তাকে আশ্রয় দিই এবং তাকে কিছু দান করতে আমি বিলম্ব করি না। আর মোমেন অন্তর থেকে মৃত্যুকে অপছন্দ করে এবং আমি তার বৃথা উদ্বেগকে অপছন্দ করি ও তা দূর করি।—বুখারী।

২২৫. যখন কোন লোক তার শয্যায় শুদ্ধভাবে উপবেশন করে' অল্লাহ্‌তা'লার উপাসনা করে এবং সেই অবস্থায় নিদ্রিত হয়, তারপর পার্শ্বপরিবর্তনের সময় ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য কিছু প্রার্থনা করে, আল্লাহ্‌তা'লা তাকে তা দান করেন।—তিরমিজী।

২২৬. উপাসনা উপবাস অপেক্ষা উত্তম।—সগির।

২২৭. নিভৃত উপাসনা এবং পরিমিত আহার্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা।—সগির

২২৮. প্রার্থনা উপাসনার মস্তিষ্ক।—তির।

২২৯. 'প্রার্থনা উপাসনা বিশেষ।' তারপর পাঠ করলেন, 'তোমার প্রভু বলেন, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জবাব দেব ; নিশ্চয় যারা আমার উপাসনা থেকে গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অবিলম্বে তারা অত্যন্ত অসম্মানিত ভাবে নরকাগ্নিতে প্রবেশ করবে।'—তির।

২৩০. আল্লাহ্ তা' লার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, কারণ তিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা করা ভালবাসেন এবং সন্তুষ্টির সাথে অপেক্ষা করাই উত্তম উপাসনা।—তির।

২৩১. প্রার্থনা বিপদকে দূর করে।—সগির।

২৩২. যখন কোন বান্দা বলে, 'হে প্রভু। হে প্রভু।' (তখন) আল্লাহ্ বলেন, 'আমি তোমার কাছেই আছি ; প্রার্থনা কর, আমি পূরণ করব।'—সগির।

২৩৩. নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল এবং দানশীল। যখন তাঁর কোন সেবক দুহাত ঊর্ধ্বে তুলে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে তখন তিনি তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।—মিশ।

২৩৪. যে কেউ কিছু প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তাকে তা দান করেন, বা যার জন্য সে প্রার্থনা করেনি এমন কোন অমঙ্গল হতে রক্ষা করেন, বা তার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।—তির।

২৩৫. আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি যে উদাসীন তিনি কখনো তার প্রার্থনা পূরণ করেন না।—তির।

২৩৬. তোমাদের প্রত্যেকের প্রার্থনাই পূর্ণ হয় যদি তোমরা দ্রুত একথা না বল যে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিলাম কিন্তু তা পূর্ণ হয়নি।—নাসায়ী ও ৫ জন।

২৩৭. বিপদ ও দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, অদৃষ্টের কুপ্রভাব এবং শত্রুদের উপহাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আল্লাহ্‌তা'লার আশ্রয় প্রার্থনা কর।—শায়। নাসায়ী।

২৩৮. তিন ব্যক্তির প্রার্থনা পূর্ণ হয় এবং সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

প্রথম, পুত্রের জন্য পিতার প্রার্থনা ; দ্বিতীয় পথিকের প্রার্থনা ; তৃতীয় নির্যাতিতের প্রার্থনা।—তির। আ. দাউদ। ই. মাজা।

২৩৯. নিজের অর্থ বা নিজের সন্তান-সন্ততি, ধনসম্পত্তি বা ভৃত্যদের জন্য কোন অমঙ্গল প্রার্থনা করো না। কারণ ও এমন এক মুহূর্তে পেঁছুতে পারে যখন ও পূর্ণ হতে পারে।—মুস। আ. দাউদ।

২৪০. যখন বজ্রধ্বনি শোন, তখন আল্লাহ্‌র জেকের (স্মরণ) কর, কারণ ও (বজ্র) জেকেরকারীর কাছে পেঁছয় না।—সগির।

২৪১. যখন তোমরা জ্বলন্ত অগ্নি দর্শন কর, তখন তকবীর পাঠ কর, কারণ নিশ্চয় তকবীর ওকে নির্বাপিত করবে।—সগির।

২৪২. যখন মোরগের ডাক শোন তখন আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, কারণ সে ফেরেশ্‌তাকে দেখতে পায় ; আর যখন গাধার চীৎকার শোন তখন শয়তানের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌তা'লার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর, কারণ সে শয়তানকে দেখতে পায়।—শায়। তির। আ. দাউদ।

২৪৩. প্রার্থনা ব্যতীত অদৃষ্টের পরিবর্তন হয় না এবং সৎকর্ম ব্যতীত আয়ু-বৃদ্ধি হয় না।—তির।

২৪৪. আল্লাহ্‌তা'লার কাছে প্রার্থনা ব্যতীত উৎকৃষ্টতর কোন জিনিস নেই।—তির। ই. মাজা।

২৪৫, যখন কেউ অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্যে প্রার্থনা করে, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, 'তোমার জন্যেও তদ্রূপ।'—সগির।

২৪৬. যে ব্যক্তি তার জন্য প্রার্থনার দ্বার খুলেছে, আল্লাহ্ তার জন্যে অনুগ্রহের দ্বার খুলেছেন।—তির।

২৪৭. নিজের জন্যে প্রার্থনা করাই হল সর্বোৎকৃষ্ট প্রার্থনা।—সগির।

২৪৮. যখন আল্লাহ্‌তা'লাকে ডাক, তখন দুহাতের পৃষ্ঠ দ্বারা নয়, তালু দ্বারা ডাক। যখন প্রার্থনা সমাপ্ত কর তখন উভয় তালু দ্বারা মুখমণ্ডল মুছে নাও।—সগির।

২৪৯. আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা অপেক্ষা অধিক সম্মানজনক আর কিছু নেই।—তির। বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

কয়েকটি প্রার্থনা

[হজরত মুহম্মদ (দঃ) যে ভাবে আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত (প্রার্থনা) করতেন নিম্নে উদ্ধৃত হল :]

২৫০. হে আল্লাহ্, আমার কাছে প্রভাতের আগমন হল, তোমার নিখিল বিশ্বের ওপর প্রভাত বিস্তৃত হল। সমস্ত প্রশংসা তোমার, তুমি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। তুমি অদ্বিতীয়, তোমার সমতুল্য কেউ নেই। তোমারই সকল শক্তি, সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তুমি যা ইচ্ছা সবই করতে পার। হে আল্লাহ্, এদিন শুভ হোক ; এ দিনের মধ্যে যা-কিছু শুভ তা সবই আমি তোমার কাছে ভিক্ষা করছি।

এদিন যেন আমার পক্ষে অশুভ না হয়, এর মধ্যে যা অশুভ আছে তার থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি। হে আল্লাহ্, আমাকে অলসতা থেকে রক্ষা কর পার্থিব আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদে রাখ ; মৃত্যুর পর কবরের আজাব (শাস্তি) থেকে আশ্রয় দাও। —তির। শায়শ

২৫১. হে আল্লাহ্, নিশ্চয় তুমি আমার কথা শোন, আমার অবস্থা দেখ এবং আমার গুপ্ত ও বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত আছ; আমার কোন কাজই তোমার কাছে গোপন নেই। আমি অসহায় ফকির, সাহায্যপ্রার্থী, আশ্রয়প্রার্থী, ভীত-সন্ত্রস্ত। (আমি) আমার পাপ সম্বন্ধে জ্ঞাত আছি ও অপরাধ স্বীকার করি, ভিক্ষুকের মত তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি, অধম পাপীরূপে তোমার কাছে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছি ; ভীত বিপদগ্রস্ত হয়ে বিনীতভাবে তোমাকে আহ্বান করছি—গ্রীবা তোমার জন্য বিনীত হয়েছে. চক্ষু সজল ও স্ফীত হয়েছে, দেহ তোমার জন্য পদানত হয়েছে এবং নাসিকা তোমার জন্য ধূলি-ধূসরিত হয়েছে। হে আমার খোদা, (আমার) প্রার্থনা ব্যর্থ করো না এবং আমার প্রতি মহানুভব ও করুণাময় হও, হে সর্বোৎকৃষ্ট প্রার্থনা-পূরণকারী ও সর্বোৎকৃষ্ট দানশীল।—সগির।

২৫২. হে আল্লাহ্, আমাকে তাদের দলভুক্ত কর যারা সৎকাজ করলে আনন্দিত হয় এবং অসৎ কাজ করলে ক্ষমা চায়। হে আল্লাহ্, আমাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল কর ; আমাকে (আমার) নিজের চক্ষে ছোট এবং মানুষের চক্ষে বড় কর।—সগির।

২৫৩. হে আল্লাহ্, আমাকে অপ্রিয় ব্যবহার, কার্য ও বাসনা এবং অনিষ্ট-কর পীড়া থেকে আশ্রয় দাও।—তির। সগির।

২৫৪. হে আল্লাহ্, যে জ্ঞানে কোন উপকার হয় না, যে কার্যে কোন উন্নতি হয় না, যে প্রার্থনা মঞ্জুর হয় না —তা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। —সগির।

২৫৫. হে আল্লাহ্, তোমার কাছে আমি কার্যে দৃঢ়তা ও সুদৃঢ় পরিচালনা এবং তোমার সম্পদের কৃতজ্ঞতা, তোমার এবাদতের সৌন্দর্য প্রার্থনা করছি। তোমার কাছে সত্যবাদী রসনা ও সুস্থ হৃদয় কামনা করছি। যা তুমি অবগত আছ সেই অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় চাইছি, যে কল্যাণ তুমি অবগত আছ তা কামনা করছি এবং যা তুমি জ্ঞাত আছ সেই পাপের মার্জনা চাইছি—নিশ্চয়ই তুমি সকল গোপন বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।—তির।

২৫৬. হে আল্লাহ্, আমাদের সকল রকমের কল্যাণ বৃদ্ধি কর, আমাদের সম্মানিত কর, অপমানিত করো না। আমাদের আশীর্বাদপ্রাপ্ত কর, তোমার অনুগ্রহ থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না। আমাদের খুশী কর আমাদের ওপর খুশী হও।—মিশ্। তির।

২৫৭. হে আমার আল্লাহ্, যে বিদ্যা ভাল, যে কার্য তোমার প্রিয়, যে ধন সৎভাবে অর্জন করা যায়, যে স্বাস্থ্য, ধার্মিকতা, ন্যায়-পরায়ণতা ও শিষ্টাচার আমাদের ভাগ্যে নির্ধারিত আছে—তাতে সন্তুষ্ট থাকার শক্তি আমাদের দান কর, আমাদের অন্তরের ভাবকে বাইরের ভাবের চেয়ে সুন্দর কর এবং বাইরের ভাবকে নির্মল কর। আমাদের সাধ্বী স্ত্রী, নির্দোষ ধন এবং যারা পথভ্রষ্ট হয় না বা পথভ্রষ্ট করে না এমন সুসন্তান দান কর।—তির।

২৫৮. হে আল্লাহ্, তোমার দেওয়া দানের বিলুপ্তি, তোমার দেওয়া সুখ-শান্তির পরিবর্তন, তোমার দেওয়া শাস্তির অবমাননা এবং তোমার সর্বপ্রকার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।—মুস। আ. দাউদ। তির।

২৫৯. হে আল্লাহ্, পরলোকে আমার ঈমান যা আমাকে রক্ষা করবে এবং আমার জীবন যা আমাকে ইহলোকে যাপন করতে হবে—সমস্তই আমার কল্যাণময় করে' দাও। হে প্রভো! এমন কর, যেন আমার জীবন প্রত্যেক জিনিসের কল্যাণ বৃদ্ধি করে এবং আমার মরণ প্রত্যেক অমঙ্গল থেকে আমাকে নিরাপদ রাখে।—মিশ।

২৬০. হে আমার আল্লাহ্, আমাকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম, আমাকে তোমারই দিকে ফিরিয়ে দিলাম, তোমার ওপর সকল কাজের ভার অর্পণ করলাম, আশা ও আকাঙ্ক্ষার সাথে একমাত্র তোমাকে পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করলাম, তুমি ছাড়া আর আশ্রয়-স্থল নেই, পলায়নের স্থলও নেই। তোমার দয়া ব্যতীত তোমার অসন্তুষ্টি থেকে কেউই রক্ষাকারী নেই। যে পবিত্র গ্রন্থ তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং তোমার প্রত্যাদেশ বহন করতে যে মহানবী (সঃ)-কে তুমি প্রেরণ করেছ—তার প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।—শায়।—তির।

আজান ও মুয়াজ্জিন

[আজান শব্দের আক্ষরিক অর্থ আহ্বান। প্রত্যেক নামাজের আগে একত্ববাদের অমৃতমন্ত্র ঘোষণা করতে করতে সকলকে নামাজে আহ্বান করাকে আজান বলে।]

'যখন তোমরা আজান দাও (অর্থাৎ নামাজের জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান ঘোষণা কর) তখন তারা ওকে নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ ও হাসি-তামাসা করে থাকে। কারণ তারা জ্ঞানশূন্য সম্প্রদায়।' ৬ পা. ১৩ রু.।

'জুমআর দিন যখন তোমাদের জুমআর নামাজের জন্য আহ্বান করা হয় (অর্থাৎ আজান দেওয়া হয়), তখন সমস্ত কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে উপাসনার দিকে অগ্রসর হও।' ২৮ পা. সুরা জুমআ।

—আল্-কোরআন।

২৬১. মুসলমানগণ যখন মদীনায় চলে আসেন তখন নামাজের সময় আন্দাজ করে তাঁরা একত্রিত হতেন, ওর (অর্থাৎ নামাজের) জন্য তাঁদের আহ্বান করা হত না। একদিন তাঁরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। কেউ কেউ বললেন, 'নাসারাদের ঘণ্টার মত ঘণ্টা অবলম্বন কর।' আবার কেউ কেউ বললেন, 'ইহুদীদের শিঙ্গার মত শিঙ্গা গ্রহণ কর।' হজরত ওমর (রাঃ) বললেন, 'নামাজে আহ্বান করার জন্য একজন লোক পাঠাও না কেন?' তখন রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'হে বেলাল, ওঠ এবং নামাজের জন্য আহ্বান কর।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

২৬২. আবদুল্লাহ্ ইবনে জায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ যখন রসুলুল্লাহ্ (সঃ) ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা মানুষকে নামাজের জন্য আহ্বান করার আদেশ দিলেন তখন ঘুমন্ত অবস্থায় আমি একজনের হাতে একটা ঘণ্টা দেখতে পেলাম। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কি ঘণ্টাটি বিক্রি করবেন?' তিনি বললেন, 'তুমি ও

দিয়ে কি করবে ?' আমি বললাম, 'ওর দ্বারা নামাজের জন্য (সকলকে) আহ্বান করব।' তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিসের সংবাদ দেব না ?' আমি বললাম, 'হাঁ'। তিনি বললেন, 'বল—আল্লাহ্-ই সর্বশ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ আল্লাহু আকবর) থেকে শেষ পর্যন্ত ; এবং একামতও এইরূপ।' তারপর সকাল হলে আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে এলাম এবং স্বপ্নে যা দেখেছিলাম তা তাঁকে বললাম। তিনি (দঃ) বললেন, 'নিশ্চয় এ সত্য স্বপ্ন ইন্‌শাআল্লাহ্। বেলালের সাথে যাও এবং যা তুমি শুনেছ সেইভাবে বেলালকে শিক্ষা দাও, সে ও উচ্চারণ ক'রে আজান দিক যেহেতু তার স্বর তোমার চেয়ে উচ্চতর।' তারপর আমি বেলালের সঙ্গে গাত্রোত্থান করলাম, তাঁকে তা শিক্ষা দিলাম এবং তিনি আজান দিলেন। ওমর ইব্‌নে খাত্তাব তা শুনতে পেলেন, তিনি তখন তাঁর ঘরে ছিলেন। তিনি তাঁর চাদরখানা তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন, 'হে রসূলুল্লাহ্, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, নিশ্চয়ই তাকে (আব্দুল্লাহ্‌কে) যা দেখান হয়েছে, আমিও তা (স্বপ্নে) দেখেছি। অনন্তর আল্লাহ্‌র রসূল বললেন, অতএব আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা।'—আ. দাউদ। ই. মাজা।

২৬৩. ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের অনুকরণে অগ্নি ও ঘণ্টার প্রস্তাব করা হলে রসূলুল্লাহ্ বেলালকে সমান সংখ্যায় আজান এবং বেজোড় সংখ্যায় একামত বলতে আদেশ দিলেন।—বুখারী। মুস। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

২৬৪. আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে আজানের সুন্নত শিক্ষা দিন।' কপাল মুছে তিনি বললেনঃ তুমি বলবে আল্লাহ্ আকবর (৪ বার) তদ্দ্বারা তোমার স্বর উচ্চ হবে। আবার বলবে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই (২বার), আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল (২ বার)—তখন তোমার স্বরকে নত করবে। নামাজে এস (২ বার)। মুক্তির জন্য এস (২ বার)। ফজরের নামাজের সময় বলবে, নিদ্রা হতে নামাজ উত্তম (২ বার)। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ (২ বার) আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই (১ বার)। [বর্তমানে এইভাবে আজান দেওয়া হয়।]—আবু দাউদ। বর্ণনায়ঃ আব্দুর রহমান (রাঃ)।

২৬৫. মোয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি 'আশহাদু আন্না মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্' বাক্য পর্যন্ত অনুরূপ বললেন, কিন্তু যখন সে (মুয়াজ্জিন) হায়্যালাস্‌সালাহ্ বলল তখন তিনি (মোয়াবিয়া) 'লাহাওলা অলা কুওঅতা ইল্লা-বিল্লাহ্, বললেন।' তারপর তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের নবী (সঃ) কে এইরকম বলতে শুনেছি।—বুখারী।

২৬৬. যখন তোমরা আজান শোন তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বল।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু সঈদ খুদরী (রাঃ)।

২৬৭. যখন মুয়াজ্জিন বলেন, আল্লাহু আকবর (২ বার) তখন তোমাদের কেউ বলে আল্লাহ্-ই সর্বশ্রেষ্ঠ দুবার,এবং যখন মুয়াজ্জিন বলেন, আমি সাক্ষ্য দিই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং সেও তাই বলে, তারপর মুয়াজ্জিন যখন বলেন, আমি সাক্ষ্য দিই মুহম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল, তখন সেও বলে আমি সাক্ষ্য দিই মুহম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল, তারপর মুয়াজ্জিন যখন বলেন, নামাজের জন্য উপস্থিত হও সে বলে আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কারো সৎকার্য সম্পাদনের এবং অসৎ-কার্য বর্জনের শক্তি নেই। তারপর মুয়াজ্জিন যখন বলেন, কল্যাণ লাভের জন্য এস

তখন সে বলে আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত…ইত্যাদি ; তারপর যখন বলে আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ, সেও বলে আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ, তারপর যখন বলে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই সেও আন্তরিকতার সাথে বলে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।—মুসলিম।

২৬৮. রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) বেলালকে দুই আঙ্গুল কানের ভেতর রাখতে আদেশ দিলেন এবং বললেন, 'এ স্বরকে উচ্চ করবে।'—ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ আব্দুর রহমান (রাঃ)।

২৬৯. রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) বেলালকে বললেন, 'যখন আজান দাও, দীর্ঘ সময় দাও, যখন একামত দাও তাড়াতাড়ি কর। তোমার আজান ও একামতের মধ্যে যেন এতটুকু সময়ের ব্যবধান থাকে যে, যে-ব্যক্তি আহার করছে সে যেন আহার শেষ করতে পারে, যে ব্যক্তি পান করছে সে যেন তার পান শেষ করতে পারে, যে ব্যক্তি পায়খানা বা প্রস্রাব করতে গেছে সে যেন তা শেষ করে আসতে পারে ; এবং আমাকে না দেখা পর্যন্ত নামাজে দাঁড়াবে না।—তির। বর্ণনায়ঃ জাবের (রাঃ)।

২৭০. যখন নামাজের আজান দেওয়া হয় তখন শয়তান পেছন ফিরে সশব্দে বাতকর্ম করতে করতে পলায়ন করতে থাকে যাতে আজানের শব্দ সে শুনতে না পায়। আজান শেষ হলে আবার সে এগিয়ে আসে। আবার যখন একামত বলা হয় তখন সে পলায়ন করে। একামত শেষ হলে সে আবার এগিয়ে এসে মানুষ ও তার অন্তরের মাঝখানে দাঁড়ায়। যে-সব কথা তার স্মরণ ছিল না সে সম্বন্ধে বলে, 'অমুক কথা স্মরণ কর, অমুক কথা স্মরণ কর।' ফলে সে কত রাকাত নামাজ পড়েছে তা পর্যন্ত তার মনে থাকে না।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২৭১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) একজন লোককে বললেন, 'তোমাকে তো বনে জঙ্গলে মেষ চরিয়ে বেড়াতে ভালবাসতে দেখি। যখন তুমি এ অবস্থায় থাক এবং আজান দাও তখন সাধ্যানুসারে উচ্চৈঃস্বরে আজান দেবে ; কেন না আমি রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর মুখে শুনেছি, মুয়াজ্জিনের সামান্য আওয়াজও মানুষ-জ্বিন, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তরু-লতা ইত্যাদি যে কেউ শুনবে সকলেই কেয়ামতের সেই ভয়ংকর দিনে আজান দাতার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দান করবে।'—বুখারী।

২৭২. আজানের শব্দ যখন শুনতে পাও তখন মুয়াজ্জিনের সঙ্গে তোমরাও ঐ শব্দগুলো উচ্চারণ কর।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু সাঈদ (রাঃ)।

২৭৩. রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন, আজান শুনে যে ব্যক্তি বলে—'হে আল্লাহ্‌! হে এই সর্বাত্মক আহ্বান এবং অবিনশ্বর নামাজের প্রভু! মুহম্মদ (দঃ)-কে (আমাদের জন্য) উপলক্ষ্য (কর) এবং যে প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছ সেই উচ্চ মর্যাদা এবং সমস্ত সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান কর'—সে কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভ করবে।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ)।

২৭৪. মুয়াজ্জিনের আজান শোনার পর যে ব্যক্তি বলে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরিক নেই, এবং মুহম্মদ তাঁর বান্দা ও রসুল ; আল্লাহ্‌কে প্রভুরূপে, মুহম্মদ (সঃ)কে রসুলরূপে এবং ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পেয়ে আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি'—তার পাপ মাফ করা হয়।—মুসলিম।

২৭৫. আজান ও একামতের মধ্যবর্তী প্রার্থনা বিফল হয় না।—আ. দাউদ। তির।

২৭৬. এক ব্যক্তি বলল, 'হে রসুলুল্লাহ্! মুয়াজ্জিনগণ আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন।' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'তারা যা বলে তুমিও তাই বল, তার পর যখন শেষ কর, প্রার্থনা কর, পূরণ করা হবে।'—আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আমর (রাঃ)।

২৭৭. পরলোকে তিন ব্যক্তি কস্তুরীর (মৃগনাভির) স্তূপের ওপরে থাকবে—১) যে ক্রীতদাস আল্লাহ্তালা ও তার প্রভুর প্রতি কর্তব্য পালন করে; ২) যে ব্যক্তি সম্প্রদায়ের নেতা হয় এবং লোকেরা তার ওপর সন্তুষ্ট থাকে এবং (৩) যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঁচবার নামাজের জন্য আহ্বান করে (অর্থাৎ মুয়াজ্জিন);—তিরমিজী।

২৭৮. মুয়াজ্জিনগণ রোজ কেয়ামতের সর্বাপেক্ষা সুদীর্ঘ গ্রীবা বিশিষ্ট হবেন।—মুসলিম।

২৭৯. যে ব্যক্তি পুণ্যের আশায় ৭ বৎসর আজান দেয় সে নরকের অগ্নি থেকে মুক্তরূপে গণ্য হয়।—তির। ই. মাজা।

২৮০. তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট সে মুয়াজ্জিন হোক এবং যে ব্যক্তি সর্বাধিক শিক্ষিত সে ইমাম হোক।—আ. দাউদ।

২৮১. ইমাম জামিনদার এবং মুয়াজ্জিন বিশ্বস্ত; হে আল্লাহ্, ইমামদের সুপরিচালিত কর এবং মুয়াজ্জিনদের ক্ষমা কর!—আ. দাউদ। তির। মিশ।

ইমাম

[ইমাম শব্দের অর্থ নেতা। যিনি সমবেত নামাজ পরিচালনা করেন তাঁকে ইমাম বলে।]

২৮২. যখন নামাজের সময় উপস্থিত হয় তখন একজন আজান দিক এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরআন শরীফে অধিকতর শিক্ষিত সেই তোমাদের ইমাম হোক।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আম্‌র বিন সালমা (রাঃ)।

২৮৩ তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তি ইমাম হোক।—আ. দাউদ।

২৮৪. প্রথম প্রথম মোহাজেরদের যে দলটি মদীনায় আসেন তাঁরা কোবা পল্লীতে অবস্থান করেন এবং নবী (সঃ)-এর হিজরত করে আসার পূর্ব পর্যন্ত আবু হোজায়ফা(রাঃ)র ক্রীতদাস সালেম (রাঃ) সেখানে তাঁদের ইমামতি করেন। কারণ তাঁদের মধ্যে তিনিই ছিলেন কোরআনে সর্বাধিক অভিজ্ঞ। [ক্রীতদাস, অবৈধ গর্ভজাত সন্তান এবং নিম্নশ্রেণীর লোক যদি শিক্ষা ও পরহেজগারিতে উন্নত হয় এবং তাঁর সমকক্ষ অন্য লোক উপস্থিত না থাকে তবে তাঁর ইমামতিতে কোন দোষ নেই।]—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)।

২৮৫. সেই ব্যক্তি ইমাম হবে যে কোরআন শরীফ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী; যদি কোরআন সম্পর্কে তাদের সবার জ্ঞান সমান হয় তাহলে হাদীস সম্পর্কে যে অধিকতর জ্ঞানী; যদি ঐ বিষয়েও তাদের জ্ঞান সমান হয়, তবে তাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম হিজরত করেছে; যদি তাতেও সমান হয় তবে যে ব্যক্তি তাদের

মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। কোন ব্যক্তিই তার অধীন ব্যক্তির ইমাম হবে না বা তার বিনা অনুমতিতে তার সম্মানের জন্য তার বাড়ীতে বসবে না।

২৮৬. ওসমান ইবনে আবিল আস বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে সর্বশেষ যে আদেশ দিয়েছেন তা হল এই যে, যখন কোন দলের ইমামতি কর, তখন তাদের জন্য নামাজকে সহজ কর।'—মুসলিম।

২৮৭. ওসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে তাঁর সম্প্রদায়ের ইমাম হতে বলায় তিনি বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্, আমি আমার মধ্যে মধ্যে একটা জিনিস (অর্থাৎ বুক ধড়ফড়ানি) দেখতে পাই।' তিনি বললেন, 'আমার কাছে এস।' তারপর তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন, আমার বুকের মাঝখানে তাঁর হাত রাখলেন, এবং বললেন, 'ঘুরে বস।' তারপর তিনি আমার উভয় কাঁধের মাঝখানের পিঠের ওপর হাত রাখলেন এবং বললেন, 'তোমার সম্প্রদায়ের ইমাম হও; এরপর যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমাম হয় সে তাদের জন্য নামাজ সহজ করবে। কেন না তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, রোগী, দুর্বল ব্যক্তি এবং এমন লোক থাকে যাদের বিশেষ জরুরী কাজ আছে। যখন তোমাদের কেউ একা-একা নামাজ পড়ে সে যে ভাবে খুশী পড়তে পারে।'—মুসলিম।

২৮৮. মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) তাঁর নিজের মহল্লার মসজিদে ইমাম ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বভাব এমন ছিল যে তিনি সন্ধ্যার পর নবী (সঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হতেন এবং এশার নামাজ পর্যন্ত তাঁর কাছেই থাকতেন। তিনি নবী (সঃ)-এর সঙ্গে এশার নামাজ পড়ে নিজ মহল্লার মসজিদে গিয়ে এশার নামাজের ইমামতি করতেন। এতে স্বভাবতই ঐ মসজিদে এশার নামাজ পড়া হতে অনেক রাত হয়ে যেত। একদিন ঐ মহল্লাবাসী এক শ্রমিক সারাদিন পরিশ্রমের পর ঐ মসজিদে এশার নামাজের জামাতে এল। একেতো জামাতের ইমাম মোয়াজ ইবনে জাবাল মসজিদে উপস্থিত হতেই দেরী করেন, তার ওপর সেদিন আবার তিনি (দীর্ঘ) সূরা বাকারা আরম্ভ করে দিলেন। তা দেখে ঐ শ্রমিক জামাত ছেড়ে দিল এবং একা-একা নামাজ পড়ে বাড়ী চলে গেল। মসজিদের ইমাম মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) নামাজ শেষে এই খবর শুনে ঐ শ্রমিকের প্রতি ভর্ৎসনা করলেন। সেকথা শুনে ঐ শ্রমিক নবী (সঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে অভিযোগ করল যে, তিনি আমাদের মসজিদের ইমাম, তিনি এশার নামাজ পড়াতে আসতে অত্যন্ত বিলম্ব করে থাকেন, তার ওপর আবার সূরা বাকারার মত সুদীর্ঘ সূরা আরম্ভ করেন—এই বলে সে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মোয়াজের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'হে মোয়াজ! তুমি কি লোকেদের নামাজ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাও?' এই ভাবে তিনবার তিনি তাঁর প্রতি কটাক্ষ করলেন, তারপর সব সময়ের জন্য সাবধান করে দিয়ে 'ওয়াল্লায়লে ইজা ইয়াগশা', 'সাব্বেহেসমা রাব্বিকাল আ'লা', 'অশ্‌শামসে অদ্দোহা' এই রকম কয়েকটা মধ্যম আকারের সূরার নাম বলে' এই সব সূরার সাহায্যেই নামাজ পড়বার জন্য আদেশ দিলেন। এবং বললেন, 'তোমার লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জামাতের মধ্যে বৃদ্ধ, দুর্বল এবং কর্মব্যস্ত ব্যক্তিগণও থাকতে পারে।' [ইহলোক ও পরলোকের কল্যাণকর্মের মধ্যে কি সুন্দর সামঞ্জস্য সাধন !]—বুখারী। বর্ণনায়ঃ জাবের (রাঃ)।

২৮৯. যখন তুমি অন্য লোকেদের ইমাম হও তখন নামাজের মধ্যে দীর্ঘতা অবলম্বন করো না; কারণ তাদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ণ এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিও থাকে।

আর যখন একাকী নামাজ পড় তখন যতদূর ইচ্ছা দীর্ঘ নামাজ পড়।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

২৯০. নবী (সঃ) বলেছেন, কোন কোন সময় এমন হয় যে আমি নামাজ আরম্ভ করি এবং তা দীর্ঘতর রূপে পড়তে ইচ্ছা করি, কিন্তু আশপাশের শিশুদের ক্রন্দন শুনে ঐ নামাজ অল্পসময়ে শেষ করে দিই। কারণ ঐ শিশুদের মাতা জামাতে যোগদান করেছে, সে বিচলিত হবে। [ইমামের কি অপূর্ব দায়িত্ববোধ !] —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু কাতাদা (রাঃ)।

২৯১. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) অল্প সময়ে নামাজ পড়লেও যেমন সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে নামাজ আদায় করতেন তেমন আর কাউকে দেখিনি। তিনি জামাতে নামাজ পড়ার সময় যদি আশেপাশের শিশুদের ক্রন্দন শব্দ শুনতে পেতেন, তবে অল্প সময়েই নামাজ শেষ করে দিতেন জামাতে যোগদানকারিণী ঐ শিশুর মাতা যেন বিচলিত না হয়।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

২৯২. নবী (সঃ) অল্প সময়ে (জামাতের) নামাজ আদায় করতেন ; কিন্তু অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে আদায় করতেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

২৯৩. ইমামের আগে যেওনা। যখন তিনি আল্লাহু আকবর বলেন তোমরাও আল্লাহু আকবর বল এবং যখন তিনি বলেন, 'তাদের পথে নয় যারা পথভ্রষ্ট' তখন তোমরা বল, 'আমিন (অর্থাৎ তাই হোক)' এবং যখন তিনি নতশির হন তখন তোমরাও নতশির হও, এবং যখন তিনি বলেন, 'আল্লাহ্ তার কথা শোনেন যে তাঁর প্রশংসা করে', তখন তোমরা বল, 'হে প্রভো, সমস্ত প্রশংসা তোমারই।' —শায়খান।

২৯৪. নিশ্চয় ইমামকে অনুসরণ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। যখন তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েন তোমরাও দাঁড়িয়ে পড়, যখন তিনি মাথা নত করেন তোমরাও মাথা নত কর, যখন তিনি মাথা তোলেন তোমরাও মাথা তোল, যখন তিনি বলেন 'আল্লাহ্ তার কথা শোনেন যে তাঁকে প্রশংসা করে,' তখন তোমরাও বল 'হে প্রভো, তোমারই সমস্ত প্রশংসা।' যখন তিনি বসে নামাজ পড়েন তখন তোমরাও একসঙ্গে বসে নামাজ পড়। [ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহ্মদ বিন হাম্বলের মতে ইমাম বসে পড়লেও মোক্তাদিদের বসে নামাজ পড়া ঠিক হবে না।] —শায়। তির।

২৯৫. যে ব্যক্তি রূকু বা সিজদা থেকে ইমামের আগে মাথা তোলে সে কি ভয় করে না যে আল্লাহ্ তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দিতে পারেন ? —শায়খান।

২৯৬. যে ব্যক্তি কোন ইমামের অনুসরণ করবে, ইমামের কেরাতই (অর্থাৎ কোরান পাঠই) তার পক্ষে কেরাত বলে গণ্য হবে।—ইবনে মাজা।

২৯৭. এক শ্রেণীর লোক ইমাম হয়ে তোমাদের নামাজ পড়াবে—তারা যদি পূর্ণাঙ্গ সুন্দর রূপে নামাজ পড়ায় তা হলে তো তোমাদের পুরোপুরি পুণ্য হবে, আর যদি তারা ত্রুটিপূর্ণভাবে নামাজ পড়ায় তবে তোমাদের পুণ্য পুরোপুরি হবে, ত্রুটির ক্ষতি তাদের (অর্থাৎ ঐ ইমামদের) ওপর বর্তাবে। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

নামাজ

['নামাজ' ফার্সী শব্দ, আরবীতে একে 'সালাত' বলে। এর অর্থ—বিনয়, প্রণাম (সিজ্‌দা), উপাসনা। আল্লাহ্‌তা'লার কাছে অত্যন্ত বিনয়সহকারে প্রণতি নিবেদনের মাধ্যমে এই উপাসনা সম্পন্ন করতে হয় বলে' এর নাম নামাজ। পানি যেমন ময়লা দূর করে, নামাজ তেমনি পাপ দূর করে।]

'নামাজ মানুষকে কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে।' ২৯(৪৫)

'আর তোমরা নামাজকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত কর এবং জাকাত দান কর।' ২(১১০)

'নামাজ পড় এবং তাঁকে ভয় কর এবং তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।' ৬(৭২)

'যথাযথভাবে নামাজ পড়, জাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।' ২৪(৫৬)

'যারা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ পাঠ করে, যথাযথভাবে নামাজ পড়ে, আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে তাদের ব্যবসা ব্যর্থ হবেনা—এজন্য যে আল্লাহ্‌ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের আরো বেশী দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।' ৩৫(২৯, ৩০)

'নামাজে স্বর উচ্চ করোনা এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না—এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।' ১৭(১১০)

'যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্র, যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে, যারা জাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে,...এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, এবং যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান, তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের (স্বর্গের), যাতে ওরা চিরস্থায়ী হবে।' ২৩(২-৫, ৮-১১)

'সুতরাং দুর্ভোগ সে সমস্ত নামাজ-আদায়কারীদের, যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে উদাসীন, যারা তা করে (নামাজ পড়ে) লোক দেখানোর জন্য।' ১০৭(৪-৬)

প্রত্যেক নামাজের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। ৭(৩১)

—আল্‌-কোরআন।

২৯৮. তারপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌ আমার উম্মত্‌দের ওপর পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামাজ ফরজ করলেন। ও (আদেশ) নিয়ে ফেরার সময় মূসার কাছে পৌঁছুলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহ্‌ আপনার উম্মত্‌দের জন্যে কি ফরজ করলেন?' বললাম, 'পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামাজ।' তিনি বললেন, 'আপনার প্রভুর কাছে ফিরে যান, কারণ আপনার উম্মত্‌ এ পালন করতে পারবে না।' আমি ফিরে গেলাম, আল্লাহ্‌ এর কিছু অংশ মাফ করলেন। মূসার কাছে ফিরে এসে বললাম, 'তিনি ওর কিছু অংশ কম ক'রে দিলেন।' তিনি (মূসা আঃ দ্বিতীয়বার) বললেন, 'আপনার প্রভুর কাছে যান, কারণ আপনার উম্মত এ পালন করতে পারবে না।' পুনরায় গেলাম। এবারেও আল্লাহ্‌ ওর আরো কিছু অংশ মাফ করলেন। আমি তাঁর কাছে ফিরে আসলে তিনি (মূসা আঃ আবার) বললেন, 'আপনার প্রভুর

কাছে যান, কারণ আপনার উম্মত্ এও পালন করতে সক্ষম হবে না।' তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র) কাছে পুনরায় গেলাম। এবার তিনি বললেন, 'ও পাঁচ এবং এই পাঁচই পঞ্চাশ। আমার কাছে বিধির পরিবর্তন নেই।' আমি মুসার কাছে ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, 'আপনার প্রভুর কাছে ফিরে যান।' বললাম, 'প্রতিপালকের কাছে যেতে লজ্জা হচ্ছে।' [প্রতিবারে পাঁচ ওয়াক্ত করে নামাজ কম করা হয়, ফলে ৫০-এর জায়গায় দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়। বর্তমানে প্রচলিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পুণ্যের দিক দিয়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সমান। এ-প্রসঙ্গে ৫৫৮-সংখ্যক হাদীস দেখুন] —বুখারী বর্ণনায় : আনাস বিন মালিক (রাঃ)।

২৯৮ (ক). প্রথমে আল্লাহ্‌তা'লা আবাসে ও প্রবাসে (মগরিব ছাড়া) প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজ দু রাকাত করে ফরজ করেছিলেন। পরে …আবাসে (তিন ওয়াক্ত) নামাজ চার চার রাকাত করে' দেওয়া হল। —বুখারী। বর্ণনায় : আয়েশা (রাঃ)।

২৯৯. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) তকবীর তাহরিমের দ্বারা নামাজ শুরু করতেন, আলহামদুলিল্লাহ্ দ্বারা কেরাত পাঠ শুরু করতেন, মাথা না-উঁচু না-নীচু মধ্যবর্তী অবস্থায় রেখে রুকু করতেন, এবং রুকু থেকে মাথা তুলে স্থির হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজদায় যেতেন না। সিজদা থেকে মাথা তুলে স্থির হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না। আর প্রত্যেক দু রাকাতে তিনি 'আত্তাহিয়্যাতো' পাঠ করতেন আর বসার সময় তিনি বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া করে' রাখতেন। তিনি শয়তানের ন্যায় কুত্তা-বসা বসতে নিষেধ করতেন এবং পশুর ন্যায় দু হাতকে মাটিতে বিছিয়ে দিতেও নিষেধ করতেন। তিনি নামাজ শেষ করতেন সালামের দ্বারা।—মুসলিম। বর্ণনায় : আয়েশা (রাঃ)।

৩০০. 'দেখ, যদি তোমাদের কারো বাড়ীর দুয়ারে একটা নদী থাকে এবং যদি সে তাতে রোজ পাঁচবার স্নান করে তবে তার শরীরে কি ময়লা থাকে?' তারা বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'এই হল পাঁচবার নামাজ পালনের দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি পাঁচবার নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে আল্লাহ্‌তা'লা তার সকল পাপ মুছে দেন।'—আ. দাউদ ও আরো পাঁচজন।

৩০১. নামাজ ধর্মের খুঁটি; যে ব্যক্তি তা দৃঢ় রাখে সে ধর্মকে দৃঢ় রাখে এবং যে তা ত্যাগ করে সে ধর্মকে ধ্বংস করে।—সগির।

৩০১. (ক) নামাজ মহাপাপসমূহের বিনিময়।—সগির।

৩০২. নামাজ যাকে অসৎ কার্য থেকে বিরত রাখে না তার নামাজ নামাজই নয়, কারণ তা তাকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।—সগির

৩০৩. নামাজ অন্তরকে আনন্দ দান করে, জাকাত ঈমানের চিহ্ন, আর পাপ থেকে সংযমই পূর্ণ গৌরব। —সগির।

৩০৪. আল্লাহ্ সে নামাজ কবুল করেন না যাতে দেহ ও মনের যোগাযোগ থাকে না।—সগির।

৩০৫. নামাজে আল্লাহ্‌তা'লার চিন্তা ব্যতীত যাবতীয় চিন্তা দূর করতে হবে। কথা বলবার সময় এমন কথা বলবে না যার জন্য পরিণামে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। অপরের জিনিষের প্রতি লোভ করো না এবং তাদের কাছে কিছু আশা করো না।—ওসিয়াতুন্নবী।

৩০৬. যখন নামাজ পড় তখন ওকে শেষ নামাজ মনে করে সেইভাবে পড়বে এবং এমন কোন কথা বলবে না যেজন্য ত্রুটি স্বীকার করতে হবে এবং মানুষের হাতে যা আছে সে বিষয়ে নিরাশ হতে একমত হবে।—সগির।

৩০৭. আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, 'হে মানব, সমস্ত চিন্তা হতে মুক্ত হয়ে আমার উপাসনা কর—আমি তোমার অন্তরকে চিন্তাশূন্য করব এবং তোমার অভাব দূর করব। নতুবা আমি তোমার দুটি হাতকেই সাংসারিক কাজে লিপ্ত রাখব এবং তোমার অভাব দূর করব না।'—তিরমিজী।

৩০৭ (ক). তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র উপাসনা করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ এবং যদি তুমি তা না পার তবে (মনে করবে) নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন। —বুখারী। শায়খান। বর্ণনায় ঃ ওমর বিন্ খাত্তাব (রাঃ)।

৩০৮. একদিন শীতকালে নবী (সঃ) ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তখন গাছ-থেকে পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি গাছের একটা শাখা গ্রহণ করে' বললেন, 'পাতা-গুলো এর থেকে ঝরে' পড়ছে।' তারপর বললেন, 'হে আবুজর!' আমি বললাম, 'হে রসুলুল্লাহ্! আমি আপনার খেদমতে হাজির আছি।' তিনি বললেন, 'যে মুসলমান খোদার সন্তুষ্টিলাভের জন্য নামাজ পড়ে তার পাপগুলো ঐ গাছের ঝরা পাতার মত ঝরে যায়।'—মিশকাত। বর্ণনায় ঃ আবুজর (রাঃ)।

৩০৯. শীতকাল মুসলমানদের কাছে বসন্ত কালের মত। কারণ ওর দিন-গুলো ছোট, তারা রোজা রাখতে পারে ; আর রাতগুলো বড়, তারা নামাজ পড়তে পারে। —বয়হাকী।

৩১০. আল্লাহ্ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ (বা অবশ্য কর্তব্য) করেছেন। যে ব্যক্তি তার জন্য ভালভাবে অজু করে, নির্ধারিত সময়ে নামাজ পড়ে, রুকুতে গমন করে (নামাজে নতশির হয়) এবং সিজদা (ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত) করে তার জন্য আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা আছে—তিনি তাকে ক্ষমা করতে পারেন। আর যে ব্যক্তি তা পালন করে না তার জন্য আল্লাহ্‌র কোন প্রতিজ্ঞা নেই ; ইচ্ছা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করতে পারেন বা শাস্তি দিতে পারেন। —আ. দাউদ। নাসায়ী।

৩১১. তাদের ও আমাদের মধ্যে নামাজই হল চুক্তি। অতএব যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করেছে সে নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করেছে। —মিশ। তির। নাসায়ী। ই. মাজা।

৩১২. আল্লাহ্ বলেন, আমি নামাজ তথা সুরা ফাতেহাকে দু ভাগে ভাগ করেছি—একভাগ আমার জন্য, একভাগ বান্দার জন্য। অতএব যখন কোন বান্দা বলে, নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্‌তা'লারই সমস্ত প্রশংসা তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন বান্দা বলে, আল্লাহ্ পরম দাতা ও করুণাময়, আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা কীর্তন করেছে। যখন বান্দা বলে, আল্লাহ্ বিচার দিনের প্রভু, তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার মহিমা বর্ণনা করেছে। যখন বান্দা বলে, আমি শুধু তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ বলেন, আমার ও আমার বান্দার মধ্যে এটাই হল চুক্তি। যখন বান্দা বলে, আমাকে সরল সঠিক পুণ্য-পথে পরিচালিত কর—তাদের পথে যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, কিন্তু তাদের পথে নয় যাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেছ এবং যারা পথভ্রষ্ট ; আল্লাহ্ বলেন,

এটাই আমার বান্দার পক্ষে উপযুক্ত। আমার বান্দার প্রার্থনা অবশ্য অবশ্য মঞ্জুর হবে।—মুসলিম।

৩১৩. বান্দা এবং কুফুর শেরেকের মধ্যে সম্পর্ক নামাজ না পড়ার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। —মুস। বর্ণনায় ঃ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)।

৩১৪. যে ব্যক্তি মনোযোগের সঙ্গে দুটি সিজদা করে আল্লাহ্ তার পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা করেন। —মিশকাত।

৩১৫. রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে কোন বিপদ উপস্থিত হলে তিনি নামাজ পড়তেন। —আ. দাউদ।

৩১৬. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুম্‌আর নামাজ—এক রমজান মাস থেকে অন্য রমজান মাসের মধ্যবর্তী (অর্থাৎ এক বছরের) যাবতীয় মহাপাপের বিনিময়।—মুসলিম।

৩১৭. দাঁড়িয়ে নামাজ পড়, যদি তা না পার তবে বসে পড়, তাতেও যদি অসমর্থ হও তবে কাত হয়ে পড়।—বুখারী।

৩১৮. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন একজন লোক মসজিদে প্রবেশ করে নামাজ পড়ল এবং পরে নবী (সঃ)কে সালাম করল। তিনি জবাব দিয়ে বললেন, 'তোমার নামাজ হয়নি, ফিরে গিয়ে নামাজ পড়।' সুতরাং সে ফিরে গিয়ে আগের মত নামাজ পড়তে লাগল, তারপর এসে নবী (সঃ)কে সালাম করল। তিনি বললেন, 'ফিরে গিয়ে নামাজ পড়, কারণ তোমার নামাজ ঠিক হয়নি।' তিনবার (একরকম ঘটল)। তখন সে বলল, 'যিনি আমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আমি এর চেয়ে ভাল করে পড়তে পারি না। আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন।' তিনি (দঃ) বললেন, 'যখন নামাজ পড়তে দাঁড়াও তখন তকবীর বল। তারপর কোরআন থেকে তোমার সুবিধামত খানিকটা পাঠ কর। পরে রুকুতে যাও এবং শান্তভাবে রুকু কর। তারপর মাথা উঁচু কর এবং সোজা হয়ে দাঁড়াও। তারপর সিজদাতে যাও এবং শান্তভাবে সিজদা কর। তারপর মাথা উঁচু কর এবং শান্ত হয়ে বস। এবং তোমার সম্পূর্ণ নামাজে এই রকম করো।' [নামাজে তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়।] —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩১৯. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'আমি সাতটি হাড়ের ওপর সিজদা করার আদেশ পেয়েছি।' তিনি হাত দিয়ে তাঁর নাকের প্রতি ইংগিত করে বলেন, ললাটের ওপর, এবং দু হাত, হাঁটু ও দু পায়ের প্রান্তের ওপর। এবং (আরো আদেশ পেয়েছি) যেন নামাজের মধ্যে কাপড় ও চুল না সামলাই।' [নামাজের মধ্যে আমরা অনেকেই কাপড় ঠিক করি, চুল ও নাকে হাত দিই, গা-হাত-পা চুলকাই —এসব সম্পূর্ণ ত্যাগ করা উচিত]—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৩২০. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে (তাঁর ছাত্র সাবিত বলেন), তিনি আমাদের রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নামাজ দেখাতেন; তিনি নামাজ পড়তেন। রুকু থেকে মাথা তোলার পর (এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে), আমরা (মনে মনে) বলতাম (সিজদার কথা) ভুলে গেছেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৩২১. তোমরা কোন কোন নামাজ তোমাদের ঘরের মধ্যে পড়ো—ঘরকে কবরে পরিণত করো না। [অর্থাৎ কবরে যেমন নামাজ পড়া হয়না, ঘরও যেন তেমন নামাজশূন্য না হয়।]—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৩২২. যখন কেউ মসজিদে নামাজ পড়ে তখন সে ওর কিছুটা অংশ পড়ার জন্য যেন তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আসে। বাড়ীতে নামাজ পড়ার জন্যে আল্লাহ্ তাকে নিশ্চয় বরকত দেবেন।—মুস। ই. মাজা।

৩২৩. রসুলুল্লাহ (সঃ) মুয়াজ্জিনকে আজান দিতে আদেশ দিতেন এবং সফরকালে অতি শীত বা অতি বৃষ্টির রাত হলে ঘোষণা করতে বলতেন, 'নিজের নিজের ঘরেই নামাজ পড়ে নাও।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৩২৪. নবী (সঃ) নামাজ পড়লেন। তিনি নামাজে কিছু বেশী করেছিলেন বা কম করেছিলেন। তিনি যখন সালাম ফেরালেন, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে রসুলুল্লাহ্, নামাজে নতুন কিছু ঘটেছে কি ?' তিনি বললেন, 'তা কি ?' তারা বলল, 'আপনি এমন এমন নামাজ পড়লেন !' তিনি তাঁর পা দুটো ঘুরিয়ে কেবলার দিকে মুখ করে দুই (সহু) সিজদা করলেন।' তারপর সালাম ফেরালেন। তিনি যখন আমাদের দিকে মুখ করলেন, বললেন, 'নামাজে নতুন কিছু (হুকুম) হলে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের তা জানাতাম। তবে আমি তোমাদেরই মত মানুষ—তোমরা যেমন ভুল কর, আমিও ভুল করি ; অতএব যখন আমার ভুল হয় তখন আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তোমাদের কেউ যদি নামাজ সম্পর্কে সন্দেহ করে তবে সে যেন প্রকৃত ব্যাপার অনুধাবন করে এবং সেই অনুসারে তার নামাজ পূর্ণ করে' সালাম ফেরায়। তারপর সে যেন দুই সিজদা করে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)।

৩২৫. যখন তোমাদের কেউ নামাজ পড়ে তখন শয়তান (তাকে ভোলাবার জন্য) তার কাছে আসে। শেষ পর্যন্ত তার মনে হয় না সে কয় রাকা'ত নামাজ পড়েছে। যখন এরকম ভাব প্রকাশ পাবে, তখন (সালামের পর) সে বসে' দুটো (সহু) সিজদা করবে।—মুস। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩২৬. মসজিদে থুতু ফেলা পাপ এবং তাকে মাটি চাপা দেওয়া (বা ধুয়ে ফেলা) তার প্রায়শ্চিত্ত।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৩২৭. যখন তোমরা নামাজে বস তখন আমার ওপর দরুদ পড়া ছেড়ো না, কারণ ও হল নামাজের জাকাত।

৩২৮. যখন তোমাদের কেউ নামাজ পড়ে তখন সে যেন তার সামনে কিছু রাখে। যদি কিছু না পায়, তাহলে অন্ততঃ যেন তার লাঠি রাখে। যদি সঙ্গে কোন লাঠি না থাকে তবে যেন কোন চিহ্ন রাখে। এরপর যা তার সামনে দিয়ে যায় তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।—আ. দাউদ। ই. মাজা।

৩২৯. নামাজের সম্মুখ দিয়ে গমনকারী ব্যক্তি যদি জানত যে সে কি (পাপ) করছে তাহলে নামাজের সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে চল্লিশ গুণ বেশী সময় সে অপেক্ষা করত এবং ও তার পক্ষে উৎকৃষ্ট হত।—তাবরানী।

৩৩০. জায়েদ ইবনে আকরাম (রাঃ) বলেছেন, আমাদের প্রত্যেকেই নামাজের মধ্যে তার পার্শ্বস্থ সঙ্গীর সাথে (প্রয়োজন মত) কথা বলত। তারপর অবতীর্ণ হল 'সকল নামাজ, বিশেষতঃ মধ্যম নামাজ সম্বন্ধে যত্নশীল হও এবং আল্লাহ্‌র সামনে ভক্তিভরে দণ্ডায়মান হও।' ফলে আমাদের (নামাজের মধ্যে) চুপচাপ থাকতে বলা হল'।—বুখারী।

৩৩১. আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার আমরা রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর

সাথে কোন একটা প্রান্তরে অবতরণ করলাম। তারপর ঘুম থেকে কেউ জাগতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত সূর্য উদয় হল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সকলকে ডেকে বললেন, 'এখান থেকে সবাই আপনাপন উট নিয়ে চল, কেননা এখানে শয়তানের আবির্ভাব হয়েছে।' সুতরাং আমরা তাই করলাম। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এগিয়ে গিয়ে পানির সন্ধান করলেন, অজু করলেন, আর (আমাদের নিয়ে) দু রাকা'ত নামাজ পড়লেন।—মুস।

৩৩২. তোমাদের কেউ যদি ঘুমিয়ে নামাজের সময় কাটিয়ে দেয়, অথবা ভুলে যায়, তার উচিত যখন স্মরণ হবে তখনই আদায় করে' দেওয়া। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'আকিমিস্ সালাতা লে জিকরি—আমার স্মরণে নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর।'—মুস। বর্ণনায়ঃ আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)।

৩৩৩. যখনই কোন ব্যক্তি নামাজ ভুলে যাবে অথবা ঘুমের কারণে নামাজের সময় অতিক্রান্ত হবে—(তখন) ওর প্রতিকার (হল) এই যে, যখন মনে পড়বে আদায় করে' দেবে।—মুস। বর্ণনায়ঃ আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)।

৩৩৪. আবু কাতাদা (রাঃ) বলেছেন, (একদিন) যখন আমরা নবী (সঃ) -এর সাথে নামাজ পড়ছিলাম, তিনি হঠাৎ লোকেদের গোলমাল শুনতে পেলেন। নামাজ শেষ করে বললেন, 'তোমাদের কি হয়েছিল?' তারা বলল, 'আমরা নামাজের জন্য তাড়াহুড়ো করছিলাম।' তিনি (নবী সঃ) বললেন, 'এরূপ করো না। যখন নামাজে আসবে তখন ধীরে-সুস্থে আসবে। (নামাজের) যতখানি পাবে তা পড়বে এবং যতখানি পাবে না পরে পূরণ করবে।'—বুখারী।

৩৩৫. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নামাজ শেষে প্রার্থনা করতেন—'হে আল্লাহ্, আমি কবরের শাস্তি থেকে তোমার আশ্রয় নিচ্ছি; এবং কানা দজ্জালের বিভ্রাট থেকে তোমার আশ্রয় নিচ্ছি; এবং জীবন ও মৃত্যুকালের বিভ্রাট থেকে তোমার আশ্রয় নিচ্ছি। হে আল্লাহ্, আমি পাপ ও ঋণ থেকে তোমার আশ্রয় নিচ্ছি।' —বুখারী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৩৩৬. আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বললেন, 'আমাকে এমন একটা প্রার্থনা শিখিয়ে দিন যা আমি নামাজে বলব।' তিনি বললেন, 'বল—'হে আল্লাহ্! আমি আমার নিজের ওপর অনেক বেশী অত্যাচার করেছি। তুমি ছাড়া পাপ মার্জনা করার আর কেউ নেই। অতএব তোমার নিজের মার্জনা গুণে আমাকে মার্জনা কর; এবং আমার ওপর অনুগ্রহ কর—তুমি মার্জনাকারী ও অনুগ্রহকারী।'—বুখারী।

নামাজের সময় ও বয়স

'নির্ধারিত সময়ে যথাযথ ভাবে নামাজ পড়া বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য (ফরজ)।' ৪ (১০৩)

'নমাজ যথাযথ ভাবে পড়বে দিনের দু' প্রান্ত ভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে।' ১১ (১১৪)

'তোমরা নমাজের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষ ভাবে মধ্যবর্তী (আসরের)

নামাজকে সযত্নে রক্ষা করবে এবং আল্লাহর সামনে বিনীত ভাবে দাঁড়াবে। ২(২৩৮)।

' সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত যথাযথ ভাবে নমাজ পড়বে এবং ফজরের নামাজ যথাযথ ভাবে পড়বে—বিশেষ ভাবে ফজরের নামাজ পরিলক্ষিত হয়।' ১৭ (৭৮)

—আল্-কোরআন।

৩৩৭. সন্তানের বয়স যখন সাত বছর হয় তখন তাকে নামাজ পড়তে আদেশ দাও ; আর যখন তার বয়স দশ বছর হয় এবং নামাজ পড়ে না, তখন তাকে প্রহার কর ও পৃথক শয্যায় শয়ন করাও।—তির। মিশ্। আ. দাউদ।

৩৩৮. ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন্ কাজ আল্লাহ্র কাছে অধিকতর প্রিয় ?' তিনি বললেন, 'নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পালন করা।' পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর কি ?' তিনি বললেন, 'মাতাপিতার বাধ্য হওয়া।' তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর কি ?' তিনি বললেন, 'খোদার পথে জেহাদ করা।' —শায়খান।

৩৩৯. হে আলী, তিনটে কাজে বিলম্ব করো না, প্রথম, নামাজের সময় হলে নামাজ পড়তে, দ্বিতীয়, জানাজা তৈরি হলে জানাজা পড়তে এবং তৃতীয়, বিধবার বর পাওয়া গেলে তার বিবাহ দিতে।—তির।

৩৪০. 'কোন্ কার্য সর্বোৎকৃষ্ট ?' জিজ্ঞাসা করা হলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'সময়ের প্রথমভাগে নামাজ পড়া।'—তির। মিশ্। আ. দাউদ।

৩৪১. সময়ের প্রথম ভাগে নামাজ পড়ার মধ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং শেষ ভাগে নামাজ পড়ার মধ্যে আল্লাহ্র মার্জনা আছে।—তির।

৩৪২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, সূর্য যখন (পশ্চিমে) অবনত হয় তখন জোহরের সময় হয় এবং যে পর্যন্ত মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান থাকে সে পর্যন্ত আছর হয় না। আছরের সময় থাকে সূর্য হলুদবর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত, মগরিবের সময় থাকে লালবর্ণ লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, এশার সময় থাকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এবং ফজরের নামাজের সময় প্রত্যূষ থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। আর যখন সূর্য উদিত হতে থাকে তখন নামাজ থেকে বিরত থাক।—মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ)।

৩৪৩. ফজরের নামাজ (সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তী) আলোকের মধ্যে পড় যেহেতু ও পুরস্কারের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ।—তির। আ. দাউদ।

৩৪৪. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) গ্রীষ্মকালে দেরীতে এবং শীতকালে সকাল সকাল (জোহরের নামাজ) পড়তেন।—নাসায়ী।

৩৪৫. যে ব্যক্তি আছরের নামাজ ছেড়েছে তার আমল বৃথা হয়েছে।—বুখারী।

৩৪৬. যে ব্যক্তি আছরের নামাজ হারিয়েছে সে যেন তার মালপত্র ও পরিজনদের হারিয়েছে।—শায়খান।

৩৪৭ যদি তারকারাজি জানালা দিয়ে উঁকি মারার পূর্বেই বিলম্ব না করে

মগরিবের নামাজ পড়ে তাহলে আমার উম্মতেরা সব সময় সৌভাগ্যশালী থাকবে। —আ. দাউদ।

৩৪৮. এই (এশা) নামাজ দেরী করে' পড়, যেহেতু এর জন্য তোমাদের সমস্ত জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। তোমাদের পূর্বে এই নামাজ আর কোন জাতি পড়েনি।—আ. দাউদ।

৩৪৯. ফজর ও এশার চেয়ে অন্য কোন নামাজ মোনাফেকদের (কপটদের) পক্ষে অধিকতর দুর্বহ নয়। তারা যদি জানত এদের মধ্যে কি (পুণ্য) আছে তাহলে হামাগুড়ি দিয়েও তারা নিশ্চয় ঐসব নামাজে যোগদান করত।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৫০. ফজরের নামাজের পরে যতক্ষণ না পর্যন্ত সূর্য সম্পূর্ণ উদিত হয় এবং আছরের নামাজের পরে যতক্ষণ না সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যায়—ততক্ষণ নফল নামাজ পড়তে নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ ওমর (রাঃ)।

৩৫১. মোয়াবিয়া (রাঃ) সকলকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমরা এমন একটা নামাজ পড়ে থাক যা আমরা রসুলুল্লাহ্ (সঃ)কে পড়তে দেখিনি, বরং তিনিও পড়তে নিষেধ করতেন—আছরের পর দুরাকাত নফল নামাজ।—বুখারী।

৩৫২. ফজরের নামাজের পর সূর্য ওপরে উঠে না-যাওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়া নিষিদ্ধ এবং আছরের নামাজের পর সূর্য অস্ত না-যাওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। —বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু সাঈদ (রাঃ)।

৩৫৩ সূর্য উদয়ের সময় তোমরা নামাজের জন্য উদ্যোগী হয়ো না এবং সূর্য অস্তের সময়ও নামাজের জন্য উদ্যত হয়ো না।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ)।

জামায়াতে নামাজ

৩৫৪. দুই বা তদ্ধিক ব্যক্তি দ্বারাই জামায়াত (অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ নামাজ) হয়। [জামায়াতে বা জামাতে নামাজ পড়া ওয়াজেব।]—ই. মাজা।

৩৫৫. জামায়াতে নামাজ পালন করা একাকী নামাজ পালন করা-অপেক্ষা ২৭ গুণ বেশী পুণ্যজনক। —তির। শায়খান। বর্ণনায়ঃ ওমর (রাঃ)।

৩৫৬. আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)কে বলতে শুনেছি 'ঐক্যবদ্ধভাবে (বা জামায়াতে) নামাজ পড়া একা-একা নামজে পড়া অপেক্ষা ২৫ গুণ শ্রেষ্ঠ। এবং ফজরের নামাজে রাত্রি ও দিনের ফেরেশ্‌তাগণ একত্রিত হয়।'—বুখারী।

৩৫৭. কোন গ্রামে বা মরুভূমিতে যেখানে তিনজন লোক থাকে অথচ জামায়াতে নামাজ পড়ে না সেখানে শয়তান তাদের উপর নিশ্চয় দৌরাত্ম্য করে; অতএব তোমরা জামায়াতে যোগ দেবে। কেননা নেকড়ে বাঘ দূরবর্তী (দল ছাড়া) মেষটিকেই হত্যা করে। [ঐক্য সুস্থ জীবনের শর্ত, অনৈক্য মৃত্যুর কারণ।] —আ. দাউদ। নাসায়ী। আহ্‌মদ।

৩৫৮. জামায়াত দরিদ্রদের পক্ষে হজ্জস্বরূপ। —সগির।

৩৫৯. যে ব্যক্তি অপেক্ষা করে ইমামের সাথে নামাজ পড়ে, তার পুণ্য যে নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশী।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু মুসা (রাঃ)।

৩৬০. পাঁচবার ঐক্যবদ্ধভাবে নামাজ পালন করলে এক জুমআ থেকে অন্য জুমআ পর্যন্ত মহাপাপ (কবীরা গুনাহ্) ব্যতীত অন্য সকল পাপের মার্জনা হয়। —তিব।

৩৬১. যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামায়াতে পড়ে সে যেন অর্ধেক রাত্রি নামাজ পড়ল, আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামায়াতের সঙ্গে পড়ে সে যেন সমস্ত রাত্রি নামাজ পড়ল —মুসলিম। বর্ণনায় ঃ ওসমান (রাঃ)।

৩৬২. যে ব্যক্তি আজান শোনে অথচ জামাতে যোগদান করে না, তার একা-একা নামাজ পালন সিদ্ধ হয়না।—তিব। দারকুৎনী (মিশ)।

৩৬৩. ইব্নে আব্বাসরাঃকে এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল, সে সারা দিন রোজা রাখত এবং সারা রাত নামাজ পড়ত কিন্তু জুমআর নামাজ বা জামাতে যোগদান করতনা। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি দোজখে যাবে। —তিব।

৩৬৪. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, আমি স্থির করেছি একদল যুবককে কিছু জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দেব ; তারপর যারা নামাজে (জামায়াতে) উপস্থিত হবে না তাদের ঘরবাড়ী (তারা) ওর দ্বারা জ্বালিয়ে দেবে।—তিব

৩৬৫. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) শপথ করে বললেন, 'আমার এমন ইচ্ছা হয় যে, আজানের পর কাউকে ইমাম করে' নামাজ শুরু করার আদেশ দিই এবং ঐ সব লোকের ঘরবাড়ী খুঁজে বের করি যারা জামায়াতে যোগ দেয়নি এবং কারো দ্বারা জ্বালানি কাঠ আনিয়ে ঐ লোকেরা যখন ঘরের মধ্যে থাকে তখন ওদের ঘরে-দোরে আগুন লাগিয়ে দিই। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে' বলেন, অনেক লোক এমন আছে যারা সামান্য শিরনীর আশায় রাত্রিকালে এশার সময় মসজিদে আসতে কুণ্ঠিত হয় না—(কিন্তু জামায়াতে যোগ দিতে কুণ্ঠিত হয়)।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৬৬. যে ব্যক্তি কোন ইমামের পেছনে নামাজ পড়বে ইমামের কেরাতই তার পক্ষে কেরাত বলে' গণ্য হবে।—ই. মাজা।

৩৬৭. একদিন রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের সঙ্গে ফজরের নামাজ পড়লেন। তারপর সালাম ফেরালেন এবং বললেন, 'অমুক উপস্থিত হয়েছে ?' লোকেরা বলল, 'না'। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'অমুক উপস্থিত হয়েছে ?' তারা বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'সমস্ত নামাজের মধ্যে এই দুটি নামাজ (ফজর ও এশা) মোনাফেকদের (কপটদের) পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। যদি তারা জানত এই দুই নামাজে কি পুরস্কার আছে তবে তারা অবশ্যই বুকে হেঁটে বা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে উপস্থিত হত। (জামায়াতের) প্রথম লাইন ফেরেশ্তাদের শ্রেণীর তুল্য ; যদি তোমরা জানতে ওর মর্যাদা কি তবে তোমরা পড়ি-মরি হয়ে ওর দিকে অগ্রসর হতে। নিশ্চয় একা-একা নামাজ পড়ার চেয়ে আর একজনের সঙ্গে একত্রে নামাজ পড়া ভাল এবং আর দুজনের সঙ্গে একত্রে নামাজ পড়া আরো ভালো এবং আরো অধিক সংখ্যক লোকের সঙ্গে

একত্রে নামাজ পড়া আল্লাহ্ তা'লার কাছে অধিকতর প্রিয়।—আ. দাউদ। নাসায়ী। বর্ণনায়ঃ উবাই ইবনে কাব (রাঃ)।

৩৬৮. একবার রসুলুল্লাহ্ (সঃ) নামাজ শেষ করেছেন, এমন সময় এক-ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হল। তিনি বললেন, এমন কোন উদার লোক কি নেই যে এই ব্যক্তির সঙ্গে একত্রে নামাজ পড়ে? অবিলম্বে একব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং তার সঙ্গে নামাজ পড়ল। [একই নামাজ একাধিকবার পড়া হলে দ্বিতীয়বারে নফল নামাজের পুণ্য পাওয়া যাবে।]—তির। আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ)।

৩৬৯. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রসুল আমাদের পরিচালনার পথপ্রদর্শন করেছেন; তার মধ্যে একটা হল এই যে যখন আজান দেওয়া হয় তখন জামায়াতের সঙ্গে নামাজ পড়া।—মুসলিম।

৩৭০. একদিন এক অন্ধ (নাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম) নবী (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে রসুলুল্লাহ্, আমাকে মসজিদে নিয়ে যাবার মত কোন চালক নেই।' তারপর তিনি বাড়ীতে নামাজ পড়ার জন্য রসুলুল্লাহ্ (সঃ) কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তারপর সেই অন্ধ চলে গেলে তিনি তাকে ডাকলেন—'তুমি কি আজান শুনতে পাও?' তিনি বললেন, 'হাঁ।' তিনি বললেন, 'তবে এতে সাড়া দাও।' [গুরুতর কারণ ব্যতীত জামায়াত পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।]—মুসলিম।

৩৭১. প্রবল শীত এবং ঝড়বৃষ্টির রাতে রসুলুল্লাহ্ (সঃ) নির্দেশ দিতেন, 'সাবধান হও, বাড়ীতে নামাজ পড়।'

৩৭২. যে ব্যক্তি মসজিদে থাকাকালে আজান শুনতে পায় এবং কোন আবশ্যকীয় কাজ ব্যতীত বের হয়ে আসে এবং ফিরে আসার ইচ্ছা করে না—সে মুনাফেক (কপট)।—ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ ওসমান (রাঃ)।

৩৭৩. যখন নামাজের একামত বলা হয় এবং তোমাদের কারো মলমূত্রের বেগ হয়, সে যেন প্রথমে তা ত্যাগ করে।—তির। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন আরকাম (রাঃ)।

৩৭৪. যদি কোন সময় রাত্রের আহার উপস্থিত করা হয় তবে প্রথমে আহার গ্রহণ কর; যদিও (এ ঘটনা) মগরিবের নামাজ পড়ার পূর্বে হয়। আহারের পূর্বে তাড়াহুড়া (করে নামাজ আদায়) করো না।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৩৭৫. নবী (সঃ) ঘরের কাজকর্মে লিপ্ত হতেন, কিন্তু যখনই নামাজের সময় উপস্থিত হত সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে নামাজের জন্য চলে যেতেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৩৭৬. সাবধান! তোমরা নামাজের মধ্যে সোজাভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দেবেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ)।

৩৭৭. একদিন নামাজের একামত শেষ হয়ে গেলে রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, সোজা সারিবদ্ধভাবে পরস্পর মিলিত হয়ে

দাঁড়াও। মনে রেখো, আমি পেছনের দিকেও তোমাদের লক্ষ্য করি। —বুখারী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৩৭৮. নবী (দঃ) বলেছেন, 'তোমরা সারি খুব সোজা করবে, আমি আমার পেছন দিকেও দেখে থাকি।' আনাস (রাঃ) বলেন, 'সেইজন্যে আমাদের প্রত্যেকে কাঁধে কাঁধ এবং পায়ে পা মিলিয়ে থাকত।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৩৭৯. সারি সোজা কর, কারণ সারি সোজা করা নামাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৩৮০, নামাজের মধ্যে সারি সোজা করে দাঁড়াও—কারণ ওর ওপর নামাজের সৌন্দর্য নির্ভর করে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৮১. (নবী সঃ-এর বহুদিন পর) তাঁর সহচর আনাস (রাঃ) বসরা থেকে মদীনায় এলেন। একজন লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)র কালের তুলনায় আমাদের কালে কি কি দোষ-ত্রুটি দেখতে পান?' তিনি বললেন, 'অন্য কোন দোষ বিশেষ করে বলতে চাই না, কেবল একটা দোষের কথা বলতে চাই —তোমরা নামাজের মধ্যে সারি যথাযথভাবে সাজাও না।'—বুখারী।

৩৮২. তোমাদের স্ত্রীগণকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না, কিন্তু তাদের ঘরই তাদের পক্ষে উত্তম। —আ. দাউদ। বর্ণনায় ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৩৮৩. যে স্ত্রীলোক মসজিদে যাবার জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে সে যে পর্যন্ত স্নান করে পবিত্র হবার মত ধুয়ে না ফেলে সে পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হবে না।—আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৮৪. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন নবী (সঃ) আমাদের ঘরে (নফল) নামাজ পড়লেন। আমি এবং অন্য এক বালক হজরতের (দঃ) পেছনে দাঁড়ালাম এবং আমার মা উম্মে সোলায়মা আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। [মহিলা একজন হলেও একাই সকলের পেছনে দাঁড়াবে।]—বুখারী।

৩৮৪. (ক) তারপর নবী (সঃ) উৎকৃষ্টরূপে অজু করলেন এবং অতিরিক্ত পানি ফেললেন না। এ ছিল তাঁর উভয় অজুর মধ্যবর্তী অজু। তারপর দাঁড়ালেন ও নামাজ পড়লেন। আমিও তখন উঠলাম ও অজু করলাম। তারপর তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার কান ধরে ডান দিকে আনলেন। [দুজনের জামায়াত হলে মোক্তাদি ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে।]—শায়খান। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৩৮৫. যে ব্যক্তি মসজিদে যাওয়া-আসা করে সে যতবার যাওয়া-আসা করে ততবারই আল্লাহ্‌তা'লা তার জন্য বেহেশতে অতিথি সৎকারের আয়োজন করেন। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

জুমআ'র নামাজ

'হে মোমেনগণ! জুমআ'র দিনে জুমআ'র জন্য আজান দেওয়া হলে তৎক্ষণাৎ তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য (ইত্যাদি কাজকর্ম) ত্যাগ ক'রে আল্লাহ্‌কে স্মরণ তথা

নামাজের দিকে অগ্রসর হও। তোমাদের যদি জ্ঞানবুদ্ধি থাকে তাহলে বুঝতে পারবে যে এটাই তোমাদের পক্ষে উত্তম ও কল্যাণকর।' ২৮ পা. ১১ রু.।

—আল্-কোরআন।

৩৮৬. সূর্যকরোজ্জ্বল দিনগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দিন হল জুমআ'র দিন বা শুক্রবার। ঐ দিন আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, ঐ দিন তাঁকে বেহেশ্তে প্রবেশ করানো হয়েছিল এবং ঐদিনই তাকে বেহেশ্ত থেকে বের করা হয়েছিল এবং (ঐ) শুক্রবার দিন ব্যতীত কেয়ামত সংঘটিত হবে না।—মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৮৭. নিশ্চয় শুক্রবার বা জুমআ'র দিন সর্বোৎকৃষ্ট দিন। আল্লাহ্‌র কাছে ঐ দিন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ঈদুল আজ্হা ও ঈদুল ফিৎর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। ঐ দিনের পাঁচটা বৈশিষ্ট্য—১) ঐ দিন আল্লাহ্ আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছিলেন, ২) ঐ দিন তাঁকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, ৩) ঐ দিন আল্লাহ্ তাঁর প্রাণ হরণ করেছিলেন, ৪) ঐ দিন এমন একটা সময় আছে যখন নিষিদ্ধ জিনিস ছাড়া মানুষ যা-কিছু প্রার্থনা করে তাই প্রাপ্ত হয় এবং ৫) ঐ দিন কেয়ামত সংঘটিত হবে। এমন কোন ফেরেশ্তা অথবা আকাশ, বাতাস, পৃথিবী, পাহাড়, সমুদ্র নেই যা জুমআ'র দিনকে ভয় করে না। [কারণ ঐ দিন সবকিছু ধ্বংস হবে।]— ই. মাজা।

৩৮৮. সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন শুক্রবার। সেইদিন আদমের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই দিন তাঁর মৃত্যু হয়, সেইদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেইদিন সকলে জ্ঞানশূন্য হবে। সুতরাং সেই দিনে আমার প্রতি অধিক দরুদ পাঠ কর, কেননা তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। তারা জিজ্ঞাসা করল, 'যখন আপনি পচে গলে যাবেন কিভাবে আমাদের দরুদ আপনার কাছে পৌছন হবে ?' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নবীদের দেহ মাটির জন্য হারাম করেছেন।' অন্য বর্ণনায়ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ নবীদের দেহ মাটির জন্য হারাম করেছেন, সে ও খেয়ে ফেলতে পারবে না। অতএব আল্লাহ্‌র নবী চিরজীবী, তাঁকে আহার্য দেওয়া হয়।— আ.দাউদ। ই. মাজা। নাসায়ী। বর্ণনায়ঃ আউস (রাঃ)।

৩৮৯. ইহুদীদের তওরাত এবং খৃষ্টানদের বাইবেল (ইঞ্জিল) প্রভৃতি ঐশী-গ্রন্থ আমাদের পূর্বে দান করা হয়েছে। আমরা দুনিয়ায় তাদের পরে আবির্ভূত হয়েছি কিন্তু কেয়ামতের দিন আমরা সর্বাগ্রে থাকব। আমাদের আর একটা গৌরব এই যে আল্লাহতা'লা পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতি সপ্তাহে একটা দিনকে উপাসনার জন্যে নির্দিষ্ট করে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে জুমআ'র দিনই (শুক্রবার) ঐ দিন রূপে অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী ইহুদীরা ওর পরের (শনিবার) দিন এবং খৃষ্টানরা তার পরের (রবিবার) দিনকে বেছে নেয়। আমাদের প্রতি করুণা পরবশ হয়ে আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর নিজের পছন্দ ঐ জুমআ'র দিনকে আমাদের জন্য মনোনীত করে দিয়েছেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৯০. প্রতিশ্রুতির দিন হল কেয়ামতের দিন এবং যে দিনের জন্য সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তাহল আরাফাতের দিন, এবং যে দিন সাক্ষ্য দেয় তা হল শুক্রবার। ওর চেয়ে ভাল দিনে সূর্য উদিত বা অস্তমিত হয় না। সেই দিনে এমন একটা সময় আছে যখন কোন মোমেন বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে কোন উত্তম জিনিস প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তা পূরণ করেন। অথবা সে যদি কোন কিছু হতে আশ্রয় চায় তবে তিনি

তাকে তা থেকে আশ্রয় দেন।—তির। মিশ। (আহ্)। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৯১. নিশ্চয় শুক্রবারে এমন একটা সময় আছে যখন কোন মুসলমান বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে যে কল্যাণ কামনা করে আল্লাহ্ তাকে তা দান করেন।—শায়খান। বুখারী। মুস। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৩৯২. জুমআ'র দিন যে সময়ের এত আশা করা হয় তা নামাজের পরে থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোঁজ কর।—তির। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৩৯৩. শুক্রবারের সে আকাঙ্ক্ষিত সময়কে আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্বেষণ কর।—তির।

৩৯৪. জুমআ'র দিনের ঐ সময় সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—এ ইমামের বসার সময় থেকে নামাজের শেষ পর্যন্ত। মুস। বর্ণনায়ঃ আবু বোরদাহ্ (রাঃ)।

৩৯৫. আবু আবুস (রাঃ) জুমআ'র নামাজে যাবার পথে বলেছিলেন, আমি নবী (সঃ) কে বলতে শুনেছি যার দুই পা আল্লাহ্‌র পথে ধূলিমলিন হয় আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করেন।—বুখারী।

৩৯৬. জুমআ'র রাত্রি সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং জুমআর দিন সর্বাপেক্ষা দীপ্তিময়।—বায়হাকী।

৩৯৭. জুমআ'র নামাজে তিন শ্রেণীর লোক উপস্থিত হয়। একব্যক্তি বৃথা বাক্য সহ উপস্থিত হয়, ওর থেকে তার ঐই লাভ; আর এক ব্যক্তি প্রার্থনা সহ উপস্থিত হয়, সে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে, হয় উনি ওকে তা দান করেন নয় করেন না; আর এক ব্যক্তি মনোযোগ ও নীরবতা সহ উপস্থিত হয়। যে কোন মুসলমানদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে চলেনা বা কাউকে কোন কষ্ট দেয়না ও তার জন্য পরবর্তী জুমআ'র আরো তিন দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হয়, যেহেতু আল্লাহ্ বলেছেনঃ হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই জুমআর দিনকে উৎসবের দিন রূপে ধার্য করেছেন, অতএব তোমরা স্নান কর এবং যার কাছে সুগন্ধি দ্রব্য আছে সে তা ব্যবহার করুক, ওতে দোষ নেই এবং তোমরা দন্ত-মার্জন কর।—ই. মাজা। মালেক।

৩৯৮. জুমআর নামাজে উপস্থিত হবার পূর্বে প্রত্যেকেরই স্নান করে নেওয়া আবশ্যক।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৩৯৯. যে ব্যক্তি স্নান করে জুমআ'র নামাজে হাজির হয় এবং তার জন্য নির্ধারিত নামাজ সম্পাদন করে এবং ইমামের খোৎবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকে, তারপর ইমামের সঙ্গে নামাজ পড়ে, সে দুই জুমআর মধ্যবর্তী দিবসের এবং পরবর্তী তিনদিনের পাপ সমূহের জন্য ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়।—মুস।

৪০০. জুমআ'র দিন প্রত্যেক সাবালকের স্নান করা কর্তব্য। সে দাঁত পরিষ্কার করবে এবং সম্ভব হলে সুগন্ধি ব্যবহার করবে।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

৪০১. লোকেরা নিজের নিজের কাজ করত এবং যে অবস্থায় থাকত সেই অবস্থায় জুমআ' পড়তে যেত। তাই তাদের বলা হয়েছিল, 'যদি তোমরা স্নান করতে!' —বুখারী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৪০২. (মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের) গৃহবাসিগণ এবং (দু মাইল পূর্ববর্তী) আওয়ালীর অধিবাসিগণ পালাক্রমে জুমআ'র নামাজে হাজির হত। তারা ধূলোবালির মধ্য দিয়ে আসত, কাজেই তাদের গারে ধূলো ও ঘাম লেগে থাকত। তারপর আবার (মসজিদে অবস্থান কালে) তাদের শরীর থেকে ঘাম বের হত। একদিন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমার কাছে ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে ওদের একজন আসল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'তোমরা যদি অন্ততঃ আজকের দিনে (জুমআ'র দিনে) উত্তমরূপে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হতে!'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৪০৩. যে ব্যক্তি উত্তমরূপে স্নান করে প্রথম সময়ে জুমআর নামাজের জন্য উপস্থিত হবে সে (এত পুণ্যের অধিকারী হবে) যেন একটা উট কোরবানী করেছে। তার পরের সময়ে যে আসবে সে যেন একটা গোরু কোরবানী করেছে। তার পরের সময়ে যে আসবে সে যেন একটা দুম্বা কোরবানী করেছে। তার পরের সময়ে যে আসবে সে যেন একটা মোরগ কোরবানী করেছে। তারপর পঞ্চমাংশে যে আসবে সে যেন একটা ডিম দান করেছে। তারপর যখন ইমাম খোৎবার জন্য অগ্রসর হবেন তখন ফেরেশ্তাগণ (ঐ পুণ্য লেখা ক্ষান্ত দিয়ে) আল্লাহ্‌র জিকির শোনার জন্য মসজিদে চলে আসেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪০৪. যে ব্যক্তি জুম্‌আ'র দিন স্নান করবে, সাধ্যানুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে, তেল ব্যবহার করবে অথবা নিজের ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করবে, তারপর মসজিদে উপস্থিত হয়ে কাউকে কষ্ট দিয়ে মাঝখানে বসার চেষ্টা না করে যেখানে পায় সেখানে বসে পড়বে, তারপর যথাসাধ্য নামাজ পড়বে, ইমামের খোৎবা পাঠ-কালে নীরব থাকবে—তার সারা সপ্তাহের পাপ মাফ হয়ে যাবে।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ সালমান ফারসী (রাঃ)।

৪০৫. সূর্য যখন (পশ্চিম দিকে) ঝুঁকে পড়ত তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) জুমআ'র নামাজ পড়তেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৪০৬. আমরা সাহাবীরা জুমআ'র নামাজ যথাসম্ভব শীঘ্র পড়তাম এবং দ্বিপ্রহরের শয়নও জুমআ'র নামাজের পরেই হত।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৪০৭. যখন শীত অধিক হত তখন নবী (সঃ) জুমআ'র নামাজে ত্বরা করতেন, এবং যখন গ্রীষ্ম প্রখর হত তখন জুমআর নামাজে দেরী করতেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৪০৮. জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক শুক্রবার আমরা নবী (সঃ)-এর সঙ্গে নামাজের জন্য একত্র হয়েছিলাম। সে সময় একদল সওদাগর আসছিল; উপস্থিত লোকেদের অনেকেই সেদিকে অগ্রসর হল। নবী (সঃ)-এর সামনে কেবল বারোজন লোক বাকি রইলেন। সেই প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের এই বাণী অবতীর্ণ হল, 'একশ্রেণীর লোক ব্যবসা-বাণিজ্য ও রঙ-তামাসার সুযোগ দেখে সেই দিকে ছুটে গেল, (খোৎবা দানে) দাঁড়িয়ে-থাকা অবস্থায় আপনাকে পরিত্যাগ করে গেল, আপনি তাদের বলে দিন, আল্লাহ্‌তা'লার কাছে যা (সন্তুষ্টি ও পুণ্য) আছে তা ব্যবসা-বাণিজ্য ও রঙ-তামাসা অপেক্ষা উত্তম এবং আল্লাহ্‌তা'লাই মানুষের সর্বোত্তম জীবিকা দানকারী।'—বুখারী।

৪০৯. কোন মুসলমান যেন আর এক মুসলমান ভাইকে তার জায়গা থেকে তুলে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে—তা সে জুমআ'র দিন হোক বা অন্য কোন দিন হোক, মসজিদে হোক বা অন্য কোন জায়গায় হোক।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৪১০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-র কালে জুমআর নামাজের জন্য শুধুমাত্র এক আজান দেওয়া হত যা খোৎবার পূর্বে ইমাম মিম্বারে বসলে দেওয়া হয়। খলীফা ওসমান (রাঃ)-র কালে যখন মুসলমানদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল তখন তিনি 'যাওরা' নামক এক উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে ঐ খোৎবার আজানের পূর্বে আর এক আজান দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। —বুখারী : বর্ণনায়ঃ সায়েব ইবনে ইয়াজিদ (রাঃ)।

৪১১. সাহাবী মোয়াবিয়া (রাঃ) মিম্বারের ওপরে বসে' মুয়াজ্জিনের আজানের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আজানের শব্দসমূহ উচ্চারণ করলেন এবং আজান শেষে বললেন, 'হে লোক সকল! আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে এমনি করে বসে মুয়াজ্জিনের আজান শুনে এমনি করে' বলতে শুনেছি।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু উমামাহ্ (রাঃ)।

৪১২. নবী (সঃ) দাঁড়িয়ে খোৎবা (ভাষণ) দিতেন এবং বর্তমানের মত মাঝখানে একবার বসে পুনরায় দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খোৎবা দান করতেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ)।

৪১৩. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) জুমআ'র দিন দুটি খোৎবা দিতেন এবং দুই খোৎবার মাঝখানে বসতেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ)।

৪১৪. মসজিদের মধ্যে একটা খেজুর গাছের থাম ছিল। তার ওপরে ভর দিয়ে নবী (সঃ) খোৎবা দান করতেন। যখন তাঁর জন্য মিম্বার (বেদী) তৈরী করা হল এবং তিনি ঐ থাম ত্যাগ করে মিম্বারের ওপরে খোৎবা দিতে আরম্ভ করলেন তখন সদ্যোপ্রসবিনী উট যেমন করে আপন বাচ্চার জন্যে কাঁদে তেমনি করে ঐ কাঠের থামটাকে আমরা নিজেদের কানে কাঁদতে শুনলাম। এ দেখে যখন রসূলুল্লাহ্ মিম্বার থেকে নেমে এসে তার ওপরে হাত বুলোলেন তখন সে শান্ত হল।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ জাবের (রাঃ)।

৪১৫. জুমআ'র দিন ইমামের খোৎবা দান কালে যদি তোমার সঙ্গীকে 'চুপ কর' বল তবে বেহুদা কথা বললে।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

বেতের ও তাহাজ্জুদ

['বেতের' বা 'বিৎর' শব্দের অর্থ বেজোড়। ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-র মতে বেতের নামাজ তিন রাকাত এবং এ হল ওয়াজেব অর্থাৎ ফরজ নামাজের পরেই এর গুরুত্ব। তাহাজ্জুদ বা রাত্রির নামাজের সঙ্গে বেতের ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত।]

'রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বে—এ তোমার এক অতিরিক্ত

(নফল) কর্তব্য, আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত স্থানে প্রশংসিত করবেন।' ১৭(৭৯)

—আল্-কোরআন।

৪১৬. আল্লাহ্তা'লা বেজোড় (অর্থাৎ তিনি এক), তাই তিনি বেজোড় নামাজ ভালবাসেন। অতএব হে কোরআন-অনুসরণকারিগণ, তোমরা বেতের পড়।—তিরমিজী।

৪১৭. রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর নিজের ইচ্ছানুযায়ী রাত্রির বিভিন্ন অংশে (যেমন প্রথম, মধ্য ও শেষ অংশে) বেতের নামাজ পড়েছেন, কিন্তু তাঁর সর্বশেষ আমল ছিল শেষ রাত্রে বেতের পড়া।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৪১৮. রাতের সমস্ত নামাজের শেষে বেতের পড়ার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আদেশ দিয়েছেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইব্নে ওমর (রাঃ)।

৪১৯. তোমরা বেতেরকে তোমাদের রাত্রিকালীন সর্বশেষ নামাজে পরিণত কর।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইব্নে ওমর (রাঃ)।

৪২০. তোমরা রাত্রির শেষ নামাজকে বেজোড় কর।—শায়খান। আ. দাউদ।

৪২১. এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে তাহাজ্জুদের (রাত্রির) নামাজের নিয়ম জিজ্ঞাসা করল। তিনি (সঃ) বললেন, দুই দুই রাকাত করে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে থাকবে। যখন ভোর হবার আশঙ্কা করবে তখন এক রাকা'ত নামাজ পড়ে নেবে। ঐ এক রাকাতের দ্বারাই তার আগের নামাজ (বেজোড়ে) পরিণত হবে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইব্নে ওমর (রাঃ)।

৪২২. ফরজ নামাজের পর সর্বোৎকৃষ্ট নামাজ হচ্ছে নিশুতি রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাজ।—আহ্মদ। বয়হাকী।

৪২৩. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাহাজ্জুদের নামাজ (বেতের সহ) এগার রাকাত পড়তেন : এর মধ্যে এক একটা সিজ্দা এত দীর্ঘ করতেন যে সেই সময়ের মধ্যে কোরআনের পঞ্চাশটি আয়াত (বাক্য) আবৃত্তি করা যায়। আর ফজরের সুন্নত দুরাকাত পড়তেন, তারপর ডান পায়ের ওপরে শায়িত থাকতেন এবং মুয়াজ্জিন এসে খবর দিলে ফজরের নামাজের জন্য চলে যেতেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৪২৪. রসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রির সকল ভাগেই বেতের নামাজ পড়তেন, তবে শেষ দিকে তাঁর বিৎর প্রত্যূষের দিকে হত।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৪২৫. এমন কোন মুসলমান নেই যে আল্লাহ্র উপাসনা করতে করতে পবিত্র অবস্থায় শয্যায় শয়ন করে, তারপর রাত্রিকালে শয্যাত্যাগ করে' আল্লাতা'লার কাছে কল্যাণকামনা করে, আর আল্লাহ্ তাঁকে তা দান করেন না।—আ. দাউদ। মিশ।

৪২৬. গেদাইফ ইবনুল হারেস (রাঃ) বলেন ঃ আমি হজরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নবী (সঃ) যখন অপবিত্র অবস্থায় থাকতেন তখন রজনীর প্রথম না শেষ কোন্ অংশে তিনি গোসল করতেন ?' তিনি বললেন, 'কখনো প্রথমাংশে কখনো শেষাংশে।' আমি বললাম আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ ; সেই আল্লাহ্রই সমস্ত

প্রশংসা যিনি কাজের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন।' তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, 'তিনি রাত্রির প্রথম না শেষাংশে বেতের পড়তেন?' তিনি বললেন, 'কখনো কখনো শেষের দিকে পড়তেন।' আমি বললাম, 'সেই আল্লাহ্‌রই সমস্ত প্রশংসা যিনি কাজের মধ্যে আরাম দিয়েছেন।' আমি বললাম, 'তিনি কি (নামাজে) উচ্চৈঃস্বরে কোরআন পড়তেন না নিম্নস্বরে?' তিনি বললেন, 'কখনো উচ্চ, কখনো নিম্নস্বরে।' আমি বললাম, 'সেই আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যিনি কাজের মধ্যে মধ্যে শান্তি দান করেছেন।'—আবু দাউদ এবং সামান্য পরিবর্তিত আকারে ই. মাজা।

৪২৭. সা'দ বিন হিশাম (রাঃ) বলেন: আমি হজরত আয়েশা (রাঃ)-র কাছে গেলাম, তারপর বললাম, হে বিশ্বাসীদের জননী, আমাদের নবী (সঃ)-এর আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বলুন। তিনি বললেন, তুমি কি কোরআন শরীফ পড়নি? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, মহানবীর চরিত্র কোরআন শরীফের অনুরূপ। আমি বললাম, আমাকে হজরত রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বেতের নামাজ সম্বন্ধে বলুন। তিনি বললেন, আমরা তাঁর দাতন ও অজুর পানি তৈরী করে রাখতাম এবং যখন আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাঁকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করতেন। তারপর তিনি দাঁত মাজতেন, অজু করতেন এবং নয় রাকা'ত নামাজ না-বসে পড়তেন, শুধু অষ্টম রাকাতে বসতেন। তারপর আল্লাহ্‌র আরাধনা ও প্রশংসা করতেন এবং তাঁকে আহ্বান করতেন। এরপর তিনি বসতেন, আল্লাহ্‌র আরাধনা করতেন, প্রশংসা করতেন, আহ্বান করতেন এবং সালাম করতেন—তা আমরা শুনতে পেতাম। সালাম করার পর আরো দুরাকা'ত নামাজ বসে পড়তেন। এই এগার রাকাত। হে পুত্র! যখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর শরীর ভারী হয়ে গিয়েছিল তখন সাত রাকাতে বেতের (বেজোড়) করতেন এবং প্রথম বারের ন্যায় দুই রাকা'ত পড়তেন। হে পুত্র এই নয় রাকা'ত। হজরত নবী (সঃ) যখন কোন নামাজ পড়তে ভালবাসতেন তখন তিনি ও ক্রমাগত পড়তে থাকতেন এবং রজনীতে অধিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার জন্য যখন নিদ্রা বা কোনরূপ বেদনা তাঁকে অভিভূত করত তখন তিনি দিবাভাগে বারো রাকা'ত পড়তেন। আমি জানি না হজরত নবী (সঃ) সমগ্র কোরআন রজনীতে পাঠ করতেন কি না বা তিনি ভোর পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি নামাজ পড়তেন কি না এবং রমজানের মাস ছাড়া পুরোপুরি সম্পূর্ণ মাস রোজা রাখতেন কি না।—মুসলিম।

৪২৮. হজরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম, রসুলুল্লাহ্ (সঃ) কত রাকা'ত বেতের পড়তেন? তিনি বললেন, চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, ও দশ এবং তিন রাকাত বেতের পড়তেন। সাত রাকাতের কম এবং তের রাকাতের অধিক বেতের পড়তেন না। আ. দাউদ। বর্ণনায়: আব্দুল্লাহ্ বিন আবি কায়েস (রাঃ)।

৪২৯. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের একটা নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন যা (অতি মূল্যবান) লালবর্ণের উটের চেয়েও উত্তম—এশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময় আল্লাহ্ এর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। —তির। বর্ণনায়: খারেজাহ্ (রাঃ)।

৪৩০. বেতের প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজেব (অবশ্য পালনীয়)। যে পাঁচ রাকা'ত বেতের পড়তে চায় সে যেন তা পড়ে এবং যে তিন রাকা'ত বেতের পড়তে চায় সে যেন তা পড়ে। —আ. দাউদ। বর্ণনায়: আবু আইয়ুব (রাঃ)।

৪৩১. যে শেষ রাতে নামাজ পড়তে অসমর্থ হবে বলে' আশঙ্কা করে সে যেন প্রথম ভাগেই বেতের পড়ে। আর যে শেষরাতে নামাজ পড়তে পারবে বলে আশা রাখে সে যেন শেষ রাতেই বেতের পড়ে ; কেননা শেষ রাতের নামাজে সাক্ষী থাকে এবং তা উত্তম। —মুসলিম। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

৪৩২. যে নিদ্রার জন্য বেতের পড়তে পারেনা সে যেন ফজর (ভোর) হলে তা পড়ে। —তির। বর্ণনায় ঃ জায়েদ (রাঃ)।

৪৩৩. বেতেরের নামাজ দ্বারা ভোরকে ত্বরান্বিত কর। বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইব্নে ওমর (রাঃ)।

৪৩৪. যে বেতেরের সময় নিদ্রা যায় অথবা তা ভুলে যায় সে যেন জাগরিত হলে বা স্মরণ হলে তা পড়ে। —তিরমিজী। বর্ণনায় ঃ আবু সাঈদ (রাঃ)।

৪৩৫. আমাদের পবিত্র ও মহীয়ান প্রভু প্রতি রাতের শেষ প্রহরের এক-তৃতীয়াংশ সময় অবশিষ্ট থাকতে থাকতে সর্বনিম্ন আকাশে অবতরণ করেন ও বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেব, যে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে আমি তার সে প্রার্থনা পূরণ করব, যে ব্যক্তি আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে আমি তাকে ক্ষমা করব।' —শায়খান। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)। [ইমাম মুসলিম আরো বর্ণনা করেছেন—অতঃপর প্রভাত হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর হস্তদ্বয় প্রসারিত করে বলেন, 'কে তাঁকে ঋণ দেবে যে অভাবগ্রস্ত ও অত্যাচারী নয় ?']

৪৩৬. নিশ্চয় প্রতি রাত্রিতে এমন একটা সময় আছে যখন যে কোন মুসলমান আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের যা কিছু কল্যাণ কামনা করে সবকিছুই সে পায়। —মুসলিম।

৪৩৭. রাত্রির শেষ অর্ধভাগে প্রভু তাঁর দাসদের অধিকতর নিকটবর্তী হন। সেই সময়ে যাঁরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করেন যদি তুমি তাঁদের অন্তর্ভূত হতে চাও তবে তাই হও।—আ. দাউদ। নাসায়ী। বর্ণনায় ঃ আমুর বিন আব্বাস (রাঃ)।

৪৩৮. লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'হে রসুলুল্লাহ্, কোন্ প্রার্থনা মঞ্জুর হয় ?' তিনি বললেন, 'নিশুতি রাতের প্রার্থনা এবং ফরজ নামাজের শেষে যে প্রার্থনা করা হয় তা।' —তির।

৪৩৯. তোমরা রাত্রিতে নামাজে দাঁড়াবে যেহেতু এ তোমাদের পূর্ববর্তী ধার্মিকদের পদ্ধতি ছিল। এই হল তোমাদের প্রভুর নৈকট্য লাভ এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও পাপ থেকে নিবৃত্ত থাকার উপায়। —তির।

৪৪০. আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল হজরত দাউদের নামাজ এবং তাঁর রোজা। তিনি রাতের অর্ধাংশ নিদ্রা যেতেন। (তারপর) এক-তৃতীয়াংশ নামাজ পড়তেন। তারপর (আবার) এক-ষষ্ঠাংশ নিদ্রা যেতেন। তিনি একদিন রোজা রাখতেন একদিন আহার করতেন।—শায়।

৪৪১. হজরত দাউদ (আঃ) রজনীর এক বিশিষ্ট অংশে তাঁর পরিজনগণকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করতেন। বলতেন, 'হে দায়ুদের পরিজনগণ, ওঠ ও নামাজ পড়, যেহেতু এই সময় মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্ শুধু জাদুকর ও (অসাধু) ট্যাক্স-আদায়কারী ব্যতীত আর সকলের প্রার্থনা পূরণ করেন।' মিশ (আহ্‌মদ)।

৪৪২. আল্লাহ্ সেই পুরুষের প্রতি প্রসন্ন হন যে রজনীতে নামাজে দাঁড়ায় এবং তার স্ত্রীকে জাগরিত করে। তারপর সেও নামাজ পড়ে। যদি সে অস্বীকার করে তবে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ্ সেই রমণীর প্রতি সন্তুষ্ট হন যে রজনীতে জাগ্রত হয়ে নামাজে দাঁড়ায় এবং তার স্বামীকে জাগ্রত করে এবং স্বামীও নামাজ পড়ে। যদি স্বামী অস্বীকার করে তবে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। —আ, দাউদ। নাসায়ী।

৪৪৩. যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে রাতের নিদ্রা হতে জাগ্রত করে তারপর উভয়ে নামাজ পড়ে অথবা সে জামাতের সাথে দুই রাকাত নামাজ পড়ে তবে তারা (আল্লাহ্র) আরাধনাকারী ও আরাধনাকারিণীদের অন্তর্গত হয়। আ. দায়ুদ। ই. মাজা।

৪৪৪. আব্দুল্লাহ্ ইব্নে ওমর (রাঃ) বলেন, তাঁর পিতা হজরত ওমর ইবনোল খাত্তাব (রাঃ) রজনীতে আল্লাহ্ যতক্ষণ ইচ্ছা করতেন ততক্ষণ নামাজ পড়তেন। তারপর যখন রাত্রি শেষ হতে থাকত, তখন পরিজনগণকে নামাজের জন্য জাগ্রত করতেন, তারপর এই আয়াত পাঠ করতেন: 'তোমরা পরিজনবর্গকে নামাজ পড়ার আদেশ দাও এবং ওতে দৃঢ় ও ধৈর্যশীল হও। আমি তোমার কাছে আহার্য চাই না। আমি তোমাকে আহার্য দান করি, পরহেজগারির জন্যই উত্তম পরিণাম।' (২০ : ৩২)।—মালেক।

৪৪৫. তিনের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন—যে ব্যক্তি রজনীতে নামাজে দাঁড়ায়, যে সম্প্রদায় শ্রেণীবদ্ধভাবে নামাজে দাঁড়ায় এবং যে জাতি শ্রেণীবদ্ধভাবে শত্রুর সম্মুখীন হয়।—মিশকাত।

৪৪৬. আমাদের প্রভু দুই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হন, ওদের একজন হল সেই ব্যক্তি যে নামাজের জন্য তার প্রিয়জন ও পরিজনের মধ্যস্থিত কোমল শয্যা ও লেপ পরিত্যাগ করে। আল্লাহ্ তার ফেরেশতাদের বলেন, আমার এই বান্দার দিকে লক্ষ্য কর—সে নামাজের জন্য এবং আমার কাছে যে (পুরস্কার) আছে তার আশায় এবং আমার কাছে যে (শাস্তি) আছে তার আশঙ্কায় তার প্রিয়জন, পরিজন, এবং কোমল শয্যা ত্যাগ করেছে॥ অপরজন হল সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, তারপর তার সহচরবৃন্দসহ পরাজিত হয়। তারপর জানতে পারে পরাজয়ের সঙ্গে ও পলায়নের সঙ্গে কি (বিপদ ও লজ্জা) জড়িয়ে আছে। তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত যুদ্ধ করে। তখন আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাদের বলেন, 'আমার দাসের প্রতি লক্ষ্য কর—আমার কাছে যা আছে তার আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় সে যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং তার রক্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করেছে।'—মিশ।

৪৪৭. যে ব্যক্তি গভীর রজনীতে নামাজে দাঁড়িয়ে দশটি আয়াত পাঠ করে তাকে অমনোযোগী বলা চলে না এবং যে ব্যক্তি একশ আয়াত পাঠ করে তাকে আল্লাহ্র অনুগত ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা হয় এবং যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত পাঠ করে সে 'আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্গত হয়।—আ. দাউদ।

৪৪৮. নবী (সঃ) বলেছেন, হে আব্দুল্লাহ্, অমুক ব্যক্তির মত হয়োনা যে রাত্রে উঠে নামাজ পড়ত তারপর সেই নামাজ পড়া ত্যাগ করেছে। —শায়। বর্ণনা: আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমুর ইবনুল আস (রাঃ)।

৪৪৯. আমার উম্মতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত তারাই যারা কোরআনের বাহক এবং রাত্রির অধিবাসী [অর্থাৎ যারা কোরআন অনুসারে কাজ করে এবং রাত জেগে উপাসনা করে।]

৪৫০. তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নিদ্রিত থাকে তখন শয়তান তার মাথার খুলিতে তিনটি গিঁঠ দেয়। প্রত্যেকটি গিঁঠ দেবার সময় সে বলে, এখনো অনেক রাত আছে ভালকরে ঘুমাও। যদি সে জেগে ওঠে, তারপর আল্লাহ্‌র জেকের (স্মরণ) করে, তার একটা বাঁধন খুলে যায়। তারপর যদি নামাজ পড়ে, তবে শেষ বাঁধনটাও খুলে যায়। অতএব ভোরে সে সুখী ও প্রফুল্ল-মনে জাগরিত হয়, নয়তো সে প্রভাতে বিরক্তিভরা মন নিয়ে অলসের মত জাগ্রত হয়।—শায়খান।

৪৫১. শরীফ আল হাওজিনি বলেন, আমি হজরত আয়েশা (রাঃ)র কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাবে রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) রাত্রিকালে নিদ্রা হতে জাগরিত হয়ে নামাজ আরম্ভ করতেন? তিনি বললেন, তুমি আমাকে এমন প্রশ্ন করেছ যা এর আগে কেউ আমাকে আর কোন দিন করেনি। রাত্রিকালে জাগরিত হয়ে তিনি দশবার 'অল্লাহু আকবর' (আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ) বলতেন, দশবার 'আলহামদোলিল্লাহ্‌' পাঠ করতেন, দশবার 'সোবহানাল্লাহে বেহামদিহি' এবং দশবার সোবহানা মালেকুল কুদ্দুস' পাঠ করতেন। তারপর বলতেন, 'হে আল্লাহ্‌ পৃথিবীর বিপদ ও কেয়ামতের দুঃখদুর্দশা থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি।' তারপর নামাজ শুরু করতেন।—আ. দাউদ।

৪৫২. রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) রাত্রিকালে যখন জাগ্রত হতেন তখন বলতেন, 'তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তোমারই পবিত্রতা ঘোষিত হউক। হে আমার আল্লাহ্‌, সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তোমারই কাছে আমার পাপের মার্জনা ভিক্ষা করি এবং তোমারই দয়া প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্‌, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর; তুমি আমাকে পরিচালিত করার পর আমার আত্মাকে বিপথগামী করোনা। তুমি অনুগ্রহ দান কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।'—আ. দাউদ।

৪৫৩. হজরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) কি (সুরা) দিয়ে বেতের পড়তেন? তিনি বললেন, 'প্রথম রাকাতে 'সাব্বে হিসমা রাব্বিকাল আ'লা' সুরা, দ্বিতীয় রাকা'তে 'ক্বোল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরুন' এবং তৃতীয় রাকা'তে 'ক্বোলহু আল্লাহু আহাদ' এবং শেষ দুই সুরা পাঠ করতেন।—আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ আব্দুল আজীজ (রাঃ)।

৪৫৪. আনাস (রাঃ)-কে (বেতেরের) দোয়া-কুনুৎ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই দোয়া-কুনুৎ (প্রচলিত) ছিল।' তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'রুকুর পূর্বে না পরে?' তিনি বললেন, 'পূর্বে।' আবার তাঁকে বলা হল, 'অমুক লোক বলে আপনি (নাকি) বলেছেন রুকুর পরে?' তিনি বললেন, 'সে ভুল বলেছে; রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) মাত্র একমাস রুকুর পরে কুনুৎ পড়েছিলেন।'
—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৪৫৫. হাসান বিন আলী (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) আমাকে কয়েকটি দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যা আমি বিৎর-এর কুনুতে পাড়ি। (যথা), 'হে আল্লাহ্‌ যাদের তুমি পরিচালিত করেছ তাদের সাথে আমাকেও পরিচালিত কর, যাদের তুমি ক্ষমা করেছ তাদের সাথে আমাকেও ক্ষমা কর' এবং যাদের তুমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছ আমাকে তুমি তাদের অন্তর্ভূত করে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর এবং আমাকে যা দিয়েছ

তাতে আশীর্বাদ কর। যে অকল্যাণ তুমি নির্ধারিত করেছ তার হাত থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর। নিশ্চয় তুমি বিচার কর, কেউই তোমার বিপক্ষে বিচার করতে পারে না; নিশ্চয়ই তুমি যার বন্ধু হও কেউ তাকে অসম্মান করতে পারে না, হে প্রভু, তুমিই আশীর্বাদপ্রাপ্ত ও মহীয়ান।

হে আল্লাহ্, আমরা তোমারই সাহায্য ভিক্ষা করি এবং তোমারই ক্ষমা প্রার্থনা করি। তোমাকেই আমাদের প্রভুরূপে বিশ্বাস করি এবং তোমারই ওপর নির্ভর করি, (তোমাদের প্রদত্ত) কল্যাণের জন্য প্রশংসা করি, তোমারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তোমাকে অস্বীকার বা অবিশ্বাস করি না। যে তোমার অবাধ্য হয় তাকে আমরা বর্জন করি ও পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ্! একমাত্র তোমারই আমরা উপাসনা করি, তোমারই (করুণা) প্রার্থনা করি, সিজদা করি, তোমার দিকে দ্রুত-বেগে ধাবিত হই, তোমার দয়া আশা করি এবং তোমার শাস্তি আশংকা করি, নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি অবিশ্বাসীদের গ্রাস করবে।'—তির। আ. দাউদ। নাসায়ী। ই, মাজা।

৪৫৬. নবী (সঃ) যখন রাত্রিকালে তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য দাঁড়াতেন তখন বলতেন, 'হে আল্লাহ্, তোমারই সমস্ত প্রশংসা, তুমিই আকাশ, পৃথিবী এবং তদুভয়ের মধ্যে যা-কিছু আছে সমস্ত কিছুর রক্ষক। তোমারই প্রশংসা, তুমি আকাশ, পৃথিবী ও তদুভয়ের মধ্যবর্তী সকলের আলোক দাতা এবং তোমারই প্রশংশা তুমিই আকাশ পৃথিবী ও তদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সব কিছুরই সম্রাট। তোমারই সমস্ত প্রশংসা। তুমিই সত্য, তোমারই প্রতিজ্ঞা সত্য এবং পরলোকে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের কথা সত্য; তোমার বাণী সত্য, বেহেশ্‌তে সত্য, দোজখ সত্য, নবীগণ সত্য, মুহম্মদ (দঃ) সত্য ও কেয়ামত সত্য। হে আমার আল্লাহ্, তোমারই প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি, তোমাতেই বিশ্বাস করেছি এবং তোমারই ওপর নির্ভর করেছি; তোমারই দিকে ফিরেছি এবং (বিপদে) তোমারই সাহায্যপ্রার্থী হয়েছি। তোমারই কাছে (ন্যায়) বিচার আশা করেছি। অতএব, পূর্বে আমি যা করেছি এবং পরে যা করব, গোপনে যা করি ও প্রকাশ্যে যা করি এবং যা তুমি আমায় সম্বন্ধে আমার চেয়েও ভাল জান সকলই আমার ক্ষমা কর। তুমিই আদিম, তুমিই অন্তিম। তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং তোমা ব্যতীত আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয়।' —শায়খান। বর্ণনায়ঃ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)।

৪৫৭. ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একরাত্রে আমি আমার খালা আম্মা মায়মুনার বাড়ীতে অবস্থান করি। নবী (সঃ) তখন তাঁর কাছে ছিলেন। তিনি ঘণ্টা খানেক তাঁর স্ত্রী বিবি মায়মুনার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন, তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন রজনীর শেষ প্রহরের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হল, তিনি উঠে বসে আকাশের দিকে তাকালেন তারপর পাঠ করলেন, 'নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃজনে এবং রজনী ও দিবসের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে'—থেকে সূরাটির শেষ পর্যন্ত। তারপর তিনি পানির পাত্রের কাছে গেলেন। তার থেকে আর একটা পাত্রে পানি ঢাললেন তারপর উৎকৃষ্টরূপে অজু করলেন এবং অতিরিক্ত পানি ফেললেন না। এ ছিল তাঁর উভয় অজুর মধ্যবর্তী অজু। তারপর দাঁড়ালেন ও নামাজ পড়লেন। আমিও তখন উঠলাম ও অজু করলাম। তারপর তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার কান ধরে ডান দিকে আনলেন। তারপর তিনি ১৩ রাকাত নামাজ শেষ করলেন। তারপর তিনি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ

করলেন, নিদ্রিত হলেন, তাঁর নাক ডাকতে লাগল। যখনই তিনি নিদ্রিত হতেন তখনই তাঁর নাক ডাকত। বেলাল আজান দিয়ে তাঁকে আহ্বান করলেন। তারপর তিনি নামাজ পড়লেন কিন্তু অজু করলেন না, (কারণ নিদ্রিত অবস্থাতেও তাঁর অজু নষ্ট হত না) এবং তিনি এই দোয়া পড়লেন—'হে আল্লাহ্, আমার হৃদয়ে আলোক দাও এবং আমার নয়নে জ্যোতিঃ দাও, আমার কানে আলো দাও। আমার দক্ষিণে, বামে, উপরে, নীচে, সামনে, পেছনে আলোক দাও এবং আমাকে আলোকে বিভূষিত কর।' (অন্য বর্ণনায় আছে) 'আমার রসনায়, আমার অস্থি-মজ্জায়, মাংসে, রক্তে, লোমে লোমে ও সর্বশরীরে আলোক দান কর। আমার আত্মা আলোকিত কর ও আমার আলো বৃদ্ধি কর।'—শায়খান।

৪৫৮. নবী (সঃ)-এর একজন সহচর বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গে একদিন বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। তিনি কিভাবে নামাজ পড়েন এবং তাঁর কাজকর্ম কেমন তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। যখন তিনি 'এতমা' নামে কথিত এশার নমাজ শেষ করলেন, তখন কিছু রাত নিদ্রিত রইলেন, তারপর জেগে উঠলেন এবং দিগন্তের দিকে তাকালেন, তারপর 'হে প্রভো, তুমি একে বৃথা সৃষ্টি করনি' থেকে 'নিশ্চয় তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর না' পর্যন্ত পাঠ করলেন। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তার শয্যা থেকে দাঁতন-টা তুলে নিলেন, তাঁর পার্শ্ববর্তী বালতি থেকে একটা পাত্রে পানি ঢাললেন, অজু করলেন এবং নামাজে দাঁড়ালেন। তিনি এতক্ষণ পর্যন্ত নামাজ পড়লেন যে, আমি বললাম, তিনি যতক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন ততক্ষণই নামাজ পড়লেন। তারপর (আবার) নিদ্রিত হলেন। আমি বললাম, যতক্ষণ তিনি নামাজ পড়েছেন, ততক্ষণ নিদ্রা দিয়েছেন। তারপর জাগ্রত হলেন এবং প্রথমবার যেমন করেছিলেন তেমন করলেন এবং প্রথম বার যেভাবে নামাজ পড়েছিলেন সেইভাবে নামাজ পড়লেন। এইভাবে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত তিনবার করলেন।—নাসায়ী। বর্ণনায়ঃ হোমাইদ ইব্নে আব্দুর রহমান ইব্নে আউফ (রাঃ)।

৪৫৯. নবী (সঃ) যখন নিশুতি রাতে নামাজের জন্যে দাঁড়াতেন তখন এই বলে, নামাজ শুরু করতেন, 'হে আল্লাহ্! জিব্রাইল মিকাইল ও ইস্রাফিলের প্রভূ! আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞানী! তোমার বান্দাগণ যে বিষয়ে বিরোধ করে তুমি তার সঠিক সমাধান কর। যে সত্য সম্বন্ধে তারা বিরোধ করে, আপন অনুমতিতে তুমি আমাকে সেই দিকে পরিচালিত কর; তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সঠিক পথের (সেরাতল মুস্তাকিমের) দিকে পরিচালিত কর।'—মুসলিম। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৪৬০. হোজায়ফা (রাঃ) বলেছেন, তিনি নবী (সঃ)-কে (নিশুতি) রাতের নামাজ পড়তে দেখেছেন। তিনি ৩ বার বললেন, 'আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ—তিনি সাম্রাজ্য, শক্তি, মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।' তারপর তিনি 'আলহামদো' সূরা দ্বারা শুরু করলেন (এবং) 'সূরা বাকারা' শেষ পর্যন্ত পড়লেন, তারপর রুকুতে গেলেন। তাঁর রুকুর সময়, তাঁর দাঁড়িয়ে-থাকার সময়ের সমতুল্য ছিল। (অর্থাৎ যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন ততক্ষণ রুকুতে রইলেন)। তিনি রুকুতে বললেন, 'আমার মহিমান্বিত প্রভুর পবিত্রতা ঘোষিত হউক।' তার পর তিনি রুকু থেকে মাথা তুললেন এবং রুকুরই সমান সময় দাঁড়িয়ে রইলেন আর বললেন, 'আমার প্রভুরই সমস্ত প্রশংসা।' তারপর তিনি সিজদা করলেন যা তাঁর দাঁড়ানর সময়েরই সমতুল্য ছিল। তিনি

সিজদায় বললেন, 'আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুর পবিত্রতা ঘোষিত হউক।' তারপর তিনি সিজদা থেকে মাথা তুললেন এবং দুই সিজদায় মাঝখানে এক সিজদার সময় বসে রইলেন আর বললেন, 'হে প্রভো! আমার ক্ষমা কর। হে প্রভো! আমার ক্ষমা কর।' তারপর তিনি ৪ রাকাত নামাজ পড়লেন, তাতে তিনি সুরা আল্-বাকারা, আল্-ইমরান, আন্নিসা, আল্-মায়েদা বা আল্-আনয়াম, পাঠ করলেন। [রুকু সিজদা বসা দাঁড়ানর এই সমান সময় দেখে এই নামাজে তাঁর কঠোর সাধনা ও গভীর একাগ্রতার বিষয় উপলব্ধি করা যায়।]—আবু দাউদ।

সুন্নত নামাজ

৪৬১. যে ব্যক্তি আমার সুন্নত (অর্থাৎ নিয়ম) ভালবাসে সে আমাকে ভালবাসে; যে আমাকে ভালবাসে সে বেহেশ্তে আমার সঙ্গে থাকবে।—সাগির।

৪৬২. যে আমার সুন্নত পালনে বিমুখ হয়, সে আমার দলের অন্তর্গত নয়।—সাগির।

৪৬৩. যে ব্যক্তি দিনে-রাতে বারো রাকাত (সুন্নত) নামাজ পড়ে তার জন্য বেহেশ্তে একটা গৃহ নির্মাণ করা হবে—জোহরের (ফরজের) পূর্বে পূর্বে ৪ রাকাত, ও পরে ২ রাকাত, মগরেবের (ফরজের) পরে ২ রাকাত, এশার (ফরজের) পর ২ রাকাত এবং ফজরের (ফরজের) পূর্বে ২ রাকাত।—তির। মুস (সামান্য পরিবর্তিত)।

৪৬৪. যে ব্যক্তি মগরেবের পর ৬ রাকাত নামাজ পড়ে এবং ঐ সময় কোন কু-কথা বলে না সে ১২ বছরের উপাসনার সমান পুরস্কার পাবে।—তির।

৪৬৫. ফজরের দু রাকাত (সুন্নত) নামাজ পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী সকল কিছু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।—মুসলিম। বর্ণনায় : আয়েশা (রাঃ)।

৪৬৬. যে ব্যক্তি জোহরের ফরজের পূর্বে ৪ রাকাত ও পরে ৪ রাকাত নামাজ সব সময় পালন করে, আল্লাহ্ তার জন্য দোজখের আগুন হারাম করে দেন।—আ: দাউদ। তির। ই. মাজা। নাসায়ী। মিশ। বর্ণনায় : উম্মে হাবিবা (রাঃ)।

৪৬৭. যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে ৪ রাকাত (সুন্নত) নামাজ পড়ে—আল্লাহ্ তার প্রতি করুণা বর্ষণ করুন।—তির। মিশ। আ. দাউদ।

নফল নামাজ

৪৬৮. একদিন প্রত্যূষে রসুলুল্লাহ্ (সঃ) শয্যা ত্যাগ করলেন, তারপর বেলালকে ডাকলেন এবং বললেন, 'কিসের দ্বারা তুমি আমার আগে বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারলে? যখনই আমি বেহেশতে প্রবেশ করেছি, তখনই তোমার পাদুকার খস্ খস্ শব্দ আমি আমার সম্মুখে শুনতে পেয়েছি।' বেলাল বলল, 'হে রসুলুল্লাহ্, যখনই আমি আজান দিয়েছি, তখনই দু রাকাত (নফল) নামাজ পড়েছি এবং যখন কোন ঘটনা ঘটেছে তখনই আমি অজু করেছি এবং মনে করেছি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র

জন্য আমার ওপর দু রাকাত নামাজের দায়িত্ব রয়েছে।' তারপর রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'ঐ দু রাকাতের জন্য' (তুমি আমার আগে বেহেশতে প্রবেশ করেছ)। —তির। বর্ণনায় ঃ বোরায়দা (রাঃ)। [শায়খানে এই হাদীসটি আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন]।

৪৬৯. যখনই কোন বিষয় নবী (সঃ)-কে বেদনা দিত তখনই তিনি নামাজ পড়তেন। —আ. দাউদ। বর্ণনায় ঃ হোজায়ফা (রাঃ)।

৪৭০. নিশ্চয় রোজ কেয়ামতে সর্বাগ্রে মানুষের যে কাজের হিসেব গ্রহণ করা হবে তা হল নামাজ। যদি তা নির্দোষ হয়, তবে সে সাফল্য ও মুক্তি লাভ করবে এবং যদি তা দোষযুক্ত হয়, তবে সে নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরজ নামাজের কিছু অংশ কম হয়, তবে মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল নামাজ আছে কিনা যা দিয়ে তার ঘাটতি পূরণ করা যেতে পারে। এইভাবে তার অবশিষ্ট কাজগুলোর হিসাব-নিকাশ হবে। —আবু দাউদ। মিশ।

উদ্দেশ্যমূলক নফল নামাজ

৪৭১. আল্লাহ্ অথবা মানুষের কাছে যার কোন প্রয়োজন আছে, সে উত্তমরূপে অজু করবে, তারপর দু রাকাত নামাজ পড়বে, তারপর আল্লাহ্তা'লার প্রশংসা করবে, তারপর নবী (সঃ)-এর প্রতি দরুদ পড়বে, তারপর বলবে, 'ধৈর্যশীল, দাতা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন উপাস্য নেই; মহিমান্বিত সিংহাসনের অধীশ্বর আল্লাহ্রই পবিত্রতা ঘোষিত হউক এবং নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকেরই সমস্ত প্রশংসা। আমি তোমার করুণা লাভের আশা করি এবং মার্জনা লাভের সুদৃঢ় প্রত্যাশা পোষণ করি, প্রত্যেক পুণ্য থেকে লাভ আশা করি এবং প্রত্যেক পাপ থেকে তোমার নিরাপত্তা ভিক্ষা করি। হে দয়াবানদের মধ্যে সর্বাধিক দয়াবান, আমার একটা পাপও অমার্জনীয় রেখো না, একটা বিপদও অদূরীভূত রেখো না এবং একটা অভাবও আপন অনুগ্রহে অপূরণীয় রেখো না।'—ই. মাজা। তির। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু আউফা (রাঃ)। [এ নামাজটি 'সালাতোল হাজাত' নামে পরিচিত।]

৪৭২. জাবের (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের যেমন কোরআন শরীফের সুরা শিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমনি সমস্ত কাজে প্রয়োগ করার জন্যে কল্যাণকামনা করা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজ করতে মনস্থ করে তখন সে দু রাকাত নফল নামাজ পড়বে, তারপর বলবে, 'হে আল্লাহ্, আমি তোমার জ্ঞান দ্বারা তোমার কাছে কল্যাণকামনা করছি এবং তোমার শক্তি দ্বারা তোমার কাছে শক্তি ভিক্ষা করছি ও তোমার মহান করুণা কামনা করছি। নিশ্চয় তুমি শক্তিমান, আমি শক্তিহীন; তুমি জ্ঞানময় আমি জ্ঞানহীন, আর গোপন জ্ঞানের বিষয়ে তুমি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। হে আল্লাহ্! যদি তুমি জান যে এই কাজ আমার ধর্ম, জীবিকা ও পরিণামের পক্ষে কল্যাণকর তবে আমাকে ওর জন্যে শক্তিদান কর, আমার জন্যে ও সহজ কর, তারপর ওতে আমাকে আশীর্বাদপ্রাপ্ত কর; আর যদি এই কাজ আমার ধর্ম, জীবিকা ও পরিণামের (অথবা আমার ইহকাল ও পরকালের) পক্ষে অকল্যাণকর হয় তাহলে আমার কাছ থেকে তুমি একে দূরীভূত

কর এবং আমাকে ওর থেকে মুক্ত কর এবং যেখানেই থাকুক আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারিত কর এবং আমাকে ওতে সন্তুষ্ট হতে দাও।' তিনি বললেন, 'তিনি তাঁর হাজত সম্বন্ধে উল্লেখ করতেন।' [বিবাহ, বাণিজ্য, চাকুরী, বিদেশযাত্রা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শুরুতে আল্লাহরকাছে এই দোয়া দ্বারা কল্যাণকামনা করার বিধান আছে] —বুখারী।

৪৭৩. যে ব্যক্তি কল্যাণ কামনা করে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, এবং যে ব্যক্তি পরামর্শ করে সে অনুতপ্ত হয় না।

৪৭৪. হজরত নবী (সঃ) আব্বাস ইব্‌নে আব্দুল মুত্তালিবকে বললেন, 'হে আব্বাস! হে চাচাজান, আমি কি আপনাকে কিছু দেব না, আপনাকে কিছু দান করব না, আপনাকে কিছু জানাব না? আমি কি আপনাকে দশটি পুণ্য লাভের অধিকারী করব না, যখন আপনি তা পালন করবেন তখন আল্লাহ্ আপনার সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ, অতীত ও বর্তমান, স্বেচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, গুপ্ত ও বাহ্য সকল রকমের পাপ মার্জনা করবেন? ও এই যে আপনি ৪ রাকাত নামাজ এইভাবে পড়বেন—প্রথম রাকা'তে আলহামদো সূরা শেষ করার পর আর একটা সূরা পড়বেন, সেটা পড়া শেষ হলে ঐ দাঁড়ান অবস্থাতেই 'সোবহানাল্লাহে আলহামদোলিল্লাহে অ লা ইলাহা ইল্লাল্লহো আল্লাহু আকবর' ১৫ বার পড়বেন, তারপর রুকুতে যাবেন এবং রুকুতে থাকা অবস্থায় ওটা দশবার পড়বেন, তারপর রুকু থেকে মাথা তুলে ও দশবার বলবেন, তারপর সিজদাতে দশবার বলবেন, তারপর সিজদা থেকে মাথা তুলে দশবার পড়বেন, তারপর সিজদা করবেন এবং ১০ বার পড়বেন এবং পুনরায় সিজদা থেকে মাথা তুলবেন এবং ১০ বার পড়বেন। এইভাবে প্রতি রাকাআতে ৭৫ বার। ৪ রাকাতেই এরকম করবেন। যদি পারেন তবে প্রত্যহ একবার পড়ুন, নতুবা প্রতি সপ্তাহে একবার, নতুবা প্রতি মাসে একবার, নতুবা প্রতি বৎসরে একবার, তাও যদি না পারেন তবে (অন্ততঃ) সারা জীবনে একবার ও পাঠ করবেন।' [এ নামাজকে সালাতোত্তাসবিহ্ বলে।]—তির। ই. মাজা। বয়হাকী। আ. দাউদ। বর্ণনায়ঃ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)।

রমজানের রোজা

[রমজান শব্দের অর্থ পুড়িয়ে ফেলা। রমজান মাসে দীর্ঘ মাসকালব্যাপী এই রোজা অর্থাৎ উপবাস মুসলমানের পাপ ও অকল্যাণকে পুড়িয়ে ফেলে এবং তাদের সংযম শিক্ষা দেয় বলে এর আর এক নাম সিয়াম বা সংযম। এরোজা ফরজ।]

'হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের জন্য উপবাসের (রোজা বা সিয়ামের) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা আত্ম-রক্ষা করতে পার। (এ উপবাস) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের (অর্থাৎ রমজান মাসের) জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা প্রবাসে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর যে ব্যক্তির রোজা রাখা দুঃসাধ্য তার পক্ষে (একটা রোজার পরিবর্তে) একজন দরিদ্রকে অন্নদান করা কর্তব্য। তবুও যদি কেউ নিজের খুশীতে পুণ্য কাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর এবং যদি তোমরা

উপলব্ধি করতে পারতে তবে বুঝতে পারতে উপবাসব্রত পালনই তোমাদের পক্ষে অধিকতর কল্যাণপ্রসূ। রমজান মাসে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী রূপে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন অবশ্যই উপবাস করে। আর যে রোগী অথবা মুসাফির (প্রবাসী) তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের (জন্য যা) সহজ (তা) করতে চান, তোমাদের কষ্ট চান না। উদ্দেশ্য, যাতে তোমরা (নির্ধারিত দিনের উপবাসের সংখ্যা) পূর্ণ করতে পার। আর তোমাদের সৎপথে চালিত করার জন্যে তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করবে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই, অতএ; তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক—যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে। রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের অঙ্গাবরণ এবং তোমরা তাদের অঙ্গাবরণ। আল্লাহ্ জানতেন যে তোমরা আত্মপ্রতারণা করছ। তাই তো তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব এখন তোমরা তোমাদের পত্নীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা থেকে উষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতিভাত না হয়। তারপর রাত্রি পর্যন্ত রোজা পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে "এ'তেফাক" রত অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস কর না। এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা। সুতরাং এর ধারে কাছে যেওনা। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে।' ২ (১৮৩- ১৮৭)।

—আল্-কোরআন।

৪৭৫. তোমাদের কাছে সম্মানিত ও পবিত্র রমজান মাস এসেছে, আল্লাহ্‌তা'লা ওর রোজা তোমাদের জন্য ফরজ করেছেন। সেই মাসে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং দোজখের দ্বার রুদ্ধ হয় এবং শয়তান আল্লাহ্‌র জন্য শৃঙ্খল-বদ্ধ হয়। সেই মাসে এমন এক রাত আছে যা সহস্র মাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। যে ব্যক্তি সেই মাসে পুণ্যকাজ করে না, তার জন্য কোন পুরস্কার নেই। -নাসায়ী। ই. মাজা (সংক্ষিপ্তাকারে)।

৪৭৬. যখন রমজান মাস আসে তখন বেহেশ্‌তের দুয়ারগুলো মুক্ত করা হয় এবং দোজখের দুয়ারগুলো বন্ধ করা হয়; আর শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৭৭. রমজানের নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা রেখো না এবং (পরের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা বন্ধ করো না—যদি তোমাদের ওপর মেঘ থাকে তবে সম্পূর্ণ মাস (৩০ দিন) গণনা কর।—শায়খান। বুখারী। বর্ণনায়ঃ ইব্‌নে ওমর (রাঃ)।

৪৭৮. ঊনত্রিশ রাত্রিতে এক মাস হয়, অতএব চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা রেখো না এবং যদি তোমাদের ওপর মেঘ থাকে তবে ত্রিশটি (রোজা) পূর্ণ কর।—শায়খান।

৪৭৯. যে ব্যক্তি রমজানের রোজা বাকি রেখে মারা যায় তার প্রত্যেক দিনের জন্য তার উত্তরাধিকারীকে এক-একজন দরিদ্রকে ভোজন করাতে হবে।—তির।

৪৮০. ইব্‌নে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'একজন কি অপরের জন্য রোজা রাখতে বা একজন কি অপরের জন্য নামাজ পড়তে পারে?' তিনি বললেন, 'না, একজন অন্য জনের জন্য নামাজ পড়তে বা রোজা রাখতে পারে না।' —মালেক।

৪৮১. আনাস (রাঃ) বলেছেন ঃ একদিন আমরা নবী (সঃ)এর সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে অনেক রোজদার ছিল। পরে এক গরমের দিনে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছুলাম। আমাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে চাদর ছিল তারা তার দ্বারা ছায়া করল আর অনেকে রোদ্দুর থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাথার ওপর হাত রাখল। রোজাদারেরা (উপবাসীরা) বসে রইল এবং বেরোজাদারেরা (যারা উপবাসী নয়) তাদের মাথার ওপর ছায়া করে দাঁড়িয়ে রইল, আর তাদের কেউ কেউ তাঁবু খাটাতে লাগল এবং ভারবাহী পশুদের পানি খাওয়াতে লাগল। তারপর নবী (সঃ) বললেন, 'আজ বেরোজাদারেরা সমস্ত পুণ্য লুট করে নিল।'—শায়খান। নাসায়ী।

৪৮২. বেহেশ্‌তে আটটা দরজা আছে। তার মধ্যে একটাকে রাইয়ান (অর্থাৎ তৃপ্তিদায়ক) বলা হয়। কেয়ামতের দিন রোজাদারেরাই ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, অপর কেউই ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। ডাক দেওয়া হবে, 'রোজাদারেরা কোথায়?' তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তারা ছাড়া অন্য কেউ ঐ দরজায় প্রবেশ করবে না। তারপর যখন তারা সকলে প্রবেশ করবে, দরজা বন্ধ করা হবে। সুতরাং আর কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ সাহল বিন সা'দ (রাঃ)।

৪৮২. (ক) আল্লাহ্‌ মুসাফিরের (অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত ভ্রমণকারীর) জন্য নামাজ অর্ধেক এবং রোজা মাফ করে দিয়েছেন। স্তন্যদাত্রী জননী ও গর্ভবতী রমণীর জন্যও রোজা মাফ করেছেন।—আ. দাউদ। তির। নাসায়ী। ই. মাজা।

৪৮৩. যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সঙ্গে ও পুণ্য লাভের আশায় রমজানের রোজা পালন করে তার অতীত পাপ মার্জনা করা হয় এবং যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সঙ্গে পুণ্য লাভের আশায় রমজান মাসে (নামাজে) দাঁড়িয়ে থাকে, তার অতীত পাপও মার্জনা করা হয়।—শায়খান।

৪৮৪. যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত কারণ বা পীড়া ব্যতীত রমজানের একটা দিনের রোজা পরিত্যাগ করে, তৎপরিবর্তে যদি সে সমগ্র জীবনব্যাপী রোজা রাখে তবুও তা তার ক্ষতিপূরণ করবে না।—তির। আ. দাউদ। ই. মাজা। মিশ।

৪৮৫. যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বা কুকর্ম ত্যাগ করে না, সে পানাহার ত্যাগ করেছে কি করেনি (অর্থাৎ রোজা রেখেছে কি রাখেনি) আল্লাহ্‌ তার খবর রাখার প্রয়োজন মনে করেন না।—বুখারী। আবু দাউদ। তির। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৮৬. মানবসন্তানেরা রোজা ব্যতীত প্রতিটি পুণ্যকর্মের জন্য ১০ থেকে ৭০০ গুণ পুরস্কার লাভ করবে। আল্লাহ্‌ বলেন, রোজা আমার জন্য এবং আমিই ওর পুরস্কার দান করব; কারণ বান্দা আমার জন্য তার প্রবৃত্তিকে দমন করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে। রোজাদারের জন্য ২টি আনন্দ নির্ধারিত আছে—একটি তার এফ্‌তারের সময়, অন্যটি তার প্রভুর সঙ্গে মিলনের সময়। রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে মৃগনাভির সৌরভ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর

এবং রোজা ঢাল সদৃশ। যখন তোমাদের কেউ রোজা পালন করে সে যেন স্ত্রী-সংসর্গ এবং কলহ পরিত্যাগ করে। তারপর যদি কেউ তাকে গালাগালি দেয় অথবা তার সাথে বিবাদ করে, সে বলুক, 'আমি একজন রোজাদার (অতএব তোমার কথা ও কাজের প্রতিবাদ করে আমি আমার ব্রত ভঙ্গ করতে পারি না)।'—বুখারী ও আরো ৫ জন। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৮৭. নবী (সঃ) বলেছেন, তাঁর উম্মতকে মার্জনা করা হয় রমজান মাসের শেষ রাত্রে। জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে রসূলুল্লাহ্, ও কি শবেকদর?' হুজুর বললেন, 'না। বরং এই কারণে যে কর্মচারীর বেতন দেওয়া হয় যখন সে তার কর্ম শেষ করে।'—আহ্মদ। মিশ। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৮৮. স্বামী (গৃহে) উপস্থিত থাকলে তাঁর বিনা অনুমতিতে কোন নারী যেন রোজা না রাখে।—নাসায়ী ও ৫ জন। [আবু দাউদ বলেছেন, 'এ কথা রমজানের রোজা সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।']

৪৮৯. আব্দুল্লাহ্-বিন-আল্-আস্-বিন ওমার বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ওমর, তুমি নাকি দিনে রোজা রাখ এবং রাত্রিতে (নামাজে) দাঁড়িয়ে থাক?' আমি বললাম, 'হাঁ।' তিনি বললেন, 'রোজা রাখ এবং এফতার কর, রাত্রিতে নামাজে দাঁড়িয়ে থাক এবং নিদ্রা যাও, কারণ তোমাদের শরীরের প্রতি কর্তব্য আছে, চক্ষুর প্রতি কর্তব্য আছে, স্ত্রী, প্রতিবেশী এবং অতিথিদের প্রতিও কর্তব্য আছে। যে ব্যক্তি সর্বদা রোজা রাখে, সে কখনো রোজা রাখেনি। প্রতিমাসে তিনদিন রোজা রাখাই সমস্ত মাস রোজা রাখার সমান। অতএব প্রতিমাসে তিনদিন রোজা রাখ। (অবশ্য একথা রমজানের রোজা সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়)। আমি বললাম, 'এর চেয়েও বেশী পারি।' তিনি বললেন, 'রোজা রাখ, তবে উত্তম রোজা হজরত দাউদের—একদিন রোজা একদিন এফতার। প্রতি সপ্তাহে এক রাত্রি জেগে নামাজ পড় এবং এর অতিরিক্ত করো না।' [ইসলাম ধর্মে বাড়াবাড়িনেই, এখানে মধ্যপথই শ্রেষ্ঠ পথ।] —শায়খান।

৪৯০. নবী (সঃ) দাউদ (আঃ)-এর (একদিন বাদ একদিন) রোজার কথা উল্লেখ করে বললেন, 'তিনি (দাউদ আঃ) যখন (শত্রুদের) মোকাবিলা করতেন তখন পলায়ন করতেন না।' একথা শুনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ্র নবী! হায়, কে আমাকে সেই শক্তি দেবে?' নবী (সঃ) পুনরায় বললেন, 'যে ব্যক্তি চিরকাল রোজা রাখে তার রোজা হয় না।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আম্র ইব্নে আস (রাঃ)।

৪৯১. নিশ্চয়ই প্রত্যেক জিনিসের জন্য জাকাত আছে, শরীরের জাকাত রোজা।—ই. মাজা।

৪৯২. কখনো কখনো রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর স্ত্রী-সহবাসজনিত অপবিত্র (জুনুব) অবস্থায় ভোর হয়ে যেত; তারপর তিনি গোসল করতেন ও রোজা রাখতেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ) ও উম্মে সালামা (রাঃ)।

৪৯৩. নবী (সঃ) রোজা অবস্থায় স্বীয় পত্নীদের চুম্বন করতেন। তিনি কামের ব্যাপারে তোমাদের অপেক্ষা বেশী সংযমী ছিলেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৪৯৩. (ক) যখন কোন ব্যক্তি ভুল করে, পানাহার করে সে যেন রোজা পূর্ণ

করে ; কেননা আল্লাহ্ তাকে পানাহার করিয়েছেন। [অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির ব্যাপারে আল্লাহ্ কত করুণাময় !]—বুখারী। বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৪৯৪. আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (একদিন) আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় একজন লোক তাঁর কাছে এসে বলল, 'হে রসূলুল্লাহ্, আমি বরবাদ হয়ে গেছি।' তিনি (দঃ) বললেন, 'তোমার কি হয়েছে ?' সে বলল, 'আমি রমজানের রোজা রেখে (দিনের বেলা) স্ত্রী সহবাস করেছি।' তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'তোমার কাছে কি একটা ক্রীতদাসকে মুক্ত করার মত সঙ্গতি আছে ?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'তবে তুমি পর পর দু'মাস রোজা রাখতে পারবে কি ?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'তুমি কি ষাট জন মিসকিনকে খাওয়াবার সামর্থ রাখ ?' সে বলল, 'না।' রাবী বলেন, সে কিছুক্ষণ নবী (সঃ)-এর কাছে অপেক্ষা করল। ঐভাবে অপেক্ষার সময় এক ব্যক্তি এক আরক (খেজুর পাতার তৈরী টুকরী) খেজুর নিয়ে আসল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'প্রশ্নকারী কোথায় ?' সে বলল, 'এই যে আমি।' তিনি (দঃ) বললেন, 'এটা নিয়ে দান করে দাও।' লোকটা বলল, 'হে রসূলুল্লাহ, আমার চেয়ে অধিকতর দরিদ্রকে এ দান করব ? আল্লাহ্‌র শপথ, মদীনার উভয় প্রান্তের প্রস্তরময় স্থানের মধ্যে আমাদের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কোন পরিবার নেই।' এ কথা শুনে নবী (সঃ) হাসলেন। তারপর বললেন, 'তোমার পরিবারবর্গকে ও খাইয়ে দাও।'—বুখারী।

৪৯৫. যে ব্যক্তি কাজা রোজা আদায় না করে মরে তার উত্তরাধিকারীরা যেন তার পক্ষ থেকে সে রোজা আদায় করে।—বুখারী। বর্ণনায় : আয়েশা (রাঃ)।

৪৯৬. এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, 'হে রসূলুল্লাহ্, আমার মা মারা গেছেন, তাঁর এক মাসের রোজা কাজা ছিল, আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় করব ?' তিনি বললেন, 'হাঁ, আল্লাহ্‌র প্রাপ্য সর্বাগ্রে দেয়।'—বুখারী। বর্ণনায় : ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)।

তারাবিহ্

['তারাবিহ্' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'রাবেহা' শব্দ থেকে—যার সাধারণ অর্থ বিশ্রাম করা। তারাবিহ্ নামাজে প্রতি চার রাকাতের পর দোয়া পাঠ করার জন্যে বিশ্রাম করতে হয় বলে, সম্ভবতঃ এ নামাজের এই নাম হয়েছে। সারা রমজান মাসে তারাবিহ্ নামাজে সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করার উদ্দেশ্যে হজরত ওসমান (রাঃ) সমগ্র কোরআন শরীফকে ৩০টি পারা বা অংশে এবং ওর আয়াত বা বাক্যগুলোকে ৫৪০টি রুকুতে বিভক্ত করেন।]

৪৯৭. হজরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) রমজান মাসে (তারাবিহ্) নামাজ পালন সম্বন্ধে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন, তবে ফরজ নামাজ হিসেবে নয়। তিনি (দঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ও পুণ্য লাভের আশায় রমজানের রাত্রিতে (নামাজে) দাঁড়ায় তার পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা করা হয়। তারপর হজরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) প্রাণত্যাগ করেন এবং এই আদেশ এ রকমই বলবৎ থাকে। তারপর

হজরত আবুবকর (রাঃ)-র খেলাফতকালে এবং হজরত ওমরের খেলাফতের অর্ধেক কাল পর্যন্ত এই আদেশ এইভাবে প্রচলিত ছিল।—মুস।

৪৯৮. খেজুর পাতায় তৈরী মসজিদে (নববীর) মধ্যে হজরত নবী (সঃ) নিজের জন্য একটা কক্ষ সংরক্ষিত রেখেছিলেন। কয়েক রাত্রি তিনি সেখানেই নামাজ (তারাবিহ্) পড়েছিলেন। লোকেরা সেখানে তাঁর পাশে সমবেত হয়ে নামাজ পড়ত। এক রাত্রে তারা তাঁর স্বর শুনতে না পেয়ে মনে করল যে তিনি নিদ্রিত হয়ে পড়েছেন। তারপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ শোরগোল করতে লাগল যাতে তিনি বের হয়ে আসেন। তারপর তিনি বললেন, 'তোমরা যে কাজ ক'রে আসছ সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করেছি; আমার ভয় হয়, যদি আমরা ও করতে থাকি তবে ও আমাদের জন্য ফরজ হয়ে যাবে এবং যে জন্য তোমরা দাঁড়িয়েছ যদি ও তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয় (তবে তোমাদের পক্ষে ও কষ্টকর হবে)। অতএব হে লোক সকল, তোমরা নিজ নিজ গৃহে নামাজ পড় যেহেতু ফরজ নামাজ ব্যতীত মানুষের জন্য আপন গৃহে নামাজ পালনই সর্বোৎকৃষ্ট।' [এই হাদীস দ্বারা হজরত (দঃ) বুঝিয়েছেন যে তারাবিহ্ নামাজ সুন্নত।]—শায়।

৪৯৯. ইবনে শেহাব জোহ্‌রী বলেন, আরুয়া আমাকে জানিয়েছেন যে, হজরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে বলেছেন, হজরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) রমজান মাসের কোন এক রাত্রির মধ্যভাগে মসজিদের দিকে রওনা হন; তারপর মসজিদে নামাজ পড়েন, লোকেরাও তাঁর সঙ্গে নামাজ পড়েন। তারপর প্রভাতে লোকেরা এই বিষয়ে আলোচনা করে, ফলে অধিক সংখ্যক লোক (পরবর্তী রজনীতে) সমবেত হয় ও তাঁর সঙ্গে নামাজ পড়েন। পরদিন প্রভাতে লোকেরা এই বিষয়ে আলোচনা করেন, ফলে তৃতীয় রজনী অপেক্ষা এই রজনীতে লোকসংখ্যা অধিকতর হয়। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজগৃহ থেকে বের হন এবং লোকেরা তাঁর সঙ্গে নামাজ পড়েন। তারপর যখন চতুর্থ রজনী আসল, মুসল্লিদের সংখ্যাধিক্যে মসজিদে স্থানাভাব দেখা দিল। ফলে তিনি ফজরের নামাজ না পড়া পর্যন্ত বাইরে আসলেন না। তারপর যখন ফজরের নামাজ শেষ করলেন, তখন লোকেদের সম্মুখে অগ্রসর হলেন। তারপর আল্লাহ্‌তা'লার একত্ব ঘোষণা করলেন, পরে বললেন, 'অনন্তর তোমাদের স্থান (বা মর্যাদা) সম্পর্কে আমার কাছে কিছুই গোপন নেই। কিন্তু আমার ভয় হয় এ তোমাদের ওপর ফরজ হয়ে যাবে; সুতরাং এ থেকে বিরত হও।' তারপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) প্রাণত্যাগ করেন এবং অবস্থা এরূপ ছিল।[পরবর্তীকালে ফকিহ্‌গণ তারাবিহ্ নামাজ জামাতে পড়ার বিধান প্রবর্তন করেন, কারণ তা অধিক পুণ্যজনক।]—বুখারী।

সেহ্‌রী ও এফ্‌তার

৫০০. তোমরা সেহ্‌রী (রোজার উদ্দেশ্যে শেষ রাত্রির আহার) খেও, কেননা সেহ্‌রীতে বরকত (প্রাচুর্য) আছে।—বুখারী। শায়। বর্ণনায়ঃ আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)।

৫০১. আমাদের ও আহ্‌লে-কেতাবদের রোজার মধ্যে তফাৎ সেহ্‌রী খাওয়া। —শারখান।

৫০২. আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) বলেছেন, "যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়

'পানাহার কর যে পর্যন্ত সাদা সুতো কালো সুতো থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট না হয়'—তখন আমি একটা কালো দড়ি ও একটা সাদা দড়ি আমার বালিশের নীচে রাখলাম এবং রাত্রিতে বারবার দেখলাম, কিন্তু কোন পার্থক্য বুঝতে পারলুম না। সুতরাং প্রাতঃকালে রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে এর উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, 'ও তো রাত্রির আঁধার ও দিনের আলো।'—বুখারী।

৫০৩. জায়েদ ইব্‌নে সাবেত (রাঃ) বলেছেন, 'আমরা নবী (সঃ)-এর সঙ্গে সেহ্‌রী খেয়েছি। পরে তিনি (ফজরের) নামাজ পড়েছেন।' তাঁকে (জায়েদকে) জিজ্ঞাসা করা হল, 'আজান ও সেহ্‌রীর মধ্যে কতটা ব্যবধান ছিল?' তিনি (জায়েদ) বললেন, 'পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ।' [অর্থাৎ ৫০ আয়াত (বা বাক্য) কোরআন পড়তে যত সময় লাগে ততটা।] —বুখারী।

৫০৪. যে পর্যন্ত মানুষ সত্বর সেহ্‌রী খাবে সে পর্যন্ত তারা উন্নত থাকবে। —শায়খান।

৫০৫. যে পর্যন্ত মানুষ সত্বর এফ্‌তার করা থেকে বিরত না হয় সে পর্যন্ত এই ধর্ম তার প্রাধান্য বজায় রাখবে, যেহেতু ইহুদী ও খৃষ্টানগণ বিলম্ব করে। —আ. দাউদ। ই. মাজা।

৫০৬. যখন একদিক দিয়ে রাত্রি আসে এবং একদিক দিয়ে দিন চলে যায় আর সূর্য অস্তমিত হয়, তখন রোজাদার এফ্‌তার করবে।—শায়খান। বুখারী।

৫০৭. আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, আমার কাছে সর্বাপেক্ষা বড় বান্দা তারাই যারা যথাসময়ে এফ্‌তার করে।—তিরমিজী।

৫০৮. সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এফ্‌তার করলে মুসলমানরা সাফল্য ও উন্নতি লাভ করবে। —বুখারী।

৫০৯. নবী (সঃ) যখন এফ্‌তার (উপবাস ভঙ্গ) করতেন তখন বলতেন, 'হে আল্লাহ্, তোমারই উদ্দেশ্যে রোজা রেখেছিলাম এবং তোমারই আহার্য দ্বারা রোজা ভঙ্গ (একতার) করলাম।'—আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ মুয়াজ বিন জাহরাহ্ (রাঃ)।

৫১০. যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে এফ্‌তার করাবে সে রোজাদারের সমান পুরস্কার পাবে, তবে এ পুরস্কার অন্য ধরনের; এতে রোজাদারের পুরস্কার কম হবেনা। —তির।

৫১১. যে ব্যক্তি কোন রোজদারকে এফ্‌তার করায় বা কোন ধর্মযোদ্ধাকে যুদ্ধের জিনিষপত্র সরবরাহ করে, তার পুরস্কার ওর (অর্থাৎ রোজাদার বা যোদ্ধার) সমান। —বয়হাকী।

৫১২. নবী (সঃ) যখন এফ্‌তার করতেন, বলতেন, 'তৃষ্ণা দূর হয়েছে, শিরা-গুলো সিক্ত হয়েছে এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে পুরস্কার নির্ধারিত হয়েছে।'—আ. দাউদ। বর্ণনায় ঃ ইব্‌নে ওমর (রাঃ)।

৫১৩. ইব্‌নে আউফা (রাঃ) বলেছেন ঃ আমরা এক সফরে রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, 'নাম এবং আমার জন্য (ছাতু) ঘোল।' সে বলল, 'হে রসুলুল্লাহ্, ঐ যে সূর্য(-এর আলো অর্থাৎ দিনের আলো)।' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'নাম এবং আমার জন্য (ছাতু) ঘোল।' পুনরায় সে বলল, 'হে রসুলুল্লাহ্! ঐযে সূর্য-(এর আলো)!'

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) (তৃতীয়বার) বললেন, 'নাম এবং আমার জন্য ছাতু ঘোল।' এবার সে নেমে তাঁর জন্য ছাতু ঘুলল। তিনি (নবী সঃ) পান করলেন। তারপর তিনি এই (পূর্ব) দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'যখন তোমরা দেখবে যে রাত্রি (অন্ধকার) এই দিক দিয়ে আসছে তখন রোজাদারদের এফ্তারের সময় হয়ে গিয়েছে।' [অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর আলো থাকলেও এফ্তারের সময় হয়] —বুখারী।

৫১৪. নবী (সঃ) সময় এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা এফ্তার করলাম। এফ্তারের পর পুনরায় সূর্য দেখা গেল। হাদীসের বর্ণনাকারিণীকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'এ অবস্থায় রোজার কাজা আদায় করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল কি?' তিনি বললেন, 'এ অবস্থায় কাজা (আদায়) করা থেকে অব্যাহতি আছে কি?' [অর্থাৎ অবশ্যই কাজা আদায় করতে হবে]—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আসমা (রাঃ)।

শবে কদর ও এ'তেকাফ

['শবে কদর'কে পবিত্র কোরআন শরীফে 'লাইলাতুল কদর' অর্থাৎ 'মহিমান্বিত রাত্রি' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। "এ'তেকাফ" শব্দের সাধারণ অর্থ কোন জায়গায় নিজেকে রাখা, শাস্ত্রীয় অর্থ রমজান মাসের শেষ দশ দিনে বিশেষ নিয়মে নিজেকে মসজিদে আবদ্ধ রাখা এবং সংসার সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্র উপাসনায় মশ্গুল থাকা। এই এ'তেকাফ সুন্নতে মোয়াক্কাদা। এ'তেকাফের মানত করা হলে তা পূরণ করা ওয়াজেব।]

'মহিমান্বিত (কদর) রাত্রিতে এ (কোরআন) আমি অবতীর্ণ করেছি। তুমি কি জান মহিমান্বিত রাত্রি কি? মহিমান্বিত রাত্রি সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এই রাত্রিতে ফেরেশতাগণ এবং রূহ্ তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সর্ববিধ মঙ্গল সহকারে অবতীর্ণ হয়। উষার আবির্ভাব পর্যন্ত এ রাত্রি বর্তমান থাকে।' ৯৭ (১-৫)।

'এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাইলের প্রতি আদেশ দিলাম, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফ্কারী, এ'তেকাফকারী এবং রুকুসিজদাকারীদের জন্য পাক পবিত্র রাখ।' (সূরা বাকারা, ১২৫ আয়াত)

—আল্-কোরআন

৫১৫. রমজানের শেষ দশকের বে-জোড় রাত্রিতে তোমরা শবে কদরের সন্ধান করবে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৫১৬. যখন রমজানের শেষ দশক আসত তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) পত্নীদের কাছে থেকে দূরে সরে গিয়ে এবাদতের জন্য কোমর বাঁধতেন। তিনি নিজে সারারাত জাগতেন এবং নিজের পরিজনগণকেও জাগিয়ে দিতেন।—মিশ। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৫১৭. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) রমজানের শেষ দশকের এবাদতে যত অধিক পরিশ্রম করতেন, তত পরিশ্রম আর কখনো করতেন না।—মুস। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৫১৮. হজরত আবু বাকরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি শুনেছি, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, রমজানের শেষের ৯, ৭, ৫, ৩ অথবা শেষ রাত্রি বাকি থাকতে শবে কদরকে সন্ধান কর।—তির।

৫১৯. হজরত উবাদা বিন সামেত (রাঃ) বলেন, একবার নবী (সঃ) আমাদের শবে কদরের খবর দেবার জন্য বের হলেন। এমন সময় দুজন মুসলমান কলহ আরম্ভ করল। নবী (সঃ) বললেন, আমি তোমাদের শবে কদরের খবর দেবার জন্য বেরিয়েছিলাম, কিন্তু অমুক অমুক লোক কলহে লিপ্ত হল, ফলে আমিও ভুলে গেলাম। সম্ভবতঃ ও তোমাদের জন্য মঙ্গল হয়েছে। সুতরাং ও তোমরা ২৯শে, ২৭শে ও ২৫শে রাত্রিতে সন্ধান করবে। —বুখারী।

৫২০. ইব্নে মসউদ (রাঃ) বলেছেন, তিনি জানতেন যে শবেকদর রমজান মাসে ওর শেষ দশ রাত্রে এবং ও ২৭শে রাত্রি। তারপর তিনি শপথ করে বললেন, ও একমাত্র ২৭শে রাত্রি। জেররে বিন হোবায়েশ (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি কারণে? তিনি বললেন, ওর কিছু নিদর্শন আছে অথবা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের যেভাবে জানিয়েছেন সেই অনুসারে। —মুস।

৫২১. নবী (সঃ)-এর কয়েকজন সাহাবীকে রমজানের শেষ সপ্তাহে স্বপ্নযোগে এবং 'শবেকদর' দেখানো হয়েছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'আমি দেখেছি, শবেকদর (রমজানের) শেষ সপ্তাহে—তোমাদের স্বপ্নগুলোর মধ্যে এই (বিষয়ে) মিল আছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ কদর সন্ধান করবে সে যেন শেষ সপ্তাহে সন্ধান করে।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ ইব্নে ওমর (রাঃ)।

৫২২. আবু সাঈদ খুদ্রী (রাঃ) বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে রমজান মাসের মধ্যবর্তী দশ দিনে এ'তেকাফ করেছিলাম। তিনি ২০ তারিখের প্রভাতে (এ'তেকাফ) থেকে বের হয়ে এসে আমাদের খোতবায় (ভাষণে) বললেন, 'স্বপ্নে আমাকে শবে কদর দেখান হয়েছিল, তারপর আমাকে ও ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে (অথবা আমি ভুলে গেছি)। অতএব তোমরা শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে ওর খোঁজ কর। আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, আমি যেন পানি ও কাদাতে সিজদা করছি। অতএব যারা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে এ'তেকাফ করেছিল তারা যেন আবার (এ'তেকাফে) ফিরে আসে।' সুতরাং আমরা ফিরে এলাম। তখন আমরা আকাশে সামান্য মেঘখণ্ডও দেখিনি। পরে মেঘ আসল এবং এত বৃষ্টি হল যে, মসজিদের ছাদ থেকে ঝরঝর করে' পানি পড়তে লাগল। ও(-র ছাউনি) খেজুর-শাখার ছিল। পরে (ফজরের) নামাজ পড়া হল এবং আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে পানি ও কাদাতে সিজ্দা করতে দেখলাম; এমন কি তাঁর কপালে কাদার দাগও দেখলাম। —বুখারী।

৫২৩. তোমরা শবে কদর অন্বেষণ কর রমজান মাসের শেষ দশরাত্রে—ন'দিন থাকতে, সাতদিন থাকতে ও পাঁচদিন থাকতে। —বুখারী। বর্ণনায়ঃ ইব্নে আব্বাস (রাঃ)।

৫২৪. আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে রসূলুল্লাহ্, শবে কদর কোন্ রাত্রিতে তা যদি আমি জানতে পারি, তাহলে আমি কি প্রার্থনা করব?' তিনি (দঃ) বললেন, 'তুমি বলবে—খোদা, তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালবাস, অতএব আমাকে ক্ষমা কর।'—তির। আহ্ (মিশ)। ই. মাজা।

৫২৫. যখন শবে কদর (বা মহিমান্বিত রাত্রি) শুরু হয় তখন হজরত জিব্রাইল (আঃ) ফেরেশতাদের নিয়ে অবতীর্ণ হন এবং আল্লাহ্‌র যে সব বান্দা দাঁড়িয়ে বসে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করছে তাদের জন্যে শুভকামনা (দোয়া) করেন। —বয়হাকী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

এ'তেকাফ

৫২৬. এ'তেকাফ-কারীর জন্য এটা সুন্নত যে সে (১) পীড়িতের সেবা করবে না, বা (২) জানাজা নামাজে হাজির হবে না, এবং (৩) স্ত্রীলোককে স্পর্শ করবে না বা (৪) তার সাথে সহবাস করবে না এবং (৫) অত্যাবশ্যকে প্রয়োজন (যেমন পায়খানা প্রস্রাব) ছাড়া সে বাইরে যাবে না। (৬) রোজাদার ব্যতীত এ'তেকাফ করতে পারে না এবং (৭) জামে মসজিদ ছাড়া এ'তেকাফ হয় না। [হানাফী ওলামাদের মতে 'জামে মসজিদ' অর্থ যেখানে জামাত সহ ওক্তিয়া নামাজ হয়।] —আ. দায়ুদ। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৫২৭. যে ব্যক্তি (বাইরে থেকে) যাবতীয় পুণ্যকাজ করে, (মসজিদে) এ'তেকাফকারীর জন্য তারই মত পুণ্য লেখা হয় এবং সে পাপ থেকে রক্ষা পায়। — ইবনে মাজা। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৫২৮. মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত রমজানের শেষ দশকে নবী (সঃ) বরাবর এ'তেকাফ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীগণ এ'তেফাক করতেন। —শায়। মিশ। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৫২৯. প্রতি বছর (রমজান মাসে) নবী (সঃ)-এর কাছে একবার সম্পূর্ণ কোরআন আবৃত্তি (দওর) করা হত, কিন্তু যে বছর তাঁর মৃত্যু হয় সে বছর দুবার আবৃত্তি করা হল। তিনি (নবী সঃ) প্রতি বছর দশদিন এ'তেকাফ করতেন কিন্তু যে বছর তাঁর মৃত্যু হয়, সে বছর তিনি কুড়িদিন এ'তেকাফ করলেন।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৩০. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) যখন এ'তেফাকের বাসনা করতেন তখন ফজরের নামাজ পড়তেন, তারপর এ'তেকাফের জায়গায় যেতেন।—আ. দাউদ। ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

৫৩১. নবী (সঃ) যখন এ'তেকাফ করতেন তখন তাঁর জন্য মসজিদে বিছানা পাতা হত এবং সেখানে 'অনুতাপের খুঁটি'র পেছনে তাঁর খাটিয়া স্থাপন করা হত। [নবীসহচর আবুসুবাবা (রাঃ) তবুকের যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করে মসজিদুন্নবীর যে খুঁটি ধরে কেঁদেছিলেন এবং মার্জনা লাভ করেছিলেন, সেই খুঁটির নাম 'অনুতাপের খুঁটি' বা 'উস্তুয়ানায়ে তওবা']—ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)।

নফল রোজা

৫৩২. যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখে তারপর শওয়ালের ৬টি রোজা রাখে, ঐ (ছটি) রোজা তার সারা বছরের রোজা রাখার সমান হয়।—মুসলিম।

৫৩৩. রমজানের পর সর্বোৎকৃষ্ট রোজা হল আল্লাহ্‌র মাস মুহররমের (রোজা)।—মুসলিম।

৫৩৪. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আশুরার দিন রোজা রাখতেন এবং ঐ দিন রোজা রাখার আদেশ দেন। তারা বলল, 'ঐ দিনটিকে ইহুদী এবং খৃষ্টানরা খুব সম্মান করে।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'যদি আমি আগামী দিনে জীবিত থাকি তবে আমি ঐদিন রোজা রাখব।'—মুসলিম। বর্ণনায়ঃ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)।

৫৩৫. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মদীনা শরীফে এসে দেখলেন যে ইহুদীরা আশুরার দিন উপবাস করে। তাদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কোন দিন যে তোমরা উপবাস করছ?' তারা বলল, 'এ একটা মহান দিন। এদিন আল্লাহ্ হজরত মূসা (আঃ) ও তাঁর উম্মতকে উদ্ধার করেছিলেন এবং ফেরাউন ও তাঁর সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলেন। হজরত মূসা (আঃ) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এদিন উপবাস করেছিলেন, সুতরাং আমরাও ঐদিন উপবাস করি।' তারপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন 'তোমাদের চেয়ে আমরাই এর অধিকতর হকদার এবং তাঁর সঙ্গে অধিকতর বন্ধু ভাবাপন্ন।' তারপর তিনি ঐ দিন উপবাস করতেন এবং ঐ দিনে উপবাস করার আদেশ দেন।—শায়খান। বর্ণনায়ঃ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)।

৫৩৬. প্রতি মাসে তিন দিন (রোজা রাখা)—এক রমজান থেকে অন্য রমজান (পর্যন্ত) সারা বছরের রোজা রাখার সমান। আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশা করি যে আরাফাতের দিনের রোজা পরবর্তী বৎসরের ক্ষতিপূরণ করবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে এই আশাও করি যে আশুরার দিনের রোজা ওর পূর্ববর্তী বৎসরেরও ক্ষতিপূরণ করবে।—মুস। বর্ণনায়ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৫৩৭. চারটি জিনিস রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কখনও পরিত্যাগ করেন নিঃ আশুরার দিনের (রোজা), (জিলহজ্জ চাঁদের প্রথম) ১০ দিনের (রোজা) এবং প্রতি মাসের ৩ দিনের রোজা—আর ফজরের ফরজ নামাজের পূর্বে দুরাকা'ত নামাজ। নাসায়ী। বর্ণনায়ঃ হাফসা (রাঃ)।

৫৩৮. আশুরার দিন যাকে নবী (সঃ) অন্য সকল দিনের ওপর মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং এই মাস অর্থাৎ রমজান মাসে রোজা রাখা অপেক্ষা অন্য কোন দিন বা মাসে (রোজা রাখা) সম্বন্ধে নবী (সঃ)-কে অধিকতর তাগাদা দিতে দেখিনি।—শায়খান। বর্ণনায়ঃ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)।

৫৩৯. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন এবং বলতেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার যারা পরস্পরের থেকে পৃথক হয়েছে শুধু সেই দুজন ছাড়া আল্লাহ্ সকল মুসলমানকে ক্ষমা করেন। তাদের সম্বন্ধে বলেন, পরস্পর মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের ছেড়ে দাও।—মিশ। ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৪০. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মাসে তিন দিন রোজা রাখতেন এবং কদাচিৎ শুক্রবারে রোজা ভঙ্গ করতেন।—তির। আ. দাঊদ। নাসায়ী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)।

৫৪১. হে আবুজর, যখন তুমি মাসে তিন দিন রোজা রাখ তখন ১৩ই, ১৪ই, ও ১৫ই রোজা রাখ।—তির। নাসায়ী।

৫৪২. উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) আমাকে প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখতে আদেশ দিয়েছেন এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবার থেকে শুরু করতে বলেছেন।—আ. দায়ুদ। নাসায়ী।

৫৪৩. মুয়াজ বিন আদিয়া বলেন: আমি আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হজরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কি প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখতেন? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, মাসের কোন্ কোন্ দিন তিনি রোজা রাখতেন? তিনি বলেন, মাসের বিশেষ কোন দিন সম্বন্ধে তিনি আগ্রহ দেখাতেন না।—মুসলিম।

৫৪৪. নবী (সঃ)-কে সোমবার রোজা রাখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'সেই দিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি এবং সেইদিন আমার কাছে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ (অহী) অবতীর্ণ হয়েছিল।'—মুসলিম। বর্ণনায়: আবু কাতাদা (রাঃ)।

৫৪৫. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন।—তির। নাসায়ী। বর্ণনায়: আয়েশা (রাঃ)।

৫৪৬. সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের কার্যাবলী পেশ করা হয়; অতএব আমি আশা করি যে যখন আমি রোজা রাখি তখন আমার কার্যাবলী পেশ করা হবে।—তির।

৫৪৭. নবী (সঃ) মাসের প্রথম ভাগ হলে শনি, রবি, ও সোমবার রোজা রাখতেন এবং মাসের শেষ ভাগে হলে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন।—তির। বর্ণনায়: আয়েশা (রাঃ)।

৫৪৮. নামাজের জন্য জুমআর রাত্রি ও রোজার জন্য জুমআর দিনকে বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করো না।—মুসলিম।

৫৪৯. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ জেহাদ, বিদেশ-ভ্রমণ ইত্যাদিতে) একদিন রোজা রাখে আল্লাহ্ তাকে দোজখ থেকে ৭০ বৎসরের পথ দূরে রাখেন।—শায়।

৫৫০. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে একদিন রোজা রাখে আল্লাহ্ তার ও দোজখের মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী ব্যবধানের সমান দূরত্ব স্থাপন করেন।—তির।

৫৫১. যে ব্যক্তি নফল রোজা রাখে সে নিজের সম্বন্ধে স্বাধীন। যদি সে ইচ্ছা করে তবে রোজা রাখবে, নয়তো রোজা ভঙ্গ (অর্থাৎ এফ্তার) করবে।—তির। মিশ।

৫৫২. একদিন নবী (সঃ) যখন আহার করছিলেন তখন হজরত বেলাল (রাঃ) তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। নবী (সঃ) বললেন, 'বেলাল, আহার কর।' তিনি বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ, আমি তো রোজা রেখেছি।' তিনি বললেন, 'আমরা আমাদের রেজেক আহার করি। বেলালের অতিরিক্ত রেজেক (আহার্য) বেহেশ্তে জমা আছে। হে বেলাল, তুমি কি বুঝতে পারলে যে রোজাদারের জন্য তার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রতঙ্গ আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করে এবং তার সম্মুখে যা আহার করা হয় তার কারণে ফেরেশ্তারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে?'—বয়। বর্ণনায়: বোরায়দা (রাঃ)।

৫৫৩. উম্মে ওমরা বিন কা'ব বলেন, একদিন নবী (সঃ) তাঁর গৃহে উপস্থিত

হলে তিনি তাঁর জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য উপস্থিত করেন। নবী (সঃ) বললেন, 'খাও।' তিনি (উম্মে ওমরা) বললেন, 'আমি রোজা রেখেছি।' তখন নবী (সঃ) বললেন, 'যখন রোজাদারের সম্মুখে কিছু আহার করা হয়, তখন ঐ আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফেরেশ্তারা রোজাদারকে অশীর্বাদ করেন।'—তির। ই. মাজা। মিশ।

৫৫৪. হজরত রসুলুল্লাহ্ (সঃ) সময় সময় এত রোজা রাখতেন যে আমরা মনে করতাম তিনি আর রোজা ভাঙবেন না এবং সময় সময় তিনি আদৌ রোজা রাখতেন না, তাতে আমরা মনে করতাম যে তিনি আর রোজা রাখবেন না। রমজানের মাস ছাড়া অন্য কোন সময়েই তাঁকে পুরোপুরি একমাস রোজা রাখতে দেখিনি এবং শাবানের মাস ছাড়া অন্য কোন সময়ে তাঁকে বেশীদিন রোজা রাখতে দেখিনি।—শায়।

৫৫৫. ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আজ্হার দিন কোন রোজা নেই।—শায়।

৫৫৬. তশরীকের দিনগুলো (অর্থাৎ জিলহজ্জ্ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ) হল পানাহার ও আল্লাহ্‌কে স্মরণ (জিকির) করার দিন।—মুসলিম।

শবে মে'রাজ

[আরবী মে'রাজ শব্দটি ''ও'রুজ'' ধাতু থেকে সৃষ্ট—যার অর্থ চড়া বা ওপরে ওঠা। নবী (সঃ)-এর এক-রাত্রে সপ্ত আকাশ ভ্রমণকে মে'রাজ বলে। হিজরতের দেড় বছর পূর্বে রজব মাসের ২৬ তারিখ রাত্রে অর্থাৎ ২৭ তারিখে এই মে'রাজ বা আকাশ-ভ্রমণ সংঘটিত হয়েছিল।]

'পবিত্র ও মহিমময় তিনি, যিনি তাঁর দাস (মুহম্মদ দঃ)কে তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম (কাবা শরীফ) হতে মসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ তিনি করেছিলেন আশিসপূত, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' ১৭ (১)

—আল্-কোরআন।

৫৫৭. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'মক্কায় থাকাকালে একদিন রাতে আমি যে ঘরে শুয়েছিলাম, সেই ঘরের ছাদ খুলে গেল, তারপর ঐ পথে জিব্রাইল (আঃ) নেমে এলেন। (আমাকে ঐ ঘর থেকে কা'বা ঘরের কাছে নিয়ে আসা হল)। তারপর আমার বুকখানাকে চিরে ফেলে ওকে জমজমের পানি দিয়ে পরিষ্কার করা হল। তারপর পরিপক্ক সত্যকার জ্ঞান ও ঈমান-বৃদ্ধিকারী বস্তুতে পরিপূর্ণ একটা সোনার পাত্র এনে তা আমার বুকের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হল।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)—আবুজর (রাঃ)-র কাছ থেকে শুনে।

৫৫৮. 'তারপর আমার জন্য একটা যানবাহন হাজির করা হল, যার নাম 'বোরাক্', যে খচ্চরের চেয়ে একটু ছোট আর গাধার চেয়ে একটু বড়, যার রঙ সাদা, যার প্রতি পদক্ষেপ দৃষ্টির শেষ সীমায়। সেই যানবাহনের ওপরে আমাকে চড়ান হল। নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে প্রথম আকাশের দুয়ারে এসে হাজির হলেন এবং দুয়ার খুলতে বললেন। ভেতর থেকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হল, জিব্রাঈল আপন পরিচয় দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করা হল,

'আপনার সঙ্গে কে আছেন ?' জিব্রাঈল বললেন, 'মুহম্মদ (দঃ)।' বলা হল, 'তাঁর কাছে পাঠান হয়েছিল ?' জিব্রাঈল বললেন, 'হাঁ।' তারপর আমাদের প্রতি মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে দুয়ার খোলা হল। ভেতরে প্রবেশ করে' সেখানে আদম (আঃ) কে দেখতে পেলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন, 'তিনি আপনার আদি পিতা আদম, তাঁকে সালাম করুন।' আমি তাঁকে সালাম করলাম। আমার সালামের উত্তর দিয়ে তিনি আমাকে 'সুযোগ্য পুত্র ও সুযোগ্য নবী' বলে আখ্যাত করলেন এবং শুভেচ্ছা জানালেন। তারপর জিব্রাঈল আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশের দুয়ারে হাজির হলেন এবং দুয়ার খুলতে বললেন। এখানেও পূর্বের মত কথোপকথন হল এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে দুয়ার খোলা হল। ভেতরে প্রবেশ করে' সেখানে ইয়াহ্‌য়্যা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম—তাঁদের দুজনের মা এবং নানীরা পরস্পরের বোন ছিলেন। জিব্রাঈল আমাকে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে সালাম করতে বললেন। আমি তাঁদের সালাম করলাম। তাঁরা দুজনেই আমার সালামের উত্তর দিয়ে আমাকে 'সুযোগ্য ভ্রাতা এবং সুযোগ্য নবী' বলে খোশ-আমদেদ জানালেন। তারপর জিব্রাঈল আমাকে নিয়ে তৃতীয় আকাশের দুয়ারে হাজির হলেন এবং দুয়ার খুলতে বললেন। সেখানেও পূর্বের মত কথোপকথনের পর শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে দুয়ার খোলা হল। ভেতরে প্রবেশ করে' ইউসুফ (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁর (সঙ্গে) পরিচয় করিয়ে সালাম করতে বললেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে আমাকে 'উপযুক্ত ভ্রাতা ও উপযুক্ত নবী' বলে মোবারকবাদ জানালেন। তারপর আমাকে নিয়ে জিব্রাঈল চতুর্থ আকাশের দুয়ারে হাজির হলেন এবং দুয়ার খুলতে বললেন। সেখানেও পূর্বের মত প্রশ্নোত্তরের পর শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান হল এবং দুয়ার খোলা হল। ভেতরে প্রবেশ করে' সেখানে ইদ্রিস (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁর (সঙ্গে) পরিচয় করিয়ে সালাম করতে বললেন। আমি তাঁকে সালাম জানালাম এবং (তিনি) 'সুযোগ্য নবী বলে' আমাকে মারহাবা জানালেন। তারপর জিব্রাঈল আমাকে নিয়ে নিয়ে পঞ্চম আকাশে উপস্থিত হলেন এবং দুয়ার খুলতে বললেন। এখানেও পূর্ববৎ প্রশ্নোত্তরের পর শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদের মাধ্যমে দুয়ার খোলা হল। আমি ভেতরে পৌঁছে হারূন (আঃ)-কে দেখতে পেলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁর পরিচয় দিয়ে তাঁকে সালাম করতে বললেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং 'সুযোগ্য ভাই ও সুযোগ্য নবী' বলে' খোশ-আমদেদ জানালেন। তারপর জিব্রাঈল আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আকাশের দুয়ারে হাজির হলেন এবং দুয়ার খুলতে বললেন। এখানেও পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হল। জিব্রাঈল নিজের পরিচয় দিলেন। তারপর তাঁর সঙ্গে কে আছে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, 'মুহম্মদ (দঃ)।' বলা হল, 'তাঁকেই তো নিয়ে আসার জন্য আপনাকে পাঠান হয়েছিল ?' জিব্রাঈল বললেন, 'হাঁ।' তখন শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানিয়ে দুয়ার খোলা হল। সেখানে প্রবেশ করে' মূসা (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁর পরিচয় দান করে সালাম করতে বললেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়ে আমাকে 'সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী' বলে' মোবারকবাদ জানালেন। যখন আমি তাঁর কাছ থেকে চলে' আসছিলাম তখন মূসা (আঃ) কাঁদলেন। তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'আমি কাঁদছি এই কারণে যে আমার উম্মতে বেহেশ্‌তলাভকারীর

সংখ্যা এই নবীর উম্মতের বেহেশ্‌তলাভকারীর সংখ্যা অপেক্ষা কম হবে অথচ তিনি বয়সের দিক দিয়ে যুবক এবং আমার পরে দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছেন।' তারপর জিব্রাঈল আমাকে নিয়ে সপ্তম আকাশের দিকে আরোহণ করতে লাগলেন এবং সেখানে পৌঁছে দুয়ার খুলতে বললেন। এখানেও পূর্বের মত প্রশ্নোত্তর হল এবং দুয়ার খুলে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান হল। আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম; সেখানে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। জিব্রাঈল বললেন, 'তিনি আপনার (বংশের আদি) পিতা, তাঁকে সালাম করুন।' আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং 'সুযোগ্য পুত্র ও সুযোগ্য নবী' বলে' আমাকে মারহাবা ও মোবারকবাদ জানালেন। তারপর আমি 'ছিদ্‌রাতুল মোনতাহার' কাছে উপস্থিত হলাম। (ও একটা এমন বড় ধরনের কুলগাছ যে) ওর এক একটা কুল 'হাজার' অঞ্চলে তৈরী (বড় বড়) মটকার মত এবং ওর পাতা হাতীর কানের মত। জিব্রাঈল আমাকে বললেন, 'এই গাছটার নাম 'ছিদ্‌রাতুল মোনতাহা।' সেখানে চারটে প্রবহমান নদী দেখতে পেলাম...দুটো ভেতরের দিকে এবং দুটো বাইরের দিকে। নদীগুলো সম্পর্কে আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, 'ভেতরের দিকের দুটি বেহেশ্‌তে প্রবহমান (ছালছাবিল ও কাওছার নামক) দুটি নদীর উৎস এবং বাইরের দিকে প্রবহমান দুটি হল (ভূপৃষ্ঠে মিশরে প্রবাহিত) নীল নদ এবং (ইরাকে প্রবাহিত) ফোরাত নদীর উৎস। তারপর আমাকে 'বায়তুল মা'মুর' পরিদর্শন করান হল। সেখানে প্রতিদিন সত্তর (৭০) হাজার ফেরেশ্‌তা (উপাসনার জন্য) উপস্থিত হয়ে থাকেন। (যারা একবার এখানে উপাসনার সুযোগ পায় তারা চিরকালের মধ্যে দ্বিতীয়বার এখানে উপাসনার সুযোগ আর পায় না)। তারপর আমার সামনে তিনটি পাত্র উপস্থিত করা হল। একটিতে ছিল মদ, অপরটিতে দুধ এবং আর একটিতে মধু। আমি দুধের পাত্র গ্রহণ করলাম। জিব্রাঈল বললেন, 'দুধ হল সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ, (অতএব আপনি সত্য ও স্বভাবধর্ম ইসলামের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত আছেন)। তারপর আমার শরিয়তে প্রতিদিন পঞ্চাশ (৫০) বার (বা ৫০ ওয়াক্ত) নামাজের বিধান দেওয়া হল। আমি (সে বিধান নিয়ে) ফিরে আসার পথে মূসা (আঃ)-কে অতিক্রম করার সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিশেষ আদেশ কি লাভ করেছেন?' আমি বললাম, 'প্রতিদিন ৫০ ওয়াক্ত নামাজ।' মূসা (আঃ) বললেন, 'আপনার উম্মতেরা প্রতিদিন ৫০ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি সাধারণ মানুষের স্বভাব সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এবং বনি ইস্রাঈলদের বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি, সুতরাং আপনি আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে এই আদেশকে আরো সহজ করার জন্যে আবেদন করুন।' আমি পরওয়ারদেগার আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে ফিরে গেলাম। তিনি (দুবারে পাঁচ পাঁচ করে) দশ ওয়াক্ত নামাজ কম করে' দিলেন। তারপর আমি আবার মূসার কাছে পৌঁছুলে তিনি আমাকে পূর্বের মতই পরামর্শ দিলেন। আমি পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরে গেলাম। এবারেও (তিনি ঐ ভাবে) দশ ওয়াক্ত কম করে' দিলেন। পুনরায় মূসার কাছে পৌঁছুলে পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরে গেলাম এবং (তিনি পূর্বের মত) দশ ওয়াক্ত কম করে' দিলেন। এবারেও মূসার কাছে পৌঁছুলে তিনি আমাকে (আবার) পূর্ববৎ পরামর্শ দিলেন। আমি পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরে গেলাম। এবার আমার জন্য প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করে' দেওয়া হল। এবারেও মূসার কাছে পৌঁছুলে আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি আদেশ লাভ করেছেন?' আমি

বললাম, 'প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আদেশ দান করা হয়েছে।' মূসা (আঃ) বললেন, 'আপনার উম্মতেরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও পালন করতে পারবে না। আমি আপনার পূর্বেই সাধারণ মানুষের স্বভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এবং বনি ইস্রাঈলদের অনেক পরীক্ষা করে' দেখেছি; সুতরাং আপনি আপনার পরওয়ারদেগারের (আল্লাহ্‌র) দরবারে আবার ফিরে যান এবং আরো কম করার আবেদন জানান।' আমি মূসাকে বললাম, 'পরওয়ারদেগারের দরবারে অনেকবার যাওয়া-আসা করেছি, এখন আবার যেতে লজ্জা বোধ হয়; আর যাব না, বরং পাঁচ ওয়াক্তেই সন্তুষ্ট হলাম এবং ওকেই বরণ করে' নিলাম।' তারপর যখন আমি ফেরার পথে অগ্রসর হলাম, তখন আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল '(বান্দাদের প্রাপ্য অর্থাৎ পুণ্যের দিক দিয়ে) আমার নির্ধারিত সংখ্যা (পঞ্চাশ)-কে রাখলাম, অবশ্য কর্মক্ষেত্রে বান্দাদের পক্ষে সহজ ও কম করে দিলাম। (অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পুণ্যের দিক দিয়ে ৫০ ওয়াক্ত বলে' পরিগণিত হবে। আমি) প্রতিটি নেক-আমলের (সৎকর্মের) জন্য দশগুণ পুণ্য দান করব।'—বুখারী বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)—মালেক ইব্‌নে মাসাআ'হ্‌ (রাঃ) থেকে।

৫৫৯. শাদ্দাদ ইব্‌নে আউস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন আমরা হজরত রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে রসূলুল্লাহ্‌, আপনার মে'রাজ ভ্রমণের ঘটনাটা কেমন ছিল?' উত্তরে হজরত (দঃ) বললেন, 'রাত্রি সম্পূর্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলে আমি আমার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে একত্রে এশার নামাজ (যা পূর্বে আমলের কোন নিয়মে পড়া হত) আদায় করলাম। তারপর আমার কাছে জিব্রাঈলের আগমন ঘটল। আমার সামনে সাদা রঙের গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে ছোট একটা যানবাহন উপস্থিত করে আমাকে ওর ওপরে আরোহণ করান হল।' (বিস্তারিত বিবরণ দানের পর) তিনি বললেন, 'তারপর ভোর হওয়ার পূর্বে আমি আমার সঙ্গী-সাথীদের কাছে ফিরে এসেছি। তখন আবুবকর (রাঃ) আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—'আপনি রাত্রে কোথায় ছিলেন? আমি তো আপনাকে সম্ভাব্য সব জায়গায়তেই সন্ধান করেছি।' তখন হজরত (দঃ) 'বয়তুল মোকাদ্দস' যাওয়ার কথা উল্লেখ করলেন। আবুবকর আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্‌, বয়তুল মোকাদ্দস তো মক্কা থেকে একমাসের পথ। (আবুবকর পূর্বে বয়তুল মোকাদ্দস দেখেছিলেন)। হজরত (দঃ) তাঁকে বয়তুল মোকাদ্দসের সমুদয় নিদর্শন বলে' দিলেন। আবুবকর নব-উদ্যমে বলে উঠলেন, 'আপনি যে আল্লাহ্‌র রসূল, এ ঘটনায় তার প্রমাণ পেলাম।'—তফ্‌সীর ইব্‌নে কাসীর ৩ × ১৩—১৪।

৫৬০. হজরতের চাচা আবু তালেবের কন্যা উম্মেহানী (রাঃ) মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করে, বলতেন, 'মে'রাজের রাত্রে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমারই ঘরে নিদ্রিত ছিলেন। হজরত (দঃ) এশার নামাজ পড়ে শুয়ে পড়লেন, আমরাও শুয়ে পড়লাম। ভোর হওয়ার আগে আমরা সকলে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলাম। ফজরের নামাজ শেষে হজরত (দঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন (আমি এই মক্কানগরীতেই তোমাদের চোখের সামনে এশার নামাজ পড়েছিলাম, তারপর আমি বয়তুল মোকাদ্দসে হাজির হয়েছিলাম, সেখানে আমি নামাজও পড়েছি, তারপর এখন তোমাদের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করলাম।'—তফ্‌সীর ইবনে কাছীর ৩—২২।

৫৬১. মসরুক (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা

করলাম, 'আম্মাজান, হজরত মুহম্মদ (দঃ) কি তাঁর প্রভু পালনকর্তাকে দেখেছিলেন ?' আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'তোমার কথায় আমার শরীর শিউরে উঠছে। তুমি কি (সেই) তিনটি বিষয় জাননা, যে তিনটি বিষয় ঘটেছে বলে উক্তি করলে তা মিথ্যা ও অবাস্তব হবে ? [তিনটি বিষয় হল] ঃ ১) যে বলবে হজরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁর প্রভু পালনকর্তাকে দেখেছেন, তার কথা অবাস্তব।' আয়েশা (রাঃ) তাঁর এই উক্তির সমর্থনে কোরআন শরীফের (এই) বাণী আবৃত্তি করলেন, 'কোন মানুষের দৃষ্টি আল্লাহতা'লাকে আয়ত্ত করতে পারে না, কিন্তু (সবকিছু, এমন কি) সকলের দৃষ্টি তাঁর আয়ত্তে।' (তিনি) আরো একটি বাণী আবৃত্তি করলেন, 'কোন মানুষের জন্য (ইহজগতে) এই সুযোগ নেই যে, ক) কাশ্‌ফে বা অন্তরাত্মার মাধ্যমে বাণী পাঠিয়ে, খ) (দৃষ্টির) আড়াল থেকে, গ) বাণী-বহনকারী ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে —এই তিন উপায় ছাড়া অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌তা'লা তার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন।' ২) আর যে ব্যক্তি বলবে হজরত মুহম্মদ (দঃ) আগামী দিনের অগ্রিম খবর জানতেন তার উক্তিও অবাস্তব। আয়েশা (রাঃ) তাঁর এই দাবীর সমর্থনে কোরআনের বাণী আবৃত্তি করলেন, 'কোনো মানুষ জানে না সে আগামীকাল কি করবে।' ৩) আর যে ব্যক্তি বলবে যে হজরত মুহম্মদ (দঃ) (উম্মতদের জানবার যোগ্য কোন কিছু) গোপন রেখেছিলেন, তার উক্তিও মিথ্যা এবং অবাস্তব। আয়েশা (রাঃ) এই দাবীর সমর্থনে কোরআনের এই বাণী আবৃত্তি করলেন, 'হে রসুল, আপনার কাছে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে সব কিছুই আপনি লোকেদের কাছে পেঁছে দিন ; তা না হলে আপনি আপনার রসুল পদের দায়িত্ব-পালনকারীরূপে গণ্য হবেন না।' তারপর আয়েশা (রাঃ) হজরত (দঃ) কর্তৃক আল্লাহ্‌তা'লাকে দেখার প্রমাণরূপে কথিত পবিত্র কোরআনের সুরা নজমের 'হজরত (দঃ) যা দেখেছিলেন তা দেখার সময় তাঁর জ্ঞান-শক্তি একটুও বিভ্রান্ত হয়নি' এবং 'হজরত (দঃ) তাঁকে দ্বিতীয়বার দেখেছিলেন ছেদরাতুল মোনতাহার কাছে'—এই ধরনের বাক্যের বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে' বললেন, 'ঐ সব বাক্যে যাঁকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ছিলেন ফেরেশ্‌তা জিব্রাইল (আঃ)। ফেরেশ্‌তা জিব্রাইল (আঃ) রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে সর্বদা যাতায়াত করলেও রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে কেবলমাত্র দুবার দেখেছিলেন। ওরই বর্ণনা সুরা নজমের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে।'—বুখারী। মুস।

৫৬২. হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) (উপরি উক্ত হাদীসে ব্যক্ত) কোরআন শরীফের বাণী সম্পর্কে বলেন, রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) জিব্রাইল (আঃ)-কে দেখেছেন। —মুসলিম।

৫৬৩. আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ) আল্লাহ্‌র বাণী—'আল্লাহ্‌র বড় নিদর্শন সমূহ দেখলেন'—এর ভাবার্থ সম্পর্কে বলেন, 'হুজুর (সঃ) জিব্রাইলকে আসল আকৃতিতে দেখেছেন। তাঁর (জিব্রাঈলের) ছয়শত ডানা আছে।'—মুসলিম।

৫৬৪. রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) আল্লাহ্‌তা'লাকে অন্তরের চোখে দেখেছেন।—মুস। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৫৬৫. রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) আল্লাহ্‌তা'লাকে অন্তরের চোখে দুবার দেখেছেন। —মুসলিম। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

শবে বরাত

৫৬৬. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যখন শাবান মাসের পঞ্চদশ রজনী উপস্থিত হয় (তখন) ঐ রজনীতে নামাজ পালন কর এবং দিবসে রোজা রাখ, যেহেতু আল্লাহ্ সেইদিন সূর্যাস্তের পর থেকেই পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে অবতীর্ণ হন। তারপর বলেন, 'কোন ক্ষমাপ্রার্থী কি নেই যাকে আমি ক্ষমা করতে পারি ? কোন জীবিকাপ্রার্থী কি নেই যাকে আমি জীবিকা দান করতে পারি ? কোন বিপন্ন ব্যক্তি কি নেই যাকে আমি ত্রাণ করতে পারি ? এমন কেউ কি নেই, এমন কেউ কি নেই ?' এইভাবে ফজর পর্যন্ত বলতে থাকেন।—ই. মাজা ! বর্ণনায় ঃ হজরত আলী (রাঃ)।

৫৬৭. নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা কি জান এই রাত্রিতে (অর্থাৎ শাবানের পঞ্চদশ রাত্রিতে) কি আছে ? তিনি (আয়েশা) বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্, ওতে কি আছে আমাদের বলুন।' তিনি (দঃ) বললেন, 'ওতে আছে এই বৎসর যত মানব সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং যত মানব-সন্তান প্রাণত্যাগ করবে ঐ রাত্রিতে সবই লিপিবন্ধ করা হবে এবং ঐ রাত্রিতে তোমাদের কার্য উত্তোলিত হবে এবং তোমাদের জীবিকা অবতীর্ণ হবে।' তারপর হজরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্, আল্লাহ্র দয়া ব্যতীত কেউ কি বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে ?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না।' তিনবার তিনি একথা বললেন। আমি (আয়েশা) বললাম, 'হে রসূলুল্লাহ্ আপনিও নন ?' একথা শুনে তিনি তাঁর কপালে হাত রাখলেন এবং বললেন, 'না আমিও না, তবে আল্লাহ্তা'লা আমাকে আপন অনুগ্রহ দ্বারা আবৃত করেছেন।' তিনবার তিনি একথা বললেন।—বয়হাকী। বর্ণনায় ঃ আয়েশা (রাঃ)।

দুই ঈদ ও কোরবানী

"হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এক সৎকর্ম-পরায়ণ পুত্রসন্তান দান কর।' তারপর আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। পরে সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম তাকে বলল, বৎস! আমি স্বপ্ন দেখি যে, তোমাকে আমি জবেহ্ করছি ; এখন তোমার অভিমত কি বল ?' সে বলল, 'হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।' যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল, এবং ইব্রাহীম তার পুত্রকে (জবাই করার জন্য) কাত করে শায়িত করল, তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, 'হে ইব্রাহীম, তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে!' এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পুত্রের পরিবর্তে কোরবানীর জন্য একটা হৃষ্টপুষ্ট পশু (দুম্বা) দিলাম। আর পরবর্তীদের মধ্যে তাঁর এই মর্যাদা (এমনভাবে) প্রতিষ্ঠিত করলাম যে, সবাই বলবে—'ইব্রাহীমের প্রতি সালাম!' এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি।" ৩৭ (১০০-১১০) [এখানেই কোরবানীর ঈদ অর্থাৎ ত্যাগের উৎসবের উৎস।]

—আল্-কোরআন।

৫৬৮. যখন শবে কদর শুরু হয় তখন হজরত জিব্রাইল (আঃ) ফেরেশ্তাদের নিয়ে অবতীর্ণ হন এবং আল্লাহ্‌র যে সব বান্দা-বান্দী দাঁড়িয়ে বসে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করছে তাদের জন্য শুভকামনা (দোয়া) করেন। তারপর যখন ঈদের দিন (ঈদুল ফিৎর) আসে তখন আল্লাহ্ তাঁর (রোজাদার) বান্দাদের জন্য গর্ব করে ফেরেশ্তাদের জিজ্ঞাসা করেন, 'হে আমার ফেরেশ্তাবৃন্দ, বল দেখি, আমার কর্তব্য-পরায়ণ প্রেমিক বান্দার প্রতিদান কি হবে ?' ফেরেশ্তারা বলেন, 'হে প্রভো, পূর্ণ-রূপে তার পারিশ্রমিক দান করাই তো তার প্রতিদান।' আল্লাহ্ বলেন, 'আমার বান্দা-বান্দীরা তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছে। তারপর আমার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে করতে ঈদগাহে গমন করছে। আমার সম্মান ও মর্যাদার শপথ, জেনে রেখো. আমি তাদের প্রার্থনা অবশ্য শ্রবণ করবো।' তারপর বলেন, 'হে আমার বান্দাগণ, গমন কর ; আমি নিশ্চয়ই তোমাদের পাপসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করলাম।' নবী (সঃ) বলেন, 'এরপর তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বাড়ী ফেরে।' —বয়হাকী। মিশ। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৫৬৯. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন অন্ততঃ কয়েকটি খোরমা না খেয়ে সকালে বের হতেন না এবং তিনি বেজোড় সংখ্যায় খোরমা খেতেন। ঈদ অর্থ উৎসব। ঈদুল ফিৎর অর্থ দানের উৎসব। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৫৭০. নবী (সঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন ঈদগাহতে গিয়ে প্রথম নামাজ পড়েছেন —খোৎবার পূর্বেই।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

৫৭১. রসূলুল্লাহ্ (সঃ), আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) সকলেই খোৎবার পূর্বে ঈদের নামাজ পড়তেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৫৭২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ঈদুল ফিৎর-এর দিন দু-রাকাত নামাজ পড়েছেন, তার পূর্বে বা পরে কোন নামাজ পড়েন নি।—বুখারী। মুস। বর্ণনায় ঃ ই. আব্বাস (রাঃ)।

৫৭৩. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ঈদের দিন এক পথে যেতেন অন্য পথে প্রত্যাবর্তন করতেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

৫৭৪. ঈদের দিন সেখানে বৃষ্টি হল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁদের সঙ্গে ঈদের নামাজ মসজিদে পড়লেন।—আ. দাউদ। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৭৫. বয়স্কা পর্দানশীন মেয়েরা যাতে দুই ঈদে মুসলমানদের জামাত ও প্রার্থনায় শরীক হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাদের বের করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেওয়া হল। ঋতুমতীদের নামাজের স্থান ভিন্ন ছিল। একজন মহিলা বলল, 'আমাদের কারো কারো ওড়না নেই।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'তার সঙ্গী তাকে ওড়না পরাবে।'—বুখারী। মুস। বর্ণনায় ঃ উম্মে আতিয়া (রাঃ)।

৫৭৬. আমি আবু মুসা আশ্য়ারী ও হোজায়ফাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কোরবানীর ঈদ ও রোজার ঈদে কিরূপে তকবীর বলতেন ?' আবু মুসা বললেন, 'চার তকবীর বলতেন—যেভাবে তিনি জানাজায় তকবীর বলতেন।' এ কথা শুনে হোজায়ফা (রাঃ) বললেন, 'তিনি ঠিকই বলেছেন।'—আবু দাউদ। বর্ণনায় ঃ সাঈদ বিন আস (রাঃ)।

৫৭৭. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) রমজানের ঈদে কিছু না খেয়ে বের হতেন না এবং ঈদুল আজহার নামাজ না পড়ে কিছু খেতেন না।—তির। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৭৮. ঈদুল আজ্হার নামাজ সকাল সকাল পড় এবং ঈদুল ফিৎর দেরীতে পড় এবং মানুষের সদুপদেশ দাও।—মিশ।

৫৭৯. নবী (সঃ) ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আজ্হার দিন নামাজের জায়গায় উপস্থিত হতেন। সর্বপ্রথম তিনি নামাজ শুরু করতেন, তারপর একটু সরে আসতেন, এবং সমবেত জনতার দিকে মুখ ফেরাতেন আর লোকেরা শ্রেণীবদ্ধভাবে বসে থাকত। তিনি তাদের কাছে বক্তৃতা দিতেন, তাদের সদুপদেশ দিতেন, তাদের (সৎকাজ পালনের জন্য) আদেশ দিতেন এবং যদি ইচ্ছা করতেন কোথাও কোন সৈন্যদল প্রেরণ করবেন তবে একদল সৈন পাঠাতেন অথবা যদি কোন কাজের জন্য আদেশ দেবার ইচ্ছা করতেন তবে ওর আদেশ দিতেন। তারপর (গৃহে) ফিরে আসতেন।—শায়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

৫৮০. জাবের (রাঃ) বলেন, একদিন আমি নবী (সঃ)-এর সাথে ঈদের নামাজে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খোৎবা পড়ার পূর্বে আজান ও একামত ছাড়াই নামাজ শুরু করলেন। তারপর যখন নামাজ শেষ করলেন, বেলালের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন করলেন এবং লোকেদের সদুপদেশ দিলেম এবং আল্লাহ্‌র জেকের ও তাবেদারী সম্বন্ধে তাদের তাগিদ দিলেন এবং বেলালকে সঙ্গে নিয়ে রমণীদের কাছে উপস্থিত হলেন। তারপর আল্লাহ্‌কে ভয় করবার জন্য তাদের আদেশ করলেন ও তাদের সদুপদেশ দিলেন এবং আল্লাহ্‌র জেকের (অর্থাৎ স্মরণ) করতে পরামর্শ দিলেন।—নাসায়ী।

৫৮১. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এক কোরবানীর ঈদের দিনে আমাদের খোৎবা দান করলেন এবং বললেন, 'এই ঈদের দিন আমাদের প্রথম যা করতে হবে তা হল নামাজ। তারপর আমরা বাড়ী ফিরব এবং কোরবানী করব। যে ব্যক্তি এই রকম করল সে আমাদের পথে চলল, আর যে ব্যক্তি আমাদের নামাজ পড়ার পূর্বে কোরবানী করল, নিশ্চয় ও তার গোশ্ত খাওয়ার পশু, যা সে (আল্লাহ্‌র জন্য নয়) পরিবারের জন্য জবেহ্ করল। এ কোরবানীর কিছুই নয়।'—বুখারী। মুস। বর্ণনায় ঃ বারায় বিন আজেব (রাঃ)।

৫৮২. একটা উট সাতজনের পক্ষ থেকে (কোরবানী করা যেতে পারে)।—মুস। আ. দাউদ। বর্ণনায় ঃ জাবের (রাঃ)।

৫৮৩. পূর্ণ ছয় মাসের ভেড়া কি উত্তম কোরবানী।—তির। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৮৪. পূর্ণ ছয় মাসের ভেড়া এক বছরের ছাগলের স্থান পূর্ণ করে।—আ. দাউদ। নাসায়ী। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ মুজাশে (রাঃ)।

৫৮৫. জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ রকমের পশু কোরবানী করতে নেই?' তিনি হাত ইশারা করে বললেন, 'চার রকমের পশু—খোঁড়া পশু যার দোষ প্রকাশ্য, অন্ধ পশু যার অন্ধতা প্রকাশ্য, পীড়িত পশু যার পীড়া প্রকাশ্য, শীর্ণ পশু যা বলবান হবার নয়।'—তির। বর্ণনায় ঃ বারায়া বিন আজেব (রাঃ)।

৫৮৬. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) নির্দেশ করেছেন—আমরা যেন শিং-ভাঙা ও কান-কাটা পশুর দ্বারা কোরবানী না করি।—ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ আলী (রাঃ)।

৫৮৭. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) শিংওয়ালা শক্তিশালী দুম্বা দ্বারা কোরবানী করতেন যার চোখ কালো, মুখ কালো এবং পা কালো। —তির। আ. দাউদ। নাসায়ী। ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ আবু দাউদ খুদরী (রাঃ)।

৫৮৮. নবী (সঃ) ঈদুল আজহার দিন দুই শিংওয়ালা শ্বেত ও কৃষ্ণকায় খাসি-ভেড়া জবেহ্ করেছিলেন। যখন তিনি তাদের কেব্‌লার দিকে রাখলেন, তখন বললেন—'নিশ্চয়ই আমি তাঁরই দিকে মুখ ফেরাচ্ছি যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। (এ) সত্যনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মের ওপরে প্রতিষ্ঠিত এবং আমি পৌত্তলিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার অনুষ্ঠান, আমার জীবন, আমার মরণ সবই নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি এই আদেশই পেয়েছি এবং আমি মুসলমানদের প্রথম। হে আল্লাহ্, এ তোমারই তরফ থেকে এবং তোমারই জন্য। মুহম্মদ ও তাঁর উম্মতদের পক্ষে (এ গ্রহণ কর)—বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবর।' তারপর তিনি জবেহ করলেন।—মিশ। আ. দাউদ। ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ জাবের (রাঃ)।

৫৮৯. ঈদুল আজ্‌হার দিন মানব-সন্তানের কোন কার্যই (বধ্যপশুর) রক্তপাত অপেক্ষা আল্লাহ্‌র (কাছে) অধিকতর প্রিয় নয়। নিশ্চয় রোজ কেয়ামতে সে ওর শিং, লোম, এবং ক্ষুর সহ উপস্থিত হবে এবং নিশ্চয় ওর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হয়। অতএব ওর দ্বারা নিজেকে পবিত্র কর। [কোরবানীর মাংসের অধিকাংশ অর্থাৎ ⅔ অংশ আত্মীয়-স্বজনদের দান না করলে কোরবানী ব্যর্থ হয়।] —তির। ই. মাজা।

৫৯০. একদিন সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই কোরবানী কি?' তিনি বললেন, 'তোমাদের পিতা হজরত ইব্রাহীমের সুন্নত (নিয়ম)।' পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এতে আমাদের কি আছে?' তিনি বললেন, 'পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে এক একটা পুণ্য আছে।' [কারণ এর ফলে বঞ্চিতরাও অবশ্যই কিছু পায়।]—আহ্। ই. মাজা। বর্ণনায়ঃ জায়েদ বিন আরকাম (রাঃ)।

হজ্জ্ ও ওমরা

[হজ্জ্ শব্দের সাধারণ অর্থ তীর্থ-ভ্রমণ। সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমানদের জন্য পৃথিবীর প্রথম উপাসনালয় কাবাশরীফ এবং মক্কামদীনা দর্শন করা ফরজ। ওমরাকে ছোট হজ্জ্-ও বলা হয়। প্রভেদ এই যে হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে, কিন্তু ওমরার জন্য নির্দিষ্ট সময় নেই, বছরের সবসময় ওমরা হতে পারে। তাছাড়া এহ্‌রাম বেঁধে কাবাগৃহের তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) ও সাফা-মারওয়া তওয়াফ করলেই ওমরা সম্পন্ন হয়, আর কিছু করতে হয় না।]

'তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর এবং সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত নয়। নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ (কা'বা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মক্কায়), ও আশিস্-প্রাপ্ত এবং বিশ্বজগতের দিশারী। ওতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, (যেমন) ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থান এবং যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য

আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ্ করা তার অবশ্য কর্তব্য (ফরজ)।' ৩ (৯৫-৯৭)

'আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ্ ও 'ওমরা' পূর্ণভাবে সম্পাদন কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কোরবানী কর। এবং যে পর্যন্ত কোরবানীর পশু গন্তব্যস্থানে উপস্থিত না হয় তোমরা মস্তক মুণ্ডণ করো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা মাথায় যন্ত্রণা বোধ করে, তবে সে তৎপরিবর্তে রোজা রাখবে, কিংবা দান-খয়রাত করবে অথবা কোরবানী দ্বারা তার ফিদ্‌য়া (বিধিসঙ্গত অর্থ) দান করবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'ওমরা' দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কোরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ কোরবানীর কিছুই না পায়, তবে তাকে হজ্জের সময় তিনদিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন এই পূর্ণ দশদিন রোজা পালন করতে হবে। এই নিয়ম সেই ব্যক্তির জন্য যার পরিবার-পরিজন পবিত্র কা'বার নিকটে বাস করে না।' ২ (১৯৬)

'সুবিদিত মাসে (শওয়াল, জিলকদ্ ও জিলহজ্জ্ মাসে) হজ্জ্ হয়। যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্জ্ করা পবিত্র বলে মনে করে, সে যেন হজ্জের সময় স্ত্রী-সহবাস, পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। আর তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ্ তা' জানেন, এবং তোমরা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ কর এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।' ২(১৯৭)

'এবং মানুষের কাছে তাদের হজ্জ্ ঘোষণা করে দাও ; ওরা তোমার কাছে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উটের পিঠে আসবে, আসবে দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে ; যাতে ওরা ওদের কল্যাণ লাভ করে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে। ওদের তিনি পশু থেকে তার জবাই (কোরবানী)-কালে যা জীবনোপকরণ (মাংস ইত্যাদি) দিয়েছেন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং দুঃস্থ অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। তারপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহের (কা'বার) তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে।' ২২ (২৭-২৯)

—আল্-কোরআন।

৫৯১. 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হজ্জ্ ফরজ (অবশ্য কর্তব্য) করেছেন।' তখন আকরা বিন হারেস দাঁড়িয়ে বললেন, 'ও কি প্রতি বছরের জন্য ?' তিনি বললেন, 'যদি বলি হাঁ—তবে ও পালন করা তোমাদের কর্তব্য হবে এবং যদি ও কর্তব্য হয় তবে তোমরা তা পারবে না। হজ্জ্ (সারা জীবনে) একবার মাত্র ফরজ (অবশ্য কর্তব্য), যে বেশী করে ও তার জন্য নফল।'—মিশকাত।

৫৯২. আল্লাহ্‌র ঘরে পৌঁছুবার জন্যে যার পাথেয় ও বাহন আছে অথচ সে হজ্জ্ করে না সে ইহুদী বা খৃষ্টান হয়ে প্রাণত্যাগ করল কিনা তাতে কিছু এসে যায় না। যেহেতু মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্ বলেছেন, 'মানুষের মধ্যে যার পাথেয় আছে, তার পক্ষে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাঁর ঘর দর্শন করা ফরজ' (৩:৯৭)। —তির

৫৯৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ্ করে, তারপর অশ্লীল কথা বলে না এবং পাপের কাজ করেনা—সে সেই দিনের মত (নিষ্পাপ হয়ে) প্রত্যাবর্তন করে যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।—বুখারী। বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৫৯৪. দ্রুত হজ্জ্ পালন কর, কারণ কেউ জানে না যে কখন সে প্রাণত্যাগ করবে।—সগির।

৫৯৫. রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ কাজ সবচেয়ে উত্তম ?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস করা।' 'তারপব কি ?' তিনি বললেন, 'খোদার পথে জেহাদ করা।' 'তারপর কি ?' তিনি বললেন 'মনোনীত হজ্জ্ পালন করা।'—শায়খান।

৫৯৬. হজরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে রসূলুল্লাহ্, আমি তো জেহাদকেই উত্তম কাজ বলে মনে করি, আমি কি জেহাদ করব ?' তিনি বললেন, 'হজ্জ্ জেহাদের চেয়েও উত্তম এবং সুন্দর, যদি তার মধ্যে কোন কুকর্ম না করা হয়, নয়তো ঘরে বসে থাকাই বাঞ্ছনীয়। বৃদ্ধ, দুর্বল ও স্ত্রীলোকদের জন্য হজ্জ্ই জেহাদ।'—বুখারী।

৫৯৭. হজ্জ্ দুর্বলদের জন্য জেহাদ।—সগির।

৫৯৮. 'হে রসূলুল্লাহ্, নারীদের জন্য জেহাদ আছে ?' তিনি বললেন, 'হাঁ। তাদের জন্য সেই জেহাদ আছে যাতে যুদ্ধ নেই। ঐ জেহাদ হল হজ্জ্ এবং ওমরা।' —ইবনে মাজা।

৫৯৯. এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হে রসূলুল্লাহ্, কিসে হজ্জ্, ফরজ করে ?' তিনি বললেন, 'পাথেয় ও যানবাহনের সুবিধা।'—তির। ই. মাজা। বর্ণনায় ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৬০০. ইয়েমেনের লোক হজ্জ্ করত কিন্তু কোন পাথেয় সঙ্গে নিত না এবং বলত আমরা (আল্লাহ্র ওপর) নির্ভরশীল। তারপর যখন মক্কায় পেঁছুতো, তারা মানুষের কাছে সাহায্য চাইত। তখন 'আল্লাহ্তা'লা এই বাণী অবতীর্ণ করলেন, 'তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর ; নিশ্চয় পুণ্যকার্যই সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয়' (২ঃ ১৯৭)।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৬০১. যখন কেউ হজ্জ্ শেষ করে সে দ্রুত গৃহে ফিরবে, নিশ্চয় ও তার জন্য মহৎ পুরস্কার।—সগির।

৬০২. যখন তোমরা কোন হাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর তখন তিনি বাড়ীতে পেঁছুবার পূর্বে তাঁকে সালাম কর এবং তাঁর করমর্দন (মোসাফা) কর এবং তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বল, যেহেতু তাঁকে ক্ষমা করা হয়েছে।—মিশ্ (আহ্)।

৬০৩. হে আল্লাহ্, হাজীকে ক্ষমা কর এবং তাঁকে ক্ষমা কর হাজীগণ যাঁর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।—সগির।

৬০৪. আল্লাহ্র মেহ্মান তিনজন—গাজী (অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধে শহীদ), হাজী এবং ওমরা পালনকারী। —নাসায়ী। বয়হাকী।

৬০৫. আনাস (রাঃ) বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সঙ্গে মদীনায় চার রাকাত জোহরের নামাজ পড়েছিলাম। তারপর সেখানেই তিনি ভোর পর্যন্ত রইলেন। পরে উটের পিঠে আরোহণ করে যখন তিনি বাইদায় পেঁছুলেন তখন আলহাম-দুলিল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ্ ও আল্লাহুআকবর বললেন। তারপর হজ্জ্ ও ওমরার জন্য 'লাব্বাইক্' বললেন। অন্যান্য লোকেরাও (হজ্জ্ ও ওমরা) উভয়ের জন্য 'লাব্বাইক'

বলল। তারপর যখন আমরা মক্কায় পেঁৗছুলাম তখন লোকে (শুধু ওমরা করে') তাঁর আদেশে এহ্‌রাম ছাড়ল। জিলহজ্জ্‌ মাসের ৮ তারিখে লোকেরা হজ্জের জন্য 'লাব্বাইক' বলে এহ্‌রাম বাঁধল। রাবী বলেন, নবী (সঃ) বহু দাঁড়িয়ে-থাকা-উট নিজ-হাতে জবাই করলেন। (অন্য সময়) তিনি মদীনায় দুটি ছাই রঙের ভেড়া কোরবানী করেছিলেন। —বুখারী।

৬০৬. রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হজ্জ্‌ করার আগে ওমরা করেছিলেন। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইব্‌নে ওমর (রাঃ)।

৬০৭. ইব্‌নে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন—তিনি জুল-হুলাইফা থেকে লাব্বাইক্‌ বলতেন এবং হরমে পেঁৗছে বিরত হতেন। তিনি তুওয়ায় পেঁৗছে রাত্রি যাপন করতেন এবং ফজরের নামাজ পড়ে গোসল করতেন। তিনি বলতেন যে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এইরকমই করেছেন। —বুখারী।

৬০৮. রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর তালবিয়া (তৌহীদ ঘোষণা) এই ঃ 'হে আমার আল্লাহ্‌, লাব্বাইকা (অর্থাৎ আমি তোমার সেবার জন্যে হাজির আছি), লাব্বাইকা, তোমার কোন শরীক নেই ; লাব্বাইকা, নিশ্চয় প্রশংসা, সম্পদ ও শক্তি তোমারই। তোমার কোন অংশী নেই।' —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে ওমর (রাঃ)।

৬০৯. আবু মুসা (রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে ইয়েমেনে আমার গোত্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমি যখন আসলাম তখন তিনি (মক্কার প্রান্তে) বাত্‌হায় অবস্থান করছিলেন। তিনি বললেন, 'তুমি কি বলে এহ্‌রাম বেঁধেছ ?' আমি বললাম, এই বলে—'আমি নবী (সঃ)-এর এহ্‌রামের মত এহরাম বাঁধলাম।' তিনি বললেন, 'তোমার সঙ্গে কি কোরবানীর জন্তু আছে ?' আমি বললাম, 'না।' ফলে তাঁর আদেশক্রমে আমি কা'বা গৃহের (চারদিক) এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তওয়াফ করলাম। তারপর তাঁর আদেশে আমি এহ্‌রাম ছাড়লাম। তারপর আমার গোত্রের একজন স্ত্রীলোকের কাছে গেলাম। সে আমার চুল আঁচড়ে দিল (অথবা আমার মাথা ধুইয়ে দিল)। তারপর ওমর (রাঃ) খলীফা হলে তিনি বললেন, 'যদি আমরা কেতাব গ্রহণ করি তবে কথা এই যে তিনি আমাদের পূর্ণরূপে আদায় করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ্‌ ও ওমরাহ্‌ পুরোপুরি আদায় কর।' আর যদি আমরা নবী (সঃ)-এর সুন্নত (নিয়ম) গ্রহণ করি তবে কথা এই যে তিনি কোরবানী না করা পর্যন্ত এহ্‌রাম ছাড়েননি।' —বুখারী

৬১০. নবী (সঃ) এর পত্নী হাফ্‌সা (রাঃ) বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্‌, লোকেদের কি হয়েছে যে তারা ওমরার এহ্‌রাম ছেড়ে দিল, অথচ আপনি নিজে ওমরার এহ্‌রাম ছাড়লেন না ?' তিনি বললেন, 'আমি আঠালো জিনিষ দিয়ে মাথার চুল জমিয়েছি, আর কোরবানীর জন্তুকে গলহার পরিয়েছি ; সুতরাং কোরবানী না করা পর্যন্ত আমি এহ্‌রাম ছাড়বনা।'—বুখারী।

৬১১. ইব্‌নে ওমর (রাঃ) বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)কে মক্কায় আসার পর প্রথম তওয়াফে 'হাজ্‌রে আসওয়াদ'কে চুম্বন করতে আর সাত বারের মধ্যে তিন তওয়াফে রমল করতে দেখেছি। —বুখারী।

৬১২. ওমর (রাঃ) বলেন, তিনি 'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের' কাছে এসে ওকে চুম্বন করলেন ও বললেন, 'আমি জানি তুমি একটা পাথর মাত্র ; (কারো) অপকার করতে

পারো না, উপকারও করতে পার না। যদি আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।'—বুখারী।

৬১৩. যে ব্যক্তি হজ্জ্ ও ওমরা পালনের জন্য বয়তুল মোকাদ্দস হতে কাবা শরীফ পর্যন্ত এহ্রাম বাঁধে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাপ মাফ হয় অথবা তার জন্য বেহেশ্ত ওয়াজেব হয়।—আ. দাউদ। ই. মাজা।

৬১৪. হজ্জ্ ও ওমরাপালনকারিগণ আল্লাহ্‌র নিমন্ত্রিত ব্যক্তি। তাঁরা যা প্রার্থনা করেন আল্লাহ্ তাদের তা দেন এবং যে বিষয়ে তাঁরা আহ্বান করেন তিনি তাঁর জবাব দেন এবং তারা যা ব্যয় করে, তার পুরস্কার স্বরূপ হাজার দিরহাম দান করেন। —সগির।

৬১৫. যে ব্যক্তি হজ্জ্ বা ওমরা পালন করার জন্যে অথবা ধর্মযুদ্ধ করার জন্যে ঘর থেকে বের হয়, তারপর পথের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে, আল্লাহ্ তার জন্য একজন গাজী, হাজী অথবা ওমরা-পালনকারীর পুরস্কার লিপিবদ্ধ করবেন।—বয়হাকী।

৬১৬. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজের হজ্জের সময় মাথার চুল কামিয়েছিলেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইব্নে ওমর (রাঃ)।

৬১৭. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'হে আল্লাহ্, (হজ্জের সময়) যারা মাথা কামায়, তাদের প্রতি দয়া কর।' তারা (সঙ্গীগণ) বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্, যারা চুল ছাঁটে তাদের প্রতিও?' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ্, যারা মাথা কামায় তাদের প্রতি দয়া কর।' তারা বলল, 'হে রসূল্লাহ্, যারা চুল ছাঁটে তাদের প্রতিও?' তিনি বললেন, 'যারা চুল ছাঁটে তাদের প্রতিও।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইব্নে ওমর (রাঃ)।

৬১৮. আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আবু আওফা (রাঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) (হোদায়বিয়ার সন্ধির পর বছর) ওমরা করলেন, কাবাগৃহ তওয়াফ করলেন এবং মকাম (-ইব্রাহীমের)-এর পশ্চাতে দু রাকাত নামাজ পড়লেন। তাঁর সাথে কতক লোক ছিল যারা তাঁকে পাহারা দিচ্ছিল। একজন লোক তাঁকে (আব্দুল্লাহ্কে) প্রশ্ন করল, '(হজ্জের সময়) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কি কাবাগৃহে প্রবেশ করিছিলেন?' তিনি বললেন, 'না।'—বুখারী।

৬১৯. ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সকলকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে তাদের শেষ দর্শন (বিদায়ী তওয়াফ) যেন কা'বাগৃহের সাথে হয়; কিন্তু ঋতুমতী স্ত্রীলোকদের এ মাফ করা হয়েছে।—বুখারী।

৬২০. ইয়াজুজ্ মাজুজ্-এর আবির্ভাবের পরও কাবার হজ্জ্ এবং ওমরা চলতে থাকবে। [ইয়াজুজ মাজুজ-নামক দুটি জাতি কেয়ামতের প্রাক্কালে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীতে উৎপাত উপদ্রব সৃষ্টি করবে।]—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু সঈদ খুদরী (রাঃ)।

বিদায় হজ্জ্

৬২১. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নয় বৎসর মদীনায় অতিবাহিত করেন কিন্তু তার মধ্যে হজ্জ্ ব্রত পালন করেন নি। তারপর দশম বর্ষে সবার সামনে ঘোষিত হল যে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হজ্জ্ উদ্যাপনে মনস্থ করেছেন। তখন মদীনায় বহু লোকের সমাগম হল। তারপর আমরাও তাঁর সঙ্গে যাত্রা করলাম। যখন আমরা জুল-

হুলাইফাতে উপস্থিত হলাম, তখন ওমায়েসের কন্যা আসমা মুহম্মদ বিন আবু বকরকে প্রসব করলেন। তিনি রসুলুল্লাহ্(সঃ)-র কাছে খবর পাঠালেন, 'এখন আমি কি করি?' তিনি (দঃ) বললেন, 'স্নান কর এবং একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা নিম্নাঙ্গ আবৃত কর এবং এহ্রাম বাঁধ।' তারপর হজরত রসুলুল্লাহ (সঃ) সেখানকার মসজিদে নামাজ পড়লেন, তারপর তাঁর কাছওয়ার (উটের) ওপর আরোহণ করলেন। যখন ও তাঁকে বায়দা নামক স্থানে নিয়ে উপস্থিত হল তিনি তৌহীদ ঘোষণা করতে লাগলেন—'হে আল্লাহ্, লাব্বাইকা (আমি তোমার খেদমতে হাজির আছি); লাব্বাইকা, তোমার কোন শরীক নেই; লাব্বাইকা, নিশ্চয় সমস্ত সাম্রাজ্য, প্রশংসা ও অনুগ্রহ তোমারই; তোমার কোন শরীক নেই।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)

৬২২. জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা শুধু হজ্জের নিয়ত (সংকল্প) করেছিলাম এবং আমরা তাঁর সঙ্গে বায়তুল্লাহ্তে না পৌঁছন পর্যন্ত ওমরা কি জানতাম না। তিনি ওর স্তম্ভকে চুম্বন করেছিলেন এবং সাতবার ওকে তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করেছিলেন। তার মধ্যে তিন বার আস্তে আস্তে দৌড়েছিলেন আর চারবার হেঁটেছিলেন। তারপর তিনি 'মকামে ইব্রাহীমের' কাছে গেলেন এবং পাঠ করলেন, 'মকামে ইব্রাহীমকে উপাসনা-স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।'

৬২৩. সেইখানে তিনি 'মকামে ইব্রাহীমের' মধ্যবর্তী স্থানে দু রাকাত নামাজ পড়লেন। (অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি দু রাকাতে যথাক্রমে কোলহু আল্লাহ্ আহাদ এবং কোল ইয়া আইওহাল কাফেরুন—এই সুরা দুটি পাঠ করেছিলেন। তারপর তিনি সেই স্তম্ভের কাছে ফিরে আসলেন এবং তা স্পর্শ করলেন। তারপর তিনি দরজার মধ্য দিয়ে সাফা নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। তারপর যখন সাফার নিকটবর্তী হলেন তখন পাঠ করলেনঃ 'নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত।' (২:১৫৮)

৬২৪. তারপর আল্লাহ্তা'লা তাঁকে যে ভাবে আরম্ভ করতে শিখিয়েছিলেন তিনি সেই ভাবে আরম্ভ করলেন। তিনি প্রথমে সাফা পর্বতে আরোহণ করলেন এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি কা'বা শরীফ দেখতে পেলেন ততক্ষণ আরো ওপরে আরোহণ করতে লাগলেন। তারপর তিনি কা'বা শরীফের দিকে মুখ ফেরালেন এবং আল্লাহ্র তৌহীদ (একত্ব) ঘোষণা করলেন ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করলেন; আর বললেন, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই; তিনি এক এবং তাঁর অংশীদার নেই; তাঁর সাম্রাজ্য, তাঁর সমস্ত প্রশংসা এবং তিনিই সমস্ত দ্রব্যের ওপর শক্তিশালী। সেই অদ্বিতীয় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, আপন প্রতিজ্ঞা পালন করেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেন এবং তাঁর বিপক্ষ দলকে একাকী পরাজিত করেন।' তারপর তিনি প্রার্থনা করেলেন এবং তিনবার ওর অনুরূপ বাণী উচ্চারণ করলেন। তারপর তিনি (সাফা পর্বত থেকে) নেমে এলেন, পায়ে হেঁটে মারওয়ার কাছে গেলেন এবং (দুই পর্বতের মধ্যবর্তী) উপত্যকার তলদেশ আপন পদদ্বয় দ্বারা স্পর্শ করলেন। মারওয়াতে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি হাঁটলেন এবং দৌড়লেন, তারপর সাফাতে যেমন করেছিলেন মারওয়াতেও তেমনি করলেন। পরে মারওয়াতে শেষ প্রদক্ষিণের সময় যখন জনগণ তাঁর পশ্চাতে নিম্নদেশে অবস্থান করছিল, তখন তিনি পর্বতের ওপর থেকে ঘোষণা করলেন, 'আমি যা পরে জেনেছি তা যদি আগে জানতে পারতাম তা হলে বধ্য পশুগুলোকে আমি

তাড়িয়ে আনতাম না এবং তাদের দ্বারা ওমরা পালন করতাম। অতএব তোমাদের মধ্যে যার কাছে কোন পশু নেই সে তা হালাল করুক এবং তা ওমরার জন্য পালন করুক।'* তারপর সুরাকা ইবনে মালেক বললেন, 'এটি শুধু এই বৎসরের জন্য না চিরকালের জন্য?' তখন রসুলুল্লাহ্ (সঃ) একটা আঙুলকে অপর আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'হজ্জের মধ্যে ওমরা প্রবেশ করেছে।' দু'বার তিনি এই কথা বললেন। তারপর বললেন, 'না বরং চিরকালের জন্য।' [*সম্ভবত যাদের সঙ্গে কোন বধ্য পশু ছিল না তাদের জন্য চুল কাটান, নখ ফেলা ও এহ্রাম বর্জন করার বিধান ছিল।]

৬২৫. নবী (সঃ) আরাফাতে না পৌঁছনো পর্যন্ত ক্রমাগত অগ্রসর হতে লাগলেন। নামরাতে তাঁর জন্য যে শিবির স্থাপিত হয়েছিল তিনি তা দেখতে পেলেন। যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল, তখন তিনি কাস্ওয়ার (উটের) ওপর থেকে অবতরণ করলেন। তারপর তিনি উপত্যকার পাদদেশে উপস্থিত হলেন এবং সমবেত জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, 'নিশ্চয় আজকের এই পবিত্র দিনের মত এই পবিত্র মাসের মত এবং এই পবিত্র শহরের মত তোমাদের পরস্পরের রক্ত ও ধনসম্পত্তি পরস্পরের জন্য হারাম। জেনে রেখো, অন্ধকার যুগের প্রতিটি অনুষ্ঠান আজ আমার পদতলে দলিত ও মথিত হল, অন্ধকার যুগের রক্তের দাবী আজ থেকে চিরকালের মত রহিত হল ; আর আমাদের মধ্যে হারেসের পুত্র ইবনে রাবিয়ার হত্যা সর্বপ্রথম রক্তপাত—তার ক্ষতিপূরণ আমি রহিত করে দিলাম—সে সায়াদ বংশে প্রতিপালিত হয়েছিল এবং হোজায়েল তাকে হত্যা করেছিল। অন্ধকার যুগের সুদ প্রথা রহিত হয়ে গেল আর আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুদ আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাসের তা রহিত করা হল এবং ওসব নিষিদ্ধ হল।

তারপর রমণীদের সম্পর্কে বললেন, আল্লাহ্কে ভয় কর, নিশ্চয় তোমরা তাদের আল্লাহ্র জামিনে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্র বাণী দ্বারা তাদের দেহকে তোমাদের জন্য বৈধ করেছ। তোমাদের প্রতি তাদের কর্তব্য এই যে তারা তোমাদের শয্যায় এমন কাউকেও স্থান দেবে না যা তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এমন করে তাদের প্রহার কর—তবে বিষম ভাবে নয় এবং তোমাদের কর্তব্য এই যে তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের ভরণ পোষণ কোরো। আর তোমাদের মধ্যে আমি একটা জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা দৃঢ় ভাবে অবলম্বন কর তাহলে তোমরা পথ ভ্রষ্ট হবে না—ও হল আল্লাহ্র গ্রন্থ (কোরআন) এবং যা তোমরা আমার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও অর্থাৎ হাদীস।'

'এখন তোমরা এ সম্বন্ধে কি বল?' তাঁরা বললেন, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আমাদের কাছে আল্লাহ্র বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, পরিপূর্ণ করেছেন এবং আমাদের সদুপদেশ দান করেছেন।' তারপর তিনি তাঁর তর্জনী অঙ্গুলি আকাশের দিকে উত্তোলন করে বললেন, 'হে আল্লাহ্ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ্ সাক্ষী থাক'—তিনি তিনবার এ কথা বললেন।

হাজ্রোল আস্ওয়াদ ও আরাফাত

৬২৬. নিশ্চয় 'হাজ্রোল আসওয়াদ' (কৃষ্ণ-প্রস্তর) এবং 'মকামে ইব্রাহীম' বেহেশ্তের দুটি মরকত মণি। আল্লাহ্ তাদের ঔজ্জ্বল্য দূরীভূত করেছেন।

যদি ওদের আলোক দূরীভূত না হত তবে ওরা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী যাবতীয় পদার্থকে উদ্ভাসিত করত।—তির।

৬২৬. (ক) হাজ্রোল আসওয়াদ বেহেশ্ত থেকে অবতরণ করেছে ; ও দুধের থেকেও সাদা ছিল, কিন্তু মানুষের পাপস্পর্শ ওকে কালো করে' দিয়েছে।—তির। মিশ্।

৬২৭. আল্লাহ্র কসম, রোজ কেয়ামতে আল্লাহ্ হাজ্রোল আসওয়াদকে দুটি চক্ষু দান করবেন, ওর দ্বারা সে দেখতে পাবে এবং একটা জিহ্বা দান করবেন যার দ্বারা সে কথা বলবে। যারা আন্তরিকতার সাথে তাকে চুম্বন করেছে, তাদের সম্বন্ধে সে সাক্ষ্য দেবে।—তির। ই. মাজা। মিশ্।

৬২৮. আবেস বিন রাবিয়া বলেন, আমি হজরত ওমরকে হাজরোল আসওয়াদ (কৃষ্ণ প্রস্তর) চুম্বন করতে দেখেছি। তিনি বলছিলেন, 'নিশ্চয় আমি জানি তুমি একখানা পাথর মাত্র—কোন উপকার অথবা অপকার করার সাধ্য তোমার নেই ; যদি আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম তবে কখনই আমি তোমায় চুম্বন করতাম না।' প্রত্যুত্তরে হজরত আলী (রাঃ) বলেন, 'না, একথা সত্য নয়, নিশ্চয় ওর উপকার বা অপকার করার শক্তি আছে। কেয়ামতের দিন ও আমাদের কাজের সাক্ষ্য দেবে।'—শায়খান।

৬২৯. আরাফাতের দিন অপেক্ষা অন্য কোনদিনেই আল্লাহ্ অধিক সংখ্যক বান্দাকে দোজখ থেকে মুক্তি দান করেন না। সেদিন আল্লাহ্ বান্দাদের অধিকতর নিকটবর্তী হন এবং ফেরেশতাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে গর্ব করেন, তারপর বলেন, 'তারা কি চায় ?'—মুস।

৬৩০. আরাফাতের দিনে আল্লাহ্তা'লা নিম্নতম আকাশে অবতরণ করেন। তারপর ফেরেশ্তাদের কাছে গর্ব করে বলেন, 'আমাদের বান্দাদের দিকে লক্ষ্য কর—তারা আমার কাছে এলোমেলো মাথায়, ধূলি-ধূসরিত অবস্থায় অতি দূর দেশান্তর থেকে এসেছে ; তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদের ক্ষমা করলাম।' ফেরেশ্তারা বলেন, 'হে প্রভো, অমুক অমুক নর ও নারীরা ধার্মিক বলে' পরিচিত ছিল।' তখন মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্ বলেন, 'আমি তাদের ক্ষমা করেছি।' তারপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'আরাফাতের দিনের চেয়ে আর কোন দিনই অধিক সংখ্যক ব্যক্তি নরক থেকে মুক্তি পায় না।'—মিশ।

৬৩১. আরাফাতের দিন ছাড়া শয়তানকে আর কোন দিনই অধিকতর হীন, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত ও ক্রুদ্ধ দেখা যায় না। কারণ সেদিন সে আল্লাহ্র করুণা এবং মহাপাপের মার্জনা লাভ হতে দেখে। তবে বদরের যুদ্ধের দিনেও সে অনুরূপ অবস্থা দর্শন করেছিল। সেদিন সে দেখেছিল জিব্রাঈল ফেরেশতাদের শ্রেণীবদ্ধ করছেন।—মালেক।

৬৩২. সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রার্থনা আরাফাতের দিনের প্রার্থনা এবং সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাক্য যা আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীরা আন্তরিকভাবে বলেছি তা হল এই—'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁরই সাম্রাজ্য, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত কিছুর ওপর শক্তিশালী (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, অহ্দাহু লাশরীকালাহু, লাহুল মুলকো, অলাহুল হামদো, অহুয়া আ'লা কুল্লে শাইয়িন কাদীর)।—তির। মালেক।

মক্কা-মদীনার ফজিলত

৬৩৩. আল্লাহ্‌র শপথ (হে মক্কা!) তুমিই পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট নগরী এবং আল্লাহ্‌তালা'র কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আমার কওম যদি আমাকে বহিষ্কৃত করে' না দিত তবে কখনই আমি বহিষ্কৃত হতাম না।—তির। ই. মাজা।

৬৩৪. (হে মক্কা!) নগরীগুলির মধ্যে তুমি কত উৎকৃষ্ট এবং আমার কাছে কত প্রিয়। যদি আমার কওম আমাকে বহিষ্কৃত করে না দিত, তবে কখনই আমি অন্যত্র বসবাস করতাম না।—তির।

৬৩৫. আল্লাহ্‌ এই শহরকে সেই দিন পবিত্র করেছেন যে দিন তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত এ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে পবিত্র থাকবে।—শায়খান।

৬৩৬. যে পর্যন্ত মানুষ একে সম্মান করতে বিরত হবে না, সে পর্যন্ত তারা উন্নত থাকবে। যখন তারা একে অবজ্ঞা করবে, তখন তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।—ই. মাজা।

৬৩৭. যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমাকে দেখতে আসে সে পরলোকে আমার প্রতিবেশী হবে, যে ব্যক্তি মদীনাতে বসবাস করে আর আপদ-বিপদে ধৈর্য ধারণ করে আমি তার জন্যে কেয়ামতে সাক্ষ্যদাতা ও সুপারিশকারী হব এবং যে ব্যক্তি পবিত্র নগরীদ্বয়ের মধ্যে যে কোন একটিতে প্রাণত্যাগ করবে, আল্লাহ্‌ তাকে কেয়ামতের দিন নির্ভীক রূপে উত্থিত করবেন।—বয়হাকী।

৬৩৮. যে ব্যক্তি হজ্জ্‌ করে, তারপর আমার মৃত্যুর পর আমার কবর জেয়ারত করে সে সেই ব্যক্তির মত যে আমার জীবিতকালে আমাকে দেখেছে।—বয়হাকী।

৬৩৯. আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থল বেহেশ্‌তের অন্যতম একটা বাগান।—তির। নাসায়ী। শায়। আহ্‌।

জাকাত

['জাকাত' এই আরবী শব্দের অর্থ শুদ্ধিকরণ। এ কেবল ধনী মুসলমানদেরই ওপর ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। প্রতি বছর তাদের সঞ্চিত ধন-সম্পদ থেকে একটা নির্দিষ্ট হারে বাধ্যতামূলকভাবে দরিদ্রদের জাকাত দান করে ধনী মুসলমানদের শুদ্ধ হতে হয়। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাই দরিদ্র ব্যক্তিদের ধনীদের জন্য পাপমোচনকারী রূমালরূপে বর্ণনা করেছেন।]

'তোমরা নামাজকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত কর এবং জাকাত আদায় কর।' ২ (১১০)

'যথাযথভাবে নামাজ পড়, জাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।' ২৪ (৫৬)

—আল্‌-কোরআন।

[কোরআন শরীফ থেকে এ সংক্রান্ত আরো উদ্ধৃত 'নামাজ' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

৬৪০. রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) মুয়াজকে ইয়েমেন প্রদেশের শাসনকর্তা রূপে প্রেরণ

করেন এবং তাঁকে বলেন, 'তুমি তাদের এই সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করবে যে—আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহম্মদ (দঃ) তাঁর রসূল। যদি তারা এ মেনে নেয় তবে তাদের শিখিয়ে দাও যে, প্রতিদিন দিনে-রাতে আল্লাহ্ তাদের ওপর পাঁচ বার নামাজ ফরজ করেছেন। যদি তারা এ-ও মেনে নেয়, তবে তাদের জানাবে যে, আল্লাহ্ তাদের ধনসম্পত্তিতে জাকাত ফরজ করেছেন। ও (জাকাত) তাদের ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরিত হবে।'—বুখারী। শায়। বর্ণনায় : ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ)।

৬৪১. একজন বেদুইন নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, 'আপনি আমাকে এমন কোন কাজের নির্দেশ দিন যা করলে আমি বেহেশ্‌তে যেতে পারব।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র উপাসনা করবে, তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর অংশী করবে না; ফরজ নামাজ যথাযথভাবে আদায় করবে, ফরজ জাকাত দান করবে এবং রমজান মাসে রোজা রাখবে।'—বুখারী। বর্ণনায় : আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬৪২. শাকসব্জি, কৃষিজাত তরিতরকারিতে কোন জাকাত নেই, পাঁচ ওসকের (অর্থাৎ প্রায় ২৮ মণ শস্যের) কমে, বা ভারবাহী পশু, অশ্ব, গর্দভ অথবা ক্রীতদাসের জন্য কোন জাকাত নেই।—মিশ্।

৬৪৩. পাঁচ উকিয়া (অর্থাৎ ৫২½ তোলা রৌপ্য)-এর কমে জাকাত নেই; পাঁচটি উটের কমে জাকাত নেই এবং পাঁচ ওসক (অর্থাৎ২৮ মণ শস্য)-এর কমেও কোন জাকাত নেই।—বুখারী। বর্ণনায় : আবু সঈদ খুদরী (রাঃ)।

৬৪৪. এক বছর পার না হলে কারো সঞ্চিত ধনের ওপর জাকাত ধার্য হবে না।—তির।

৬৪৫. যে সব ভূমি বৃষ্টি ও ঝর্ণা দ্বারা অথবা নদ-নদী দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সিঞ্চিত হয়—ওতে উশুর (দশমাংস) দেয় হবে; আর যে সব ভূমিতে জলসেচ করতে হয় ওতে কুড়ি ভাগের এক ভাগ (ফসল) দেয় হবে। [এটাই ফসলের জাকাত।]—বুখারী। বর্ণনায় : আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ)।

৬৪৬. জাকাত দান ব্যতীত আল্লাহ্ ঈমান ও নামাজ কবুল করেন না। —সগির।

৬৪৭. জাকাত আদায়ের মধ্যেই ইসলামের পরিপূর্ণতা।—সগির।

৬৪৮. জাকাত আদায়ের মধ্যেই পাপের পরিত্রাণ।—সগির।

৬৪৯. রোজা তোমাকে বেহেশ্‌তের এক-তৃতীয়াংশ পথে, নামাজ ওর দুই-তৃতীয়াংশ পথে এবং জাকাত তোমাকে বেহেশ্‌তের মধ্যে পৌঁছে দেবে। —সগির।

৬৫০. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র-দেওয়া ধনের জাকাত আদায় করে না, পরলোকে ঐ ধন বিষধর সর্পের আকার ধারণ করে দুগাছা মালার মত তার কণ্ঠ বেষ্টন করবে। তারপর তার মুখের উভয় দিক বেষ্টন করে বলবে, 'আমি তোমার ধন, আমি তোমার ধনাগার।'—বুখারী।

৬৫১. তোমাদের ধন-দৌলত কেয়ামতের দিন একটা কেশহীন সর্পের আকার ধারণ করবে এবং ওর মালিক ওর কাছ থেকে পালিয়ে যেতে থাকবে—কিন্তু ও তাকে অনুসরণ করবে; অবশেষে তাকে দংশন করবে এবং অঙ্গুলিগুলিতে দংশন করতে থাকবে।—মিশ্ (আহ্)।

৬৫২. (সাড়ে সাত তোলা) স্বর্ণ অথবা (৫২½ তোলা) রৌপ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার ন্যায্য জাকাত আদায় করে না, কেয়ামতের দিন তার জন্য অগ্নিশলাকা থাকবে। ও (শলাকা) দোজখের আগুনে পুড়িয়ে তার পিঠে ও কপালে দাগ দেওয়া হবে এবং যতবার সে পালিয়ে যেতে চাইবে ততবার তাকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। [দরিদ্রদের দেয় না দিলে কি মর্মন্তুদ শাস্তি !]—মুস

৬৫৩. স্বর্ণ ও রৌপ্যের অধিকারীদের মধ্যে যে জাকাত দেয় না, কেয়ামতের দিন তার জন্য দোজখ থেকে আনানো আগুনের থালায় পরিবেশন করা হবে এবং ওকে (ঐ থালাকে) দোজখের আগুন দ্বারা উত্তপ্ত করা হবে। তারপর ওর দ্বারা তার পাশে, কপালে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যতবার ও ফুরিয়ে যাবে ততবার ও আবার আনান হবে। ও হল সে দিন যে দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর। তার বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই রকম চলতে থাকবে। তারপর বেহেশ্‌তে অথবা দোজখের দিকে তার পথ দেখান হবে।—মুস।

৬৫৪. মালের জাকাত দিলে তুমি তোমার কর্তব্য পালন করবে।—সাগির।

৬৫৫. জাকাতের অর্থ নিয়ে যখনই কেউ রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হত তখনই তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ্‌, তাকে আশীর্বাদ কর।'—শায়।

৬৫৬. জাকাত কখনো মালের সাথে মিশ্রিত হয় না ; কিন্তু ওকে ধ্বংস করে। [অর্থাৎ জাকাত না দিলে ধন বৃদ্ধি পায় না, হ্রাস পায়।] —বুখারী।

৬৫৭. রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) জাকাত সম্পর্কে যা নির্দিষ্ট করেছেন আবু বকর (রাঃ) তা তাকে [আনাস (রাঃ)] লিখে দিয়েছিলেন। (তার মধ্যে এও ছিল) 'জাকাতের ভয়ে যা ভিন্ন আছে তা যেন একত্রিত করা না হয় এবং যা একত্রিত আছে তা যেন ভিন্ন করা না হয়।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

ফিত্‌রাহ্‌

[ফিত্‌রাহ্‌ এক প্রকার দান। রমজানের রোজার শেষে ঈদুল ফিৎর-এর নামাজে যোগদানের পূর্বে এই দান দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা কর্তব্য।]

৬৫৮. রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) মুসলমান দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি, নর ও নারী এবং বালক ও বৃদ্ধের ওপর রোজার ফিত্‌রা এক সা খেজুর অথবা এক সা (৩ সের ৮ ছটাক) যব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি এও আদেশ করেছেন যে, (ঈদের) নামাজের পূর্বেই যেন তা লোকদের দিয়ে দেওয়া হয়।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইবনে ওমর (রাঃ)।

৬৫৯. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কালে ঈদুল ফিৎরের দিনে আমরা ফিত্‌রা বাবদ (মাথা পিছু) এক সা পরিমাণ খাদ্য দান করতাম। তখন আমাদের খাদ্য ছিল -যব, কিশমিশ, মোনাক্কা, পনির ও খুরমা। —বুখারী।

৬৬০. রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের ওপর যবের এক সা অথবা খোরমার এক সা সদকাতুল ফিত্‌রা হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ ইব্‌নে ওমর (রাঃ)।

৬৬১. এর (অর্থাৎ ফিত্‌রার) দ্বারা তোমাদের ধনীদের আল্লাহ্ পবিত্র করবেন এবং দরিদ্রদের তারা যা দান করে আল্লাহ্ তার চেয়ে অনেক বেশী দান করেন।—আবু দাঊদ।

তকদির বা ভাগ্য

৬৬২. এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল হে রসূলুল্লাহ্, 'কে বেহেশ্‌তে যাবে আর কে দোজখে যাবে তা কি নির্ধারিত হয়ে আছে?' হজরত (দঃ) বললেন, 'হাঁ।' ঐ ব্যক্তি বলল, 'তবে মানুষ কাজ করবে কেন?' হজরত (দঃ) বললেন, 'সৃষ্টির প্রথম থেকে যা নির্ধারিত হয়ে আছে, প্রত্যেকে সেই অনুসারে কাজ (আমল) করে থাকে।' [কিন্তু কি নির্ধারিত হয়ে আছে তা তো কেউ জানে না!]—বুখারী। বর্ণনায়ঃ এমরান ইব্‌নে হোসেন (রাঃ)।

৬৬৩. তোমাদের ব্যবহার (বা কাজ)-ই তোমাদের জন্য শাস্তি বা পুরস্কার নির্ধারণ করবে, যেন তোমরা পূর্ব থেকেই তার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছ।—সগির।

৬৬৫. নিশ্চয় মানুষের কাছে কোন দুর্ভাগ্য বা অশান্তি উপস্থিত হয় না, কিন্তু ও শুধু তার পাপের জন্য।—সগির।

৬৬৫. একদিন হজরত আদম (আঃ) ও হজরত মুসা (আঃ) বিতর্ক করছিলেন। হজরত মুসা (আঃ) হজরত আদম (আঃ)-এর ওপর কটাক্ষ করে বললেন, 'হে আদম! আপনি আমাদের আদি পিতা; (নিজের দোষের দরুন) আপনি আমাদের বঞ্চিত করেছেন এবং বেহেশ্‌ত থেকে বহিষ্কৃত করেছেন।' আদম (আঃ) বললেন, 'হে মুসা, আল্লাহ্ আপনাকে বিশেষভাবে মর্যাদা দান করেছেন; তিনি আপনাকে (তৌরিত) তৌরাত নামক গ্রন্থ দান করেছেন, (এবং সেই গ্রন্থ) আমার সৃষ্টির চল্লিশ (৪০) বছর পূর্বে লৌহে-মাহ্‌ফুজের মধ্যে লিখিত হয়েছিল। আপনি কি সেই তৌরাতে এই বিবরণটি পেয়েছেন—'আদম তার প্রভু পরওয়ারদেগারের আদেশ-বিরুদ্ধ কাজ করে ফেলল, ফলে সে ভ্রম ও ভুল করার দোষে দোষী সাব্যস্ত হল'?' মুসা (আঃ) বললেন, 'হাঁ, এ বিবরণ পেয়েছি।' আদম (আঃ) বললেন, 'আপনি কি আমার ওপর এমন একটা কাজের জন্য দোষারোপ করছেন, যা আল্লাহ্‌তা'লা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আমার জন্যে লিখে রেখেছেন?' নবী (সঃ) বললেন, 'এইভাবে হজরত আদম (আঃ) হজরত মুসা (আঃ)-এর ওপর জয়ী হলেন।'—বুখারী। মুস। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬৬৬. সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌তা'লা কলমকে সৃষ্টি করে বললেন, 'লেখ।' কলম বলল: 'কি লিখব।' তিনি বললেন, 'তকদির লেখ।' সুতরাং যা অতীত হয়ে গিয়েছে এবং যা অনন্তকাল পর্যন্ত সৃষ্ট হবে তা লেখা হল।—তির। বর্ণনায়ঃ হজরত ওবাদাহ্ বিন সোয়ামেত (রাঃ)।

৬৬৭. যে ব্যক্তির অদৃষ্টে যে দেশে মৃত্যু হবে বলে লেখা আছে সেখানে যাবার জন্য তিনি এক আবশ্যকতা সৃষ্টি করেন।—তির। মিশ। বর্ণনায়ঃ মাতার বিন ওক্কাসেস (রাঃ)।

৬৬৮. যে ব্যক্তি তকদির বা অদৃষ্ট সম্পর্কে কিছু তর্কবিতর্ক করে, বিচারের দিন তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, যে তর্কবিতর্ক করে না তাকে জিজ্ঞাসা

করা হবে না। [কেন না তকদিরে বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ।]—মিশকাত। বর্ণনায়ঃ আয়েশা (রাঃ)।

কেয়ামত ও তার পূর্বাভাস

[কেয়ামত বা মহাপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী। তারপর পুনরুত্থান এবং শেষ বিচার। ঐস্‌লামিক দর্শনের এ এক অন্যতম প্রধান সিদ্ধান্ত।]

'যে কেউ আল্লাহ্‌ ও কেয়ামতে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার আছে।' ২(৬২)

'আল্লাহ্‌ যে গ্রন্থ দান করেছেন যারা তা গোপন করে ও বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন পেট ভরে এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে দুঃখজনক শাস্তি।' ২(১৭৪)

'আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই; নিশ্চয় তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদের একত্র করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই।' ৪(৮৭)

'আল্লাহ্‌ কেয়ামতের দিন তোমাদের বিচার-মীমাংসা করবেন।' ৪(১৪১)

'যেদিন কেয়ামত উপস্থিত হবে—মানুষ তার মা, তার বাবা, তার স্ত্রী ও তার সন্তানদের পরিহার করবে। সেদিন ওদের প্রত্যেকে অপরের চিন্তা না করে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। অনেকের মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল হবে এবং অনেকের মুখমণ্ডল সেদিন ধূলি-ধূসর ও কালিমাচ্ছন্ন হবে—এরাই সত্য-প্রত্যাখ্যান-কারী ও দুষ্কৃতিকারী।' ৮০(৩৩-৪০)

'যেদিন কেয়ামত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎ কাজ করেছে তারা বেহেশ্‌তে আনন্দে থাকবে, আর যারা অবিশ্বাস করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। সুতরাং তোমরা সন্ধ্যায় ও প্রভাতে এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল প্রশংসা তাঁরই, তিনিই মৃত হতে জীবিতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।' ৩০(১৪-১৯)

'যেদিন শিঙ্গায় একবার ফুঁ দেওয়া হবে এবং পর্বতমালা সমেত পৃথিবীকে উৎক্ষিপ্ত করে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, সেই দিনই ঐ কেয়ামত (অর্থাৎ মহাপ্রলয়) সংঘটিত হবে এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিশিলষ্ট হয়ে পড়বে, আর ফেরেশ্‌তারা আকাশের প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর সেদিন আটজন ফেরেশ্‌তা তাদের প্রতিপালকের আরশকে (আসনকে) ঊর্ধ্বদেশে বহন করবে। সেদিন তোমাদের (আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে) উপস্থিত করা হবে, তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। তখন যার ডান হাতে আমলনামা (অর্থাৎ কর্মবিবরণী) দেওয়া হবে সে (আনন্দের সঙ্গে সকলকে) বলবে, 'এস, তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ; আমি তো বিশ্বাস করতাম যে আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।' সুতরাং সে বেহেশ্‌তের মধ্যে শান্তিময় জীবন যাপন করবে—যেখানকার উচ্চ

(উপাদেয়) ফলরাজি ঝুলতে থাকবে তার নাগালের মধ্যে। তাকে বলা হবে, 'তৃপ্তির সঙ্গে পানাহার কর, কারণ তুমি পার্থিব জীবনে সৎকর্ম করেছিলে।' কিন্তু যার বাম হাতে আমলনামা (কর্মবিবরণী) দেওয়া হবে সে বলবে, 'হায়, আমার আমলনামা যদি আদৌ না দেওয়া হত এবং আমার হিসাব যদি আমি না জানতাম! হায়, আমার মৃত্যুই যদি আমার পরিসমাপ্তি হত! আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই এল না; আমার ক্ষমতা (বা প্রভাব-প্রতিপত্তি) ধ্বংস হয়ে গেল!' (তখন) ফেরেশতাদের বলা হবে, 'ধর ওকে, ওর গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও এবং জাহান্নামের (নরকের) মধ্যে নিক্ষেপ কর। পুনরায় তাকে শৃংখলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শৃংখলে, সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না; এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে আগ্রহ সৃষ্টি করত না। কাজেই আজ এখানে তার কোন বন্ধুবান্ধব নেই; ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত তার কোন খাদ্যও নেই, যে খাদ্য একমাত্র পাপিষ্ঠরাই আহার করে থাকে।' ৬৯(১৩-৩৭)

'ভূলোক যখন ভূকম্পনে কেঁপে উঠবে এবং তার অভ্যন্তরস্থ ভার বের করে ফেলবে, আর মানুষ বলবে, 'এর কি হল?'—সেদিন সে (ভূলোক বা পৃথিবী) তার সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ তোমার প্রভু যে তাঁকে হুকুম করেছেন। সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে পড়বে, কেন না তাদের কৃতকর্ম তাদের দেখানো হবে; কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখতে পাবে, আবার কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কার্য (পাপকর্ম) করলে সেও তা দেখতে পাবে।' ৯৯(১-৮)

—আল্-কোরআন।

৬৬৯. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) মজলিসে বসে লোকেদের কিছু বলছিলেন এমন সময় এক বেদুইন এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কেয়ামত কখন হবে?' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) (পূর্ববৎ) কথা বলেই যেতে লাগলেন। এতে কেউ কেউ বলল, 'তিনি ওর কথা শুনেছেন কিন্তু ভাল লাগেনি।' কেউ কেউ বলল, 'না, তিনি শোনেন নি।' অবশেষে তিনি (দঃ) নিজের বক্তব্য শেষ করে বললেন, 'কেয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্নকারী কোথায়?' সে বলল 'হে রসুলুল্লাহ্! এই যে আমি।' তিনি (দঃ) বললেন, 'যখন আমানতের (গচ্ছিত দ্রব্যের) খেয়ানত (ক্ষতিসাধন) করা হবে তখন কেয়ামতের প্রতীক্ষা কর।' সে বলল, 'কি ভাবে আমানতের খেয়ানত করা হবে?' তিনি বললেন, 'যখন অযোগ্য ব্যক্তির ওপর কাজের ভার দেওয়া হবে তখন কেয়ামতের প্রতীক্ষা কর।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬৭০. যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে (ভাণ্ডার ভরে) উপচে পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। এমন কি ধন-সম্পদের মালিক তখন ভাবনায় পড়বে যে কে তার দান গ্রহণ করবে। যাকেই সে দান করতে যাবে সেই বলবে, 'আমার কোন প্রয়োজন নেই।'

৬৭১. কেয়ামতের আগে এক সময় এমন একটা দিন আসবে যেদিন ফোরাত নদীর কূল শুকিয়ে পাহাড়ের মত এক সোনার খনি বেরিয়ে পড়বে; সেখানে উপস্থিত কেউ যেন তা স্পর্শ করতে না যায়।—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬৭২. ঐ সোনার খনির জন্যে লোকেদের মধ্যে রক্তারক্তি হবে, শতকরা নিরানব্বই জনই নিহত হবে; প্রত্যেকে ভাববে, আমি হয়তো সফলকাম হব। —মুস।

৬৭৩. হজরত হোজায়ফা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের কাছে

দুটো হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস দুটোর একটাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং অন্যটা দেখার অপেক্ষায় আছি। প্রথম হাদীসটি এই যে, (আমানত) মানুষের অন্তরের মূল গ্রন্থিতে অবতরণ করেছিল, তারপর কোরআন অবতীর্ণ হল, মানুষ কোরআন শিখল এবং সুন্নত (হাদীস) শিখল।' তারপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমানত উঠে-যাওয়া সম্পর্কে দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করলেন এবং বললেন, 'মানুষ অল্পক্ষণ মাত্র ঘুমুবে, তারপর তার অন্তর থেকে আমানত উঠে যাবে এবং অস্পষ্ট রঙের মত অন্তরের মধ্যে ওর কিছুটা আভাস বিদ্যমান থাকবে। তারপর আবার অল্পক্ষণ মাত্র শুয়ে থাকবে, এবারেও তার অন্তর থেকে আমানত উঠে যাবে (এবং) ফোসকা আকারে ওর নিদর্শন বিদ্যমান থাকবে—জ্বলন্ত কয়লার আগুন পায়ে লাগলে চামড়া যেমন ফুলে যায় অথচ তার ভেতরে কিছু থাকে না সেই রকম। দ্বিতীয়বার আমানত উঠে যাবার পর ওর কোন অংশ (চিহ্ন) বাকি থাকবে না।' এ সময় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটি পাথর নুড়ি নিয়ে পায়ের ওপর গড়িয়ে দিলেন। তিনি (দঃ) আরো বললেন, 'মানুষ বেচা-কেনা তো করবেই, কিন্তু কেউই দায়িত্বশীল ভাবে কাজ-কারবার করবে না। পক্ষান্তরে বলাবলি করবে যে অমুক গোত্রে একজন বিশ্বাসী (আমীন) লোক আছেন। কিন্তু যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ঐ কথা বলাবলি করবে সে ব্যক্তি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ইত্যাদি হওয়া সত্ত্বেও তার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান (বিশ্বস্ততা) বিদ্যমান থাকবে না।' এরপর হজরত হোজায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি ইতিপূর্বে একটা কাল অতিবাহিত করেছি যখন দ্বিধাহীন চিত্তে যার সঙ্গে খুশী কেনাবেচা করেছি। কারণ সে যদি মুসলমান হয় তাহলে তার ঈমান তাকে বেইমানি করতে দিত না, আর সে যদি ইহুদী বা নাছারা হয় তাহলে তাদের শাসক-বৃন্দ তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করতে দিত না। কিন্তু আজকাল অমুক অমুক লোক ছাড়া কারো সঙ্গে কাজ-কারবার করি না। [হজরত হাসান বসরী এখানে আমানত অর্থে 'ধর্ম" বুঝেছেন, কেউ 'ঈমান' বুঝেছেন, কেউ মানুষের ওপর অর্পিত দায়িত্ব বুঝেছেন।]—মুসলিম।

৬৭৪. হজরত হোজায়ফা (রাঃ) বলেন, 'আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর কাছে শুনেছি, মানুষের মনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ (ফিত্না ফাসাদ) ক্রমাগত এমন ধারায় আসতে থাকবে, যেমন ধারায় চাটাই বুনার পাতা সকল একের পর এক এসে ভাঁজ হতে থাকে। তারপর যে-অন্তরের শিরা-উপশিরা ও রক্তকণিকা পর্যন্ত ঝগড়া-বিবাদ (ফেত্না ফাসাদ) দানা বেঁধে উঠবে সে অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে যাবে। আর যে-অন্তরে ওসব ঝগড়া-বিবাদ গৃহীত হবে না সে অন্তরে একটা সাদা দাগ পড়ে যাবে। (এইভাবে) ঝগড়া-বিবাদ দুই প্রকারের অন্তরের মুখোমুখি হবে—এক প্রকার (অন্তর) সাদা পাথরের সমতল পৃষ্ঠের মত পরিষ্কার, অন্য প্রকার অন্তর যার মধ্যে কালো দাগ পড়ে গিয়েছে, তা নিম্নমুখী কলসীর মত, ভাল-মন্দের প্রভেদ বুঝবে না, যা মনে হবে তাই গ্রহণ করবে।—মুস।

৬৭৫. পুনরায় সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে কেয়ামত সম্বন্ধে বলুন।' হজরত (দঃ) বললেন, 'যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নকারী (জিব্রাইল) অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী নয়।' তিনি বলেন, 'তবে আমাকে তার পূর্বাভাষ সম্বন্ধে বলুন।' হজরত (দঃ) বললেন, 'ও হল এই যে ক্রীতদাসী তার কর্ত্রীকে জন্মদান করবে এবং তুমি নগ্নপদ উলঙ্গ দরিদ্র মেষপালকগণকে (আমির ও বাদশাহের পরিবর্তে) গর্বভরে প্রাসাদ মধ্যে বসবাস করতে দেখবে।'—শায়। বর্ণনায়ঃ ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)।

৬৭৬. ইসলাম মুসাফিরের ন্যায় (সামান্য সংখ্যক মুসলমানকে নিয়ে) আরম্ভ হয়েছে এবং যে অবস্থায় আরম্ভ হয়েছে আবার সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। অতএব মুসাফিরদের (অর্থাৎ স্বল্প সংখ্যক নিষ্ঠাবান মুসলমানদের) জন্য সুসংবাদ। —মুস। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬৭৭. ইসলাম মুসাফিরের ন্যায় আরম্ভ হয়েছে এবং যে অবস্থায় আরম্ভ হয়েছে আবার সেই অবস্থায় ফিরে আসবে। ও সংকুচিত হয়ে দুই মসজিদের (মক্কা ও মদীনা) মধ্যস্থলে আসবে যেমন ভাবে সাপ (ঘুরে ফিরে) তার গর্তের মধ্যেই আবার ফিরে আসে।—মুস। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্নে ওমর (রাঃ)।

৬৭৮. ঈমান মদীনার দিকে এমন ভাবে গুটিয়ে যাবে যেমন ভাবে সাপ তার গর্তের মধ্যে গুটিয়ে (অর্থাৎ ফিরে) যায়।—মুস। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬৭৯. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, পৃথিবীতে যতক্ষণ 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বুলি বর্তমান থাকবে ততক্ষণ কেয়ামত হবে না।— মুস। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৬৮০. যে ব্যক্তি 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলতে থাকবে তার সামনে কেয়ামত হবে না।—মুস। বর্ণনায়ঃ আনাস (রাঃ)।

৬৮১. কেয়ামতের দিন এই শ্রেণীর অনেক লোক উপস্থিত হবে যারা পার্থিব জীবনে মোটামোটা দেহবিশিষ্ট বড় বড় পদবীধারী ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাদের ওজন (ও মর্যাদা) মাছির ডানার সমানও হবে না।—বুখারী বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬৮২. রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের পূর্বে অবশ্যই এই ঘটনাগুলো ঘটবেঃ ১) দুটো বৃহৎ দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে, তারা উভয় দল একই সম্প্রদায়ভুক্ত হবার দাবীদার; ২) বিভিন্ন সময়ে এমন এমন মিথ্যাবাদী জালিয়াতের আবির্ভাব হবে যাদের প্রত্যেকেই দাবী করবে সে আল্লাহ্র রসূল—তাদের সেই সংখ্যা প্রায় ত্রিশে দাঁড়াবে; ৩) ধর্মীয় শিক্ষা বা জ্ঞান বিলুপ্ত হবে; ৪) ভূমিকম্পের আধিক্য হবে; ৫) সময় দ্রুতগামী মনে হবে—সপ্তাহ, মাস ও বৎসরগুলো যেন পরস্পরের নিকটবর্তী তথা অপেক্ষাকৃত ছোট মনে হবে; ৬) বিপর্যয় ও বিশৃংখলা ব্যাপকতর হবে; ৭) মারামারির খুনোখুনির আধিক্য দেখা দেবে; ৮) ধন-দৌলতের প্রাচুর্য হবে— ধনের গড়াগড়ি ও ছড়াছড়ি হবে, এমন কি দান-খয়রাত গ্রহণকারীর সন্ধানে ধনীরা খুবই ব্যস্ত হয়ে থাকবে, কাউকে টাকা পয়সা নিতে বলা হলে সে বলবে এখন আমার কোনো প্রয়োজন নেই, ৯) মানুষ গগনচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণ করে পরস্পর গর্ব ও প্রতিযোগিতা করবে; ১০) জীবিত মানুষ মৃতের কবরের কাছে গিয়ে আক্ষেপ করে বলবে, আমার স্থান কবরের মধ্যে হলেই ভাল হত (কেন না তাদের দুঃখ অসহ্য হবে); ১১) সূর্য যেদিকে অস্ত যায় সেদিক থেকে উদিত হবে; সে সময় এমন হবে যে লোকেরাও প্রকাশ্যে দেখবে—ও হল সেই সময় যার সম্পর্কে পবিত্র কোরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঐ সব লোকের ঈমান কবুল হবে না যারা পূর্বে ঈমান আনেনি এবং ঐ লোকেদের তওবা (অনুশোচনা) কবুল হবে না যারা এর আগে তওবা করেনি। কেয়ামত বা মহাপ্রলয় অকস্মাৎ উপস্থিত হয়ে পড়বে। দুজন লোক কাপড় কেনা-বেচা করার সময় ভাঁজ করে রাখার পূর্বেই কেয়ামত বা মহাপ্রলয় আরম্ভ হয়ে যাবে। কেউ দুগ্ধবতী পশুর দুধ দুইছে—তা পান করার পূর্বেই প্রলয় আরম্ভ হবে। কেউ পানির চৌবাচ্চা তৈরী করেছে—

তা থেকে পান করার পূর্বেই প্রলয় আরম্ভ হবে। কেউ খাবারের গ্রাস মুখের কাছে তুলেছে—তা খাওয়ার পূর্বেই প্রলয় আরম্ভ হয়ে যাবে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬৮৩. (ক) কেয়ামতের লক্ষণ হল—শিক্ষা বা জ্ঞান বিলুপ্ত হবে ; অজ্ঞানতা প্রবল হবে, মদ্যপান ব্যাপক হবে, ব্যাভিচার এমনি বৃদ্ধি পাবে যে তা আর গোপনে হবে না (প্রকাশ্যেই অনুষ্ঠিত হবে)।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৬৮৩ (খ). কেয়ামতের কয়েকটি লক্ষণ হল এই যে—জ্ঞান শিক্ষা (এল্‌ম) দুর্বল হবে, অজ্ঞতা প্রবল হবে, প্রকাশ্যে ব্যাভিচার হবে, নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে, এমন কি এক-একজন পুরুষের অধীনে পঞ্চাশজন নারী আশ্রিতা হয়ে থাকবে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

৬৮৪. (কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে) জ্ঞান বিলুপ্ত হবে, অজ্ঞতা ও বিবাদ-বিসংবাদ বৃদ্ধি পাবে, কাটাকাটি মারামারি মাত্রাতিরিক্ত হবে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬৮৫. (কি ভাবে জ্ঞান বিলুপ্ত হবে ?) আল্লাহ্‌তা'লা জবরদস্তি করে, জ্ঞান বিলুপ্ত করবেন না, কেবল জ্ঞানীদের তুলে নেবেন। যখন পৃথিবীতে জ্ঞানী ব্যক্তি থাকবে না তখন জনগণ অজ্ঞান বা মূর্খ ব্যক্তিদের (তাদের) নেতা নিযুক্ত করবে, এবং ঐ সব মূর্খ নেতাদের কাছে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করবে। ঐ মূর্খরা কিছু না জেনেও বিধান (ফতওয়া) দেবে যার ফলে ওরা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে আমরে ইবনুল আস (রাঃ)।

৬৮৬. যতক্ষণ না পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি মূর্খের পুত্র মূর্খ না হয় ততক্ষণ কেয়ামত সংঘটিত হবে না।—তির। বর্ণনায় ঃ হোজায়ফা (রাঃ)।

৬৮৭. একশত উটের মধ্যে বাহন-উপযোগী একটা উটও পাওয়া যায় না—মানুষের অবস্থাও সেই রকম হবে। [অর্থাৎ একশত মানুষের মধ্যে একজনও যথার্থ মানুষ পাওয়া দুষ্কর হবে]।-বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে ওমর (রাঃ)।

৬৮৮. যতক্ষণ পর্যন্ত না অস্তাচলের (পশ্চিম) দিক থেকে সূর্য উদিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত (বা মহাপ্রলয়) সংঘটিত হবে না। যখন তা (উদিত) হবে এবং সবাই তা প্রত্যক্ষ করবে তখন সারা পৃথিবীর মানুষ (ভয়ে) ঈমান গ্রহণ করবে ; কিন্তু ও সময়টি হল (কোরআন বর্ণিত) সেই সময় যে সময়ের পূর্বে যারা ঈমান আনেনি পরে আনা-ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না এবং যে সময়ের পূর্বে যারা অনুশোচনা (বা তওবা) করেনি পরে-করা অনুশোচনা (বা তওবা) তাদের কোন উপকার করবে না।

কেয়ামতের (মহাপ্রলয়) অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং তা এমন অকস্মাৎ সংঘটিত হবে যে—হয়তো ক্রেতা ও বিক্রেতা একখানা কাপড়ের ভাঁজ খুলেছে, সেটা বিক্রি সম্পূর্ণ করার বা পুনরায় ভাঁজ করার অবকাশ পাবে না—এমন সময় কেয়ামতের সিঙ্গা বেজে উঠবে। আরো শোনো, কেউ হয়তো গাই দুইছে, সে দুধ পান করার অবকাশ পাবে না, সহসা মহাপ্রলয়ের সিঙ্গা বেজে উঠবে। আরো শোনো,

হয়তো হাওজের (কূপের) প্লাস্টার করছে, সেটা ব্যবহার করার পূর্বেই প্রলয়ের সিঙ্গা বাজবে। আরো শোনো, কেউ হয়তো মুখের কাছে গ্রাস তুলেছে তা আহার করার সুযোগ পাবার পূর্বেই মহাপ্রলয়ের সিঙ্গা বেজে উঠবে।

৬৮৯. একদিন নবী (সঃ) জনসমাবেশে ভাষণ দান করার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্‌তা'লার মহিমাকীর্তনের পর দজ্জালের উল্লেখ করলেন। তিনি (দঃ) বললেন, হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের দজ্জাল সম্বন্ধে সাবধান করে দিচ্ছি। আমার পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীও নিজ নিজ উম্মতগণকে দজ্জাল সম্বন্ধে সাবধান করে গিয়েছেন। কিন্তু আমি এখন তোমাদের দজ্জাল সম্বন্ধে এমন একটা কথা বলব যা কোন নবীই তাঁর উম্মতকে বলে নি। (মিথ্যা-বাদী দজ্জাল নিজেকে আল্লাহ্‌ বলে দাবী করবে)। জেনে রেখো, দজ্জালের চক্ষু দোষযুক্ত হবে, আর মহান আল্লাহ্‌তা'লা হলেন সর্বদোষমুক্ত, তাঁর দর্শন শক্তিও দোষ-ত্রুটি মুক্ত।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে ওমর (রাঃ)।—বুখারী।

৬৯০. দজ্জালের দক্ষিণচক্ষু এমন ত্রুটিপূর্ণ হবে যে ও যেন আঙ্গুর গুচ্ছের একটা বেরিয়ে-পড়া আঙ্গুর।—বুখারী।

৬৯১. দজ্জালের (অপর) একটা চক্ষু হবে লেপা-পোঁছা—ঐ চক্ষুর কোটর পুরু চামড়া বা বর্ধিত মাংস দ্বারা আবৃত হবে।—মুস।

৬৯২. রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেন, একদিন আমি নিদ্রিত ছিলাম! স্বপ্নে দেখলাম আমি কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ করছি। হঠাৎ দেখি, একজন লোক—গায়ের রঙ কালো; মাথার চুল লম্বা, সোজা অকুঞ্চিত; মাথা থেকে পানি ঝরছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ লোকটা কে?' উপস্থিত সবাই বলল, 'মরিয়ম-পুত্র ঈসা (আঃ)।' তারপর অন্য দিকে তাকিয়ে আর একটা লোককে দেখতে পেলাম—মোটা, গায়ের রঙ লাল, মাথার চুল কোঁকড়ানো, চোখ ত্রুটিপূর্ণ—একটা চোখ আঙ্গুর-গুচ্ছের বেরিয়ে-পড়া একটা আঙ্গুরের মত।' লোকেরা বলল, 'এই হল দজ্জাল।' হজরত (দঃ) বলেছেন, 'সে ছিল খোজায়া গোত্রের ইব্‌নে কাতান নামক ব্যক্তির মত।' —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে ওমর (রাঃ)।

৬৯৩. দজ্জালের সঙ্গে ঠাণ্ডা পানি ও আগুন দুই-ই থাকবে; কিন্তু তার ঠাণ্ডা পানি প্রকৃত প্রস্তাবে হবে আগুন এবং আগুন হবে ঠাণ্ডা পানি।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ হোজায়ফা (রাঃ)।

৬৯৪. দজ্জালের সঙ্গে একটা বেহেশ্‌ত ও একটা দোজখ থাকবে। তার বেহেশ্‌ত প্রকৃত প্রস্তাবে দোজখ হবে এবং দোজখ প্রকৃত প্রস্তাবে বেহেশ্‌ত হবে। [অর্থাৎ দজ্জালের-দেওয়া সুখ-ঐশ্বর্যে যারা ভুলবে তারা দোজখে যাবে এবং যারা তার দোজখের মত নির্যাতন সহ্য করবে তারা বেহেশ্‌তে যাবে।]—মুসলিম।

৬৯৫. প্রত্যেক নবীই আপন উম্মতকে মিথ্যাবাদী কানা দজ্জাল সম্বন্ধে সাবধান করে' গেছেন। সে হবে কানা, বিকৃত চোখবিশিষ্ট—আর তোমাদের প্রভু পাওয়ারদেগার কানা নন, তিনি সর্বদোষমুক্ত। আরো জেনে রেখো, দজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে কপালে 'কাফের' লেখা থাকবে। [শব্দটা আরবী ভাষায় লেখা থাকবে এবং প্রকৃত মুসলমানেরা তা পড়তে পারবে।]—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আনাস (রাঃ)।

আল্লাহ্‌র দর্শন ও পুলসেরাত

[কেয়ামত বা শেষ বিচারের দিন সবাই পুনর্জীবন লাভ করবে। আল্লাহ্‌তা'লা সবলকে দর্শন দেবেন এবং সকলের বিচার করবেন। নরকের ওপর দিয়ে টাঙানো সেতুপথ (পুলসেরাত) দিয়ে মানুষকে বেহেশ্‌তের দিকে যেতে হবে। পাপ-পুণ্যের মাত্রানুসারে সেতুপথের ওপরে কার কি অবস্থা হবে—এখানে তার জনবদ্য বর্ণনা।]

'সেদিন (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) আটজন ফেরেশ্‌তা তাদের প্রতিপালকের আরশকে ঊর্ধ্বদেশে বহন করবে। সেদিন তোমাদের (আল্লাহ্‌র দরবারে) উপস্থিত করা হবে।' ৬৯ (১৭, ১৮)

'এবং তোমাদের সকলকেই তার (নরকের) উপর (পুলসেরাত) দিয়ে যেতে হবে ; এ তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি সাবধানীদের উদ্ধার করব এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের সেখানে (নরকে) নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।' ১৯ (৭১, ৭২)

—আল্‌-কোরআন।

৬৯৬. একদিন কিছু লোক জিজ্ঞাসা করল, 'হে রসুলুল্লাহ্‌, কেয়ামতের দিন আমরা আমাদের প্রভু পালনকর্তাকে দেখতে পাব কি ?' রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'মেঘমুক্ত পূর্ণিমা-আকাশে চাঁদ দেখতে কোন বিঘ্ন ঘটে কি ?' তারা বলল, 'না'। তখন রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে সূর্য দেখতে কোন বিঘ্ন ঘটে কি ?' সবাই উত্তর দিল, 'হে রসুলুল্লাহ্‌, না।' তখন রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেন, 'কেয়ামতের দিন এই রকমই নির্বিঘ্নে তোমরা আল্লাহ্‌তা'লাকে দেখতে পাবে।'

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তা'লা (হিসাব নিকাশের জন্য ভালমন্দ) সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তারপর বলবেন, 'যে ব্যক্তি যার উপাসনা করেছে তাকে অবশ্যই তার পেছনে পেছনে যেতে হবে।' সেই (আদেশ) মত যারা সূর্য-উপাসনা করত তারা সূর্যের পেছনে চলবে এবং সূর্য যেখানে যাবে তারাও সেখানে যেতে বাধ্য হবে। যারা চাঁদের উপাসনা করত তারা চাঁদের পেছনে যেতে বাধ্য হবে। যারা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করত তারা সেই সব দেবদেবীর পেছনে পেছনে দেবদেবীরা যেখানে যাবে সেখানে যেতে বাধ্য হবে। (এইভাবে অংশীবাদীরা সবাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে)। তখন সেখানে শুধুমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌তা'লার উপাসকদল অবশিষ্ট থাকবে যাদের মধ্যে মোনাফেকরূপে পরিচিত কপট বা নামসর্বস্ব মুসলমানরাও থাকবে। এবার আল্লাহ্‌তা'লা তাদের দর্শন দেবেন এবং বলবেন, 'আমি তোমাদের প্রভু পালনকর্তা।' কিন্তু তারা (ঐশীগ্রন্থ ও পয়গম্বর বর্ণিত রূপ-গুণের সঙ্গে আল্লাহ্‌র ঐ রূপের মিল নেই দেখে) ঐ দর্শনে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করবে না। তারা বলবে, 'যতক্ষণ না আমরা আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব, আমরা এখানেই থাকব। প্রভু-পালনকর্তাকে দেখতে পেলে আমরা তাঁকে চিনতে পারব।' তখন আল্লাহ্‌ তাদের এমন রূপগুণে দর্শন দেবেন যার সঙ্গে তারা পরিচিত। আল্লাহ্‌ বলবেন, 'আমি তোমাদের প্রভু-পালনকর্তা।' সঙ্গে সঙ্গে তারা স্বীকার করে বলবে, 'হাঁ, আপনি আমাদের প্রভু-পালনকর্তা।' তারপর ঐ দল আল্লাহ্‌তা'লার (আদেশ-) অনুসরণে চলতে থাকবে।

তখন জাহান্নামের ওপরে পুলসেরাত (অর্থাৎ সেতুপথ) স্থাপন করা হবে। আমি (রসূলুল্লাহ্) সর্বপ্রথম পুলসেরাত পার হব। ঐ সময় (কেউ ভয়ে কথা বলতে পারবে না) কেবল রসূলগণই কথা বলবেন. আর সে কথা হবে শুধু এই, 'হে আল্লাহ্, রক্ষা করুন ! রক্ষা করুন।'

জাহান্নামের মধ্যে অসংখ্য আঁকড়া থাকবে যার বাঁকান মাথা (নজ্‌দ অঞ্চলের) সা'দান কাঁটার মত হবে। তোমরা দেখেছ তো সা'দান কাঁটা কি সাংঘাতিক রকমের হয় ? সকলেই নিবেদন করল, 'হাঁ—হে রসূলুল্লাহ্ ! আমরা সা'দান কাঁটা দেখেছি।' হজরত (দঃ) বললেন, জাহান্নামের আঁকড়াগুলোর (বঁড়শির মত) বাঁকান মাথা সেই সা'দান কাঁটার মত হবে ; অবশ্য দুনিয়ার সা'দান কাঁটার তুলনায় ঐ আঁকড়াগুলোর বাঁকান মাথা যে কতগুণ বেশী বড় হবে তা আল্লাহ্‌তা'লাই জানেন। জাহান্নামের ওপরে-টাঙান পুলসেরাত (সেতুপথ) অতিক্রম করার সময় ঐ আঁকড়াগুলো (স্বয়ংক্রিয়ভাবে) বিভিন্ন লোককে তাদের কর্মানুসারে (বা আমল অনুপাতে) টেনে ধরবে। সেই টানে কেউ বা তার অসৎকর্মের দরুন জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে পড়বে, কেউ বা হোঁচট খেয়ে পড়বে, কেউ বা রক্ষা পাবে। এইভাবে বিচারপর্ব শেষ করার পর আল্লাহ্‌তা'লা করুণাপরবশ হয়ে কোন কোন জাহান্নাম-বাসীকে জাহান্নাম (নরক) থেকে বের করার ইচ্ছা করবেন। তখন তিনি ফেরেশ্‌তাদের আদেশ করবেন, 'যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করেনি, যারা লা-ইলালা-ইল্লাল্লাহ্‌···(এই কলেমা) গ্রহণ করেছিল, তাদের সকলকে জাহান্নামে থেকে বের করে আন।' ফেরেশ্‌তারা ঈমানদারদের সিজদা করার চিহ্ন দেখে জাহান্নামের মধ্যে (তাদের সহজে) চিনতে পারবেন—জাহান্নামের আগুন মোমেনের সমস্ত শরীরকে দগ্ধ করতে পারবে কিন্তু সিজদা-স্থানসমূহের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্‌তা'লা ঈমানদারদের সিজদাস্থানগুলোকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে' দিয়েছেন। তাদের এমন অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যেন তারা পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে। তাই তাদের ওপর 'মাউল-হায়াৎ' (নামক) জীবনীশক্তিভরা পানি প্রবাহিত করা হবে। সেই পানির প্রবাহণে তারা অতিশয় সুন্দর জীবন লাভ করবে—যেমন বাদলা ঘাসের মূল পলিমাটির মধ্যে (সোনার বরণ নিয়ে) অঙ্কুরিত হয়। এই পর্যায়ের বিচার-বিবেচনাকেও আল্লাহ্ সমাপ্ত করবেন। শুধুমাত্র একটা লোক অবশিষ্ট থাকবে—সেই হবে জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থেকে সর্বশেষ বেহেশ্‌তে প্রবেশকারী। তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে জাহান্নামের তীরে বসিয়ে রাখা হবে, তার মুখ ফেরান থাকবে জাহান্নামের দিকে। সে প্রার্থনা করবে, 'হে আমার প্রভু পালনকর্তা, আমার মুখটা জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিন, ওর দুর্গন্ধ আমাকে অতিষ্ঠ করে তোলে এবং ওর অগ্নিশিখা আমাকে দগ্ধ করে দেয়।' যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা—ততক্ষণ সে আল্লাহ্‌র কাছে এই প্রার্থনা করতে থাকবে। তারপর আল্লাহ্‌তা'লা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমার এই আকাঙ্ক্ষাটা পূরণ করা হলে নতুন কিছু চেয়ে বসার সম্ভাবনা নেই তো ?' সে বলবে, 'আপনার সম্মানের শপথ, এছাড়া আর আমি অন্য কিছুই চাইব না।' এই বলে সে আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে অনেক অঙ্গীকার করবে—যেমন আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছা হবে। তখন আল্লাহ্‌তা'লা জাহান্নামের দিক থেকে তার মুখ ফিরিয়ে দেবেন। যখন সে বেহেশ্‌তমুখী হবে এবং বেহেশ্‌ত দেখতে পাবে। তখন যতক্ষণ আল্লাহ্ তাকে শক্তি দেন ততক্ষণ সে চুপ করে' থাকবে। তারপর বলবে, 'হে পালনকর্তা, আমাকে বেহেশ্‌তের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিন।' আল্লাহ্ বলবেন, 'তুমি না আমার কাছে অঙ্গীকার করেছ যে কখনো আর

অন্য কিছু চাইবে না ? তুমি কতই না অঙ্গীকার-ভঙ্গকারী। তখন সে 'হে প্রভু ! হে প্রভু !' বলে (কাকুতি মিনতি করে) প্রার্থনা করতেই থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্‌তা'লা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এমন সম্ভাবনা আর নেই তো যে এই আকাঙ্ক্ষাটা পূরণ করা হলে তুমি আবার অন্য কিছু চাইবে ?' সে বলবে, 'না না আপনার সম্মানের শপথ ! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না।' এই কথা বলে সে যথেচ্ছ অঙ্গীকার করতে থাকবে। তখন আল্লাহ্‌ তাকে বেহেশ্‌তের দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন। যখন সে বেহেশ্‌তের দুয়ারে দাঁড়াবে তখন বিশাল বেহেশ্‌ত তাঁর নজরে আসবে এবং বেহেশ্‌তের অসংখ্য আশীর্বাদ ও বিলাস-সামগ্রী সে দেখতে পাবে। এবারেও যতক্ষণ চুপ করে' থাকা আল্লাহ্‌ তার কপালে রেখেছেন ততক্ষণ সে চুপ করে' থাকবে। তারপর বলবে, 'হে পালনকর্তা, আমাকে বেহেশ্‌তের মধ্যে পৌঁছে দিন।' আল্লাহ্‌তা'লা বলবেন, 'তুমি আমার কাছে আর কিছু চাইবে না বলে' কতবারই না অঙ্গীকার করলে ! হে আদম-সন্তান ! তুমি কঠোর শাস্তির যোগ্য। তুমি কতই না অঙ্গীকার-ভঙ্গকারী !' সে বলবে, 'হে প্রভু ! আপনার করুণা থেকে বঞ্চিত হয়ে পোড়াকপালের মত বেঁচে থাকতে চাই না।' এই বলে সে প্রার্থনা করতেই থাকবে। আল্লাহ্‌তা'লা তার প্রতি সন্তুষ্টও হয়ে যাবেন। যখন আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হবেন তখন তাকে বললেন. 'যাও. বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর।'

ঐ ব্যক্তি বেহেশ্‌তে যাবার পর আল্লাহ্‌ তাকে বলবেন, 'তোমার যা কিছু প্রার্থনা-কামনা আছে তুমি তা সব প্রকাশ কর।' ঐ ব্যক্তি তার প্রার্থনা-কামনা প্রকাশ করবে এবং তা পূরণ করার জন্য আল্লাহ্‌তা'লার কাছে আবেদন পেশ করবে। তা ছাড়া আল্লাহ্‌তা'লাও তার (আরো) অনেক কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন—এটা চাও ওটা চাও। এমনকি তার আর কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা বাকী থাকবে না। তখন আল্লাহ্‌তা'লা বললেন. 'তোমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা হল এবং আরো ঐ (আকাঙ্ক্ষার সম-)পরিমাণ অতিরিক্ত দেওয়া হল।' এই পর্যন্ত শুনে সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বললেন. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন, 'তোমাকে ওর দশগুণ অধিক দেওয়া হল।' এই ব্যক্তি হবে সর্বশেষে বেহেশ্‌তে প্রবেশকারী।'—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৬৯৭. একদিন নবী (সঃ) বললেন, জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে এসে বেহেশ্‌তে প্রবেশ-কারীদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তিটির অবস্থা আমি ভালভাবে জানি। সে হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। আল্লাহ্‌ তাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করার অনুমতি দেবেন। সে বেহেশ্‌তে এলে তার মনে হবে বেহেশ্‌ত যেন পরিপূর্ণ। সে সেখান থেকে ফিরে এসে বলবে, 'হে পালনকর্তা, বেহেশ্‌ত তো পরিপূর্ণ দেখলাম।' আল্লাহ্‌তা'লা বলবেন. 'তুমি যাও এবং বেহেশতে প্রবেশ কর।' এবারেও তার মনে হবে বেহেশ্‌ত যেন পরিপূর্ণ। সে পুনরায় ফিরে আসবে এবং বলবে, 'হে পালন-কর্তা, বেহেশ্‌ত তো পরিপূর্ণ। আল্লাহ্‌ বলবেন, 'তুমি বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর। তোমাকে সমগ্র জগৎ পরিমাণ, আরো ওর দশগুণ অধিক পরিমাণ বিশাল ও বিস্তীর্ণ বেহেশ্‌ত দান করা হল।' সে বলবে. 'আপনি সকল বাদশাহ্‌র বাদশাহ্‌। আপনি আমার সঙ্গে রহস্য করছেন ?' একথা শুনে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এমন ভাবে হেসে ফেললেন যে তাঁর মুখের মধ্যেকার দাঁতগুলো বিকশিত হল। তখন সকলে বলাবলি করল যে এই হবে সর্বনিম্ন বেহেশ্‌তী ব্যক্তির মর্যাদা। —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ)।

৬৯৮. (প্রকৃতি, ক্রুশ ও মূর্তি পূজারী কাফেররা জাহান্নামে যাবার পর) জাহান্নামকে (হাশর-ময়দানের কাছে) আনা হবে। দূর থেকে ওকে মরীচিকার মত দেখা যাবে। তখন ইহুদীদের জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমরা কাকে উপাস্য বলে স্বীকার করেছ?' তারা বলবে, 'আল্লাহ্‌র পুত্র ওযায়েরকে (যিনি আসলে একজন নবী ছিলেন) উপাস্যরূপে গণ্য করতাম।' তাদের বলা হবে, 'তোমরা মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্ তা'লার স্ত্রী-পুত্র নেই। এখন তোমরা কি চাও?' তারা (পিপাসায় কাতর হয়ে) বলবে, 'আমাদের পানি পান করান।' তাদের বলা হবে, 'ঐ জায়গায় (অর্থাৎ মরীচিকাময় জাহান্নামে) গিয়ে পানি পান কর।' তখন তারা ঐ জায়গায় যাবে এবং জাহান্নামে পতিত হবে। তারপর নাসারাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমরা কার উপাসনা করেছ?' তারা বলবে, 'আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র মসীহ্-এর উপাসনা করেছি।' তাদের বলা হবে, 'তোমরা মিথ্যাবাদী; আল্লাহ্ তা'লার স্ত্রী-পুত্র নেই।' তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমরা কি চাও?' তারাও (পিপাসায় কাতর হয়ে) বলবে, 'আমরা পানি চাই।' তাদেরও (ঐ জাহান্নামের দিকে দেখিয়ে) বলা হবে, 'ঐ পানি পান কর।' তারাও সেখানে গিয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। এখন অবশিষ্ট থাকবে শুধু আল্লাহ্‌র উপাসনার দাবীদারেরা—যাদের মধ্যে কপট (মোনাফেক) এবং পাপিষ্ঠারা আত্মগোপন করে থাকবে।' তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমরা বসে আছ কেন? সবলোক তো চলে গেছে।' তারা উত্তর দেবে, 'ঐ লোকেদের সাথে দুনিয়াতে যে আমরা আলাদা ছিলাম। দুনিয়ায় তাদের সাথে আমাদের প্রয়োজন ছিল, আজ তো সেই প্রয়োজন নেই। আমরা এখানে একজনকে ঘোষণা করতে শুনেছি যে প্রত্যেক দলকে তাদের উপাস্যের সঙ্গে যেতে হবে। সুতরাং আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রভু পালনকর্তার প্রতীক্ষায় আছি।' তখন ওরা আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করবে। প্রথম দর্শনে আল্লাহ্ তা'লার এমন গুণাবলীর বিকাশ হবে যা তাদের পূর্বে জানা গুণাবলীর থেকে বিভিন্ন। (তখন দ্বিতীয়বার দর্শন হবে এবং) ঘোষণা হবে, 'আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রভু ও পালনকর্তা।' তখন তারা স্বীকার করে' বলবে 'হাঁ—আপনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা—প্রভু পালন কর্তা।' (এইটুকু ছাড়া) ঐ দিন আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে (কেবল) নবীগণেরই কথোপন-কথন হবে। তারপর জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমরা কি প্রভু পালনকর্তার বিশেষ কোন গুণের পরিচয় জান?' তারা বলবে, 'হাঁ। সে গুণের নাম কোরআনে বর্ণিত এবং পৃথিবীতে অপ্রকাশিত 'সাক্ব' গুণ। তখন সেই গুণের প্রকাশ ঘটবে যার ফলে প্রকৃত মুসলমানেরা অনায়াসে আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদানত হবে। পক্ষান্তরে যারা লোক-দেখানো ও লোক-শোনানোর উদ্দেশ্যে সিজদা করত—ঐ দিনে তারা প্রত্যেকেই সিজদা করা থেকে বঞ্চিত থাকবে। সিজদা করার জন্য প্রস্তুত হবে, কিন্তু তাদের পিঠ ও কোমরের হাড়গুলো জমাট বেঁধে একখানা কাষ্ঠখণ্ডের মত হয়ে যাবে।

তারপর পুলসেরাত আনা হবে এবং দোজখের (নরকের) ওপর তাকে স্থাপন করা হবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে রসূলুল্লাহ্, পুলসেরাত কি রকম?' তিনি (দঃ) বললেন, '(পাপীদের পক্ষে) ও ভীষণভাবে আছাড়পাছাড় খাওয়ার স্থান। ওর দুপাশে অসংখ্য লোহার আঁকড়া ঝোলান থাকবে যার লম্বা লম্বা কাঁটার বাঁকানো মাথায় বঁড়শির মত উল্টো কাঁটাও থাকবে যেমন, নজদ্‌ অঞ্চলের সা'দান কাঁটা হয়। (ঐ সব কাঁটা পাপীদের আকর্ষণ করে দোজখে ফেলে দেবে)। পক্ষান্তরে

সৎ ও সত্যকার মুসলমানেরা ঐ পুলসেরাত (সেতুপথ) পার হয়ে যাবে—কেউ বা চোখের পলকের ন্যায় দ্রুতগতিতে, কেউ বা বিদ্যুতের মত, কেউ বা বাতাসের মত, কেউ বা দ্রুতগামী অশ্ব বা উটের মত। সার কথা এই যে, এক শ্রেণীর লোক সম্পূর্ণ নিরাপদ ও অক্ষত অবস্থায় অতিক্রম করবে, আর এক শ্রেণীর লোক ক্ষতবিক্ষত হয়ে রেহাই পাবে এবং পার হবে, আর এক শ্রেণীর লোককে তো দোজখের মধ্যেই ফেলে দেওয়া হবে—এমন কি পুলসেরাত অতিক্রমকারীদের সর্বশেষ ব্যক্তি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে পার হবে।

তারপর পুণ্যবান মুসলমানেরা যারা পরিত্রাণ পেয়েছে তারা তাদের পাপী মুসলমান ভায়েদের জন্য মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে এমন জোরদার দাবী পেশ করতে থাকবে যে, তোমাদের কেউ তার সুস্পষ্ট প্রাপ্যের জন্য আমার [নবী (দঃ)] কাছে অমন জোরদার দাবী পেশ কর না। তারা বলবে, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের ভায়েরা, আমাদের সঙ্গে যারা নামাজ পড়ত, আমাদের সঙ্গে যারা রোজা রাখত, আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন আমল (কাজ) করত (আমরা তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করছি)।' তখন আল্লাহ্‌ ঐ মোমেন-(প্রকৃত মুসলমান)-গণকে বলবেন, 'তোমরা যাও এবং যার অন্তরে গিনি পরিমাণ ঈমান দেখতে পাও তাকে দোজখ থেকে বের করে আন।' পাপের কারণে যেসব মুসলমান দোজখে যাবে আল্লাহ্‌ তাদের চেহারাগুলোকে দোজখের আগুনের জন্য হারাম করে দেবেন। সুপারিশকারী মোমেনগণ পাপিষ্ঠ মুসলমানগণের কাছে এসে দেখবে, কারো দুই পা দোজখের আগুনে, কারো পায়ের উর্ধ্বগোছা পর্যন্ত দোজখের আগুনে। তারা যাদের উল্লিখিত সীমার অন্তর্ভুক্ত পাবে তাদের দোজখ থেকে বের করবে। তারপর পুনরায় আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরে সুপারিশ করবে। এবার আল্লাহ্‌ বলবেন, 'যাদের অন্তরে আধ দিনার পরিমাণ ঈমান দেখতে পাও তাদের বের করে আন।' তারা ঐ সীমার মধ্যে যাদের দেখতে পাবে তাদের বের করে আনবে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরে আসবে। এবার আল্লাহ্‌তা'লা বলবেন, 'যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান দেখতে পাও তাকে দোজখ থেকে বের কর।' তারা তাই করবে—অণু পরিমান ঈমানের অধিকারীদের নরক থেকে বের করে আনবে।

এইভাবে নবীগণ, ফেরেশ্‌তাগণ এবং পুণ্যবান মুসলমানগণও পাপাচারী মুসলমানদের দোজখ থেকে বের করার জন্য সুপারিশ করবে এবং বের করা হবে। তারপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌তা'লা বলবেন, 'সকলে সুপারিশ করেছে, কেবল আমার সুপারিশ বাকী।' এই বলে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর করুণাবলে একদল লোককে বের করবেন যারা আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে। তাদের বেহেশ্‌তের দুয়ারে প্রবাহিত (মাউল হায়াত নামে পরিচিত) একটা খালের মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে—ঐ খালের পানি জীবনীশক্তিবাহী। ফলে তারা (নতুন জীবন ও নবরূপ লাভ করে') যেভাবে বাদলা ঘাসের মূল পলি মাটির মধ্যে অঙ্কুরিত হয় সেইভাবে ঐ খালের ধার বেয়ে (ওপরে) উঠবে। তারা মোতির মত উজ্জ্বল কান্তি নিয়ে বের হবে। তাদের ঘাড়ের উপর শীলমোহর দ্বারা চিহ্নিত করা হবে। বেহেশ্‌তবাসিগণ তাদের 'ওতাক্বাউর রহ্‌মান' অর্থাৎ 'করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লার মুক্ত দল' এই আখ্যায় বিভূষিত করবে। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের দুনিয়া থেকে আখেরাতের প্রতি প্রেরিত কোন প্রকার পুণ্যকর্ম ব্যতিরেকেই (ঐ অণু পরিমাণ ঈমানের কারণে) বেহেশ্‌তে পোঁছে দেবেন। বেহেশ্‌তের মধ্যে তাদের প্রত্যেককে বলা হবে, 'যে পরিমাণ তোমাদের দৃষ্টি ও ধারণাতে আসতে পারে সেই পরিমাণ এবং সেই সঙ্গে আরো

ততখানি পরিমাণ অতিরিক্ত তোমাদের দেওয়া হল।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ).

৬৯৯. যখন জ্ঞানসাধক ও উপাসকদের (আবেদদের) পুলসেরাতের ওপর সমবেত করা হবে, তখন উপাসককে বলা হবে, 'বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর এবং তোমার উপাসনার ফল উপভোগ কর।' আর জ্ঞানসাধককে বলা হবে, 'এখানে অপেক্ষা কর এবং যাকে ভালবাস তার জন্য সুপারিশ কর ; নিশ্চয় তুমি যার জন্য সুপারিশ করবে আমি তার জন্য সুপারিশ করব।' তারপর সে নবীদের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে। [জ্ঞানসাধকেরা ইহলোক ও পরলোকে সর্বত্র সম্মানিত হবে।] —সগির।

বেহেশ্‌ত-দোজখ

[বেহেশ্‌ত ফার্সী শব্দ, অর্থ স্বর্গ—একে আরবীতে জান্নাত বলে। দোজখ ও ফার্সী শব্দ, অর্থ নরক—একে আরবীতে জাহান্নাম বলে। সে সময় আরববাসীরা ভাবত মৃত্যুকেই জীবনের শেষ, কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার করল, মৃত্যুতেই জীবনের শেষ নয় ; এখানে মৃত্যুর পর পরলোকে পুনর্জীবন, তারপর পার্থিব কার্যকলাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার—তারপর পাপ ও পুণ্য অনুসারে স্বর্গ অথবা নরকের সুখ-দুঃখ-ভরা ভীষণ-মধুর জীবনযাত্রা। যে সব বিশ্বাসী নরকগামী হবে নিজ নিজ পাপকর্মের জন্য নির্দিষ্ট-কাল নরক ভোগের পর তাদের জন্য অনন্ত স্বর্গসুখ প্রতীক্ষমান। ইসলামী দর্শনের এই বেহেশ্‌ত ও দোজখের ধারণায় মধ্যে তাই বিশ্ব-মানবের ভূলোক-দ্যুলোক ব্যাপী এই চির গতিমুখর জীবনচিত্রটি জীবন্তরূপে চিত্রিত।]

'সাবধানীদের জন্য প্রতিশ্রুত বেহেশ্‌তের মধ্যে আছে নির্মল পানির নহর, আছে অপরিবর্তনীয় স্বাদ সম্পন্ন দুধের নহর, আছে সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর—আর থাকবে বিবিধ ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা।' ৪৭ (১৫)

"নিশ্চয়ই 'জাক্কুম' বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য—গলিত তাম্রের আকারে তা উদরে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত। আমি বলব, 'ওকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যে। তারপর ওর মস্তকে ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও এবং বল—আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত অভিজাত ; তোমরা তো এ শাস্তি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলে।' সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে—প্রস্রবণ-বহুল জান্নাতে , ওরা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে। ওদের আয়তলোচনা হুর (স্বর্গসুন্দরী) দান করব। সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে তাদের বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। ইহকালের মৃত্যুর পর বেহেশ্‌তে তারা আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না।" ৪৪ (৪৩-৫৬)

'সেই আগুনকে ভয় কর মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে। যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে তাদের শুভসংবাদ দাও যে তাদের জন্য রয়েছে বেহেশ্‌ত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যখনই তাদের ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা বলবে, 'আমাদের পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত এ তো তাই ; তাদের ইচ্ছানুরূপ ফলই দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে, অধিকন্তু তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।' ২ (২৪, ২৫)

'সাবধানীদের জন্য আছে সাফল্য ; উদ্যান, দ্রাক্ষা, সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন-যৌবনা তরুণী এবং পূর্ণ পানপাত্র। সেখানে তারা অসার ও মিথ্যা কথা শুনবে না।' ৭৮ (৩১-৩৫)

'দোজখ প্রতীক্ষারত থাকবে, এ হবে সীমালংঘন-কারীদের আশ্রয়স্থল, সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে, অবস্থান করবে। সেখানে ওরা কোনো শীতল বস্তু উপভোগ করবে না, পানীয়ও নয়—কেবল আস্বাদ গ্রহণ করবে ফুটন্ত পানি আর পুঁজের ; এটাই উপযুক্ত প্রতিফল।' ৭৮ (২১-২৬)

—আল্‌-কোরআন।

৭০০. দোজখের পথ আনন্দ ও উল্লাস দ্বারা আবৃত এবং বেহেশ্‌তের পথ দুঃখ ও যন্ত্রণা দ্বারা পূর্ণ।—শায়।

৭০১. তোমাদের জুতার ফিতা অপেক্ষা বেহেশ্‌তে ও দোজখ তোমাদের অধিক নিকটবর্তী।—বুখারী।

৭০২. বেহেশ্‌তের বুনিয়াদ স্বর্ণ ও রৌপ্যের সারের ওপর ; ওর চুন অত্যন্ত সুগন্ধী কস্তুরী এবং ওর সুরকী মুক্তা ও পদ্মরাগ মণি এবং ওর চুনকাম জাফরানের। যে ব্যক্তি ওতে প্রবেশ লাভ করবে সে সবসময় সুখে থাকবে, কখনো দুঃখ বোধ করবে না ; এবং অমর হবে—কখনো মরবে না। তার বস্ত্র জীর্ণ হবে না, তার যৌবন বিলুপ্ত হবে না।—সগির।

৭০৩. বেহেশ্‌তে প্রবেশকারী প্রথম দলের চেহারা পূর্ণিমা চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। তাদের পরবর্তী দল আকাশের সর্বাধিক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দীপ্তিমান হবে। বেহেশ্‌তবাসীদের প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজন হবে না। তাদের মুখে থুথু এবং নাকে শ্লেষ্মার উৎপত্তি হবে না। তাদের চিরুনিখানা পর্যন্ত সোনার হবে। তাদের গায়ের ঘাম কস্তুরীর মত সুগন্ধময় হবে। গন্ধবিস্তারের জন্যে বিশেষ ধরনের আগরের ধুনির ব্যবস্থা থাকবে। হরিণ-নয়না স্বর্গসুন্দরীগণ তাদের পত্নী হবে। তারা সবাই (৩৩/৩৪ বছরের পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত) সমবয়স্ক হবে। সবাই আদিপিতা আদম (আঃ)-এর দেহাকৃতির ধারক তথা ষাট হাত দীর্ঘ হবে।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৭০৪. যদি বেহেশ্‌তের কোন নারী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হত তবে তার দেহভরা মৃগনাভির সৌরভে পৃথিবী ভরপুর হয়ে যেত এবং তার সৌন্দর্যে সূর্য ও চন্দ্র মলিন হত।—সগির।

৭০৫. বেহেশ্‌তে একটা ঘর আছে বাইরে থেকে যার ভেতর দেখা যায় এবং ভেতর থেকে যার বাইরেটা দেখা যায়। আল্লাহ্‌ তার জন্য ওটা সৃষ্টি করেছেন যে ক্ষুধিতকে খাদ্য দেয়, মিষ্টবাক্য বলে, রোজা রাখে এবং রাত্রিকালে যখন সকলে নিদ্রিত থাকে তখন নামাজ পালন করে।—তির। সগির।

৭০৬. আল্লাহ্‌ বলেন, 'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন একটা জিনিস তৈরী ক'রে রেখেছি মানুষ যা চোখে দেখেনি, কানে শোনেনি এবং অন্তরে যা কখনো কল্পনাও করেনি।'—শায়। তির।

৭০৭. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যে দিন ইচ্ছা করেছেন, সেই দিন বেহেশ্‌তকে সৃষ্টি করেছেন। ওর বিস্তার আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমান এবং ওর দৈর্ঘ্য আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং পৃথিবী

ও আকাশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে সেদিন আল্লাহ্ ওকে বিস্তারিত করবেন যাতে বেহেশ্তের সমস্ত মানুষ ওর মধ্যে বাস করতে পারে। প্রত্যেক বেহেশ্তের একশ করে দুয়ার আছে এবং ওদের পরস্পরের দূরত্ব পাঁচশ বছরের পথ; আর তার মধ্যে সর্বদা-প্রবাহিত পবিত্র নির্ঝরিণী আছে এবং ওর ফলগুলো যে যখন যা ইচ্ছা করবে সেই তখন তা পাবে। সেখানে অপ্সরা সদৃশ পুণ্যময়ী নারীরা রয়েছে, আল্লাহ্ তাদের আলোকের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তারা যেন মরকত ও প্রবালের মত। আনত-নয়না সেই নারীরা তাদের স্বামী ব্যতীত আর কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, জিন ও মানবদের মধ্যে কেউই তাদের ইতিপূর্বে স্পর্শ করেনি, তাদের স্বামীরা যখনই তাদের সাথে মিলিত হবে তখনই তাদের কুমারী দেখতে পাবে। তাদের গলায় থাকবে নানা রঙের সত্তরটা (৭০) করে' হার, কিন্তু সেগুলো তাদের শরীরে একটা কেশের মতও ভারী মনে হবে না। যেমন কাঁচের গেলাসের লাল শরাব বাইরে থেকে দেখা যায় তেমনি তাদের অস্থি, মাংস, চর্ম, কণ্ঠ-নালীর মধ্য দিয়ে তাদের সর্বাঙ্গ দেখা যাবে। তাদের মাথার চুল মুক্তা ও পদ্মরাগমণি দ্বারা সুশোভিত থাকবে।—ইমাম গাজ্জালীর দাকায়েকোল আখবার।

৭০৮. জান্নাত যোদ্ধার তরবারির তলায়।—সগির।

৭০৯. 'নিতান্ত হতভাগ্য ব্যতীত কেউই দোজখে প্রবেশ করবে না।' জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে রসুলুল্লাহ্, কে সেই হতভাগ্য?' তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টির জন্য কোন সৎকার্য পালন করেনি বা কোন অসৎকার্য ত্যাগ করেনি।'—ই. মাজা।

৭১০. তোমাদের (পৃথিবীর) আগুন দোজখের আগুনের ৭০ ভাগের এক ভাগ।—শায়খান।

৭১১. যদি দোজখের এক বালতি গলিত রক্ত ও পুঁজ পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হত তবে পৃথিবীর কেউই তার দুর্গন্ধে বেঁচে থাকতে পারতো না।—তিরমিজী।

৭১২. যদি সে কণ্টকময় বিষাক্ত খাদ্যের বিন্দুমাত্র পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হত তবে কাউকে আর জীবিকা অর্জনের জন্যে বিবাদ-বিসংবাদ করতে হত না, (কারণ তা খেলে কেউ বাঁচত না)। অতএব তার কি হবে যে তা খাদ্যস্বরূপ প্রাপ্ত হবে?—তিরমিজী।

তৃতীয় খণ্ড

আদম থেকে মুহম্মদ

[এখানে পৃথিবীর আদিমতম ধর্ম ইসলামের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যৎসামান্য আলোক-সম্পাতের চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রয়াসে লক্ষাধিক পয়গম্বরের মধ্যে মাত্র সামান্য কয়েকজন সম্পর্কে পবিত্র কোরআন শরীফ এবং হাদীস শরীফ থেকে কিছু কিছু মহামূল্য উদ্ধৃতি পরিবেশন করা হল। আশাকরি এর ফলে, সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে এই আধুনিক কালপর্যন্ত ইসলাম তথা মানবসভ্যতা সম্পর্কে কিছু পরিমাণ আলোক লাভ করা সম্ভব হবে।]

হজরত আদম (আঃ)

"তোমরা স্মরণ কর তখনকার ঘটনা যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রভু ফেরেশ্‌তাদের সম্মুখে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি (খলীফা) সৃষ্টি করব', তখন ফেরেশ্‌তাগণ বলেছিলেন, 'আপনি কি পৃথিবীতে এমন এক-জাতি সৃষ্টি করতে চান যারা ঝগড়া-দাঙ্গা আর খুনখারাপী করবে, অথচ আমরাই তো আপনার মহিমাকীর্তন ও পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকি।' আল্লাহ্‌তা'লা বললেন, 'নিশ্চয় আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।" ২(৩০)

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করলেন, 'আমি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটির সাহায্যে মানুষ সৃষ্টি করছি এবং যখন ওকে আমি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করব এবং ওর মধ্যে আমার বিশেষ সৃষ্টি আত্মা বা রূহ্‌ প্রদান করব, তখন তোমাদের তার প্রতি সিজদা (অর্থাৎ প্রণত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন) করতে হবে।" ১৫(২৮, ২৯)।

"আল্লাহ্‌তা'লা আদমকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তারপর আদেশ করেছেন, 'কুন (অর্থাৎ সৃষ্টি হও)'—সঙ্গে সঙ্গে মাটির মূর্তিটি মানবরূপ ধারণ করল।"

"এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সে সকল ফেরেশ্‌তাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন, এবং বললেন, এই সব জিনিসের নাম আমাকে বলে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' তারা (ফেরেশ্‌তারা) বলল, 'আপনি মহান, পবিত্র, আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।' তিনি বললেন, 'হে আদম, ওদের এসব জিনিসের নাম বলে দাও।' তখন সে তাদের ওসবের নাম বলে দিল। তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি যে স্বর্গ ও মর্তের অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তা জানি?' ২(৩১-৩৩)

"যখন ফেরেশ্‌তাদের আদেশ দিলাম, আদমকে সিজদা কর' তখন ইবলিস ব্যতীত

সকলেই সিজ্‌দা (প্রণাম) করল। সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল—সুতরাং সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হল।" ২(৩৪)

"আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে ফেরেশ্‌তাগণ সবাই সিজদা করল, কিন্তু ইব্‌লিস করল না ; সে সিজদাকারীদের (অর্থাৎ প্রণত রূপে শ্রদ্ধানিবেদনকারীদের দলভুক্ত হতে অস্বীকার করল। আল্লাহ্‌তা'লা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ইব্‌লিস, সিজদাকারীদের সঙ্গে তুই কেন সিজ্‌দা করলি না ?' ইব্‌লিস বলল, 'আপনি শুকনো ঠন্‌ঠনে মাটির দুর্গন্ধময় কাদা দিয়ে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি কখনো তার কাছে নত হতে প্রস্তুত নই।' 'আমি আদম আপক্ষা শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর ওকে সৃষ্টি করেছেন মাটির সাহায্যে।' (৩৮ ঃ ৭৬)। আল্লাহ্‌ বললেন, 'তবে তুই এখান থেকে বেরিয়ে যা—তোর প্রতি কেয়ামত পর্যন্ত চিরকাল আমার ধিক্কার ও অভিশাপ রইল।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তবে অবকাশ দিন।' আল্লাহ্‌ বল্‌লেন, 'নিশ্চয় তোকে নির্ধারিত দিন তথা কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হল।' ইব্‌লিস বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আদমের জন্য আপনি আমাকে সর্বহারা করে দিলেন, অতএব আদম-সন্তানদের (অর্থাৎ) মানুষদের কাছে আমি পাপকর্ম এবং আপনার প্রতি অকৃতজ্ঞতাকে মনোরম ও শোভন ক'রে তুলব এবং আমি তাদের সকলেরই সর্বনাশ সাধন করব। অবশ্য তাদের মধ্যে যারা আপনার নিষ্ঠাবান সেবক, (বান্দা) তাদের নয়।' আল্লাহ্‌ বললেন, 'আমার নিষ্ঠাবান বান্দা বা সেবক হওয়াই সোজা পথ, যে পথ তার পথিককে আমার কাছে পোঁছে দেয় (বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার এ হেন (নিষ্ঠাবান) বান্দাদের ওপর তোর কোন প্রভাবই খাটবে না। অবশ্য যেসব ভ্রষ্টব্যক্তি তোর অনুসরণকারী হবে তাদেরই তুই ক্ষতিসাধন করতে পারবি। নিশ্চয় তোর অনুসরণকারীদের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে জাহান্নাম—যার সাতটা দরজা আছে, যার প্রত্যেক দরজায় প্রবেশের জন্য (পৃথক পৃথক) দল আছে।' সাবধানীরা থাকবে প্রস্রবণবহুল জান্নাতে (অর্থাৎ স্বর্গে)।' ১৫(৩০-৪৪)

"আমি বললাম, হে আদম, তুমি ও তোমার সঙ্গিনী স্বর্গে বসবাস কর এবং যথা ইচ্ছা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষটির ধারেও যেওনা গেলে তোমরা অন্যায়কারী ও নিজেদের ক্ষতিসাধনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" ২(৩৫)

"তারপর শয়তান আদম ও হাওয়াকে কুমন্ত্রণা দিল। তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, (নিষিদ্ধ গন্দম বৃক্ষের ফল খাইয়ে) একজনকে অপর জনের সামনে উলঙ্গ ক'রে (দিয়ে অপমানিত) করবে। সে আদম ও হাওয়াকে এই বুঝিয়ে ছিল যে, 'তোমরা যাতে ফেরেশ্‌তা ও অমর হয়ে না যাও শুধু সেই কারণেই তোমাদের প্রভু তোমাদের ঐ (গন্দম) বৃক্ষ থেকে (ভক্ষণ করতে) নিষেধ করেছেন।" (সুরা আ'রাফ। ৮ পা. ৯ রুকু)

"ঐ বৃক্ষের ফল মুখে রাখার সঙ্গে সঙ্গে (তাদের বেহেশ্‌তী পোশাক খসে পড়ল), পরস্পরের সম্মুখে তাদের গুপ্তাঙ্গ উন্মুক্ত হয়ে পড়ল ! তারা উভয়ে বেহেশ্‌তের বৃক্ষপত্রদ্বারা আবরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করল। আর প্রভু পালনকর্তা তাদের উভয়কে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি কি তোমাদের এই বৃক্ষ থেকে (ভক্ষণ করতে) নিষেধ করিনি ? এবং বলিনি যে জেনে রেখো, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু—তোমরা তার থেকে সতর্ক থেকো।' (সুরা আ'রাফ ! ৮ পা. ৯ রুকু)

"আদম তার প্রভুর আদেশ বিরোধী কাজে পতিত হয়ে ভুল করে বসল।" (সূরা ত্বা-হা। ১৬ পা. ১৬রু)

"আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।" ২(৩৬)

"উভয়ে করজোড়ে বললে, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হবো।" (সূরা আ'রাফ। ৮ পা ৯ রু.)

"আল্লাহ্ আদমের তওবা (অনুতপ্ত ক্ষমাপ্রার্থনা) কবুল করলেন ; নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী দয়ালু।" (সূরা বাকারাহ্। ১ পা. ৮. রু)

"তারপর আদম তার প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল।"

—আল্-কোরআন।

৭১৩. সূর্যকরোজ্জ্বল দিনগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দিন হল জুমআ'র দিন বা শুক্রবার। ঐ দিন আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, ঐ দিন তাঁকে বেহেশ্তে প্রবেশ করানো হয়েছিল, ঐ দিন তাঁকে বেহেশ্ত থেকে বের করা হয়েছিল এবং (ঐ) শুক্রবার দিন ব্যতীত কেয়ামত (অর্থাৎ মহাপ্রলয়) সংঘটিত হবে না। —মুসলিম। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৭১৪. ঐ (শুক্রবার) দিন আল্লাহ্ আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করেছিলেন, ঐ দিন তাঁকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, ঐ দিন আল্লাহ্ তাঁর প্রাণ হরণ করেছিলেন। ই. মাজা।

৭১৫. আল্লাহ্ তা'লা আদমকে যে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, সেই মাটি-টুকু পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে সংগৃহীত ছিল। (যার মধ্যে লাল, সাদা, কালো এবং নরম, শক্ত, মন্দ, ভাল—বিভিন্ন রকমের মাটি ছিল)। তার ফলে আদম সন্তানগণ লাল, সাদা, কালো, নরম, শক্ত এবং ভালমন্দে বিভক্ত হয়েছে। —মিশকাত।

৭১৬. আল্লাহ্ তা'লা আদম (আঃ)কে তাঁর নিজস্ব দৈহিক গঠন এ আকারের পরেই সৃষ্টি করেছিলেন—(সৃষ্টিকাল থেকেই) তাঁর দৈর্ঘ্য বা দেহের উচ্চতা ষাট হাত ছিল। তাঁকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্ তা'লা সেখানে সমবেত এক দল ফেরেশ্তার কাছে তাঁকে যেতে বললেন এবং তাঁদের সালাম করার আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ নির্দেশও দিলেন, 'তাঁরা কিভাবে সালামের উত্তর দান করে তা আপনি লক্ষ্য করবেন ; ঐ উত্তরই আপনার এবং আপনার বংশধর ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য পারস্পরিক সালাম আদান-প্রদানের নিয়ম হবে।'

আদম (আঃ) ফেরেশ্তাদের কাছে গিয়ে বললেন 'আস্সালাম আলাইকুম।' ফেরেশ্তারা উত্তরে বললেন, 'অ আলাইকাস্সালামু অ রহ্মাতুল্লাহ্।' সালাম তথা শান্তির শুভকামনার উত্তরে ফেরেশ্তাগণ সালাম তথা শান্তির শুভকামনা ছাড়াও বিশেষ (রহ্মত বা) করুণালাভের জন্য প্রার্থনা করলেন।

আদম-দেহের আসল উচ্চতা ছিল ষাট হাত। যাঁরা বেহেশ্তে যাবেন তাঁরাও তখন সেই আদিমতম পরিমাপ ষাট হাত উচ্চতা বিশিষ্টই হবেন। মধ্যবর্তী জাগতিক জীবনে আদম-সন্তানের দেহের দৈর্ঘ্য ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত

হয়ে বর্তমান পরিমাপ পর্যন্ত পেঁ ৗছেছে। [বৃক্ষের ফুল ফল যেভাবে প্রাথমিক আকারের তুলনায় ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হতে থাকে সেইভাবে আদম-সন্তানও ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হয়েছে।]—বুখারী।

৭১৭. মাংস পচে দুর্গন্ধময় হয় এর সূচনা বনি ইস্রাইলদের ঘটনা থেকে ; আর স্ত্রী তার স্বামীকে প্রভাবিত করে ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত করে এর সূচনা মা হাওয়ার ঘটনা থেকেই। [আল্লাহর আদেশ অমান্য করে বনি ইসরাইলগণ যখন 'বটের' পাখীর মাংস সঞ্চয় করতে শুরু করল, তখন থেকেই মাংস-পচা শুরু হল।] —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৭১৮. সমস্ত রূহ্ বা আত্মা (বহু পূর্বে সৃষ্ট হয়ে এক বিশেষ স্থানে) সন্নিবেশিত ছিল। সেখানে যেসব আত্মার পরস্পর পরিচয় ও মিল হয়েছিল পৃথিবীতে আসার পর তাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ, প্রেম ও মিলন সংঘটিত হয় ; আর যেসব আত্মার পরস্পরের মধ্যে গরমিল ছিল পৃথিবীতে আসার পর তাদের মধ্যে গরমিলই স্থাপিত হয়।—বুখারী। [এই হাদীস এবং আদম অধ্যায়ের অন্যান্য কোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতিগুলো প্রথম খণ্ডে ১৪৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'মানুষ' শীর্ষক কোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি সমূহের সাথে মিলিয়ে পাঠ করলে ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতির ঐতিহাসিক পরিচয় সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হবে।]

৭১৯. কেয়ামতের মাঠে যখন সুপারিশকারী সন্ধান করা হবে, তখন বলা হবে, 'সকলের আদি পিতা আদম (আঃ) এ কাজের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি।' তারপর সবাই সমবেত ভাবে আদম (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হবে এবং বলবে, 'আপনি মানবজাতির আদি পিতা। আপনাকে আল্লাহতা'লা বিশেষ কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন, ঐ ভাবেই আপনার মধ্যে আত্মা দান করেছিলেন, ফেরেশতাদের আপনার প্রতি সিজদা (সশ্রদ্ধ প্রণতি) করার আদেশ দিয়ে আপনাকে সম্মানিত করেছিলেন এবং আপনাকে বেহেশতের মধ্যে স্থান দান করেছিলেন। আপনি আল্লাহতা'লার কাছে আমাদের এই ভয়ংকর অবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করুন।' কিন্তু আদম (আঃ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ব্যাপারে নিজের ত্রুটির কথা উল্লেখ করে আতংকিত ও সন্ত্রস্তভাবে নূহ্ (আঃ)-এর কাছে যাবার জন্য সকলকে পরামর্শ দেবেন।—বুখারী।

দ্বিতীয় আদম হজরত নূহ্ (আঃ)

[দশম নবী হজরত নূহ্ (আঃ) আর্মেনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাইবেলের মতে তিনি ৯৫০ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু কোরআন ও তৌরাতের বর্ণনা অনুসারে তিনি ১০৫০ বছর ১ মাস ১০ দিন জীবিত ছিলেন। ৪০ বছর বয়সে তিনি নবুয়ত পান, ৯৫০ বছর নবী হিসেবে ধর্ম প্রচার করেন, তারপর ৪০ দিন স্থায়ী মহাপ্লাবন ; সাহাবী ইব্নে আব্বাস (রাঃ)-র বর্ণনা (রুহুল মায়ানী) থেকে জানা যায়, জাহাজ থেকে অবতরণের পর অর্থাৎ প্লাবনের পর আরো ৬০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। (মওলানা আজিজুল হক অনূদিত 'বোখারী শরীফ' ৪র্থ খণ্ড ২য় সংস্করণ দেখুন।)]

'আমি নূহকে তার জাতির কাছে রসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম, তিনি তাদের কাছে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর (রসূলরূপে) রইলেন। (এই দীর্ঘ দিনের চেষ্টাতেও তারা ঈমান আনল না,) ফলে সর্বগ্রাসী মহাপ্লাবন তাদের নিমজ্জিত করল ; বস্তুতঃ তারা ছিলও স্বৈরাচারী।' (সূরা আনকাবুত। ২০ পারা ১৪ রুকু)।

'নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে রসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম। সেইমত সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, তিনি ভিন্ন অন্য কেউ তোমাদের উপাস্য হতে পারে না। (এর ব্যতিক্রম করলে) নিশ্চয় আমি তোমাদের ওপর এক ভয়ংকর দিনের শাস্তির আশংকা করছি।' উত্তরে তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, 'আমরা তো এই সিদ্ধান্তে পোঁচেছি যে, তুমি স্পষ্টতর বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছ।' নূহ্ বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে বিভ্রান্তির লেশমাত্র নেই—অবশ্যই আমি বিশ্বস্রষ্টা পালনকর্তা রক্ষাকর্তার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি রূপে প্রেরিত হয়েছি।' সৃষ্টিকর্তা রক্ষাকর্তা পালনকর্তার বাণী ও আদেশ-নিষেধ-সমূহই আমি তোমাদের কাছে পোঁছে দিয়ে থাকি এবং আমি তোমাদের হিতাকাংক্ষী। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন এমন সব তথ্য জ্ঞাত হই যা তোমরা জ্ঞাত নও। তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছ যে তোমাদেরই মত একজন মানুষের মাধ্যমে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের সতর্ক করার জন্য উপদেশবাণী আসল যাতে তোমরা সংযত হও এবং আল্লাহ্‌তা'লার করুণাপ্রাপ্ত হও?' এত বোঝান সত্ত্বেও তারা নূহ্‌কে অমান্য করল, তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল। ফলে (তাদের ওপরে প্লাবনের আকারে শাস্তি নেমে আসল,) আমি নূহ্‌কে এবং তাঁর সঙ্গীগণকে জাহাজে রেখে বাঁচালাম। আর যারা আমার বাণী সমূহকে মিথ্যা বলে' অমান্য করেছিল, তাদের পানিতে ডুবিয়ে মারলাম, নিশ্চয় তারা ছিল একেবারে অন্ধের দল।' (সূরা আ'রাফ। ৮ পারা, ১৫ রুকু)

'তাঁর সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানগণ সর্বসাধারণকে বলে বেড়াল যে এই লোকটা তোমাদের মত একজন মানুষ, সে তোমাদের মধ্যে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আল্লাহ্‌তা'লা যদি প্রতিনিধি পাঠাবার ইচ্ছা করতেন তাহলে নিশ্চয় কোন ফেরেশ্‌তাকে পাঠাতেন। এমন উদ্ভট কথা বাপ দাদা চোদ্দপুরুষেও আমরা শুনিনি। এ লোকটা পাগল ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা কিছু দিন অপেক্ষা কর!' নূহ্ আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে বললেন, 'হে পালনকর্তা আমাকে সাহায্য করুন—তারা তো আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে।' তখন আমি তার কাছে অহী মারফৎ আদেশ পাঠালাম, 'আমার তত্ত্বাবধানে আমার আদেশ মত তুমি একটা জাহাজ নির্মাণ কর। যখন আমার শাস্তি আরম্ভ হওয়ার সময় উপস্থিত হবে এবং ধরণী বিদীর্ণ হয়ে পানি উৎসারিত হতে আরম্ভ করবে তখন প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের এক একটা জোড়া এবং তোমার পরিজনবর্গকে জাহাজে তুলে নেবে, অবশ্য তাদের মধ্যে যার শাস্তি সম্পর্কে আমার আদেশ হয়ে গেছে সে উঠতে পারবে না। আর একটা কথা এই যে যারা অন্যায়কারী বিদ্রোহী তাদের সম্পর্কে আমার কাছে কোন অনুরোধ করবে না, তাদের অবশ্য অবশ্যই নিমজ্জিত করে হত্যা করা হবে! যখন তুমি আপন সঙ্গীদের নিয়ে জাহাজে গিয়ে বসবে তখন বলবে সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা আল্লাহ্‌তা'লার জন্য যিনি আমাকে অত্যাচারীদের কবল থেকে পরিত্রাণ করলেন।' (সূরা মো'মেনুন। পারা ১৮, রুকু ২)

নূহ্ সকলকে বলল, "তোমরা এই জাহাজে উঠে যাও, আল্লাহ্‌র নামে এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার পরওয়ারদেগার অতিশয় মেহেরবান এবং ক্ষমা-পরায়ণ।" ও জাহাজ পাহাড় সমান ঢেউ-এর মধ্য দিয়ে তাঁদের সকলকে নিয়ে চলতে লাগল। নূহের এক পুত্র জাহাজ থেকে দূরে অবস্থান করছিল; নূহ্ তাকে ডেকে বলল, 'হে আমার স্নেহের পুত্র, আমাদের সঙ্গে উঠে পড়, কাফেরদের সঙ্গে থেকো না।' উত্তরে সেই পুত্র বলল, 'আমি এখুনি কোন পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছি, পাহাড় আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে।' নূহ্ বলল, 'আজ আল্লাহ্‌র শাস্তির হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না—অবশ্য আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করেন।' (পুত্র পিতার কথা মানল না) এবং একটা বিরাট তরঙ্গ তাদের উভয়ের মধ্যে অন্তরায় হল—সঙ্গে সঙ্গে পুত্র নিমজ্জিত হল। (অন্যান্য কাফেরদলও প্লাবনে নিমজ্জিত হল)। এবং (তখন) আদেশ দেওয়া হল, 'হে মৃত্তিকা, তোমার উদ্গত পানি শোষণ করে নাও এবং হে আকাশ, বর্ষণ বন্ধ কর।' ফলে পানি অপসারিত হল এবং দুর্যোগের অবসান হল, যার ফলে জাহাজ 'জুদী' পর্বতের ওপর থেমে গেল। আল্লাহ্‌র মহিমা এই ছিল যে স্বৈরাচারী দল চিরতরে ধ্বংস হোক। নূহ্ আপন প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করে বলল, 'হে আমার পালনকর্তা, আমার পুত্র তো আমার পরিবার-বর্গেরই একজন এবং আপনার প্রতিশ্রুতি একান্ত সত্য, আপনি সর্বশক্তিমান; সর্বোপরি এখতিয়ারের মালিক।' (আমার পুত্রকে রক্ষার ব্যবস্থা আপনি করতে পারেন)। আল্লাহ্ তা'লা উত্তরে বললেন, 'হে নূহ্, নিশ্চয় সে তোমার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত নয়; নিশ্চয় সে তোমার আদর্শের বিপরীত অসৎকর্মপরায়ণ। অতএব যে বিষয়ে তুমি অবগত নও, সে বিষয়ে আমার কাছে কোন আবেদন করো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, অজ্ঞ লোকেদের মত কাজ করো না।' (তখন) নূহ্ বলল: 'হে পালনকর্তা, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যে বিষয়ে আমি অজ্ঞ সে বিষয়ে যেন আমি আর আপনার কাছে আবেদন না করি; এবং যদি আপনি আমাকে মার্জনা না করেন এবং আমার প্রতি বিশেষ করুণাপ্রদর্শন না করেন তাহলে আমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।' (অবশেষে) অনুমতি আসল, 'হে নূহ্, অবতরণ কর শান্তি ও সর্ববিধ কল্যাণ সহকারে—তোমার ওপর এবং তোমার সঙ্গীদের ওপর। পক্ষান্তরে (পরবর্তী) বংশধরদের মধ্যে অপর একটা এমন দলও হবে যাদের আমি ক্ষণস্থায়ী উপস্থিত সুখস্বাচ্ছন্দ্য দান করব—তারপর তাদের উপর আমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবে ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"
(সূরা হূদ। ১২ পা. ৩×৪ রু)

"নূহ্ আমার কাছে কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করেছিল। তার ডাকে আমি উত্তমরূপে সাড়া দিয়েছিলাম। তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে ভয়ংকর বিপদ হতে রক্ষা করেছিলাম। এরপর একমাত্র তার বংশধরদেরই ধরাপৃষ্ঠে অবশিষ্ট রেখেছি এবং তার জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এই কথা রেখে দিলাম—'সালাম নূহের প্রতি বিশ্বমানবের মধ্যে'। আমি পুণ্যবান বান্দাদের এভাবে পুরস্কৃত করে থাকি।"
(সূরা সাফ্‌ফাত। ২৩ পা. ৭ রু)

[এই সঙ্গে কোরআন শরীফের ২৯ পারার ৭১ সংখ্যক সূরা নূহের অনুবাদ দেখুন।]

—আল্-কোরআন।

৭২০. (কেয়ামতের দিন) নূহ্ (আঃ) এবং তাঁর উম্মতেরা আল্লাহ্ তা'লার

দরবারে উপস্থিত হবেন। আল্লাহ্ নূহ্‌কে জিজ্ঞাসা করবেন, 'আপনি ধর্মপ্রচার (তবলীগ) করেছিলেন কি?' তিনি উত্তর দেবেন, 'হে পরওয়ারদেগার, হাঁ।' তারপর আল্লাহ্ তাঁর উম্মতদের জিজ্ঞাসা করবেন, 'নূহ্ কি তোমাদের কাছে ধর্ম-প্রচার করেছিলেন?' তারা বলবে, 'না না, আমাদের কাছে কখনো কোন নবী আসেননি।' আল্লাহ্ নূহ (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করবেন, 'আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে কে?' নূহ্ (আঃ) বলবেন, 'মুহম্মদ (দঃ) এবং তাঁর উম্মত।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'তখন আমরা সাক্ষ্য দেব যে, হ্যাঁ, নূহ্ ধর্মপ্রচার করেছিলেন।' —বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু সাঈদ (রাঃ)।

ইব্রাহীম (আঃ)

[কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সন্ত্রস্ত মানুষেরা যখন সুপারিশের জন্য আদি পিতা আদম (আঃ)-এর কাছে যাবে, তখন আদম (আঃ) আপন ত্রুটির কথা উল্লেখ করে তাদের নূহ (আঃ) এর কাছে পাঠাবেন। কিন্তু নূহ্ (আঃ) তাঁর কাফের (বা অবাধ্য) পুত্র কেনানের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করে অপরাধ করেছিলেন এবং কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে 'হে পরওয়ারদেগার, ভূপৃষ্ঠে কাফের-গোষ্ঠীর একজন প্রাণীকেও অবশিষ্ট থাকতে দেবেন না' (২৯ পা. ১০ রু) বলে অশুভ কামনা করে দোষ করে ফেলেছিলেন। নূহ্ (আঃ) হাশরের দিন এই বিষয় দুটি উল্লেখ করে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি আশংকা করে বলবেন, 'তোমরা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্‌র কাছে যাও।'—বুখারী।

আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে খ্রীস্টপূর্ব ২১০০ অথবা ২২০০ অব্দে* এসিয়ার অন্তর্গত ইরাকের সুপ্রসিদ্ধ বাবেল বা ব্যাবিলন অঞ্চলে 'ফাদ্দানে-আরাম্'-এর অন্তর্গত 'ওর' নামক বস্তীতে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তৌরাত বা তোরায় বর্ণিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে নূহ্ (আঃ)-এর পুত্র 'সাম'-এর বংশে 'সাম'-এর আট পুরুষ পরে হজরত ইব্রাহীম (আঃ)এর জন্ম। হজরত ইব্রাহীমের পিতাকে তৌরাতে 'তারেখ' এবং কোরআনে 'আজর' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহম্মদ (সঃ) এই ইব্রাহীমেরই উত্তর-পুরুষ। মুসলমানদের খাত্না প্রথা, কোরবানী প্রথা, জমজম, মক্কা শরীফ, কা'বা শরীফ ইত্যাদির মূল উৎস এই ইব্রাহীম (আঃ)।]

"স্মরণ কর, ইব্রাহীম তার পিতা আজরকে বলেছিল, 'আপনি কি মূর্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।' এভাবে ইব্রাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা দেখাই যাতে সে নিশ্চিতবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল, তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, 'এটিই আমার প্রতিপালক।' তারপর যখন ও অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'যা অস্তমিত হয়, তা আমি পছন্দ করি না।' তারপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হতে দেখল তখন বলল, 'এটিই আমার প্রতিপালক।' যখন সেটি অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব।' তারপর যখন সে

* আরুজোল কোরআন ২য় খণ্ড ৩য় পৃষ্ঠা।

সূর্যকে উদিত হতে দেখল তখন বলল, 'এটিই আমার মহান প্রতিপালক।' যখন সেও অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র অংশী কর তা থেকে আমি নির্লিপ্ত। নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" ৬ (৭৪-৭৯)

"আমি অবশ্য এর পূর্বে ইব্রাহীমকে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দিয়েছিলাম। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, 'এই যে মূর্তিগুলোর তোমরা পূজা করছ, এগুলো কি?' ওরা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এদের পূজা করতে দেখেছি।' সে বলল, 'তোমরা নিজেরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ, তোমাদের পিতৃপুরুষেরাও ছিল।' ওরা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে সত্য সহ অবতীর্ণ হয়েছ না কৌতুক করছ?' সে বলল, 'বরং তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি ওদের সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা চ'লে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্পর্কে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব।' তারপর সে ওদের বড় মূর্তিটা ছাড়া অন্যান্য মূর্তিগুলোকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে' দিল, যাতে ওরা এর শরণাগত হয়। ওরা বলল, 'আমাদের দেবতাদের প্রতি এমন আচরণ কে করল? নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘনকারী।' কেউ কেউ বলল, 'এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি, তার নাম ইব্রাহীম।' ওরা বলল. 'তাকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত কর, সকলেই তাকে দেখুক।' (তাঁকে উপস্থিত করা হলে) ওরা বলল, 'হে ইব্রাহীম, তুমিই কি আমাদের দেবতাদের প্রতি এরূপ (আচরণ) করেছ?' সে বলল, 'বরং এই বড় মূর্তিটাই এ কাজ করেছে, এদেরই জিজ্ঞাসা করে দেখনা যদি এরা কথা বলতে পারে।' তখন ওরা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল, 'তোমরাই সীমালঙ্ঘনকারী'। তারপর ওদের মস্তক অবনত হল এবং ওরা বলল, 'ইব্রাহীম, তুমি তো বোঝই. এই মূর্তিগুলো কথা বলতে পারে না।' ইব্রাহীম বলল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা কর যা তোমাদের কোন উপকার অথবা অপকার করতে পারে না? ধিক্ তোমাদের এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের! তবুও কি তোমরা বুঝবে না?' ওরা বলল, 'তবে ওকে (ইব্রাহীমকে) পুড়িয়ে দাও, তোমাদের দেবতাদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।' (তারা ইব্রাহীমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল)। আমি বললাম, 'হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও।' ওরা ইব্রাহীমের ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু আমি ওদেরই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।" ২১ (৫১-৭০)

"সে পুত্র (ইসমাইল) যখন পিতা ইব্রাহীমের সাথে চলাফেরা করার মত বয়স প্রাপ্ত হল তখন ইব্রাহীম বলল, 'হে বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি তোমাকে জবাই করছি। এখন তুমি ভেবে দেখ তোমার মতামত কি?' পুত্র উত্তর দিল, 'হে আমার পিতা, আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা সম্পন্ন করে' ফেলুন, ইন্‌শাআল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে পাবেন।' তারপর যখন আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ পালনার্থে পিতাপুত্র পূর্ণ অনুগত হয়ে আসল এবং পিতা পুত্রকে নিম্নমুখে শায়িত করলেন এবং আমি পিতাকে এই বলে ডাকলাম, 'হে ইব্রাহীম. নিশ্চয় তুমি স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছ; এরূপ প্রতিদান আমি নিষ্ঠাবান সৎকর্মশীল সমস্ত ব্যক্তিকেই দান করে থাকি।' নিশ্চয় ও একটা মস্তবড় কঠিন

পরীক্ষা ছিল এবং (কোরবানীর উদ্দেশ্যে) জবাই করার মত একটা পশু (দুম্বা) পুত্রের বদলে দান করলাম। আর পরবর্তী লোকদের মধ্যে তার এই মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করলাম যে, সকলেই বলবে—'ইব্রাহীমের প্রতি সালাম'।" (সূরা সাফ্‌ফাত। ২৩ পা, ৭ রু)

—আল্-কোরআন।

৭২১. রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হিসাব নিকাশের জন্যে হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষকে পুনর্জীবিত করা হবে—এই অবস্থায় তারা নগ্ন পদ, নগ্ন দেহ এবং খাৎনাবিহীন হবে। হজরত নবী (সঃ) আপন উক্তির সমর্থনে পবিত্র কোরআনের এই বাক্যটি আবৃত্তি করলেন, 'আমি তোমাদের প্রথমে যে অবস্থায় সৃষ্টি ও ভূমিষ্ঠ করেছিলাম সেই অবস্থাতেই পুনর্জীবিত করব—এ আমার অটল সিদ্ধান্ত, এ আমি করবই।' (তিনি দঃ এও বলেছেন), কেয়ামতের দিন যাঁকে সর্বপ্রথম কাপড় পরান হবে তিনি হবেন ইব্রাহীম (আঃ)।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৭২২. আল্লাহ্‌র নবী ইব্রাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে কুঠারের সাহায্যে নিজে হাতে নিজের খাৎনা (অর্থাৎ লিঙ্গাগ্রত্বকছেদন) করেছিলেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৭২৩. ইব্রাহীম (আঃ) কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেননি, কেবল তিনটি ঘটনায় তিনি আপন উদ্দেশ্যকে একাধিক অর্থবোধক উক্তির আবরণে ব্যক্ত করেছেন। তার মধ্যে নিছক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে (যে) দুটো ছিল (তার) একটা হল—(মূর্তি ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে ঘরে থাকবেন বলে সবার সঙ্গে মেলায় না যাবার কারণ হিসাবে) তিনি বলেছিলেন, 'আমি রুগ্ণ।' অপরটা হল, তিনি বলেছিলেন, 'বরং (আমি বলি) এদেরই এই বড় মূর্তিটা এ কাজ করেছে।' আর তৃতীয় ঘটনার বিবরণ এই যে, হজরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন আপন স্ত্রী সারাহ্ (বা সায়েরা) রাঃ-কে সঙ্গে নিয়ে মাতৃভূমি (ব্যাবিলন) ত্যাগ করে এসেছিলেন, তখন (মিসরের অন্তর্গত) একটা জায়গায় হাজির হন। সেখানকার রাজা অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও অত্যাচারী ছিলেন। সেই রাজাকে খবর দেওয়া হল যে, এ অঞ্চলে একজন বিদেশী এসেছে যার সঙ্গে এক পরমাসুন্দরী রমণী আছে। রাজা সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে জানতে চাইলেন যে সঙ্গী রমণীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি? হজরত ইব্রাহীম (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমার ভগ্নী', এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে সারাহ্ (রাঃ)-র কাছে এসে 'ভগ্নী' বলার বাস্তব উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বুঝিয়ে বললেন, 'হে সারাহ্, বর্তমান পৃথিবীতে মোমেন কেবল তুমি এবং আমি, (আর মোমেনগণ পরস্পর ভাই-ভগ্নী, তাই) এই অত্যাচারী রাজার জিজ্ঞাসায় উত্তরে আমি বলেছি, 'তুমি আমার ভগ্নী। অতএব আমার উক্তিকে তুমি মিথ্যা বলো না।' তারপর (হজরত ইব্রাহীম আঃ) অজু করে নামাজে দাঁড়ালেন।

এ দিকে ঐ (অত্যাচারী) রাজা লোক পাঠিয়ে সারাহ্ (রাঃ)কে আনাল। (তারপর) যখন রাজা তাঁর প্রতি হাত বাড়াল তখনই সে আল্লাহ্‌র রোষে শ্বাসরুদ্ধ হল। তখন সে (রাজা) বলল, 'আমার জন্যে দোয়া করুন, আমি আপনাকে কোনপ্রকার কষ্ট দেব না।' সারাহ্ (রাঃ) দোয়া করলেন। (ফলে সে বিপদমুক্ত হল এবং) পুনরায় তাঁর দিকে হাত বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সে পূর্বাপেক্ষা কঠিন

অবস্থায় পতিত হল। এবারেও সে দোয়ার জন্য নিবেদন করল এবং তাঁকে কষ্ট দেবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিল। সারাহ্ (রাঃ) দোয়া (শুভকামনা) করলেন, সে রেহাই পেল। (তখন সে) একজন দারোয়ানকে ডাকিয়ে বলল, 'তোমরা যাকে এনেছ তাকে মানুষ বলে' মনে হয় না, সে জিন-পরী হবে।' সেই মত তাঁর সেবার জন্যে সে হাজেরা নাম্নী এক রমণীকে উপহার দিল।

সারাহ্ (রাঃ) হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে ফিরে আসলেন; তিনি তখনো নামাজে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হাত-ইশারা করে কি ঘটনা ঘটেছে তা জিজ্ঞাসা করলেন। সারাহ্ (রাঃ) বললেন, 'কাফের রাজার সকল প্রয়াসকে আল্লাহ্তা'লা তারই বিপদে রূপান্তরিত করে আমাকে রক্ষা করেছেন, আর রাজা হাজেরাকে আমার সেবার জন্য দান করেছে।'

উক্ত হাদীস বর্ণনা করে আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন, 'হে আরববাসিগণ, এই হাজেরা (রাঃ)-ই তোমাদের আদি মাতা।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

৭২৪. (হাজেরার গর্ভে ইসমাইলের জন্ম হলে সারার মনে নারীসুলভ স্বপত্নী-বিদ্বেষ জাগল। হাজেরা তা দূর করতে সচেষ্ট হলেন)। বিবি হাজেরাই প্রথম নারী যিনি পরিচারিকা নারীদের (মত) কোমরে কাপড় বাঁধার রীতি অবলম্বন করেন। তিনি সাধারণ পরিচারিকার মত কোমরে কাপড় বেঁধে বিবি সারার মনের দুঃখ দূর করার উদ্দেশ্যে তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। (কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল)। যখন ইব্রাহীম (আঃ) এবং বিবি সারার মধ্যেও কিছুটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, তখন (আল্লাহ্র আদেশক্রমে) ইব্রাহীম (আঃ) শিশুপুত্র ইসমাইল ও বিবি হাজেরা (রাঃ)কে (দূর দেশে রেখে আসার জন্য) তাঁদের নিয়ে বের হলেন। তাঁদের সঙ্গে ছোট এক মশক পানি ছিল, পথে তারা ঐ পানি পান করতেন এবং শিশু মাতার দুগ্ধ পান করত। এইভাবে তাঁরা (বর্তমানে) মক্কা-নগরী যেখানে অবস্থিত সেখানে পৌঁছুলেন। (তারপর) ইব্রাহীম (আঃ) মা ও শিশুকে বড় একটা গাছের তলায় রাখলেন। তখন এই এলাকায় কোন মানুষজন ছিল না, এবং পানিরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। তিনি তাঁদের কাছে শুধুমাত্র একটা থলের মধ্যে কিছু খোরমা এবং মশকের মধ্যে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে আসলেন। এই অবস্থায় শিশু ও তার মাকে সেখানে রেখে ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর (ফিলিস্তিনস্থ) গৃহ-জনের দিকে রওনা হলেন।

যখন ইব্রাহীম শিশু এবং শিশুর মাকে পরিত্যাগ করে বিপরীত দিকে চলে আসছিলেন তখন মা হাজেরা তাঁর পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলেন এবং চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'হে ইব্রাহীম, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? অথচ আমাকে এমন জায়গায় রেখে যাচ্ছেন যেখানে কোন মানুষ নেই, পানাহারের কোন ব্যবস্থা নেই।' তিনি বার বার এইভাবে বলতে লাগলেন, কিন্তু হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর দিকে আদৌ তাকালেন না, তাঁর দৃষ্টি ও গতি সম্মুখের দিকেই।" শেষে হাজেরা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আল্লাহ্তা'লার আদেশেই এ কাজ করলেন?' উত্তরে ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, 'হাঁ'। উত্তর শুনে হাজেরা (রাঃ) সান্ত্বনা লাভ করলেন এবং নির্ভীক চিত্তে বললেন, 'তাহলে আমাদের কোন ভয় নেই, আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করবেন।' বিবি হাজেরা (রাঃ) এও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি আমাদের এই জনশূন্য স্থানে কার আশ্রয়ে রেখে যাচ্ছেন?' উত্তরে ইব্রাহীম (আঃ) বললেন,

'আল্লাহ্‌তা'লার আশ্রয়ে।' একথা শুনে হাজেরা (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট।' এই বলে তিনি হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পেছন ছেড়ে চলে আসলেন।

ইব্রাহীম(আঃ) শিশুপুত্র ও তাঁর মাকে পরিত্যাগ করে পেছনদিকে না তাকিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। যেখানে স্ত্রীপুত্রের নজরে পড়ার সম্ভাবনা আর নেই যখন (সেই) গিরিপথের বাঁকে পেঁছিুলেন, তখন (আদম আঃ কর্তৃক নির্মিত প্রায় চিহ্নহীন) কা'বাগৃহের (স্থানের) দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালেন এবং হাত তুলে মোনাজাত করলেন, 'হে পালন-কর্তা, আমি জনশূন্য মরুর বুকে তোমার সম্মানিত ঘরের কাছে আমার পরিজনদের বসতি-স্থাপন করে যাচ্ছি এই উদ্দেশ্যে যে তারা নামাজকে (এবং তোমার এবাদৎ-বন্দেগীকে) দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করবে। হে প্রভু, তুমি আরো লোকের মন এই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট ক'রে দাও যেন এর জনহীনতা দূর হয়ে যায়। আর ফলমূলাদি খাদ্য দ্রব্যের আমদানি ক'রে পানাহারের ব্যবস্থা ক'রে দাও যাতে মানুষ তোমার দান উপভোগ ক'রে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।' (১৩ পা. ৮ রু)।

বিবি হাজেরা (রাঃ) হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পশ্চাত পরিত্যাগ করে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন। মশকের পানি তিনি নিজে পান করতেন এবং শিশুকে বুকের দুধ পান করাতেন। কিছু দিনের মধ্যেই পানি ফুরিয়ে গেল। তখন তিনি নিজেও ভীষণভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন এবং শুষ্কতার দরুন বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায় শিশুও তৃষ্ণাকাতর হয়ে পড়ল। এমন কি চোখের সামনে শিশুপুত্র পিপাসায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। তখন মা হাজেরা চোখের সামনে শিশু পুত্রের এই দুরবস্থা সহ্য করতে না পেরে সেখান থেকে চলে গেলেন এবং নিকটতম 'সাফা' পর্বতের ওপরে উঠে কারো খোঁজ পাওয়া যায় কিনা (তা দেখার জন্যে) এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন, কিন্তু কোন কিছুরই সন্ধান পাওয়া গেল না। সুতরাং তিনি দ্রুত 'সাফা' পর্বত থেকে নেমে ওরই সম্মুখস্থ 'মারওয়া' পর্বতের দিকে অগ্রসর হলেন। সাফা পর্বত থেকে নামলে সম্মুখস্থ স্থানটা অপেক্ষাকৃত নীচু, (সেখান থেকে শিশু ইসমাইলকে দেখা যাচ্ছিল না, তাই) তিনি পড়ি-মরি হয়ে ছুটে (নীচু) জায়গাটা পার হয়ে গেলেন। তারপর 'মারওয়া' পর্বতের ওপরে উঠে চারদিকে তাকালেন, কিন্তু কোনকিছুরই সন্ধান পেলেন না। এই ভাবে দিশাহারা হয়ে তিনি (কাতর কণ্ঠে আল্লাহ্‌তা'লাকে ডাকতে ডাকতে) ঐ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে দৌড়দৌড়ি করতে লাগলেন। এমন কি বারবার (এই) দৌড়দৌড়ির সংখ্যা সাতে গিয়ে দাঁড়াল।

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) উক্ত ঘটনার প্রতি ইংগিত করে বলেছেন, বিবি হাজেরা কর্তৃক ঐ পর্বতদ্বয়ে আসা-যাওয়া করার স্মরণেই আজও হজ্জ্‌ব্রত পালনকারিগণ হজ্জের একটা বিশেষ অঙ্গ হিসেবে ঐ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে (বিভিন্ন দোয়া ও জিকির করতে করতে) সাতবার আসা-যাওয়া করে থাকেন। (বর্তমানে উল্লিখিত নীচু স্থানটা যদিও সমতল তবুও শরিয়তের নির্দেশ অনুসারে হজ্জ্‌ পালনকারীদের মা হাজেরার মতই দৌড়ে ওস্থান অতিক্রম করতে হয়)।

বিবি হাজেরা (রাঃ) সপ্তমবার মারওয়া পর্বতে ওঠার পর শিশুর অবস্থা দেখার উদ্দেশ্যে তার কাছে ফিরে আসবার ইচ্ছা করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি পরিপূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে ঐ শব্দের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং

পুনরায় শব্দ শুনলেন। এবার তিনি বললেন, 'তোমার শব্দতো আমাকে শুনিয়েছ, যদি সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা তোমার কাছে থাকে তবে সাহায্য কর।' তখন তিনি (শিশু ইসমাইলের কাছে বর্তমান) জমজম কূপের জায়গায় একজন ফেরেশ্তাকে দেখতে পেলেন। (ঐ) ফেরেশ্তা ছিলেন জিব্রাঈল (আঃ)। ঐ ফেরেশ্তা তাঁর পায়ের গোড়ালির আঘাতে সেখানে গর্ত করলেন, তা থেকে পানি উথলে উঠতে লাগল। বিবি হাজেরা বিস্মিত হলেন এবং হাত দিয়ে মাটি খুঁড়ে তার চার দিকে বাঁধ সৃষ্টি করে তাকে কূপে পরিণত করলেন। তারপর অঞ্জলি পূর্ণ করে মশকে পানি ভরতে লাগলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত বিষয়ের উল্লেখ করে হজরত নবী (সঃ) বললেন, ইসমাইলের মায়ের প্রতি আল্লাহ্ করুণা বর্ষণ করুন—তিনি যদি তখন পানির চার দিকে বাঁধ না দিতেন তবে জমজমের ঐ পানি (কূপে পরিণত না হয়ে) প্রবাহমান ঝরনায় (তথা নদীতে) পরিণত হত।

বিবি হাজেরা (রাঃ) এই পানি পান করে দিন কাটাতে লাগলেন, ফলে তাঁর বুকে দুধের সঞ্চার হল, শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পান করাতে লাগলেন। ফেরেশ্তা জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে এই সান্ত্বনাও দিয়েছিলেন যে, 'এ পানি ফুরিয়ে যাবে আর আপনি বিপদে পড়বেন—এমন আশংকা কখনো করবেন না। জেনে রাখুন, এখানেই আল্লাহ্তা'লার ঘরের স্থান নির্দিষ্ট আছে এবং এই শিশু তাঁর পিতার সঙ্গে সেই ঘর পুনর্নির্মাণ করবেন। এই ঘরের নির্মাতাগণকে আল্লাহ্-তা'লা ধ্বংস করবেন তা কখনও হতে পারে না। ঐ সময় (মহাপ্লাবনে নূহের ভগ্নাবশেষ) আল্লাহ্র ঘরের নিদর্শন ভিটাটুকু মাটির ওপরে উঁচু একটা ঢিবির মত ছিল। তাও পাহাড়ী অঞ্চল থেকে আগত (প্রাচীন) বন্যায় ভগ্নপ্রায় হয়েছিল।

বিবি হাজেরা একাকিনী এখানে বসবাস করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে (ইয়েমেন দেশীয়) 'জুরহুম' (বা জুরহাম) গোত্রের কিছু লোক এই স্থান অতিক্রম করার সময় নিকটবর্তী একটা জায়গায় আশ্রয় নিল। তারা হঠাৎ দেখতে পেল কতকগুলো পাখী কোন একটা জিনিষকে কেন্দ্র করে উড়ছে। এ দেখে তারা অনুমান করল যে, এই তৃষ্ণার্ত জীবগুলো নিশ্চয় পানিকে কেন্দ্র করে উড়ছে। তারা আশ্চর্য হল এই ভেবে যে, আমরা তো এখানে বহুবার এসেছি। এখানে কখনো পানি দেখিনি। সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রকৃত সংবাদ জানার জন্য সেখানে দু-একজন লোক পাঠাল। লোকেরা পানির সংবাদ আনলে তারা সবাই সেখানে উপস্থিত হয়ে ইসমাইল (আঃ)-এর মা বিবি হাজেরা (রাঃ)কে দেখতে পেল। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা এখানে বসতি স্থাপন করতে চাই; অনুমতি দেবেন কি?' বিবি হাজেরা বললেন, 'অনুমতি দিতে পারি, কিন্তু এই কূপের ওপর তোমাদের কোন স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না।' তারা এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সেখানে বসবাস আরম্ভ করল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হজরত নবী (সঃ) বলেছেন, বিবি হাজেরা লোক-সাহচর্যের আশা করছিলেন, তিনি সেই সুযোগ পেয়ে গেলেন। ঐ পর্যটকদল সেখানে বসতি স্থাপন করল, তার ওপর তারা নিজেদের আরো লোক খবর দিয়ে সেখানে আবাদ করল, এইভাবে সেখানে কয়েকটা পরিবারের একটা বস্তী বসে গেল।

এদিকে ইসমাইল (আঃ)-এরও বয়স ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লাগল। সঙ্গে

সঙ্গে তিনি 'জুরহুম' গোত্রের কাছ থেকে তাদের 'আরবী' ভাষা শিক্ষা করে নিলেন, তার ফলে তিনি জুরহুম গোত্রের লোকেদের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। যখন ইসমাইল (আঃ) পূর্ণ যুবক তখন তারা নিজেদের একটা মেয়েকে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দিল। বিবাহের পর ইসমাইল (আঃ)-এর মা বিবি হাজেরা (রাঃ) ইহলোক ত্যাগ করলেন।

ইসমাইল (আঃ)-এর বিবাহের (এবং মা হাজেরার মৃত্যুর) পর একদিন হজরত ইব্রাহীম (আঃ) আপন পরিজনদের অবস্থা পরিদর্শন করার জন্য সেখানে আসলেন। ইসমাইল (আঃ) তখন বাড়ী ছিলেন না। তাঁর স্ত্রীর কাছে ইব্রাহীম (আঃ) ইসমাইলের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী বললেন, তিনি শিকার করে আহার্য সংগ্রহের জন্য কোথাও বেরিয়েছেন। তারপর ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রবধূকে তাদের জীবনযাত্রার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। পুত্রবধূ বললেন, 'আমরা অতিশয় দুরবস্থা, দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের মধ্যে আছি।' (পুত্রবধূ কিন্তু শ্বশুরকে চিনতে পারেননি)। ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, 'তোমার স্বামী বাড়ী আসলে তাকে আমার সালাম জানিও এবং বলো যে, সে যেন তার ঘরের দুয়ারের চৌকাঠ বদলে নেয়।' এই বলে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) চলে গেলেন।

ইসমাইল (আঃ) বাড়ী পেঁৗছে আপন পিতার উপস্থিতির আভাস অনুভব করলেন। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়ীতে কোন অতিথি এসেছিল কি?' স্ত্রী উত্তর দিল, 'হাঁ, এই এই রকম আকৃতির এক বৃদ্ধ এসেছিলেন। তিনি এসে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, আমি সে সম্পর্কে উত্তর দিয়েছি। এবং আমাদের সাংসারিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি বলেছি যে, আমরা অত্যন্ত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে আছি।' ইসমাইল (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন আদেশ করে গিয়েছেন কি?' স্ত্রী বললেন, 'হাঁ, আপনাকে সালাম জানাবার আদেশ করে গিয়েছেন এবং আপনার ঘরের চৌকাঠ বদলাবার আদেশ করেছেন।'

একথা শুনে ইসমাইল (আঃ) বললেন, 'সেই বৃদ্ধ আমার পিতা; তিনি এই কথার দ্বারা আমাকে তোমায় পরিত্যাগ করার আদেশ দিয়েছেন, অতএব তুমি আপন পিত্রালয়ে গমন কর।' এই বলে ইসমাইল আপন পত্নীকে পরিত্যাগ (তালাক) করলেন। এবং ঐ গোত্রের অন্য এক কন্যাকে বিবাহ করলেন।

কিছুদিন এইভাবে চলার পর ইব্রাহীম (আঃ) পুনরায় সেখানে আসলেন। সেদিনও ইসমাইল (আঃ) বাড়ী ছিলেন না। তাঁর স্ত্রীকে ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তরে স্ত্রী বললেন, 'তিনি আহার্যের সন্ধানে বেরিয়েছেন।' তাঁদের সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় পুত্রবধূ বললেন, 'আমরা ভাল আছি ও সচ্ছলতার মধ্যে আছি।' এই বলে আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসা করলেন। পুত্রবধূ তাঁকে পানাহারের জন্যও বিশেষ অনুরোধ করলেন। ইব্রাহীম (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদর প্রধান খাদ্য কি?' পুত্রবধূ বললেন, 'মাংস।' পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বললেন, 'পানি।' হজরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ্‌, তাদের জন্য মাংস ও পানিতে বরকত (প্রাচুর্য) দান কর।'

হজরত নবী (সঃ) বলেছেন, ঐ সময়ে সেখানে শস্য-ফসল ছিল না, নতুবা ও সম্পর্কেও ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করতেন। হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এই দোয়ার ফলেই শুধু মাংস ও পানির দ্বারা মক্কা অঞ্চলেই মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে, অন্য কোথাও কেবলমাত্র ঐ দুটো জিনিষের দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে

না। ইব্রাহীম (আঃ) তখন এই দোয়াও করেছিলেন, 'হে আল্লাহ্, তাদের খাদ্য ও পানীয়ে বরকত দান কর।' হজরত নবী (সঃ) বলেছেন, 'মক্কা শরীফের খাদ্য ও পানীয়ে যে বরকত দেখা যায় তা হজরত ইব্রাহীমেরই দোয়ার বদৌলতে।

হজরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রবধূর সঙ্গে কথোপকথনের পর তাঁকে বললেন, 'তোমার স্বামী বাড়ী ফিরলে আমার সালাম বলো এবং বলো যে আপন ঘরের চৌকাঠকে যেন বহাল রাখে।' ইসমাইল (আঃ) বাড়ী এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের কাছে কেউ এসেছিলেন কি?' স্ত্রী বললেন, 'হাঁ, এক জ্যোতির্ময়মূর্তি বৃদ্ধ এসেছিলেন। তিনি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি উত্তর দিয়েছি। তারপর আমাদের সাংসারিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করেছিলেন; আমি বলেছি, আমরা সুখে-শান্তিতেই আছি।' ইসমাইল (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন আদেশ করে গিয়েছেন কি?' স্ত্রী বললেন, 'হাঁ, আপনাকে সালাম জানিয়েছেন আর আপনাকে আদেশ দিয়েছেন, আপনি যেন আপন ঘরের চৌকাঠ বহাল রাখেন।' ইসমাইল (আঃ) বললেন, 'তিনি আমার পিতা, তোমাকে স্ত্রীরূপে বহাল রাখার জন্যে আমাকে আদেশ দিয়েছেন।'

কিছুদিন পর হজরত ইব্রাহীম (আঃ) আবার আসলেন। এবার ইসমাইল (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলেন—তিনি জমজম কূপের কাছে একটা গাছের নীচে বসে তীর তৈরী করছিলেন। ইসমাইল (আঃ) হজরত ইব্রাহীম (আঃ)কে দেখা মাত্র উঠে দাঁড়ালেন। এবং পিতা-পুত্রের মধ্যে আচরণের উপযোগী ব্যবহারের আদান প্রদান করলেন। তারপর হজরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, 'হে ইসমাইল, আল্লাহ্ আমাকে এক বিশেষ আদেশ করেছেন।' ইসমাইল (আঃ) বললেন, 'আপনি প্রভুর আদেশকে বাস্তবায়িত করুন।' ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, 'আল্লাহ্ আদেশ করেছেন—তুমি আমাকে সাহায্য করবে। তুমি আমায় সাহায্য করবে কি?' ইসমাইল (আঃ) বললেন, 'তবে আমি নিশ্চয় আপনার সাহায্য করব।' ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, 'আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেন যে এই উঁচু ভিটাকে ঘেরাও করে একটা ঘর তৈরী করি।' ঐ সময়েই তাঁরা বয়তুল্লাহ্ শরীফের (অর্থাৎ কা'বা শরীফের) ঘর তৈরী করতে লেগে গেলেন। ইসমাইল (আঃ) পাথর এনে দিতেন আর ইব্রাহীম (আঃ) ঘর গাঁথতেন। যখন দেওয়াল উঁচু হয়ে গেল তখন ইব্রাহীম (আঃ) একটা পাথর আনলেন, এবং ওর ওপর দাঁড়িয়ে গাঁথুনির কাজ করতে লাগলেন। আর হজরত ইসমাইল (আঃ) তাঁকে গাঁথুনির পাথর এনে দিতে লাগলেন। তাঁরা দুজনে চারিদিকে ঘুরে ঘর গাঁথছিলেন আর এই প্রার্থনা করছিলেন, 'হে আমাদের প্রভু, আমাদের এই কাজকে আপনি কবুল করুন—আপনি সবকিছু শোনেন এবং প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবকিছু জানেন।'—বুখারী। বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৭২৫. আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি নিবেদন করলাম, হে রসূলুল্লাহ্, ভূ-পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে?' হজরত (দঃ) বললেন, 'হেরেম শরীফের মসজিদ (তথা কা'বা শরীফ ও ওকে কেন্দ্র করে যে মসজিদ আছে)।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর কোন্ মসজিদ?' হজরত (দঃ) বললেন, মসজিদে আক্সা (বায়তুল মোকাদ্দসের মসজিদ)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম উক্ত মসজিদদ্বয় নির্মাণের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল?' হজরত (দঃ) বললেন, 'চল্লিশ বছর।' [হজরত ইব্রাহীম (আঃ) হেরেম শরীফ তথা

ওর মূলকেন্দ্র কা'বা শরীফের পুনর্নির্মাণ করেছিলেন আর সোলায়মান (আঃ) (Solomon) 'মসজিদে আকসা'র পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। উভয়ের কালগত ব্যবধান হাজার বছরের অধিক ছিল। কিন্তু উক্ত মসজিদদ্বয়ের মূল নির্মাতা হজরত আদম (আঃ)-এর দ্বারা উক্ত মসজিদদ্বয়ের নির্মিত হওয়ার মধ্যে হয়তো ৪০ বছর সময়ের ব্যবধান ছিল।]—বুখারী।

[দ্রষ্টব্য : হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সত্তর (৭০) বছর বয়সে বিবি হাজেরা (রাঃ)-র গর্ভে তাঁর প্রথম পুত্র ইসমাইল (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। (ফতহুলবারী ৬-৩১৩)। তিনি ইসমাইল ও তাঁর মা হাজেরাকে যখন মক্কায় মরুভূমিতে রেখে গিয়েছিলেন, তখন ইসমাইলের বয়স ছিল ২ বছর। (ফতহুল বারী ৬-৩০৮)। তারপর তিনি মাঝে মাঝে তাঁদের দেখতে আসতেন। (ঐ ৬-৩১১।) যখন ইসমাইল সাত বছর বয়সে পদার্পণ করলেন তখন স্বপ্নাদেশ অনুসারে কোরবানীর ঘটনা সংঘটিত হল। হজরত ইসমাইল (আঃ)-এর বয়স যখন ১৪ বছর তখন তাঁর প্রথম বিবাহ হয় এবং এর অল্পকাল পরে মা হাজেরার মৃত্যু ঘটে। (আহ্ওয়ালে আম্বিয়া-১)। যখন ইব্রাহীম (আঃ)-এর বয়স ১০০ বছর এবং ইসমাইল (আঃ)-এর বয়স ৩০ বছর, তখন তাঁরা কা'বা গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেন। (ফতহুল বারী ৬-৩১৩)]

হজরত মূসা (আঃ)

[কেয়ামতের দিন বিভীষিকাময় হাশর-ময়দানে যখন সন্ত্রস্ত মানুষেরা হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে গিয়ে তাদের জন্য আল্লাহ্‌তা'লার কাছে সুপারিশ করতে তাঁকে অনুরোধ করবে, তখন হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদের মূসা (আঃ)-এর কাছে যেতে পরামর্শ দেবেন। সেই পরামর্শ মত সবাই মূসা (আঃ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল মূসা, আল্লাহ্ আপনাকে রসূল করেছেন, তারপর আপনার সাথে বাক্যালাপ করে আপনাকে উচ্চ মর্যাদায় অধিকারী করেছেন—আপনি আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।'

হজরত মূসা (আঃ) হজরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র হজরত ইয়াকুব-(যাঁর আর এক নাম ইস্‌রাইল)-প্রতিষ্ঠিত বনি ইসরাইল বংশে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় মিসরের রাজাদের ফেরাউন নামে অভিহিত করা হত। হজরত মূসা (আঃ) যে ফেরাউনের আমলে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর রাজত্বকাল খৃষ্ট পূর্ব ১৩২৫ থেকে ১২৯২ অব্দ পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল। 'কাছাছোল কোরআন' এর উক্ত হিসেব অবশ্য 'আরজোল কোরআন'এ সমর্থন করা হয়নি। সুদূর অতীতের এই সময়কাল সম্বন্ধে সামান্য মতপার্থক্য থাকলেও হজরত মূসা (আঃ)-এর আবির্ভাব এবং অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে বিশেষ মতপার্থক্য দেখা যায় না।]

"আমি তোমার কাছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে মূসা ও ফেরাউনের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি। ফেরাউন আপন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে ওদের একটা শ্রেণীকে (বনি ইসরাইলকে) সে হীনবল করেছিল। ওদের কন্যাসন্তানদের (দাসী করার জন্য) সে জীবিত রাখত আর পুত্র সন্তানদের হত্যা করত; নিঃসন্দেহে সে ছিল মস্ত বা,

বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আমার ইচ্ছা হল যে যাদের হীনবল করে রাখা হচ্ছিল তাদের বিশেষ অনুগ্রহ দান করি, তাদের প্রাধান্য দান করি, তাদের দেশের উত্তরাধিকারী করি এবং দেশের শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি। আর ফেরাউন, তার মন্ত্রী হামান এবং লোক-লস্করেরা যে ভয় করছিল তা তাদের দেখিয়ে দিই। (এরকম সময় মূসা জন্মগ্রহণ করলেন)। আমি মূসা-জননীর অন্তরের মধ্যে এই আদেশ পাঠালাম—'মূসাকে স্তন্যপান করিয়ে লালন পালন কর; যখন মূসার ওপর (ফেরাউনের লোকদের অত্যাচারের) আশঙ্কা করবে তখন তাকে সিন্দুকে রেখে) নদীতে ভাসিয়ে দিও। কোন ভয় বা চিন্তা করো না। নিশ্চয় আমি তাকে তোমার কাছে ফেরত দেব এবং তাকে রসূল মনোনীত করবো।' শেষে ফেরাউনের স্ত্রীই তাকে (নদী থেকে) তুলে নিলেন। (স্বামীকে) বললেন, 'এ শিশু তোমার ও আমার নয়নের আনন্দ হবে, একে হত্যা করো না। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে পুত্র হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে তারা (মূসাকে পালনের) পরিণতি সম্পর্কে বুঝতে পারেনি। মূসাজননীর মন অধৈর্য হয়ে পড়ল, হয়তো সে ঘটনাটা প্রকাশই করে ফেলত যদি আমি তার অন্তরকে দৃঢ় না করতাম—এই উদ্দেশ্যে যে সে যেন আমার কথার ওপর অবিচলভাবে বিশ্বাসী হয়। মূসা জননী মূসার ভগিনীকে বলল, 'মূসার (সিন্দুকের) অনুসরণ কর।' সেই কথামত ভগিনী তাকে দূরে দূরে থেকে লক্ষ্য করতে লাগল; ফেরাউনের লোকেরা তার পরিচয় জানত না। আমি পূর্ব থেকেই স্থির করে রেখেছিলাম যে মূসা কোন ধাত্রীর দুধ পান করবে না। (সেইমত ফেরাউন-পত্নী সংকটে পড়লে) ঐ ভগিনী বলল, 'আমি তোমাদের এমন লোকের সন্ধান দিতে পারি যারা এই শিশুকে সযত্নে লালন পালন করবে।' এই ভাবে আমি মূসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম যাতে সে সান্ত্বনা লাভ করে, তার চিন্তা দূর হয় এবং সে দেখতে পায় যে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়—কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

"যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত এবং পরিনত (৩০ বছর) বয়স্ক হল তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম; এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করিয়া থাকি। একদিন সে নগরে প্রবেশ করে দেখল যে দুজন লোক মারামারি করছে—একজন তার নিজ (বনি ইসরাইল) সম্প্রদায়ের এবং অপর জন তার শত্রু (মিসরীয় কিব্‌তী) সম্প্রদায়ের। মূসার সম্প্রদায়ের লোকটা ওর শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে এক ঘুষি মারল, তাতে সে নিহত হল। (কিন্তু তাকে হত্যা করার ইচ্ছা মূসার ছিল না।) তাই মূসা বলল, 'শয়তানের প্ররোচনায় এ ঘটল। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি তো আমার নিজের প্রতি অত্যাচার করেছি, সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর।' তারপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সে আরো বলল, 'হে আমার প্রতিপালক তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ তার শপথ, আমি কখনো অপরাধীকে সাহায্য করব না।' তারপর ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় সেই নগরীতে তার প্রভাত হল। হঠাৎ সে শুনতে পেল পূর্বদিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে তার সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। মূসা তাকে বলল, 'তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি।' তারপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে প্রহার করতে উদ্যত হল তখন সে ব্যক্তি বলে উঠল, 'হে মূসা, গতকাল তুমি এক ব্যক্তিকে যেভাবে হত্যা করেছ সেইভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে

চাইছ ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাও, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না।' নগরীর প্রান্ত থেকে একজন লোক ছুটে এসে বলল, 'হে মূসা, ফেরাউনের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে, সুতরাং তুমি নগরের বাইরে চলে যাও—আমি তো তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।' ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় সে সেখান থেকে বের হয়ে পড়ল এবং বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি অত্যাচারীদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।'

'যখন মূসা মাদ্‌য়ান অভিমুখে যাত্রা করল তখন বলল, 'আশাকরি আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।' যখন সে মাদ্‌য়ানের কূপের কাছে পৌঁছুল দেখল, একদল লোক তাদের পশুগুলোকে পানি খাওয়াচ্ছে আর তাদের পেছনে দুজন রমণী তাদের পশুগুলোকে আগলে আছে। মূসা রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের কি ব্যাপার ?' ওরা বলল, রাখালেরা তাদের পশুপাল নিয়ে সরে না গেলে আমরা আমাদের পশুপালকে পানি খাওয়াতে পারছি না। আর (আমরা কূপে এসেছি কারণ) আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ।' মূসা তখন ওদের পশুগুলোকে পানি খাওয়াল, তারপর সে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দান করবে আমি তারই প্রত্যাশী।' ইতিমধ্যে রমণী দুজনের একজন লজ্জাজড়িত চরণে তার কাছে এল এবং বলল, আমার পিতা (শোয়ায়েব আঃ) তোমাকে পুরস্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন, কেননা তুমি আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়েছ।' তারপর মূসা তার কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে সে বলল, 'ভয় করো না, অত্যাচারী সম্প্রদায়ের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছ।' ঐ রমণীদ্বয়ের মধ্যে একজন বলল, 'হে পিতা, এই লোককে তুমি চাকরী দাও ; শক্তিশালী বিশ্বাসী লোকই চাকরীতে শ্রেয়ঃ।' পিতা মূসাকে বলল, 'আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই এই সর্তে যে তুমি আমার কাছে ৮ বছর কাজ করবে, আর যদি তুমি ১০ বছর পূর্ণ কর তবে তা হবে তোমার উদারতার পরিচয়। আমি তোমাকে চাপ দিতে চাই না। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে (ইনশা আল্লাহ্) তুমি আমাকে নিষ্ঠাবান পাবে।' মূসা বলল, 'আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রইল। এ দুটি মেয়াদের কোন একটা আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ্ তার সাক্ষী।'

''মূসা যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করার পর সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তূর পর্বতের* দিকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিজনবর্গকে বলল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখছি, সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর আনতে পারব অথবা একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারবো যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।' যখন মূসা আগুনের কাছে পৌঁছল তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ এক বৃক্ষ থেকে তাকে আহ্বান করে বলা হল, 'হে মূসা,

---

* সুয়েজ উপসাগর ও আকোবা উপসাগরের মধ্যস্থলে সাইনা উপত্যকা অঞ্চলে 'তূর' নামক পর্বতমালা অবস্থিত। লোহিত সাগরের যে জায়গাটা থেকে সুয়েজের শুরু সেইখানে সুয়েজের পূর্বতীরে এর অবস্থান। পবিত্র কোরআন শরীফে এই পর্বতসংলগ্ন প্রান্তরকে 'পবিত্র মহান প্রান্তর' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

আমিই আল্লাহ্, বিশ্বজগতের প্রতিপালক।' আরো বলা হল, 'তুমি তোমার যষ্ঠি নিক্ষেপ কর।' তারপর যখন সে ওকে (যষ্ঠিকে) সাপের মত ছুটাছুটি করতে দেখল তখন পিছনে না তাকিয়ে সে বিপরীত দিকে ছুটতে লাগল। তাকে বলা হল, হে মূসা, ফিরে এস, ভয় করো না; নিশ্চয় তুমি নিরাপদে রয়েছ। তোমার হাত তোমার জামার ভেতরে বগলের তলায় প্রবেশ করিয়ে বের করে আন, দেখবে ও অতি উজ্জ্বল (শুভ্র) হয়ে বের হয়ে আসবে। যদি ভয় হয় তবে হাত দুটোকে বুকের ওপরে চেপে ধর, দেখবে ও স্বভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। এই দুটো মোজেজা (অদ্ভুত শক্তি) তোমার সত্যতা ও প্রমাণস্বরূপ দান করে তোমাকে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করছি—ওরা সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে।' মূসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি তো ওদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমি আশঙ্কা করছি যে ওরা আমাকে হত্যা করবে। আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে ভাল বক্তা, অতএব তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর। সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি অবশ্য আশঙ্কা করি, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।' আল্লাহ্ বললেন, 'আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করবো এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। ওরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসরণকারীরা আমার নিদর্শন বলে ওদের ওপর প্রবল হবে।' মূসা যখন ওদের কাছে প্রতিপালকের সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো আনল ওরা বলল, 'এতো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র। আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে কখনো এমন ঘটতে শুনিনি।' মূসা বলল, আমার প্রতিপালক সম্পূর্ণ অবগত কে তাঁর কাছ থেকে পথনির্দেশ এনেছে এবং কার পরিণাম শুভ হবে। সীমালঙ্ঘনকারীরা কখনই সফলকাম হবে না।' ফেরাউন বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে জানি না। হে হামান, তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, হয়তো আমি এতে মূসার উপাস্যকে দেখতে পারি। তবে আমি অবশ্যই মনে করি সে মিথ্যাবাদী।' ফেরাউন ও তার বাহিনী অকারণে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং ওরা মনে করেছিল যে ওরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণাম কি হয়ে থাকে। ওদের আমি নেতা করেছিলাম। ওরা লোকদের জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত; কেয়ামতের দিন ওরা কিছুমাত্র সাহায্য পাবে না। এ পৃথিবীতে আমি ওদের অভিশপ্ত করেছিলাম এবং কেয়ামতের দিন ওরা হবে ঘৃণিত।

"আমি অবশ্যই পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম, মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা, পথনির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে। যখন মূসাকে আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি (মুহম্মদ) পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিল ছিল না। বস্তুতঃ মূসার পর অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম, তারপর ওদের বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। তুমি তো মাদয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না ওদের কাছে আমার বাক্য আবৃত্তি করার জন্য। আমিই তো ছিলাম রসূলপ্রেরণকারী।" ২৮ (৩-৪৫)।

"ফেরাউন বলল, বিশ্বনিখিলের পালনকর্তার পরিচয় কি?' মূসা বলল, 'যিনি আকাশ, পৃথিবী এবং ওর মধ্যস্থিত সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা

পালনকর্তা তিনিই বিশ্বনিখিলের পালনকর্তা ; যদি বিশ্বাস করতে চাও (তবে এই পরিচয়ই যথেষ্ট)। ফেরাউন তার দরবারস্থিত সকলকে বলল, 'তোমরা তার কথা শুনছ কি?' মুসা আরো বলল, 'তোমাদের সকলের এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের সৃষ্টি রক্ষা ও পালনকর্তা যিনি (তিনিই বিশ্বনিখিলের পালনকর্তা)। ফেরাউন বলল, 'তোমাদের সামনে তোমাদের এই রসুল—যে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে—(সে) নিশ্চয় পাগল, (নয়তো আমার সামনে এভাবে কথা বলতে সে ভয় পেত)। মুসা বলল, 'তিনি সমগ্র সৌরজগতের প্রভু—চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্ত, উদয়-অস্তের কাল ও স্থান এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী সকল কিছুর প্রভু ; বিবেকবুদ্ধি থাকলে এতেই প্রভুকে চিনতে পারবে।' ফেরাউন বলল, 'যদি তুমি আমাকে ভিন্ন অন্য কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর তবে নিশ্চয় আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করব।'' (সূরা শোয়ারা। ১৯ পা. ৬, ৭ রুকু)

—আল-কোরআন।

৭২৬. রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, ইব্রাহীম (আঃ)-এর আকৃতি অনুমান করতে তোমরা তোমাদের পয়গম্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আর মুসা (আঃ) ছিলেন বাদামী রঙের, তাঁর দেহের মাংস জমাট-বাঁধা ও খুব মজবুত ছিল। নাকে খেজুরগাছের ছোবড়ার তৈরী দড়ি পরানো একটা লাল উটের ওপরে আরোহণ করে তিনি হজ্জের সফর করেছিলেন। তখন পার্বত্য পথে নীচের দিকে অবতরণ কালে তিনি হজ্জের যে তলবীয়া ও তকবীর ধ্বনি দিতে দিতে যাচ্ছিলেন সেই দৃশ্য যেন আমি এখনো দেখছি।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৭২৭. একদিন আদম (আঃ) ও মুসা (আঃ) বিতর্কে লিপ্ত হলেন। মুসা (আঃ) আদম (আঃ)-এর উপর কটাক্ষ করে বললেন, 'হে আদম, আপনি আমাদের আদি পিতা—আপনি আমাদের বঞ্চিত করেছেন এবং বেহেশ্‌ত থেকে বহিষ্কৃত করেছেন।' আদম (আঃ) বললেন, 'হে মুসা, আল্লাহ্ আপনাকে বিশেষভাবে মর্যাদাবান করেছেন—তিনি আপনার সঙ্গে সরাসরি বাক্যালাপ করেছেন এবং তাঁর বিশেষ মহিমাবলে লিখিত আকারে আপনাকে তৌরাত গ্রন্থ দান করেছেন (এবং সেই গ্রন্থ) লৌহে-মাহ্‌ফুজের মধ্যে আমার সৃষ্টির ৪০ বছর পূর্বে লিখিত হয়েছিল। আপনি সেই তৌরাতে এই বিবরণটি কি পেয়েছেন, 'আদম তার প্রভু পালনকর্তার আদেশ-বিরুদ্ধ কাজ করে ফেলল বলে সে ভ্রম ও ভুল করার দোষে দোষী হল?' মুসা (আঃ) বললেন, 'হাঁ এ বিবরণ পেয়েছি।' আদম (আঃ) বললেন, 'আপনি কি আমার ওপর এমন একটা কাজের জন্য দোষারোপ করছেন যা আল্লাহ্‌তা'লা আমার সৃষ্টির ৪০ বছর পূর্বে আমার জন্য লিখে রেখেছেন?' এই প্রশ্নেই আদম (আঃ) মুসার ওপর জয়ী হলেন।—বুখারী। বর্ণনায় ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)।

হজরত ঈসা (আঃ)

[হাশর-ময়দানে সন্ত্রস্ত মানুষেরা যখন তাদের বিপদমুক্তির জন্য মুসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌তা'লার কাছে সুপারিশ করতে বলবে, তখন মুসা (আঃ) মিসরে অবস্থান

কালে জনৈক কিব্‌তীকে হত্যাকরার অপরাধের কথা স্মরণ করে ভীত হবেন এবং সকলকে ঈসা (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হবার পরামর্শ দেবেন। বর্তমানে যীশুখৃীস্ট নামে পরিচিত হজরত ঈসা (আঃ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রায় ৬০০ বছর পূর্বে তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী নবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হজরত ঈসা (আঃ)-এর পিতা ছিল না, মাতার নাম মরিয়ম এবং মাতামহের নাম এমরান। তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাব উভয়ই রহস্যাবৃত।]

"এম্‌রানের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করলাম। সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তুমি তা গ্রহণ কর—নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা 'সর্বজ্ঞ।' তারপর সে (এমরানের স্ত্রী হান্নাহ্‌) ওকে (মরিয়মকে) প্রসব করল, তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি কন্যা প্রসব করেছি।' বস্তুতঃ সে যা প্রসব করেছে সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত। পুত্র সন্তান ঐ কন্যার তুলনায় কিছুই নয়। আর আমি (হান্নাহ্‌) এই কন্যার নাম রাখলাম মরিয়ম। আর হে প্রভু, আমি একে এবং এর বংশধরগণকে অভিশপ্ত শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমার আশ্রয় নিলাম।' তারপর তাঁর প্রতিপালক তাকে ভালভাবেই গ্রহণ করেন এবং ভালভাবেই মানুষ করেন এবং তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে প্রদান করেন। যখনই যাকারিয়া কক্ষে তার সঙ্গে দেখা করতে যেত তখনই তার কাছে খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত, 'হে মরিয়ম, এসব তুমি কোথা থেকে পেলে?' সে বলত, 'ও আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।' নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা অশেষ জীবিকা দান করেন।" ৩ (৩৫-৩৭)।

"(স্মরণ কর), যখন ফেরেশ্‌তারা বলল, নিশ্চয় আল্লাহ্‌তা'লা নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে একটা সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হবে মসীহ* মরিয়ম-পুত্র ঈসা। সে হবে ইহকাল ও পরকালে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্যতম। সে দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।' সে (মরিয়ম) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি, আমার সন্তান হবে কি ভাবে?' তিনি বললেন, 'এভাবেই।' আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন; তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন 'হও'—আর অমনি তা হয়ে যায়। আর তিনি (আল্লাহ্‌) তাঁকে শিক্ষা দেবেন গ্রন্থ, প্রজ্ঞা, তৌরাত ও ইঞ্জিল। এবং তিনি বনি-ইস্রাইলদের জন্য তাঁকে রসূল করবেন। সে বলবে, 'আমি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন এনেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা একটা পাখীসদৃশ আকৃতি গঠন করব, তারপর আমি তাতে ফুঁ দেব, ফলে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে ও পাখী হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা তোমাদের গৃহে যা আহার কর এবং যা জমা করে রাখ তা বলে দেব। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। আজ আমি এসেছি আমার কাছে যে তৌরাত আছে তার সমর্থক রূপে ও তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল তার কতকগুলোকে বৈধ করতে এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন এনেছি, সুতরাং আল্লাহ্‌কে

* অর্থাৎ পরশমুক্তি—যার পরশেই রোগমুক্ত হয়।

ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক—সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা করবে—এটিই সরলপথ। যখন ঈসা তাদের অবাধ্যতা উপলব্ধি করল, তখন সে বলল, আল্লাহ্‌র পথে কারা আমার সাহায্যকারী?' শিষ্যরা (হাওয়ারিরা) বলল, 'আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করেছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী, তুমি (একথার) সাক্ষী থাক। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ তাতে আমরা বিশ্বাস করেছি এবং আমরা রসুলের অনুসরণ করেছি—সুতরাং আমাদের সত্য-সমর্থকদের তালিকাভুক্ত কর।' তারা শঠতা করল এবং আল্লাহ্‌ও কৌশল করলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ উত্তম কৌশলী।

"(স্মরণ কর), যখন আল্লাহ্ বললেন, হে ঈসা, নিশ্চয়ই আমি তোমার কাল পূর্ণ করেছি এবং আমার কাছে তোমাকে তুলে নিচ্ছি এবং যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের মধ্য থেকে তোমাকে পবিত্র (মুক্ত) করছি। আর তোমার অনুসারীগণকে কেয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের ওপরে জয়ী করে রাখব, তারপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে।' তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটেছে তার মীমাংসা করে দেব।" ৩ (৪৫-৫৫)।

"হে (ইঞ্জিল) গ্রন্থধারিগণ, ধর্মীয় ব্যাপারে অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিওনা এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে অবান্তর কথা বলো না। ঈসা মসীহ্ যিনি মরিয়মপুত্র তিনি আল্লাহ্‌র রসুল ছিলেন মাত্র এবং আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ আদেশে সৃষ্ট হয়ে ছিলেন, সেই আদেশ আল্লাহ্‌তা'লা মরিয়মের প্রতি প্রদান করেছিলেন এবং তিনি আল্লাহ্‌রই সৃষ্ট একটা আত্মা (জীব)। অতএব তোমরা সঠিকরূপে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌র রসুলদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর; এমন কথা মুখেও এনো না যে আল্লাহ্ তিনজন।—এ ধরনের কথা চিরতরে পরিহার কর, তাতে তোমাদেরই মঙ্গল হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লাই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশী নেই। তাঁর কোন সন্তান আছে এমন মন্তব্য হতে তিনি চিরপবিত্র—অতি মহান। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাঁরই—সকল কিছুর সমাধানে মহান আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ংসম্পূর্ণ।" (সুরা নেসা। পা. ৬, রু ৩)

—আল্-কোরআন।

৭২৮. আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি (নবীদের মধ্যে) দুনিয়া এবং আখেরাতে মরিয়ম-পুত্র ঈসার সর্বাধিক নিকটবর্তী—আমাদের উভয়ের মধ্যে অন্য কোন নবীর আবির্ভাব হয়নি। নবীদের পরস্পরের সম্পর্ক ঐ ভ্রাতৃবৃন্দের মত যাদের পিতা একজন মাতা বিভিন্ন। সকল নবীর প্রচারিত ধর্মের মূল একই—বিভিন্নতা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে।—বুখারী।

৭২৯. দজ্জাল দিকে দিকে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় সৃষ্টি করবে—এমন সময় অকস্মাৎ আল্লাহ্‌তা'লা মরিয়ম-পুত্র মসীহ্‌কে পাঠাবেন। তিনি অবতরণ করবেন দামেশ্‌কে শহরের পূর্বাংশ অবস্থিত (মসজিদের) 'মিনারা-বায়জা'—শ্বেতবর্ণের মিনারার ওপর। তাঁর পরনে একজোড়া রঙিন চাদর থাকবে, অবতরণকালে তাঁর হাতদুখানা দুজন ফেরেশ্‌তার ডানার ওপর ভরদেওয়া থাকবে। কান্তিতে তাঁর

ঘাম বেরুতে থাকবে—মাথা নীচু করলে টপটপ করে ঘামের ফোঁটা পড়বে—আর মাথা সোজা করলে ঘামের ফোঁটা মোতির মত গড়িয়ে পড়বে।—মুসলিম।

৭৩০. হজরত ঈসার অবতরণ সময়ে আল্লাহ্ ইসলাম ভিন্ন অন্য সব বিধর্মের উচ্ছেদ সাধন করে দেবেন।—আবু দাউদ।

হজরত মুহম্মদ (সঃ)

"তখনকার কথা স্মরণ কর, যখন মরিয়মপুত্র ঈসা বলেছিলেন, হে বনি-ইস্রাইলগণ, আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্‌তা'লার রসুল, আমার পূর্ববর্তী তৌরাত গ্রন্থের সমর্থনকারী এবং আমার পরে 'আহ্‌মদ' নামে এক রসুল আসবেন তার সুসংবাদবহনকারী হয়ে এসেছি।" (সুরা সাফ। ২৮ পারা)

'যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল দুজনে কা'বা গৃহের দেওয়াল তুলছিল, (এবং আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছিল)—হে আমাদের প্রভু, আমাদের পক্ষ থেকে এই (কা'বা নির্মাণের) প্রয়াস কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রভু, আমাদের আরো প্রার্থনা এই যে, আপনি আমাদের উভয়কেই আপনার প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী, আপনার সন্তুষ্টি লাভার্থে সর্বস্ব পরিত্যাগকারী ক'রে তুলুন; এবং আমাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন একটা দল সৃষ্টি করুন যারা এই রকম আত্মসমর্পণকারী ও সর্বস্ব-পরিত্যাগকারী হবে; এবং আমাদের (এই কা'বা গৃহের) হজ্জের সমস্ত নিয়মকানুন শিক্ষা দিন এবং আমাদের প্রতি শুভদৃষ্টি দান করুন—একমাত্র আপনিই বাস্তবিক শুভদৃষ্টিসম্পন্ন ও দয়ালু। হে আমাদের প্রভু, আমাদের উভয়ের বংশধরের থেকে যে বিশেষ দলটি দাঁড় করাবেন, তাদের মধ্য থেকে একজনকে রসুলরূপে মনোনীত করুন যিনি তাদের আপনার বাণী ও উপদেশ পাঠ করে শোনাবেন এবং আপনার গ্রন্থ ও জ্ঞান শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের বাহ্যিক ও আত্মিক সমুদয় কদর্যতা থেকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় একমাত্র আপনিই হলেন সর্বাধিক ক্ষমতাশালী ও সুকৌশলী।' ২ (১২৭-২৯)

—আল্-কোরআন।

[এই মহান প্রার্থনার ফলশ্রুতি স্বরূপ আবির্ভূত হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল মহানবী মুহম্মদ (সঃ)। সমগ্র হাদীস শরীফ তাঁর জীবন ও বাণী। পবিত্র কোরআন শরীফ তাঁর সুমহান চরিত্র-চিত্র।]

মুহাদ্দেস প্রসঙ্গ

[এখানে কয়েকজন হাদীস-সংকলনকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় মুদ্রিত হল]

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)

হি. ৮০-১৫০

খ্রী. ৬৯৯-৭৬৭

রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর তিরোধানের (হি. ১১) প্রায় সত্তর বছর পরে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) আবির্ভূত হন। তাঁর পূর্ণ নাম ইমাম আবু হানীফা বিন নো'মান বিন সাবিত। তিনি হিজরী ৮০ সালে ইরাকের অন্তর্গত বিখ্যাত কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবে লেখাপড়া শেখার তেমন কোন সুযোগ তিনি পান নি। পূর্বপুরুষদের মতই কাপড়ের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করার একটা গোপন বাসনা তাঁর মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মেরে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা তা ছিল না। তাই একদিন দরদী শিক্ষাবিদ্ ইমাম শাবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ ঘটল। ইমাম শাবী তাঁর প্রতিভাদীপ্ত মুখচ্ছবি দেখে মুগ্ধ হলেন। তাঁর মধ্যে একটা মহান প্রতিভার কুঁড়ি যে ফুটি ফুটি করছে তা তিনি বুঝতে পারলেন। সৎশিক্ষার আলো পেলে সেই কুঁড়ি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হবে, এই ভেবে তিনি তাঁকে লেখাপড়া শিখতে উৎসাহিত করলেন। তাঁর উৎসাহে আবু হানীফা কুফার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ইমাম হেমাদের মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হলেন। সেখানে তিনি কোরআন, হাদীস, ফেকাহ্, উসুল, সাহিত্য, অলংকার, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করলেন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং বুদ্ধিমত্তা দেখে তাঁর সহপাঠী ও শিক্ষকবৃন্দ বিস্মিত ও চমৎকৃত হলেন। সত্যকার শিক্ষার্থীর এই স্মরণীয় গৌরবে নিজেকে সুসমৃদ্ধ করতে করতে তিনি ক্রমে কুফা ও নাজায়েলের ৯০ জন মহান শিক্ষাবিদের শিষ্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন। তাঁদের কাছে তিনি হাদীস, কোরআন, ফেকাহ্ প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে' ঐ সব শাস্ত্রে অতুলনীয় পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। তাঁর এই পাণ্ডিত্যের খ্যাতি মৃগনাভির স্নিগ্ধ গন্ধের মত দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল।

ফলে দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে আসতে লাগল। তিনি তাঁদের শিক্ষাদান করতে লাগলেন। কোরআন, হাদীস, ফেকাহ্—প্রধানতঃ এই ছিল তাঁর শিক্ষাদানের মূল বিষয়। হাদীস শিক্ষাকে সুবিন্যস্ত করার উদ্দেশ্যে এবং হাদীসকে সুসংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কিছু হাদীস সংগ্রহ করে একখানা 'মসনদ' প্রণয়ন করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় শিষ্য প্রধান বিচারপতি আবুল মইদ মুহম্মদ আল খারজামী ঐ মসনদের সঙ্গে আরো অনেক হাদীস সংযুক্ত করে 'মসনদে ইমামে আজম' নাম দিয়ে ঐ হাদীস-সংকলন-গ্রন্থকে পূর্ণতর আকারে প্রকাশ করলেন।

কিন্তু হাদীস অপেক্ষা ফেকাহ্ বা বিধান শাস্ত্রের প্রতিই ইমামে-আজম আবু হানীফা (রঃ)-র আগ্রহই সমধিক ছিল। কারণ ইমাম মালেক (রঃ)-র 'মুয়াত্তা' বা সমতল পথ নামক হাদীস-সংকলন-গ্রন্থটি তখন সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 'মুয়াত্তার' মাধ্যমেই বিশ্ব মুসলিমের হাদীস-রস-পিপাসা বহুলাংশে পরিতৃপ্ত

হয়েছে। তাই তিনি ফেকাহ্ শাস্ত্রকে সুশৃঙ্খল করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ফেকাহ্ বা বিধানশাস্ত্র হল কোরআন-হাদীস মন্থনজাত জ্ঞানরত্নের খনি। কোরআনে যে বিধিবিধান আছে, হাদীসে যে বিধিবিধান আছে এবং যে সব বিধি-বিধান কোরআন ও হাদীস বিশ্লেষণ করে আবিষ্কৃত হয়েছে—বিশ্ব-মুসলিমের ধর্ম ও সমাজ পরিচালনার জন্য অপরিহার্য সেই শাস্ত্রটির নাম বিধান শাস্ত্র।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তাঁর চার হাজার সুপণ্ডিত শিষ্যের সহযোগিতায় কোরআন ও হাদীসের বিধিবিধানগুলো তন্ন তন্ন করে' অনুসন্ধান এবং বিচার বিশ্লেষণ করে' মুসলমানের ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, দৈনন্দিন কার্যকলাপ, রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে যে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য বা বিধিবিধান আবিষ্কার করেন, সেই বিধিবিধানের সংকলন-গ্রন্থটির নাম 'ফেকাহে আকবর' বা 'শ্রেষ্ঠ বিধান'। কিভাবে তাঁরা এ বিধান প্রণয়ন করেছেন সে প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, 'আমরা প্রথমে কোরআন, তারপর হাদীস, তারপর হজরত (সঃ)-এর সহচরদের ফতওয়া থেকে নির্বাচন করি। সহচরেরা যে বিষয়ে সম্মত হয়েছিলেন আমরা তা অনুসরণ করি এবং যে বিষয়ে সন্দেহ করেছিলেন আমরাও সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করি।'[১] যাইহোক সমস্যাজড়িত সেদিনের মুসলিম-জগৎ হাদীস-কোরআন-সম্মত ঐ বিধিবিধানের অভাবে চোখের সামনে বিশ্বজগৎকে যেন অন্ধকার দেখছিল। 'ফেকাহে আকবর' বা 'শ্রেষ্ঠ বিধান' তাদের চোখের সামনেকার সেই ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে আলোর নিশানা তুলে ধরল। ফলে ঐ শ্রেষ্ঠ বিধান অনুসারেই সেকালের মুসলিম জগতের সমাজ, শাসনতন্ত্র ও আইন-বিচার সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। এই জন্যেই ইমাম আবু হানীফাকে আজো 'ইমামে আজম' বা 'শ্রেষ্ঠ নেতা' বলে' সম্মান জানান হয়। এই জন্যেই বর্তমান বিশ্বের ৪০ কোটি মুসলমান নর-নারীর মধ্যে ৩৯ কোটি নরনারীই তাঁর বিধান মেনে 'হানাফী মজহাবের' লোক হিসেবে আপনাপন পরিচয় প্রদান করে' কৃতার্থ বোধ করেন।

অবশ্য তাঁর এই সম্মান ও জ্ঞানৈশ্বর্য তাঁর শেষ জীবনে অপরিসীম দুঃখ ও কারুণ্যের কারণে পরিণত হয়। সমসাময়িক খলীফা আল-মনসুর (খৃী. ৭৫৪-৭৫/ হি. ১৩৭-৫৯) তখন তাঁর নব নির্মিত রাজধানী বাগদাদকে সর্ববিষয়ে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় নগরীতে পরিণত করে তোলার চেষ্টা করছিলেন। সুরম্য প্রাসাদ শ্রেণীর সুরুচিকর বিন্যাস বাগদাদকে স্বপ্ননগরীতে পরিণত করেছিল। এবারে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসাধকের সান্নিধ্যের মাধ্যমে তিনি বাগদাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে বিশ্বের সামনে স্মরণীয় করে তুলতে চাইলেন। তাই মহাজ্ঞানী 'ইমামে আজমকেই' তিনি বাগদাদে এসে সুবিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন (হি. ১৫০)। কিন্তু আবু হানীফা (রঃ) সবিনয়ে জানালেন যে অত বড় একটা পদ গ্রহণ করার মত যোগ্যতা তাঁর নেই। খলীফা মনসুর এই প্রত্যাখ্যানে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, 'আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।' আবু হানীফা বললেন, 'তাহলে একজন মিথ্যাবাদীকে কি প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ করা উচিত?' এতে খলীফা অধিকতর ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। এই কারাগারেই তাঁর জীবনাবসান হল (হি. ১৫০)।

১ Wolluston's—Muhammad, His Life and Doctorine. P. 274.

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্ব সচেতন, দৃঢ়চেতা এবং ফেরেশ্‌তার মত নির্মল চরিত্রের অধিকারী এক সত্যকার মুসলমান। তাঁর চরিত্রে কোথাও ফাঁক ছিল না। তিনি প্রতিদিন অর্ধরাত্রি জেগে নামাজ পড়তেন। কিন্তু একদিন একজন লোক তাঁকে দেখিয়ে অন্য একজনকে বললেন, 'ইনি সারারাত জেগে নামাজ পড়েন।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে এই প্রশংসার উপযুক্ত করে তোলার জন্যে সেই দিন থেকেই সারারাত জেগে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। তাই শেখ অলীউদ্দীন খতীব তাঁর 'আসমাউর রেজাল' গ্রন্থে বলেন, 'গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচনা করলেও ইমাম আবু হানীফার গুণ গরিমার কথা শেষ করা যাবে না।' জীবনে সত্তর (৭০) হাজার বার তিনি কোরআন শরীফ খতম (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পাঠ) করেছিলেন। পবিত্র কোরআন শরীফ ছিল তাঁর সকল জ্ঞানের উৎস। ফরিদুদ্দীন আত্তারী তাঁর 'তাজকেরাতুল আওলিয়া' গ্রন্থে বলেন, 'ইমাম আবু হানীফার সামনে কোন কঠিন সমস্যা আসলে তিনি ৪০ বার কোরআন খতম করতেন।'

ইমাম মালেক (রঃ)

হি. ৯৩—১৭৯

খৃী. ৭১৫—৮০১

নবী (সঃ) এর অমরবাণী হাদীস শরীফকে সংরক্ষণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করে যে-সব মহান জ্ঞানসাধক নিখিল বিশ্বে অবিনশ্বর গৌরবের অধিকারী হয়েছেন ইমাম মালেক (রঃ) তাঁদের অন্যতম। তিনি হি. ৯৩ অব্দে নবীর নগর মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আনাস। তাই তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাম হয় আনাসের পুত্র মালেক বা মালেক বিন আনাস।

তিনি ছিলেন আশৈশব বিদ্যানুরাগী। শুরুতেই দারিদ্র্য তাঁর বিদ্যানুরাগের পথে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু তিনি হতোদ্যম না হয়ে ঘরের আসবাবপত্র পর্যন্ত বিক্রি করে সে বাধা দূর করেন। অখণ্ড মনোযোগ এবং অনবিচ্ছিন্ন নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি কোরআন, হাদীস, ফেকাহ্, উসুল প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর অসাধারণ মেধা ও স্মরণশক্তি তাঁকে অল্পদিনের মধ্যেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় 'ইমাম' হিসেবে সুপরিচিত করে তোলে। কথিত আছে, তিনি একবার যা শুনতেন, সারা জীবনে আর তা কখনো ভুলে যেতেন না।

শিক্ষালাভের পর তিনি যথারীতি শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর কাছে হাদীস-শিক্ষা লাভ করার জন্যে বিশ্বের দিগ্‌দিগন্ত থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থীর সমাগম ঘটতে থাকে। তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ শিক্ষাদানের ফলেই তাঁর বহু শিষ্য পরবর্তীকালে বিশ্ববরেণ্য মনীষী হিসেবে সুপরিচিত হন। তাঁর এইসব শিষ্যদের মধ্যে ইমাম-শাফেয়ী, জহ্‌রী এবং আব্দুল্লাহ্ বিন ওহাব সমধিক প্রসিদ্ধ।

তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি 'মুয়াত্তা' বা 'সমতল পথ' নামক একখানা কালজয়ী হাদীস সঙ্কলন। এতে বিষয়-অনুসারে-সাজানো মোট ১৭০০ হাদীস তিনি সঙ্কলন করেছেন। হাদীসগুলোর ইসনাদ বা সাক্ষীতালিকার সুদীর্ঘ বর্ণনা দান করা

অপেক্ষা তিনি হাদীসের 'মতন' বা বিষয়বস্তু বর্ণনার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাই হাদীসগুলো সহীহ বা বিশুদ্ধ কিনা সেদিকে দৃষ্টি দেবার তত বেশি অবকাশ তিনি পাননি। তবে মদীনাশরীফের আলেমদের ফতওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদীসগুলোই গ্রহণ করায় 'মুয়াত্তার' বিশুদ্ধতা বহুলাংশে সন্দেহাতীত হয়েছে। তাঁর হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'হাদীস সম্পর্কে ইমাম মালেক অপেক্ষা আর কারো ওপর আমার অধিক আস্থা নেই। তাঁর সংকলিত হাদীস পেলে তাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর।'

ইমাম মালেক ছিলেন একজন স্বনামধন্য আইনজীবী এবং মদীনার প্রধান বিচার-পতি। তাই ইমাম আবু হানীফার 'মসনদে ইমামে আজম'-এর মতই আইন ও বিচারবিভাগের প্রয়োজনোপযোগী হাদীসগুলোকেই তিনি তাঁর মুয়াত্তার মধ্যে সংকলন করেছিলেন। সেকালে পারস্য থেকে সিরিয়া, মিসর, স্পেন প্রভৃতি ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত দেশে দেশে মুয়াত্তার মানদণ্ডেই বিচারকার্য পরিচালিত হত। বিশ্বের ধর্ম ও শাসননীতির ইতিহাসে মুয়াত্তা বা সমতল পথ তাই চির অবিস্মরণীয়।

প্রখর আত্মবিশ্বাস এবং মোহমুক্ত নিষ্কাম জ্ঞানতপস্বী হিসেবে তিনি ইমামে আজম আবু হানীফা(রঃ)-রই সমতুল্য ছিলেন। তাঁর সমকালীন খলীফা প্রবল পরাক্রমশালী হারুন-অর-রশীদ (হি. ১৭০—১৯৪/খৃী. ৭৮৬—৮০৯) তাঁকে রাজধানী বাগদাদে গিয়ে তাঁর পুত্রকে শিক্ষাদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি তাঁকে বলেন, 'জ্ঞানের কাছে মানুষ আসে, মানুষের কাছে জ্ঞান যায় না।' তখন খলীফা হারুন তাঁর 'মুয়াত্তার' অনুলিপি প্রস্তুত করিয়ে (হজরত ওসমানের কোর-আনের অনুলিপির মত) দেশে দেশে তা প্রেরণ করার প্রলোভন দেখান। তবুও তিনি নবীর নগর মদীনা ত্যাগ করতে রাজী হলেন না। তখন কুটীরবাসী-দরিদ্র ইমামের গৃহনির্মাণের জন্য খলীফা হারুন তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন। ইমাম মালেক অত্যন্ত বিনয় সহকারে তাও প্রত্যাখ্যান করলেন। সোনার মদীনার জ্ঞানের সোনার কাছে সোনার হরিণের এ মায়া যে কত মিথ্যা ইমাম মালেক তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ!

এতবড় একজন জ্ঞানসাধক, বিধানশাস্ত্রবিদ্ (ফকীহ্) ও সত্যকার মুসলমান কিন্তু শেষ জীবনে সবসময় আল্লাহর ভয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছিলেন। একদিন তাঁর এক বন্ধু তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'আমার প্রতিটি বিধানের জন্য যদি আল্লাহ্ একবার করে কষাঘাত করতেন তাহলে আমার হিসাব দেওয়া সহজ হত।' নবী (সঃ)-এর এই একনিষ্ঠ ভক্ত নবীর নগর মদীনা-শরীফেই হি. ১৭৯ সালে পরলোক গমন করেন।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ)

হি. ১৫০—২০৪

খৃী. ৭৬৭—৮২০

বাগদাদের কারাগারে যে বছর (হি. ১৫০) ইমামে আজম আবু হানীফা (রঃ) পরলোক গমন করেছেন, ঠিক সেই বছর মহানবী মুহম্মদ (সঃ)-এর জন্মভূমি মক্কার

অন্তর্গত গোর্‌রাহ্‌ নামক স্থানে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) জন্মগ্রহণ করলেন। যেন এক সূর্যের অস্তরাগ মেঘে আর এক নতুন সূর্যের শুভ অভ্যুদয় সূচিত হল। ইমাম শাফেয়ীর পূর্ণ নাম আবু আব্দুল্লাহ্‌ মুহম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী।

শৈশব কালে তিনি এতই দরিদ্র ছিলেন যে শিক্ষকের বেতন দেবার এবং খাতাপত্র কেনার সামর্থ্য তাঁর ছিলনা। তাই মাদ্রাসার শিক্ষক বা মোদারেস্‌ও তাঁর প্রতি বিশেষ যত্ন নিতেন না। কিন্তু আল্লহ্‌তা'লা বালক শাফেয়ীকে এমন অসাধারণ মেধা এবং স্মরণশক্তির অধিকারী করেছিলেন যে শিক্ষক যখন অন্য ছাত্রদের পড়াতেন তখন সেই পাঠ অনুসরণ করে তিনি ঐসব ছাত্রদের চেয়ে অনেক ভালভাবে তা আয়ত্ত করে নিতেন। পরে শিক্ষক তাঁর অবহেলিত শিষ্যের এই অসাধারণ গুণের খবর পেয়ে তাঁরই ওপর অন্যান্য ছাত্রের পড়ানর দায়িত্ব অর্পণ করে' নিজে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করতে লাগলেন।

তিনি অতি অল্প বয়সেই কোরআন, হাদীস, ফেকাহ্‌ প্রভৃতি শাস্ত্রে সবিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং ইমাম মালেক্‌ (রঃ)-র বিশ্ববিখ্যাত হাদীস সংকলন 'মুয়াত্তা' সংগ্রহ করে তা সম্পূর্ণরূপে মুখস্থ করে ফেলেন। এখন থেকে ইমাম মালেক (রঃ)-র কাছে শিক্ষালাভ করার জন্য তাঁর জ্ঞানপিপাসু মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে তিনি মক্কার শাসনকর্তা (গভর্নরের) কাছ থেকে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে নিয়ে মদীনার শাসনকর্তার কাছে গিয়ে হাজির হন। তারপর তাঁর হয়ে সুপারিশ করার জন্যে তিনি মদীনার শাসনকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে ইমাম মালেক (রঃ)-র মাদ্রাসায় গিয়ে হাজির হন। কিন্তু অমন একজন শাসনকর্তার সুপারিশ সত্ত্বেও ইমাম মালেক (রঃ) শাফেয়ীকে প্রথম প্রথম কোন আমলই দিলেন না। শেষে বালক শাফেয়ীর কণ্ঠে তাঁর সুবৃহৎ 'মুয়াত্তার' আদ্যোপান্ত এবং অনবদ্য আবৃত্তি শুনে তিনি মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন। সেই থেকে তাঁর জীবনাবসান পর্যন্ত শাফেয়ী তাঁর প্রিয় শিষ্য, সহচর ও পরামর্শদাতা হিসেবে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। ইমাম মালেক (রঃ) তাঁর এই জ্ঞান-তাপস শিষ্যকে এতখানি নির্ভর করতেন যে তিনি জনসাধারণকে যেসব 'ফত্‌ওয়া' বা 'বিধান' দিতেন তাতে তিনি তাঁর পরিবর্তে শিষ্য শাফেয়ীর স্বাক্ষর নিতে বলতেন। শাফেয়ী স্বাক্ষর করতে অসম্মত হলে সেই বিধান জনগণকে অনুসরণ করতে তিনি নিষেধ করতেন।

এইভাবে মাত্র ১৪ বছর বয়সে অসাধারণ জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার অধিকারী হয়ে শাফেয়ী (রঃ) জন্মভূমি মক্কা নগরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কথিত আছে, তিনি মক্কায় প্রবেশ করে, কাবা শরীফের চত্বরে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয় ও আত্মবিশ্বাস সহকারে সকলকে ডেকে বলেন, 'আপনাদের যা কিছু জিজ্ঞাসার আছে তা সব আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।' একজন ১৪ বছরের কিশোরের জ্ঞানের এই গভীরতা ও বিস্তার বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তবে হাদীস সংকলনের ইতিহাসে তাঁর বিখ্যাত মসনদখানা চির-অবিস্মরণীয়। তিনি একজন আইন-বিশারদ ছিলেন। তাই আইনের ধারা অনুসারেই তিনি তাঁর সংকলিত হাদীসগুলোকে সজ্জিত করেন। বিচারক ও আইন ব্যবসায়ীদের কাছে তাঁর ঐ হাদীস-সংকলনখানার গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর হাদীস সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে D. B. Mcdonald সাহেব তাঁর Development of Muslim Theology and Jurisprudence নামক গ্রন্থে বলেন, 'হজরতের একটা সম্পূর্ণ সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীসকে তিনি কোরআনের আয়াতের

(বাক্যের) সমশক্তিসম্পন্ন বলে গণ্য করতেন। উভয়েই প্রত্যাদিষ্ট বাণী, কেবল সামান্য পৃথক আকারে প্রেরিত হয়েছে।'

হিজরী ২০৪ সালে ৫৪ বছর বয়সে এই মহান মনীষী মিসরে পরলোক গমন করেন।

মিশকাত শরীফের সংকলনকারী তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'ইমাম শাফেয়ীর জ্ঞানগরিমা অপরিসীম ছিল। পূর্ব অথবা পশ্চিমে পার্থিব এবং ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর মত অমন গভীর জ্ঞান আর কারো ছিলনা।' ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) বিখ্যাত মুহাদ্দেস এহিয়া বিন মইনকে শাফেয়ী সম্পর্কে বলেন, 'যে ব্যক্তি ফেকাহ্ শাস্ত্রে পণ্ডিত হতে চায় সে যেন শাফেয়ীর গাধার পুচ্ছের ঘ্রাণ গ্রহণ করে।'

ইমাম আহমদ বিন-হাম্বল (রঃ)

হি. ১৬৪-২৪১

খৃী. ৭৮০-৮৫৫

হাম্বলের পুত্র আহমদ বা ইমাম আহমদ-বিন-হাম্বল (রঃ) হিজরী ১৬৪ সালে প্রাসাদ নগরী বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদেই তাঁর হাদীস শিক্ষার হাতে-খড়ি। তারপর মক্কা, মদীনা, ইয়েমেন, সিরিয়া, কুফা, বসরা প্রভৃতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা-কেন্দ্রগুলোতে তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। হাদীস সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সর্বজন বিদিত হয়। হাদীসের প্রতি অসাধারণ প্রীতিবশতঃ তিনি একের পর এক অসংখ্য হাদীস কণ্ঠস্থ করেন। এ প্রসঙ্গে আবু জরায়া বলেন, 'আহমদ-বিন-হাম্বলের লক্ষাধিক হাদীস কণ্ঠস্থ ছিল।' তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফকিহ্ এবং মুহাদ্দেস ইব্রাহীম হারবী বলেন, 'আমি আহমদ-বিন-হাম্বলকে দেখেছি, খোদা যেন তাঁকে ভূত-ভবিষ্যতের সমস্ত জ্ঞান দান করেছেন। তিনি যত ইচ্ছা তত জ্ঞানের কথা বলে যেতে পারতেন।'

হাদীস শিক্ষালাভ করার পর তিনি অন্যান্য ইমামদের মতই হাদীস শিক্ষাদানে ব্রতী হন। তাঁর শিক্ষানিকেতনে অসংখ্য শিক্ষার্থীর আগমন ঘটতে থাকে। তাঁর যত্ন ও নিষ্ঠাপূর্ণ শিক্ষকতার ফলে পরবর্তীকালে তাঁর বহু শিষ্যই বিশ্ববিখ্যাত হন। এই সব বিশ্ববিখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), আল্লামা আবু দাউদ (রঃ) এবং তাঁর দুই পুত্র আব্দুল্লাহ্ ও সালেহ্ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর শিক্ষাদানের প্রধান বিষয়বস্তুই ছিল আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসূল এবং পরলোক। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য আল্লামা আবু দাউদ (রঃ) বলেন, 'আহমদ-বিন-হাম্বলের মজলিস পরলোকের মজলিস ছিল। ঐ মজলিসে পৃথিবীর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা হত না এবং আমি কখনো ঐ মজলিসে পার্থিব বিষয়ের আলোচনা হতে শুনিনি।'

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন, তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হাদীস শরীফের একটা সুবৃহৎ 'মসনদ' সংকলন। শিক্ষা গ্রহণ কালে এবং বিভিন্ন সময়ে তিনি স্বনামধন্য মুহাদ্দেসদের কাছ থেকে সাত লক্ষ পঞ্চাশটি হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। ঐ বিপুল

সংখ্যক হাদীস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করে তার থেকে মাত্র ত্রিশ হাজার হাদীস বেছে নিয়ে তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত মসনদ খানা সঙ্কলন করেন। তাঁর নিজের ভাষায়, 'সাত লক্ষ পঞ্চাশটি হাদীস থেকে চয়ন করে' আমি এ হাদীস রচনা করেছি।' পরবর্তীকালে তাঁর দুই সুযোগ্য পুত্র ওর সঙ্গে আরো দশ হাজার হাদীস সংযুক্ত করেন। ফলে ৪০ হাজার হাদীস-সম্বলিত ঐ সুবৃহৎ গ্রন্থ আধুনিক পৃথিবীতেও হাদীসের বৃহত্তম গ্রন্থ হিসেবে সম্মানিত। ঐ বিশালায়তন মসনদখানি ১৭২ টি খণ্ডে বিভক্ত এবং ওর হাদীসসমূহ বর্ণনাকারী সাহাবীদের নামানুসারে সুশৃঙ্খল ভাবে সজ্জিত।

৭৭ বছর বয়সে হিজরী ২৪১ অব্দে এই মহান ধর্ম ও হাদীসশাস্ত্রজ্ঞ মনীষী পরলোকগমন করেন। তাঁর শেষকৃত্য বা জানাজা অনুষ্ঠানে ৮ লক্ষ পুরুষ এবং ৬০ হাজার নারী উপস্থিত ছিলেন।

আশৈশব তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু, পুণ্যবান ও পবিত্রহৃদয় পুরুষ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'আমি যখন বাগদাদ ত্যাগ করি তখন ইমাম আহমদ অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়পরায়ণ, ধর্মপরায়ণ, সংযমী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি আর দেখিনি।'

আব্দুর রহমান দারমী (রঃ)

হি. ১৮১-২৫৫

খৃী. ৭৯৫-৮৭৯

আল্লামা দারমী (রঃ)-র পূর্ণ নাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ-বিন-দারমী। তিনি হিজরী ১৮১ অব্দে বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত সমরকন্দে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শৈশবেই তিনি দেশে দেশে গমন করেন। আবু জরায়া রাজী, মুহম্মদ-বিন-ইসমাইল বুখারী এবং হাসান-বিন শাজায়ী বলখীর মতই তিনি সেকালে হাদীসের একজন হাফেজ (অর্থাৎ কণ্ঠস্থকারী) হিসেবে সুবিখ্যাত হয়েছিলেন।

হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে তিনি একজন অতি সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। আল্লামা আবুদাউদ, তিরমিজী এবং মুসলিমের মত কালজয়ী হাদীস শাস্ত্রবিশারদগণ তাঁর শিষ্য ছিলেন। শিক্ষক হিসেবে দারমীর যোগ্যতা এবং মহাজ্ঞানী মুহাদ্দেস হিসেবে তাঁর খ্যাতিই যে ঐ সব স্বনামধন্য শিষ্যদের তাঁর সান্নিধ্যে আকর্ষণ করেছিল তা অনায়াসে বোঝা যায়। হাদীস শাস্ত্রের সত্যকার জ্ঞানই ছিল তাঁর চরিত্রের যথার্থ চৌম্বক।

বহু সহীহ্ বা বিশুদ্ধ হাদীস সহ আল্লামা দারমী (রঃ) তাঁর সুবিখ্যাত মসনদখানি রচনা করেন। ঐ মসনদে তিনি মোট ৩৫৫৭টি হাদীস সঙ্কলন করেন।

হিজরী ২৫৫ সালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত হয়ে হাদীস-সম্রাট ইমাম বুখারী (রঃ) মাথা নত করে কাঁদতে থাকেন। হাদীস-

সম্রাটের এই শোকের আলোকে হাদীসের ইতিহাসে দারমীর সুউচ্চ আসনখানা যেন অকস্মাৎ বিদ্যুচ্চমকের মত আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়।

ইমাম বুখারী (রঃ)

হি. ১৯৪-২৫৬
খ্রী. ৮১০-৮৭২

ইমাম বুখারী (রঃ) নিখিল বিশ্বে হাদীসশাস্ত্রের সম্রাট হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর আসল নাম মুহম্মদ। ডাকনাম আবু আব্দুল্লাহ্। পিতার নাম ইসমাইল। পিতামহের নাম ইব্রাহীম। প্রপিতামহের নাম মুগীরা। সব মিলিয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ-বিন-ইসমাইল-বিন-মুগীরা। ইমাম মালেক (রঃ)-এর মৃত্যুর পনেরো বছর পরে হিজরী ১৯৪ সালের ১৩ই শওয়াল শুক্রবার জুমআ'র নামাজ অন্তে বুখারা নামক শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বুখারার সন্তান বলেই তিনি বুখারী নামে সমধিক পরিচিত।

খোরাসানের অন্তর্গত এই বুখারা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী সুপ্রাচীন নগরী। এক-সময় এই নগরী সাসানীয়া রাজাদের রাজধানী ছিল। পরে মুসলিম শাসনকালে বুখারা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। বর্তমানে শহরটি সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত উজবেকিস্তানে অবস্থিত।

সুদূর অতীতে ইমাম বুখারী (রঃ)-র প্রপিতামহ মুগীরা পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। ইয়ামান জা'ফী যখন বুখারার শাসনকর্তা ছিলেন তখন তিনি পারস্য ত্যাগ করে বুখারায় আসেন এবং জা'ফীর কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। নবদীক্ষিত এই মুসলমান পরিবারটি অল্পকাল মধ্যে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মর্যাদা ও কৃতিত্বের অধিকারী হয়। ইমাম বুখারীর পিতা ইসমাইল হাদীস ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি ইমাম মালেক, হাম্মাদ এবং ইবনুল মুবারক প্রমুখ স্বনামধন্য মুহাদ্দেসদের কাছে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর 'তারীখ-ই-কবীর' গ্রন্থে তাঁর পিতার জ্ঞান গরিমা ও অন্যান্য মনীষার কথা সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন।

কথায় বলে, 'বাপকা ব্যাটা।' যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র হিসেবেই বুখারী (রঃ) হাদীস শাস্ত্রের প্রতি সুগভীর প্রীতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র অপার মহিমা বোঝার সাধ্য মানুষের নেই। হাদীস শিক্ষার সূত্রপাত হতে না হতেই অতি বাল্যকালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়; শুধু তাই নয়, তিনি অন্ধ হয়ে যান। পিতৃহারা পুত্রের এই অকাল-অন্ধত্ব মোচনের জন্যে তাঁর মাতা দিনরাত আল্লাহ্‌তা'লা'র কাছে কাঁদতে থাকেন। আল্লাহ্ তাঁর কান্না কবুল করেন। এক আলোঝলমল প্রভাতে বুখারী সত্যসত্যই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান।

স্বদেশে প্রাথমিক শিক্ষা : যাই হোক মায়ের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে বালক বুখারীর শিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। মাত্র ৯ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরে হাদীস-শিক্ষার প্রবল বাসনা জাগ্রত হল। বুখারী (রঃ)-র নিজের ভাষায়, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

অধ্যয়নকালে আমি হাদীস কণ্ঠস্থ করার প্রেরণা পাই।' যাই হোক দশ বছর বয়সে বুখারী (রঃ) হাদীস শিক্ষার সাধারণ পাঠ্যক্রম শেষ করে ১১ বছর বয়সেই বুখারার বিখ্যাত মুহাদ্দেস দাখেলীর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন। সেখানে তিনি হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অনন্যসাধারণ অধিকারের পরিচয় দেন। একদিন শিক্ষাদান-কালে দাখেলী একটা হাদীসের সনদ বর্ণনায় ভুল করলেন। বললেন, 'সুফিয়ান আবু জুবায়ের হতে, জুবায়ের ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন।' বালক বুখারী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'হুজুর, আবু জুবায়ের ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেন নি।' এতে দাখেলী প্রথমে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। তারপর আপন পাঠকক্ষে গিয়ে হাদীসের ঐ লিপিখানা দেখে যখন বুঝলেন যে বালক বুখারীই ঠিক বলেছেন, তখন আনন্দিত হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। দাখেলী ছাড়া বুখারার আরো যেসব খ্যাতিমান মুহাদ্দেসবৃন্দের কাছে বুখারী (রঃ) শিক্ষালাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আল্লামা মুহম্মদ ইবনে সালাম বয়কন্দী, ইউসুফ বয়কন্দী এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহম্মদ খুসনদী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুহম্মদ বয়কন্দীর কাছে অধ্যয়নকালে ৭০ হাজার হাদীস তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। একদিন বয়কন্দী তাঁর শিষ্য বুখারীকে বললেন, 'বৎস, আমার গ্রন্থসমূহে কোন ভুল দেখতে পেলে তুমি অসংকোচে তা সংশোধন করে দিও।' এতে বিস্মিত হয়ে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুজুর, ছোকরাটি কে?' বয়কন্দী বললেন, 'ইনি এমন এক ব্যক্তি যাঁর কোন সমকক্ষ নেই।' এইভাবে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত মাতৃভূমি বুখারাতেই অপরিসীম খ্যাতি এবং সম্মানের মধ্যে বুখারী (রঃ) শিক্ষালাভ কার্য সম্পন্ন করলেন।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা ঃ এরপর শুরু হল বিদেশে শিক্ষালাভের পালা। ষোল বছর বয়সে জ্ঞানের খনি বুখারী (রঃ) পুণ্যবতী মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে পবিত্র তীর্থ মক্কায় হজ্জ্ করতে গেলেন (হি. ২১০)। কিন্তু নবী (সঃ)-এর শৈশবের শত সহস্র স্মৃতি-মাধুরী মাখানো মক্কা নগরী তাঁকে আর সেখান থেকে ঘরে ফিরে যেতে দিল না। মাতা ও ভ্রাতাকে স্বদেশে পাঠিয়ে দিয়ে বুখারী (রঃ) সেখানেই রয়ে গেলেন। সেখানে তিনি সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীস-শাস্ত্রবিদ্ ইমাম আব্দুল ওয়ালিদ, আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবায়ের, আল্লামা হোমায়দী প্রমুখ আলেমদের কাছে হাদীস অধ্যয়ন করলেন। দু'বছর পরে মদীনায় গিয়ে (হি. ২১২) তিনি ইব্রাহীম ইবনে আল মনজর, আব্দুল আজীজ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ওয়াইসি প্রমুখ মুহাদ্দেসদের কাছে হাদীস অধ্যয়ন করলেন। মক্কা, মদীনা, তায়েফ ও জেদ্দা শহরে হাদীস অধ্যয়নের জন্য তিনি একাধিক সফরে ৬ বছর অতিবাহিত করলেন। হেজাজ, ইরাক, খোরাসান, মিসর, বসরা, বল্খ, মার্ভ, রাই, হিরাট প্রভৃতি নানান দেশে হাদীস শিক্ষার পিপাসা নিবারণের জন্য তিনি বছরের পর বছর অতিবাহিত করলেন। বাগদাদে গিয়ে তিনি ইমাম হাম্বল (রঃ)-র কাছে হাদীস শিক্ষা লাভ করলেন। এইভাবে দেশে দেশে হাদীস শিক্ষা লাভ করার সময় তিনি অমানুষিক কষ্ট সহ্য করলেন। ঘোড়ার অভাবে পায়ে হেঁটে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পায়ে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করলেন। কখনো তরকারিবিহীন সামান্য এক টুকরো রুটি খেয়ে, কখনো সারাদিনে তিনটি মাত্র বাদাম খেয়ে, আবার কখনো তাও না পেয়ে কেবল লতাপাতা চিবিয়ে খেয়ে পরম সন্তুষ্টচিত্তে ও একনিষ্ঠ মনোযোগ সহকারে হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন।[২]

---

২ ইমাম বাহ্রেী কৃত—'হায়াতে ইমাম বুখারী।'

হাদীস সংকলনের ইতিহাসে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'জামেয়েস সহীহ্' বা 'সহীহ্ বুখারী'। মাত্র ১৮ বছর বয়সে পবিত্র মক্কা নগরীর মসজিদে হেরেমে বয়তুল্লাহ্ শরীফে বসে তিনি এর সংকলনকার্য শুরু করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ অকল্পনীয় নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের পর মদীনার মসজিদে নববীতে বসে এর সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন (খৃী. ৮৪৪)। তাঁর নিজের কথায়, 'আমি মসজিদে হেরেমে বয়তুল্লাহ্ শরীফে বসে এটা সংকলন করেছি, দুরাকাত নামাজ পড়ার পর প্রতিটি হাদীস নিয়ে বিশ্লেষণ করেছি, যখন সকল দিক দিয়ে ঐ হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছি তখনই ঐ হাদীস 'জামেয়েস সহীর' অন্তর্ভুক্ত করেছি। এ গ্রন্থ সংকলনকালে ৬ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে কেবল মাত্র বিশুদ্ধতম হাদীসগুলোই লিপিবদ্ধ করেছি।'[৩] তিনি আরো বলেছেন, 'স্নান করে নামাজ আদায় না করে আমি কোন হাদীস জামেয়েস সহীর অন্তর্ভুক্ত করি নি।' এতে মোট ৭২৭৫টি হাদীস আছে, তার মধ্যে ৩২৭৫টি তকরীরী (সমর্থনমূলক)। এই জামেয়েস সহীহ্ বা সহীহ্ বুখারীর প্রধান বৈশিষ্ট্য—বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসারে বিষয়-ভিত্তিক অধ্যায়-বিভাগ। প্রতি অধ্যায়ের শুরুতে উল্লিখিত হাদীসসমূহের আইনগত প্রয়োগ সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। ফলে ধর্মশাস্ত্রের মত আইনশাস্ত্রে আগ্রহী পাঠকদের কাছেও এর আদর-কদর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া হাদীসের যে একটা সাহিত্যমূল্য আছে, নবী (সঃ) বাণী যে ভোরের আজানের মত মুসলমানের অন্তরে অন্তরে আনন্দ-শিহরণ সৃষ্টি করে অথবা ভোরের কাকলির মত মানুষকে তা নতুন উষার স্বর্ণদ্বারের সন্ধান দেয়—বুখারীর হাদীস-সন্নিবেশের নিপুণতা সে সত্যটি অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতে আমাদের সহায়তা করে। অবশ্য একই হাদীসের পুনরুল্লেখ এবং 'মূল শব্দের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জন' বুখারী শরীফকে ত্রুটি রাহুর কবল থেকে পূর্ণ মুক্তির সুযোগ দেয়নি।

তবু বিশ্বমুসলিমের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাঠ্যক্রমে এই জামেয়েস সহীহ্ বা সহীহ্ বুখারীর স্থান পবিত্র কোরআন শরীফের ঠিক পরই। পণ্ডিতেরা একে 'আফজালুল কিতাব' বা 'সম্মানিত গ্রন্থ' আখ্যায় বিভূষিত করেন এবং এর সংকলন-কারী বুখারী (রঃ)-কে 'ইমামুল মুহাদ্দেসীন' বা 'হাদীস সম্রাট' উপাধিতে সম্মানিত করেন। স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এ গ্রন্থকে তাঁর 'নিজের গ্রন্থ' বলে আবুজাদ মারজযীকে স্বপ্নযোগে জানিয়েছিলেন বলে মারজয়ী উল্লেখ করেছেন।

সহীহ্ বুখারী ছাড়া 'আত্তারীখুল কবীর' 'তারীখুস সগীর' প্রভৃতি আরো বহু গ্রন্থ বুখারী (রঃ) রচনা করেন।

হাদীস সংকলনের পর হাদীস শিক্ষাদান কর্মই বুখারী (রঃ)-এর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম ছিল। বুখারায় যখন তিনি শিক্ষাদান কর্মে মগ্ন ছিলেন তখন তাঁর খ্যাতি দিকে দিকে বিস্তারিত হয় এবং অসংখ্য শিক্ষার্থীর সমাগমে তাঁর মাদ্রাসা মুখরিত হয়ে ওঠে। ৯০ হাজার শিক্ষার্থী তাঁর কাছে কেবল 'জামেয়েস সহীহ্' অধ্যয়ন করে-ছিলেন।[৪] কিন্তু অবিলম্বে এই খ্যাতিই তাঁর দুর্গতির কারণে পরিণত হয়। বুখারার তৎকালীন শাসনকর্তা খালিদ ইবনে আহমদ জহলী তাঁর খ্যাতির কথা শুনে তাঁকে তাঁর প্রাসাদে গিয়ে তাঁর পুত্রদের পড়ানোর দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য বলেন।

৩ মোল্লা আলী কারী কৃত 'মিরকাত' ১ম খণ্ড।

৪ মুহাদ্দিম প্রসঙ্গ—অধ্যাপক মুজীবর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, 'তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিরাই কূপের কাছে আসে, কূপ কখনো তৃষ্ণার্তদের বাড়ী বাড়ী যায়না।' অতএব তিনি তাঁর পুত্রদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের জন্যে তাঁর প্রাসাদে যেতে পারবেন না অথবা তাঁর মাদ্রাসায় ঐ শাসকপুত্রদের পড়ানোর জন্যে স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা করে ইসলামের মূল আদর্শের অসম্মান করতে পারবেন না।

এতে শাসনকর্তা খালিদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং ছলে বলে ও কৌশলে বুখারী (রঃ)-কে শায়েস্তা করার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি প্রথমে তাঁর কৃপাপুষ্ট দুর্জন ব্যক্তিদের সাহায্যে প্রচার করতে লাগলেন যে—বুখারী পবিত্র কোরআন শরীফকে আল্লাহতা'লার বাণী বলে স্বীকার করেন না, তিনি একে 'মাখলুক' বা বানানো বলে' মনে করেন। ধর্মান্ধ মুসলমানেরা এই অপপ্রচারের সত্যমিথ্যা যাচাই না করেই বুখারী (রঃ)-র শাস্তি দাবী করতে লাগল। সুযোগ বুঝে শাসনকর্তা খালিদ তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণের বিন্দুমাত্র অবকাশ না দিয়েই তাঁকে বুখারা থেকে নির্বাসিত করলেন।

বুখারী (রঃ) আল্লাহ্‌ত'লাকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর স্বপ্ন ও স্মৃতি দিয়ে ঘেরা জন্মভূমি বুখারা ত্যাগ করে নিশাপুরে গিয়ে হাজির হলেন (হি. ২৫০)। নিশাপুরের অধিবাসীরা সোৎসাহে তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা জানালেন। নিশাপুরবাসীদের আন্তরিক আপ্যায়নে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাঁদের অনুরোধে তিনি সেখানেই মাদ্রাসা খুললেন। পরবর্তীকালের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি সেখানে তাঁর মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হলেন। তাঁর মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা দিনে দিনে যেমন জোয়ারের পানির মত বৃদ্ধি পেতে লাগল তেমনি নিশাপুরের অন্যান্য মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা ভাটার পানির মত হ্রাস পেতে শুরু করল। নিশাপুরের বিখ্যাত মুহাদ্দেস এবং ইমাম মুসলিমের অন্যতম শিক্ষক হাফিজ যুহলীর মাদ্রাসা এই সময় ছাত্রাভাবে উঠে যাবার জোগাড় হল। ফলে যুহলী শাসনকর্তা খালিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে সেই কোরআন সংক্রান্ত অপপ্রচারে কোমরবেঁধে নামলেন। তা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়ে ইমাম মুসলিম গুরু যুহলীর সংস্রব পরিত্যাগ করলেন এবং বুখারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। বুখারী (রঃ) নিশাপুর ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

নিশাপুর ত্যাগ করে বুখারী (রঃ) বয়কন্দে গিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু এখানেও ষড়যন্ত্রকারীদের মিথ্যা প্রচারের বিষ তাঁকে পেছনে পেছনে অনুসরণ করল। তিনি সমরকন্দে গেলেন। কিন্তু সেখানেও সুবিধা হলনা। তিনি সমরকন্দ শহর পরিত্যাগ করে সমরকন্দের অন্তর্গত খাজতনুক নামক এক নিরালা গ্রামে গিয়ে তাঁর আত্মীয় গালিবের গৃহে আশ্রয় নিলেন। পরে অনুতপ্ত সমরকন্দবাসীদের অনুরোধে যখন তিনি আবার তাঁর দুর্বল দেহ নিয়ে দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে পুনরায় সমরকন্দ শহরে ফিরে যাবার জন্যে অগ্রসর হলেন তখন তাঁর অক্ষম দেহ অকস্মাৎ বিকল হবার উপক্রম হল। তিনি তাঁর সাহায্যকারী সঙ্গীদের বললেন, 'তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, আমি অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ করছি।' তখন তাঁকে সেখানে বসানো হল। তিনি আল্লাহর নাম করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে দরদর ধারায় ঘাম বেরুতে লাগল। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। হি. ২৫৬ সালের ১লা শওয়াল ঈদুলফিৎর-এর পবিত্র রাতে তাঁর পবিত্র আত্মা পৃথিবী পরিত্যাগ করল। ঈদুলফিৎর-এর নামাজের পর খাজতনুক গ্রামের নিভৃত মাটির তলায় তিনি চিরবিশ্রাম লাভ করলেন। শওয়াল মাসের এক শুক্রবারে জুমআ'র নামাজের পর যে জীবনের

সূত্রপাত হয়েছিল, আর এক শওয়ালের শুরুতে ঈদুলফিৎর-এর নামাজের পর তার শেষ সমাধি রচিত হল।

চরিত্র : বুখারী (রঃ) ছিলেন নবী (সঃ)-এর নিতান্ত নিষ্ঠাবান এবং 'পদে পদে অনুসরণকারী' এক অসামান্য ভক্ত ও স্বনামধন্য হাদীস-শাস্ত্রবিশারদ। নাজম বিন ফাদল্ বলেন, 'আমি স্বপ্নে নবী (সঃ)-এর পেছনে পেছনে বুখারীকে দেখতে পেলাম। যেখানে হজরত পা ফেলছেন সেখানে বুখারীও পা ফেলছেন—ঠিক যেন পদে পদে অনুসরণ করছেন।'

তিনি ছিলেন এক অতুলনীয় কোরআন-প্রেমিক। তিনি তাঁর প্রাত্যহিক নামাজের প্রতি রাকাতে পবিত্র কোরআনশরীফের ২০টি করে আয়াত (বাক্য) আবৃত্তি করতেন এবং এইভাবে তিনদিনে সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ একবার আগাগোড়া পাঠ করতেন। প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ নামাজে তিনি পবিত্র কোরআনের অর্ধাংশ অথবা দুই-তৃতীয়াংশ পাঠ করতেন। রমজান মাসে প্রতিদিন সন্ধ্যায় রোজা (উপবাস) ভঙ্গ করার পূর্বেই তিনি একবার করে' সুবিশাল কোরআন শরীফ সম্পূর্ণরূপে পাঠ করতেন।

পরনিন্দা মানুষের সমাজ ও সভ্যতাকে ভয়ঙ্করভাবে সংকটসঙ্কুল করে তোলে। তাই পরনিন্দাকে প্রবল শক্তিতে তিনি পরিহার করতেন। বলতেন, 'যেদিন থেকে আমি পরনিন্দাকে হারাম (নিষিদ্ধ) বলে জেনেছি, সেদিন থেকেই কাউকে আর কোনদিন আমি নিন্দা করিনি।'

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে তিনি সত্যসত্যই তাঁর ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করতেন। একবার এক মুসল্লি মসজিদে নামাজ পড়তে এসে তাঁর দাড়িতে জড়িয়ে-থাকা এক-টুকরো সুতো মসজিদের ঝকঝকে মেঝেয় ফেলে দিলেন। সেই সুন্দর মেঝেকে মালিন্যমুক্ত করার জন্যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সবার অলক্ষ্যে সেটা তুলে নিয়ে নিজের পকেটে পুরলেন।

তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু ধনের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিলনা। একবার এক সমুদ্র যাত্রায় তাঁর সঙ্গে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ছিল। এক দুর্জন সহযাত্রী কথায় কথায় সে কথা জেনে নিয়ে, তাঁর সহস্র স্বর্ণমুদ্রা চুরি গিয়েছে বলে কান্না শুরু করে দিল। তখন সকলের বাক্স প্যাঁটরা তল্লাসী করার ব্যবস্থা করা হল। বুখারী তাঁর সুনামকে নিষ্কলুষ করার উদ্দেশ্যে সবার অলক্ষ্যে তাঁর নিজের সেই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা অবলীলায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। তল্লাসী শেষে সেই শয়তান সহযাত্রী তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার সেই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা কি হল?' বুখারী (রঃ) বললেন, 'সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছি।' আপন বিশ্বাসযোগ্যতাকে নিষ্কলুষ করার জন্যে যিনি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারেন তাঁর সঙ্কলিত হাদীস-মণিমুক্তার বিশ্বাস-যোগ্যতা তো প্রশ্নাতীত হবেই। মহাপণ্ডিত রাজা-বিন-মুরজা বলেন, 'নারীদের ওপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব যেরকম, অন্যান্য জ্ঞানীদের ওপর বুখারীর শ্রেষ্ঠত্বও সেই রকম।'

নিখিল বিশ্বে বুখারী (রঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীস শাস্ত্রবিদ্ বা 'হাদীস সম্রাট।' ইমাম মুহম্মদ ইসহাক বিন খুজারমা বলেন, 'নীল আকাশের নীচে হাদীসে-রসূলের শ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম বুখারী অপেক্ষা আর কেউ নেই।' বিখ্যাত মুহাদ্দেস ইবনে হাজার আসকালানী (মৃত্যু—হি. ৮৫২) বলেন, ইমাম বুখারীর প্রশংসা-দীপ্ত

পরবর্তীদের মন্তব্য সমূহের উদ্ধৃত করতে গেলে কাগজ ফুরিয়ে যাবে, আয়ু নিঃশেষিত হবে—এ যেন এক অতলান্ত সমুদ্র বিশেষ।'[৫]

ইমাম মুসলিম (রঃ)

হি. ২০৪-২৬১

খৃী. ৮১৭-৮৭৫

ইমাম মুসলিম (রঃ) খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম আবুল হোসায়েন। লকব নাম আসকারুদ্দীন। নাম মুসলিম। পিতার নাম হাজ্জাজ। পিতামহের নাম মুসলিম। সব মিলিয়ে তাঁর পূর্ণ নাম—আবুল হোসায়েন আসকারুদ্দীন মুসলিম-বিন-হেজাজ-বিন-মুসলিম।

নিশাপুরের আদর্শ মাদ্রাসায় মুহাদ্দেস যুহলীর কাছে তাঁর হাদীস শিক্ষার হাতে খড়ি। কিন্তু বুখারী (রঃ)-র বিরুদ্ধে যুহলীর অন্ধ বিদ্বেষকে সমর্থন করতে না পারার জন্যে তাঁকে ঐ মাদ্রাসা পরিত্যাগ করতে হয়। তিনি ছিলেন মুহাদ্দেস বুখারীর পরম অনুরাগী। মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কৃত বুখারী নিশাপুরে আসলে তাঁর সংবর্ধনা-মিছিলে তিনি যোগদান করেন। ক্রমে তিনি ইমাম বুখারীর একজন বিশিষ্ট ভক্তশিষ্যে পরিণত হন। ভক্তির প্রাবল্যে তিনি গুরু বুখারীর কপোল চুম্বন করে গদগদ কণ্ঠে বলতেন, 'ওগো বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হাদীস-সম্রাট, দয়া করে আমাকে আপনার পদ-চুম্বনের অনুমতি দিন।'[৬] বুখারী ব্যতীত তিনি এহিয়া বিন এহিয়া, এসহাক বিন রাহ্‌ওইয়া এবং ইমাম আহমদ-বিন-হাম্বলের মত তৎকালের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তাদের কাছে হাদীস অধ্যয়ন করেন। এই উপলক্ষ্যে শৈশব থেকেই তিনি ইরাক, হেজাজ, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্রগুলো পরিভ্রমণ করেন।

ইমাম মুসলিমের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'সহীহ্ মুসলিম' নামক হাদীস-সঙ্কলন। সংগৃহীত তিন লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে নিপুণভাবে বিচার ও বাছাই করে মাত্র বারো হাজার হাদীস তিনি এই সঙ্কলনে গ্রন্থবদ্ধ করেন। এই বারো হাজারের মধ্যে থেকে আবার তকরারী বা সমর্থনমূলক হাদীসগুলো বাদ দিলে সহীহ্ বুখারীর মত এরও হাদীস-সংখ্যা চার হাজারই হয়। সহীহ্ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিম—বিশ্ব-মুসলিমের শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়-বেদীতে 'দুই বিশুদ্ধ হাদীস' বা 'সহীহায়েন' নামে যুগ যুগ ধরে আদৃত ও সম্মানিত হয়ে আসছে।

তবু কতকগুলো বিষয়ে বুখারী শরীফ অপেক্ষা মুসলিম শরীফের উৎকৃষ্টতা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বীকার করেন। প্রথমত, সিরিয়ার যে সব রাবী বা বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে বুখারী (রঃ) হাদীস সংগ্রহ করেছেন তাঁদের একই ব্যক্তিকে কখনও তিনি

---

[৫] মুকাদ্দামাই ফাত্‌হুল বারী।

[৬] মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ—অধ্যাপক মুজীবর রহমান।

তাঁর নাম দ্বারা আবার কখনো বা তাঁর বংশ পরিচয় দ্বারা পরিচিত করেছেন। ফলে একজন রাবীকে একাধিক পৃথক রাবী বলে ভুল ধারণা করার কারণ ঘটেছে। পক্ষান্তরে মুসলিম শরীফে এমন নজীর নেই। দ্বিতীয়তঃ, বুখারী (রঃ) বহু ক্ষেত্রেই মূল হাদীসের বহু শব্দের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জন দ্বারা ঐ হাদীসকেক্ষ হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ করেছেন; অথচ ইমাম মুসলিম অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলের ভাষাকেই যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। তৃতীয়ত, সহীহ্ মুসলিমের প্রতিটি হাদীস দুজন তাবেয়ীর[৭] কাছ থেকে গৃহীত হয়েছে এবং সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—বুখারী শরীফের প্রতিটি হাদীসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম যথাযথ নয়। এইসব কারণে হাফেজ আবু আলী নিশাপুরী বলেন, 'আকাশের নীচে সহীহ্ মুসলিম অপেক্ষা বিশুদ্ধতর কোন হাদীস নেই।'

তবু বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ—এই উভয় হাদীস সংকলনই হাদীস-জগতের দুই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। দাঁড়ি-পাল্লার ওজনে উভয়েরই গুরুত্ব আজকের মুসলিম জগতে প্রায় তুল্য মূল্য। একটা বিষয়ে একের ওজন একটু কম হলে অন্য বিষয়ে সে ঘাটতি আবার তিনি পূরণ করেছেন। বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ—এজাতীয় বাক্-যুদ্ধ তাই নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত। হাফেজ আব্দুর রহমান বিন আলী আর রাবী ইয়েমেনী শাফেয়ী বলেন, 'একদল লোক আমার সামনে এসে বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে ঝগড়া শুরু করল, আর বলল—উভয়ের মধ্যে কোনটা প্রধান?' আমি বললাম, 'বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে যেমন বুখারী শরীফ প্রধান, তেমনি অভিনব পরিবেশনা ও বিন্যাস-কৌশলের দিক দিয়ে সহীহ্ মুসলিম অতুলনীয়।'[৮]

হি. ২৬১ অব্দে ইমাম মুসলিম (রঃ) পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যু প্রসঙ্গে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তার বর্ণে বর্ণে তাঁর অসাধারণ অধ্যয়ন-তন্ময়তার উদাহরণ দেদীপ্যমান। একবার কোন এক জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তি তাঁকে হাদীস সম্পর্কে একটা জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের জন্য তিনি তাঁর পাঠকক্ষে প্রবেশ করেন। সেখানে তাঁর পরিবারের জন্য উপহার-হিসেবে-পাওয়া একঝুড়ি খেজুর রক্ষিত ছিল। তন্ময় ভাবে তিনি একের পর এক গ্রন্থ মন্থন করতে থাকেন আর অন্যমনস্কভাবে একটার পর একটা খেজুর ঝুড়ি থেকে তুলে খেতে থাকেন। এইভাবে এক সময় ঝুড়ির সমস্ত খেজুর তাঁর উদরস্থ হয়। ফলে তাঁর পরিপাক যন্ত্র গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয় এবং তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর আত্মবিস্মৃত একাগ্র জ্ঞান সাধনার কাহিনী তাঁর পরলোক গমনকে চির-স্মরণীয় করেছে।

---

[৭] নবী সহচরদের সাহাবী বলে আর ঐ সহচরদের দর্শনধন্য ব্যক্তিকে তাবেয়ী বলে।

[৮] বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন—শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবী।

আল্লামা আবু দাউদ (রঃ)

হি. ২০২-২৭৫
খ্রী. ৮১৭-৮৮৯

আল্লামা আবু দাউদ (রঃ)-র পূর্ণ নাম আবু দাউদ সোলায়মান বিন আশয়াস সাজস্তানি। তিনি বেলুচিস্তানের অন্তর্গত 'সিজস্তান' নামক গ্রামে ২০২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য মুহাদ্দেসদের মত তাঁর জন্মস্থান বাচক নাম 'সাজস্তানির' দ্বারা পরিচিত না হয়ে তিনি তাঁর আসল নাম আবু দাউদ দ্বারাই পরিচিত হন।

তিনি হাদীস ও ফেকাহ্ শাস্ত্রে জ্ঞান আহরণের জন্য আকৈশোর দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। আরব, ইরাক, সিরিয়া, মিসর, গ্রীস প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বিশ্ব-বিখ্যাত মুসলিম শিক্ষানিকেতনগুলো থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মুসলিম কুম্বী প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞান-সাধকগণ তাঁর সুদীর্ঘ শিক্ষক-তালিকার অন্তর্গত ছিলেন।

তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'সুনানে আবু দাউদ' নামক হাদীস সংকলন। বিশুদ্ধতা এবং বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে এ হাদীস 'সিহাসেত্তা' বা 'ছয় বিশুদ্ধ হাদীসের' অন্তর্গত। এতে তিনি তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশ হাদীস সংকলন করেছেন। সহীহ্ (বিশুদ্ধ), সহীর অনুরূপ এবং সহীর নিকটবর্তী—এই তিন শ্রেণীর হাদীসকে তিনি এতে স্থান দিয়েছেন। হাদীস গ্রন্থটি সম্পর্কে খাত্তাবী বলেন, 'আবু দাউদের সুনানের মত সুন্দর কোন গ্রন্থ আগে আর লেখা হয়নি।' গ্রন্থটি যে কি পরিমাণ সরল সহজবোধ্য সে প্রসঙ্গে সেকালের একজন মুহাদ্দেস বলেন, 'হজরত দাউদ (আঃ) যেমন লোহাকে নরম করেছেন, আবু দাউদও সেই রকম হাদীসকে নরম (অর্থাৎ সহজ) করেছেন।' আহমদ বিন মুহম্মদ বরদি বলেন, 'ইসলাম জগতে আবু দাউদ রসুলুল্লাহ্‌র হাদীসের হাফেজ এবং মুহাদ্দেসদের সম্রাট ছিলেন।'

হি. ২৭৫ সালে ৭৩ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি অন্যের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহের জন্য সব সময় তাঁর একটা হাত বাড়িয়ে রাখতেন, কিন্তু কারো কাছ থেকে হাত পেতে পার্থিব কিছু নেবেন না বলে আর একটা হাত সব সময় গুটিয়ে রাখতেন। তাঁর মত স্বাবলম্বী, আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন ধর্মপ্রাণ মুহাদ্দেস সর্বকালের সর্বমানবের ঐশ্বর্য স্বরূপ।

আল্লামা তিরমিজী (রঃ)

হি. ২০৯-২৮৯
খ্রী. ৮১৫-৮৯২

আল্লামা তিরমিজীর পূর্ণ নাম আবু ঈসা মুহম্মদ বিন ঈসা মুহম্মদ তিরমিজী। তিনি হি. ২০৯ অব্দে জয়হুন নদীর তীরে অবস্থিত তিরমিজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মনগরের নামানুসারেই তিনি তিরমিজী নামে বিখ্যাত হন।

হাদীস শিক্ষার্থী হিসেবে তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। এক সময় তিনি ৪০ টি নতুন হাদীস একবার মাত্র পাঠ করে সঙ্গে সঙ্গে তা মুখস্থ আবৃত্তি করেন। তাঁর শিক্ষাদাতৃগণের মধ্যে ইমাম বুখারীর নাম সবিশেষ স্মরণীয়।

তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'জামেয়ে তিরমিজী' নামক হাদীস সংকলন। হাদীস সংকলনটি 'সিহাহ্ সেত্তা'-র অন্যতম। এতে সংকলিত হাদীস সমূহের শেষে প্রতিটি হাদীস সহীহ্ (বিশুদ্ধ), না হাসান (উত্তম), না গরীব তা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে তকরীরী হাদীসের সংখ্যা অতি সামান্য।

ফেকাহ্ তত্ত্ব বা বিধান শাস্ত্রে তাঁর মত জ্ঞানী গুণী মুহাদ্দেস ও হাফেজ সেকালে অতি অল্পই ছিল। তিনি এমনই ধর্মভীরু পরহেজগার মুসলমান ছিলেন যে শেষ জীবনে আল্লাহ্‌তা'লার ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যান এবং সেই অবস্থাতেই জন্মভূমি তিরমিজ নগরেই পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। হি. ২৮৯ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

আহমদ-বিন-শোয়ায়েব নাসায়ী (রঃ)

হি. ২১০-৩০৩

খৃী. ৮৩০-৯১৪

নাসায়ীর পূর্ণ নাম আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন শোয়ায়েব নাসায়ী। তিনি হি. ২১০ সালে বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত খোরাসান প্রদেশের মার্ভ নগরের নিকটবর্তী নাসা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

জন্মভূমি নাসা গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৫ বছর বয়সে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশে গমন করেন। প্রথমে তিনি বল্খ প্রদেশের বিখ্যাত আলেম কুতুবিয়া ইবনে সাঈদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারপর নজ্দ, হেজাজ, সিরিয়া, ইরাক, বসরা, মিসর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। মুহাদ্দেস আবু দাউদ (রঃ) তাঁর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। আলকাস্তালানী তাঁর 'তাহ্জীবুত্তাহজীব' নামক গ্রন্থে মুহাদ্দেস কুলশিরোমণি ইমাম বুখারী (রঃ)-কেও তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর অন্তর্ভূত করেছেন।

তাঁব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'সুনানে নাসাঈ' বা 'জামেয়ে নাসাঈ' নামক হাদীস সংকলন। গ্রন্থটি সিহাহ্‌সেত্তার (ছয় বিশুদ্ধ হাদীসের) অন্তর্গত। বিখ্যাত মুহাদ্দেস হাকিম আব্দুর রহমান-বিন-নিশাপুরী বলেন, 'ফেকাহ্ এবং হাদীস শাস্ত্রে আব্দুর রহমান বিন নাসায়ীর গ্রন্থ-সংখ্যা যা বলা হয় তার চেয়েও বেশি। যে ব্যক্তি তাঁর সুনান দেখেছেন, তিনি তাঁর ভাষার সৌন্দর্য ও সারল্যে মুগ্ধ হয়েছেন।'

তিনি ছিলেন অত্যন্ত গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্যবান এবং সুদর্শন পুরুষ। তাঁর মুখমণ্ডল গোলাপের পাপড়ির মত লাবণ্য ও মাধুর্যমণ্ডিত ছিল। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও পরহেজগার ছিলেন এবং প্রায়ই উপবাস ব্রত পালন করতেন।

হি. ৩০৩ সনে পবিত্র মক্কানগরীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ইবনে মাজা (রঃ)

হি. ২০৯-২৭৩

খৃী. ৮২৪-৮৮৭

ইবনে মাজার পূর্ণনাম আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ-বিন-এজিদ-ইবনে মাজা। তিনি হিজরী ২০৯ অব্দে ইরাকের অন্তর্গত কাইজন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মক্কা, মদীনা, মিসর, সিরিয়া, কুফা, বাগদাদ প্রভৃতি ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র পরিভ্রমণ করেন। ঐসব শিক্ষাকেন্দ্রে অসংখ্য স্বনামধন্য মুহাদ্দেসদের কাছে তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে 'মুয়াত্তা'-রচয়িতা ইমাম মালেক (রঃ)-র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইবনে মাজা কোরআন শরীফের একখানা তফসীর রচনা করেছিলেন। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'সুনানে ইবনে মাজা' নামক হাদীস সঙ্কলন গ্রন্থ। হাদীস ও ফেকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যের দীপ্তিতে সংকলনখানি ভাস্বর। ৩২টি খণ্ডে বিভক্ত এই সুবিশাল হাদীস-সঙ্কলনে ১৫০০ অধ্যায় এবং চার সহস্র হাদীস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর ভাষা সহজ সরল এবং সর্বজনবোধ্য। এতে পুনরাবৃত্তি নেই। ফলে এর সংক্ষিপ্ত সুন্দর এবং মাধুর্যমণ্ডিত বর্ণনা হাদীস-রসিক পাঠকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে। এই হাদীস সংকলন-খানাই সিহাহ্ সেত্তা বা বিশুদ্ধ ছয় হাদীসের সর্বশেষ গ্রন্থ।

হিজরী ২৭৩ অব্দে ৬৪ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

ইমাম দারকুতনী (রঃ)

হি.৩০৫-৩৮৫

খৃী. ৯১৯-৯৯৫

ইমাম দারকুতনী (রঃ)-এর পূর্ণ নাম ইমাম আবু হোসেন আলী বিন ওমার দারকুতনী। তিনি হিজরী ৩০৫ অব্দে বাগদাদের অন্তর্গত দারকুতনী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবেই তিনি সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ সুন্দর ভাবে কণ্ঠস্থ করে হাফেজ হিসেবে সুখ্যাত হন। কোরআনের নিগূঢ় অর্থ এবং তাৎপর্য সম্পর্কেও তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর তিনি হাদীস শিক্ষায় মনোযোগ দেন। হাদীস শিক্ষার জন্য তিনি সিরিয়া, বসরা, কুফা প্রভৃতি ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। হাদীসশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু সুযোগ্য শিষ্য দেশ-দেশান্তর থেকে তাঁর কাছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে আসতে থাকে। আবু নঈম ইস্পাহানী, আবুবকর বেরকানী, আবুল তৈয়ব তেবুরানী প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দেসগণ তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর শিষ্য তেবুরানী

তাঁর হাদীস-জ্ঞানের অসাধারণত্ব বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেন, 'দারকুতনী হাদীস-শাস্ত্রের আমীরুল মো'মেনীন ছিলেন।'

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন, তবে 'সুনানে ইবনে দারকুতনী'ই তাঁকে বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাসে অমরত্ব প্রদান করেছে। সিহাসেত্তার বিশুদ্ধ হাদীস সমূহের পর এই 'সুনানে দারকুতনীই' বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিজরী ৩৮৫ অব্দে ৮০ বছর বয়সে মহাত্মা দারকুতনী পরলোক গমন করেন।

ইমাম বয়হাকী (রঃ)

হি. ৩৮৪-৪৫৮

খৃী. ৯৯৪-১০৬৬

ইমাম বয়হাকী (রঃ)-র পূর্ণনাম আবুবকর আহমদ বিন হোসায়েন বয়হাকী। তিনি ৩৮৫ হিজরীতে নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস ও মারেফত তত্ত্বে সেকালে তাঁর সমতুল্য ব্যক্তি খুব কমই ছিল। আবু আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী তাঁর একজন বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন। তাঁর হাদীস সিহাহ্সেত্তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবু তা বিশুদ্ধ এবং প্রামাণ্য বলে 'মিশকাত শরীফের' মধ্যে নানান স্থানে সযত্নে সংরক্ষিত হয়েছে।

তিনি ৭৪ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। অতঃপর হিজরী ৪৫৮ সালে জীবনের সকল সাধনা সমাপ্ত করে পরলোকের পথে যাত্রা করেন।